সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ **ঈমান ও আকাইদ (৩৯-৮৮)**
[ঈমান-আকীদা, কুফর, শিরক, বিদআত, রছম, কুসংস্কার, গোনাহে কাবীরা, গোনাহে ছগীরা ইত্যাদি বিষয়ক]

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ **ইবাদাত (৮৯-৩১২)**
[পবিত্রতা, ইস্তেনজা, উযূ, গোসল, তাইয়াম্মুম হায়েয, নেফাছ, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, মুনাজাত, এ'তেকাফ, কুরবানী, মান্নত, কছম, আকীকা, খতনা, পর্দা, চুল, নখ, দাড়ি, গোঁফ, বিভিন্ন দিন ও সময়ের আমল ইত্যাদি বিষয়ক]

তৃতীয় অধ্যায় ঃ **মুআমালাত (৩১৩-৩৬৪)**
[লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, শ্রমনীতি, চাকুরী, কৃষি, শিল্প কল-কারখানা, বিভিন্ন পেশা, বিবাহ, তালাক, ওয়াক্ফ, মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, ওছিয়ত, মীরাছ, শোফআ, বন্ধক, ঋণ, মামলা-মোকদ্দমা, বিচার ইত্যাদি বিষয়ক]

চতুর্থ অধ্যায় ঃ **মুআশারাত (৩৬৬-৫২৭)**
[আচার-আচরণ, মানবাধিকার, পরিবার নীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজ-গোছ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সালাম-কালাম, চিঠি-পত্র, মুছাফাহা, মুআনাকা, কদমবুছী, আদব-কায়দা শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি, খানা-খাদ্য, মেহমানদারী, বন্ধুত্ব, হাদিয়া-তোহফা, রোগ শুশ্রুষা, কাফন-দাফন, ঈসালে ছওয়াব, কবর যেয়ারত, নিদ্রা, স্বপ্ন ইত্যাদি বিষয়ক]

পঞ্চম অধ্যায় ঃ **আখলাকিয়াত (৫৩০-৫৯০)**
[আখলাক- চরিত্র, আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি, পীর-মুরীদী, যিকির-আযকার, দুআ- দুরূদ, তিলাওয়াত ও তাজবীদ ইত্যাদি বিষয়ক]

বিস্তারিত সূচীপত্র

❑ হযরত মাওঃ মাহমূদুল হাসান সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)-এর কথা ২৫
❑ লেখকের কথা ২৮
❑ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গ ৩১
❑ **ইল্‌ম হাছিল (জ্ঞান অর্জন) করা সম্পর্কিত প্রাথমিক কিছু কথা**
* ইল্‌ম কাকে বলে ৩২
* ইল্‌ম হাছিল করার গুরুত্ব ৩২
* ইল্‌মের ফজীলত ৩২
* ইল্‌ম হাছিল করার পদ্ধতি ৩২
* (এক) উস্তাদ নির্বাচনের নীতিমালা ৩৩
* (দুই) গ্রন্থ পাঠের নীতিমালা ৩৩
* (তিন) ওয়াজ-নছীহত বা দ্বিনী আলোচনা শোনার নীতিমালা ৩৪
* ইল্‌ম হাছিল করার জন্য যা যা শর্ত ও করণীয় ৩৪
* শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি ৩৫
* ইল্‌মের জন্য সফরের মাসআলা ৩৫
* আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জাগতিক বিদ্যা অর্জন সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ৩৬
* তাকলীদ ও মাযহাব অনুসরণ প্রসঙ্গ ৩৭

প্রথম অধ্যায়

ঈমান ও আকাইদ

❑ কয়েকটি পরিভাষার অর্থ ৩৯
❑ **যে সব বিষয়ে ঈমান রাখতে হয়**
১. "আল্লাহ"-এর উপর ঈমান ৪১
২. ফেরেশতা সম্বন্ধে ঈমান ৪২
৩. নবী ও রাসূল সম্বন্ধে ঈমান ৪২
৪. আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে ঈমান ৪৩
৫. আখেরাত সম্বন্ধে ঈমান ৪৪
৬. তাকদীর সম্বন্ধে ঈমান ৪৭
❑ আল্লাহর ছিফাত বা গুণ প্রকাশক ৯৯টি নাম ৪৯
মুসলমানদের আরও কতিপয় আকীদা
❑ মে'রাজ সম্বন্ধে আকীদা ৫১
❑ আরশ কুরছী সম্বন্ধে আকীদা ৫১
❑ আল্লাহর দীদার সম্বন্ধে আকীদা ৫২
❑ কিয়ামতের আলামত সম্বন্ধে আকীদা ৫২

❏ হযরত মাহ্দী সম্বন্ধে আকীদা ৫২
❏ দাজ্জাল সম্বন্ধে আকীদা ৫৩
❏ হযরত ঈসা (আঃ) এর পৃথিবীতে অবতরণ সম্বন্ধে আকীদা ৫৪
❏ ইয়াজূজ মাজূজ সম্বন্ধে আকীদা ৫৪
❏ আকাশের এক ধরনের ধোঁয়া সম্বন্ধে আকীদা ৫৫
❏ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের আকীদা ৫৫
❏ দাব্বাতুল আরদ সম্বন্ধে আকীদা ৫৫
❏ কিয়ামতের পূর্বক্ষণে দুনিয়ার অবস্থা ও কিয়ামত সংঘটন সম্বন্ধে আকীদা ৫৬
❏ ঈছালে ছওয়াব সম্বন্ধে আকীদা ৫৬
❏ দুআর মধ্যে ওছীলা প্রসঙ্গে আকীদা ৫৬
❏ জীন সম্বন্ধে আকীদা ৫৬
❏ কারামত, কাশ্ফ, এল্হাম ও পীর বুযুর্গ সম্বন্ধে আকীদা ৫৭
❏ অলী, আবদাল, গওছ, কুতুব ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা ৫৮
❏ মাজার সম্বন্ধে আকীদা ৫৯
❏ মাজার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সমূহ ৫৯
❏ সাহাবীদের সম্বন্ধে আকীদা ৫৯
❏ রাসূল (সঃ)-এর বিবি ও আওলাদগণের সম্বন্ধে আকীদা ৬০
❏ আস্বাব/বস্তুর ক্ষমতা সম্বন্ধে আকীদা ৬১
❏ রোগ সংক্রমণ সম্বন্ধে আকীদা ৬১
❏ রাশি ও গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা ৬২
❏ হস্ত রেখা বিচার সম্বন্ধে আকীদা ৬২
❏ রত্ন ও পাথরের প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা ৬২
❏ তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক সম্বন্ধে আকীদা ৬২
❏ নজর ও বাতাস লাগা সম্বন্ধে আকীদা ৬৩
❏ কুলক্ষণ ও সুলক্ষণ সম্বন্ধে আকীদা ৬৪
❏ শরীয়তের আকীদা বিরুদ্ধ কয়েকটি লক্ষণ ও কুলক্ষণের তালিকা ৬৪
❏ আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সম্বন্ধে আকীদা ৬৫
❏ ঈমান সম্পর্কিত কোন বিষয়ে মনে সন্দেহ জাগলে তখন কি করণীয় ৬৬
❏ ঈমান বাড়ে কমে কিভাবে ৬৬
❏ ঈমানের শাখা ৬৬
❏ কতিপয় কুফরী ও তার বিবরণ ৬৯
❏ ঈমান পরিপন্থী কিছু আধুনিক ধ্যান ধারনা ৭১
❏ কতিপয় শিরক ৭৩

❑ কতিপয় বিদআত — ৭৪
❑ কতিপয় রসম বা কুসংস্কার ও কুপ্রথা — ৭৫
❑ কবীরা গোনাহ বা বড় গোনাহের তালিকা — ৭৬
❑ ছগীরা গোনাহের বিবরণ ও তার একটি তালিকা — ৮২
❑ মুসলমান হওয়ার বা মুসলমান বানানোর তরীকা — ৮৬
❑ কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা (تكفير করা)-এর নীতি — ৮৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদাত

❑ কয়েকটি পরিভাষার ব্যাখ্যা — ৮৯
❑ নাপাকীর বর্ণনা — ৯১
❑ শরীর ও কাপড় পাক করার নিয়ম — ৯৩
❑ আসবাব/দ্রব্য পাক করার নিয়ম — ৯৫
❑ জমিন পাক করার নিয়ম — ৯৫
❑ খাদ্য দ্রব্য পাক করার নিয়ম — ৯৬
❑ হাউজ বা ট্যাংকি পাক করার নিয়ম — ৯৬
❑ নলকূপ পাক করার নিয়ম — ৯৮
❑ **পেশাব/পায়খানার সুন্নাত, আদব ও বিধি-নিষেধ সমূহ** — ৯৮
❑ **উযূ**
* উযূর ফরয, সুন্নাত, মোস্তাহাব ও আদব সমূহ — ১০১
* উযূর সব অঙ্গের জন্য প্রযোজ্য মাসায়েল — ১০৮
* উযূ শেষ হওয়ার পর করণীয় কয়েকটি আমল — ১০৯
* যে সব কারণে উযূ মাকরূহ হয় — ১১০
* যে সব কারণে উযূ ভাঙ্গে না — ১১১
* যে সব কারণে উযূ ভেঙ্গে যায় — ১১১
* মাযুর ব্যক্তির উযূর বয়ান — ১১২
❑ **মেসওয়াকের মাসায়েল** — ১১৩
❑ **গোসলের ফরয, সুন্নাত, মোস্তাহাব ও আদব সমূহ** — ১১৪
* গোসলের ফরয সমূহ — ১১৫
* যে সব কারণে গোসল ফরয হয় — ১১৬
* যে সব কারণে গোসল ফরয হয় না — ১১৭
❑ **তাইয়াম্মুমের মাসায়েল** — ১১৭
* কি কি বস্তু দ্বারা তাইয়াম্মুম করা জায়েয — ১১৯
* কোন অপবিত্রতায় তাইয়াম্মুম করা যায় — ১১৯

* কখন তাইয়াম্মুম করতে হবে ১১৯
* কোন কোন্ কারণে তাইয়াম্মুম নষ্ট হয় ১২১
হায়েয ও নিফাসের বর্ণনা
* হায়েযের মাসায়েল ১২১
* নিফাসের মাসায়েল ১২২
* হায়েয ও নিফাসের আরও কতিপয় হুকুম ১২২
* ইস্তেহাযার হুকুম ১২৩
* পবিত্রতার সময়সীমা ও কিছু মাসায়েল ১২৩
মোজায় মসেহ করার বয়ান
* মোজায় মসেহের শর্তসমূহ ১২৪
* কোন্ ধরনের মোজায় মসেহ করা জায়েয ১২৪
* মোজায় কত দিন মসেহ করা জায়েয ১২৪
* মোজায় মসেহের তরীকা ১২৫
* যেসব কারণে মোজায় মসেহ ভঙ্গ হয়ে যায় ১২৫
আযান ইকামতের মাসায়েল ১২৫
* আযানের শর্ত সমূহ ১২৬
* **আযান ইকামতের সুন্নাত ও মোস্তাহাব সমূহ** ১২৬
* আযান ও ইকামতের মাঝে সময়ের ব্যবধান কতটুকু হবে ১২৭
* আযান ও ইকামতের শব্দ সমূহ আদায় করার নিয়ম ১২৮
* আযান বলার সুন্নাত তরীকা ১৩০
* ইকামত বলার সুন্নাত তরীকা ১৩০
* আযানের ভুল সমূহ ১৩১
* ইকামতের ভুল সমূহ ১৩২
* আযান ও ইকামতের জওয়াব প্রসঙ্গ ১৩৩
* যে সব অবস্থায় আযানের জওয়াব দেয়া উচিৎ নয় ১৩৩
* আযান ও ইকামতের শব্দসমূহ এবং তার জওয়াবের শব্দসমূহ ১৩৪
* আযানের সময়কার বিশেষ কয়েকটি আমল ১৩৫
মসজিদে যাওয়ার সুন্নাত ও আদব সমূহ ১৩৬
* মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত ও আদব সমূহ ১৩৭
* মসজিদের ভিতরের সুন্নাত ও আদব সমূহ ১৩৭
* মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত ও আদব সমূহ ১৩৯
নামায
দুই রাকআত নামাযের আমলসমূহ ১৪০

❑ তিন/চার রাকআত নামাযের অতিরিক্ত আমল সমূহ ১৪৭
❑ মুক্তাদীর জন্য খাস মাসায়েল ১৪৮
❑ মাছবূকের জন্য খাস মাসায়েল ১৪৮
* মাছবূক এক রাকআত ছুটে গেলে তা কিভাবে পড়বেন ১৪৯
* মাছবূক দুই রাকআত ছুটে গেলে তা কিভাবে পড়বেন ১৪৯
* মাছবূক তিন রাকআত ছুটে গেলে তা কিভাবে পড়বেন ১৪৯
* মাছবূক কোন রাকআত না পেলে কিভাবে পড়বেন ১৪৯
❑ ইমামের জন্য খাস মাসায়েল ১৫০
❑ **দুআ/মুনাজাতের আদব ও আমল সমূহ**
(ক) দুআ কবূল হওয়ার জন্য সর্বক্ষণ যা যা করণীয় ১৫০
(খ) দুআর সময় বসার আদব ১৫১
(গ) দুআর সময় হাত উঠানোর নিয়মাবলী ১৫১
(ঘ) দুআ শুরু এবং শেষ করার বাক্য সমূহ ১৫১
(ঙ) দুআর সময় মনের অবস্থা যে রকম রাখতে হয় ১৫২
(চ) চাওয়ার আদব সমূহ ১৫২
(ছ) দুআর বিষয় বস্তু বিষয়ক আদব সমূহ ১৫২
(জ) দুআর ভাষা বিষয়ক আদব সমূহ ১৫৩
❑ দুআ সম্পর্কে আর ও বিশেষ কয়েকটি কথা ১৫৩
❑ দুআ কবূল হওয়ার বিশেষ কয়েকটি মুহূর্ত ১৫৩
❑ কুরআনে বর্ণিত বিশেষ কয়েকটি মুনাজাত ১৫৪
❑ হাদীছে বর্ণিত বিশেষ কয়েকটি মুনাজাত ১৫৭
❑ নামাযে মনোযোগ সৃষ্টির জন্য যা যা করণীয় ১৫৯
❑ **ওয়াক্তিয়া নামায** ১৫৯
❑ ফজরের নামায ১৫৯
* ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদার বিশেষ কয়েকটি বিধান ১৬০
* ফজরের দুই রাকআত ফরযের বিশেষ কয়েকটি বিধান ১৬১
❑ জোহরের নামায ১৬১
* জোহরের চার রাকআত সুন্নাতের বিশেষ বিধান সমূহ ১৬১
* জোহরের চার রাকআত ফরযের বিশেষ মাসায়েল ১৬২
❑ আসরের নামায ১৬২
* আসরের চার রাকআত ফরযের বিশেষ কয়েকটি মাসআলা ১৬২
❑ মাগরিবের নামায ১৬২
* মাগরিবের তিন রাকআত ফরযের বিশেষ কয়েকটি মাসআলা ১৬৩

❑ ইশার নামায ১৬৩
* ইশার চার রাকআত ফরযের বিশেষ কয়েকটি মাসায়েল ১৬৩
❑ **জামাআতের মাসায়েল** ১৬৩
* জামাআত ছাড়ার ওযর সমূহ ১৬৬
* কাতারের মাসায়েল ১৬৭
❑ নামাযে লোকমা দেয়া ও নেয়ার মাসায়েল ১৬৮
❑ ইমাম নিযুক্ত করার নীতি ও মাসায়েল ১৬৯
* যাদেরকে ইমাম বানানো মাকরূহ ১৭০
❑ বিতর নামায ও তার মাসায়েল ১৭১
❑ **জুমুআর নামায** ১৭২
* জুমুআর জামাআত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত সমূহ ১৭৩
* জুমুআ ছহীহ হওয়ার শর্তসমূহ ১৭৩
❑ জুমুআর খুতবার সুন্নাত, আদব ও মাসায়েল
* খুতবার জরুরী বিষয় সমূহ ১৭৪
* খুতবার সুন্নাত ও আদব সমূহ ১৭৪
* খতীবের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি মাসায়েল ১৭৫
* খুতবার সময় শ্রোতাদের করণীয় আমলসমূহ ১৭৬
❑ **তারাবীহ্-র নামায ও তার মাসায়েল** ১৭৭
* খতম তারাবীহ্-র মাসায়েল ১৭৮
❑ **ঈদুল ফিতরের নামায** ১৭৯
* ঈদুল ফিতরের নামায পড়ার তরীকা ১৭৯
* ঈদুল ফিতরের খুতবা ও তখনকার আমল সমূহ ১৮০
* ঈদুল ফিতরের খুতবার মধ্যে যে সব বিষয় থাকবে ১৮০
❑ **ঈদুল আযহার নামায** ১৮১
* ঈদুল আযহার খুতবা ও তখনকার আমল সমূহ ১৮১
❑ **তাহাজ্জুদের নামায** ১৮১
❑ তাহিয়্যাতুল উযূ নামায ১৮২
❑ দুখূলুল মসজিদ বা তাহিয়্যাতুল মসজিদ-এর নামায ১৮২
❑ ইশরাক এর নামায ১৮৩
❑ চাশ্‌ত এর নামায ১৮৪
❑ যাওয়াল বা সূর্য ঢলার নামায ১৮৪
❑ আওয়াবীন নামায ১৮৫
❑ **সালাতুত তাছবীহ** ১৮৫

❑ **এস্তেখারার নামায** ১৮৭
❑ সালাতুল কাতল বা নিহত হওয়া কালীন নামায ১৮৮
❑ তওবার নামায ১৮৮
❑ সালাতুল হাজত বা প্রয়োজনের মুহূর্তের নামায ১৮৮
❑ ভয়াবহ পরিস্থিতির নামায ১৮৯
❑ মারাত্মক ধরনের বিপদে কুনূতে নাযেলার আমল ১৮৯
❑ সফরের নামায ১৯০
❑ কছরের নামায ১৯০
❑ সালাতুত তালিবে ওয়াল মাতলূব ১৯১
❑ সালাতুল মারীয বা অসুস্থ ব্যক্তির নামায ১৯২
❑ সালাতুল খাওফ বা ভয়কালীন নামায ১৯৩
❑ সালাতুল ফাতাহ বা বিজয়ের নামায ১৯৪
❑ শোকরের নামায ১৯৪
❑ সালাতুল কুছূফ (সূর্য গ্রহণের নামায) ১৯৪
❑ সালাতুল খুছূফ (চন্দ্র গ্রহণের নামায) ১৯৫
❑ এস্তেস্কার নামায ১৯৫
* নামাযের শর্ত সমূহ ১৯৬
* নামাযের আরকান ১৯৭
* নামাযের ওয়াজিব সমূহ ১৯৭
* নামায ভঙ্গের কারণ সমূহ ১৯৯
* নামাযের মাকরূহ সমূহ ২০১
* যে সব অবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়া যায় ২০২
❑ সাজদায়ে সহোর মাসায়েল ২০৪
❑ নামাযের মধ্যে রাকআত নিয়ে সন্দেহ হলে তার মাসায়েল ২০৬
❑ কাযা নামাযের মাসায়েল ২০৭
❑ উম্‌রী কাযার মাসায়েল ২০৮
❑ নামাযের ফেদিয়ার মাসায়েল ২০৯
❑ **রমযানের রোযা** ২০৯
* রোযার নিয়তের মাসায়েল ২১০
* সেহ্‌রীর মাসায়েল ২১০
* ইফতার-এর মাসায়েল ২১১
* যে সব কারণে রোযা ভাঙ্গে না এবং মাকরূহও হয় না ২১২
* যে সব কারণে রোযা ভাঙ্গে না তবে মাকরূহ হয়ে যায় ২১৩

* যে সব কারণে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হয় ২১৪
* রোযা ভেঙ্গে যাওয়া এবং কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গ ২১৫
* যে সব কারণে রোযা না রাখার অনুমতি আছে ২১৫
* রোযা শুরু করার পর তা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি প্রসঙ্গ ২১৬
* রমযান মাসের সম্মান রক্ষার মাসায়েল ২১৭
* রোযার কাযার মাসায়েল ২১৭
* রোযার কাফফারা-র মাসায়েল ২১৭
* রোযার ফেদিয়ার মাসায়েল ২১৮
❑ নফল রোযার মাসায়েল ২১৯
❑ মান্নতের রোযার মাসায়েল ২১৯
❑ **সুন্নাত এ'তেকাফ** (রমযানের শেষ দশকের এ'তেকাফ)-এর মাসায়েল ২২০
* এ'তেকাফের শর্ত সমূহ ২২০
* এ'তেকাফ ফাসেদ হওয়ার কারণ সমূহ ২২১
* এ'তেকাফের অবস্থায় যে সব জিনিস মাকরূহ ২২১
* এ'তেকাফের মোস্তাহাব ও আদব ২২১
❑ ওয়াজিব এ'তেকাফ (মান্নতের এ'তেকাফ)-এর মাসায়েল ২২২
❑ মোস্তাহাব/ নফল এ'তেকাফের মাসায়েল ২২৩
❑ **যাকাতের মাসায়েল**
* যে পরিমাণ অর্থ সম্পদের যাকাত ফরজ হয় ২২৩
* যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত সমূহ ২২৪
* যে সব অর্থ/ সম্পদের যাকাত আসে না ২২৫
* যাকাত হিসাব করার তরীকা ও মাসায়েল ২২৬
* গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি প্রাণীর যাকাত ২২৯
* কোন কোন লোকদেরকে বা কোন কোন খাতে যাকাত দেয়া যায় না ২৩০
* যে লোকদেরকে যাকাত দেয়া যায় ২৩০
* যাদেরকে যাকাত দেয়া উত্তম ২৩১
* যাকাত আদায় করার তরীকা ও মাসায়েল ২৩১
❑ **সদকায়ে ফিতর/ ফিতরা-এর মাসায়েল** ২৩২
❑ **কুরবানী**
* কুরবানীর ফজীলত ২৩৩
* কাদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব ২৩৩
* কোন্ কোন্ জন্তু দ্বারা কুরবানী করা দুরস্ত আছে ২৩৪
* কুরবানী-র জন্তুর বয়স প্রসঙ্গ ২৩৪

* কুরবানীর জন্তুর স্বাস্থ্যগত অবস্থা প্রসঙ্গ ২৩৪
* শরীকের মাসায়েল এবং একটা পশুতে কয়জন শরীক হতে পারে? ২৩৫
* কুরবানীর পশু জবেহ করা প্রসঙ্গ ২৩৬
* গোশত বন্টনের তরীকা ২৩৭
* কুরবানীর গোশত খাওয়া ও দান করার মাসায়েল ২৩৭
* কুরবানীর পশুর চামড়া সম্পর্কিত মাসায়েল ২৩৮

❑ আকীকার মাসায়েল ২৩৮

❑ মান্নতের মাসায়েল ২৩৯

❑ কছমের মাসায়েল ২৪০

❑ কছমের কাফফারা ২৪২

❑ হজ্জ

* হজ্জ ও উমরার ফজীলত ২৪২
* কাদের উপর হজ্জ ফরয ২৪৩
* হজ্জ ফরয হওয়ার পর না করা বা বিলম্ব করা ২৪৩
* উমরাতে যা যা করতে হয় ২৪৩
* কোন্ প্রকার হজ্জ করা উত্তম ২৪৪
* এফরাদ হজ্জে যা যা করতে হয় ২৪৪
* কেরান হজ্জে যা যা করতে হয় ২৪৫
* তামাত্তু হজ্জে যা যা করতে হয় ২৪৭
* এহরামের মাসায়েল ২৪৮
* কোথা থেকে এহরাম বাঁধবেন ২৪৮
* এহরাম বাঁধার তরীকা ২৪৯
* এহরামের অবস্থায় যা যা করা উত্তম ২৫১
* এহরাম অবস্থায় যা যা নিষিদ্ধ ২৫১
* এহরাম অবস্থায় যা যা মাকরূহ ২৫২
* মক্কা ও হারাম শরীফে প্রবেশের সুন্নাত ও আদব সমূহ ২৫৩
* তওয়াফের তরীকা ও মাসায়েল ২৫৪
* সায়ীর তরীকা ও মাসায়েল ২৫৮
* মাথা মুন্ডন করা বা চুল ছাঁটার মাসায়েল ২৬০
* ৮ই জিলহজ্জ মিনায় গমন ও তথায় অবস্থানের মাসায়েল ২৬১
* ৯ই জিলহজ্জ আরাফায় গমন ও উকূফে আরাফার মাসায়েল ২৬১
* মুযদালেফায় গমন ও উকূফে মুযদালেফার মাসায়েল ২৬৩
* ১০ই জিলহজ্জ থেকে ১৩ই জিলহজ্জ পর্যন্ত সময়ের আহকাম ২৬৪

* কংকর নিক্ষেপের তরীকা ২৬৪
* তওয়াফে যিয়ারত ২৬৬
* বিদায়ী তওয়াফ ২৬৭
* বদলী হজ্জের মাসায়েল ২৭৮
* নফল উমরা ও নফল তওয়াফের মাসায়েল ২৬৯
* যে সব কারণে দম বা সদকা দিতে হয় ২৬৯
❑ মক্কায় যিয়ারতের স্থান সমূহ ২৭৪
❑ মদীনা মুনাওয়ারা-র যিয়ারত ২৭৬
❑ মদীনাতে *যিয়ারতের বিশেষ কয়েকটি স্থান* ২৮০
❑ **পর্দার আহকাম** ২৮৩
* নারীর মাহরাম ২৮৪
* পুরুষের মাহরাম ২৮৫
❑ **খতনার আহকাম** ২৮৬
❑ **গোঁপ, দাড়ির মাসায়েল** ২৮৬
❑ **চুল ও শরীরের অন্যান্য পশমের মাসায়েল** ২৮৭
❑ **নখ কাটার মাসায়েল** ২৮৯
❑ **বিশেষ কয়েকটি দিন, রাত ও বিশেষ কয়েকটি সময়ের আমলসমূহ**
* জুমুআর দিনের বিশেষ কয়েকটি আমল ২৮৯
* সকাল সন্ধার বিশেষ কয়েকটি আমল ২৯০
* প্রত্যেক ফরয নামাযের পরের বিশেষ কয়েকটি আমল ২৯৪
* আইয়্যামে বীযের আমল (রোযা) ২৯৫
* আশূরা উপলক্ষে করণীয় আমল সমূহ ২৯৫
* শবে বরাত– এর আমল সমূহ ২৯৬
* শবে কদর এর ফজীলত ও করণীয় ২৯৮
* দুই ঈদের রাত ২৯৯
* তাকবীরে তাশরীকের বিধান ২৯৯
* ঈদের দিনগুলো ৩০০
* ১লা *এপ্রিলে এপ্রিল* ফুল পালন করা ৩০১
* শাওয়ালের ছয় রোযা ৩০১
* ৯ই জিলহজ্জের রোযা ৩০১
* শবে মেরাজ ৩০১
* ১২ই রবিউল আউয়াল ৩০২
* ফাতেহা ইয়াযদহম ৩০৩

* আখেরী চাহার শোম্বাহ ৩০৩
❑ মসজিদের অর্থ কড়ি, মসজিদ নির্মাণের পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের মাসায়েল ৩০৪
❑ মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত মাসায়েল ৩০৫
❑ মাদ্রাসা সম্পর্কিত নীতিমালা ও মাসায়েল ৩০৭
❑ মসজিদ মাদ্রাসা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ধর্মীয় কাজের জন্য চাঁদা কালেকশনের মাসায়েল ৩০৯
❑ কবরস্থান সম্পর্কিত মাসায়েল ৩১০
❑ ঈদগাহ সম্পর্কিত মাসায়েল ৩১১
❑ মুতাওয়াল্লী, মুহতামিম এবং মসজিদ/মাদ্রাসা কমিটির গুণাবলী ও দায়িত্ব কর্তব্য ৩১১

তৃতীয় অধ্যায়

মুআমালাত

অর্থনীতি

❑ সম্পদ উপার্জনের নীতিমালা ৩১৩
❑ সম্পদ ব্যয়ের নীতিমালা ৩১৪
❑ সম্পদ সঞ্চয় ও সংরক্ষণের মাসায়েল ৩১৫
❑ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে টাকা দেয়ার মাসায়েল ৩১৫
❑ কোম্পানী বা যৌথ কারবারের মাসায়েল ৩১৭
❑ যৌথ ফার্মের মাসায়েল ৩১৯
❑ মিল/ফ্যাক্টরীর সাথে সম্পর্কিত মাসায়েল ও শ্রমনীতি ৩২০
❑ পেশাজীবি শ্রমিক/ব্যবসায়ী শ্রমিকদের মাসায়েল ৩২২
❑ ক্রয়-বিক্রয়ের সাধারণ মাসায়েল ৩২৩
❑ বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়ের মাসায়েল ৩২৬
❑ দাম এখন পণ্য পরে—এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের মাসায়েল ৩২৭
❑ আধুনিক কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে শরীয়তের বিধান ৩২৭
❑ চাকুরীজীবিদের বিষয়ে কয়েকটি মাসআলা ৩৩২
❑ চাকুরী বা বসবাসের জন্য বিদেশ গমনের মাসায়েল ৩৩৩
❑ কয়েকটি আধুনিক পেশা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান ৩৩৪
❑ বাড়ি/গৃহ নির্মাণ সম্পর্কিত নীতিমালা ও মাসায়েল ৩৩৬
❑ ঘর/বাড়ি/দোকান ইত্যাদি ভাড়া দেয়ার মাসায়েল ৩৩৭
❑ ঘর/বাড়ি/দোকান ইত্যাদি ভাড়া নেয়ার মাসায়েল ৩৩৮
❑ যানবাহনের ভাড়া দেয়া/নেয়া সম্পর্কিত মাসায়েল ৩৩৯
❑ হক্কে শোফআর মাসায়েল ৩৪০
❑ জমি বর্গা দেয়ার মাসায়েল ৩৪১
❑ গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি রাখালী দেয়ার মাসায়েল ৩৪২

❑ বন্ধকের মাসায়েল ৩৪৩
❑ আরিয়াত বা কোন বস্তু ধার দেয়া নেয়ার মাসায়েল ৩৪৪
❑ আমানতের মাসায়েল ৩৪৫
❑ পড়ে পাওয়া জিনিসের মাসায়েল ৩৪৬
❑ ঋণ সম্পর্কিত আদব ও মাসায়েল ৩৪৭

বিবাহ

❑ যাদের সাথে বিবাহ হারাম ৩৪৮
❑ যাদের সাথে বিবাহ জায়েয ৩৪৯
❑ পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের তরীকা ৩৫০
❑ বিবাহের পয়গাম/প্রস্তাব দেয়ার তরীকা ৩৫০
❑ পাত্রী দেখা প্রসঙ্গ ৩৫১
❑ মহর সম্পর্কিত মাসায়েল ৩৫১
❑ ওলীর বর্ণনা ৩৫২
❑ এযেন নেয়ার তরীকা ও মাসায়েল ৩৫৩
❑ বিবাহের দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে কথা ৩৫৩
❑ আকদ সম্পন্ন করা বা বিবাহ পড়ানোর তরীকা ৩৫৪
❑ বিবাহ মজলিসের কয়েকটি রছম ও কুপ্রথা ৩৫৬
❑ বাসর রাতের কতিপয় বিধান ৩৫৬
❑ ওলীমা বিষয়ক সুন্নাত ও নিয়ম সমূহ ৩৫৬

তালাক

❑ তালাক দেয়ার মাসায়েল ৩৫৭
❑ তালাক দেয়ার তরীকা ৩৫৮
❑ ইদ্দতের মাসায়েল ৩৫৮
❑ ওয়াকফ/ সদকায়ে জারিয়ার মাসায়েল ৩৬০
❑ ওয়াসিয়াত ৩৬১
❑ মীরাছ বা উত্তরাধিকার বন্টনের মাসায়েল ৩৬২
❑ মামলা- মোকদ্দমা, সাক্ষ্য ও বিচার সংক্রান্ত মাসায়েল ৩৬৪

চতুর্থ অধ্যায়

মুআশারাত

মানবাধিকার

❑ মাতা-পিতার জন্য সন্তানের করণীয় তথা মাতা-পিতার অধিকার ৩৬৬
❑ সন্তানের জন্য পিতা-মাতার করণীয় তথা সন্তানের অধিকার ৩৬৮
❑ উস্তাদের জন্য ছাত্রের করণীয় তথা উস্তাদের হক ৩৭০

❑ ছাত্রের জন্য উস্তাদের করণীয় তথা ছাত্রের হক ৩৭২
❑ স্বামীর জন্য স্ত্রীর করণীয় তথা স্বামীর অধিকার সমূহ ৩৭৪
❑ স্ত্রীর জন্য স্বামীর করণীয় তথা স্ত্রীর অধিকার সমূহ ৩৭৭
❑ পীর মুরশিদ বা শাইখে তরীকতের সাথে মুরীদদের করণীয় ৩৮০
❑ উলামায়ে কেরাম, মাশায়েখ ও বুযুর্গদের সাথে করণীয় ৩৮১
❑ সাধারণ মানুষের জন্য উলামা ও মাশায়েখদের করণীয় ৩৮২
❑ ছোটদের প্রতি বড়দের করণীয় ৩৮৩
❑ ইমামের জন্য মুসল্লী/মুক্তাদীগণের করণীয় ৩৮৪
❑ মুসল্লী/ মুক্তাদীদের জন্য ইমামের করণীয় ৩৮৪
❑ আত্মীয় স্বজনের সাথে করণীয় তথা আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ৩৮৫
❑ প্রতিবেশীর সাথে করণীয় (প্রতিবেশীর অধিকার) ৩৮৬
❑ সাধারণ মুসলমানের অধিকার ৩৮৭
❑ অমুসলমানের হক বা অধিকার ৩৮৮
❑ দুঃস্থ মানুষের জন্য করণীয় তথা দুঃস্থদের অধিকার ৩৮৮
❑ শ্রমিকের প্রতি মালিকের করণীয় তথা শ্রমিকের অধিকার ৩৮৯
❑ মালিকের জন্য শ্রমিকের করণীয় তথা মালিকের অধিকার ৩৯০
❑ পশুপক্ষী ও জীবজন্তুর হক বা অধিকার - ৩৯১
❑ চাকর-নওকরদের সাথে করণীয় ৩৯১
❑ ব্যবসায়ী/বিক্রেতার করণীয় তথা ক্রেতার অধিকার ৩৯২
❑ ক্রেতার করণীয় তথা ব্যবসায়ী/বিক্রেতার অধিকার ৩৯৩

আদব, শিষ্টাচার ও সংস্কৃতি

❑ **সাক্ষাত ও মুলাকাতের সুন্নাত এবং আদব সমূহ**
* সাক্ষাতে প্রার্থীর করণীয় ৩৯৩
* যার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করা হয় তার কর্তব্য ৩৯৪
❑ টেলিফোনে কথা বলার সুন্নাত ও আদব সমূহ ৩৯৫
❑ **সালামের সুন্নাত ও আদব সমূহ**
* সালাম প্রদান সংক্রান্ত ৩৯৫
* সালামের জওয়াব সংক্রান্ত ৩৯৭
❑ **মুসাফাহার সুন্নাত ও আদব সমূহ** ৩৯৭
❑ **মুআনাকার মাসায়েল** ৩৯৮
❑ কারও আগমনে দাঁড়িয়ে যাওয়া (কেয়াম করা) ৩৯৯
❑ মুরব্বী ও গুরুজনের কদমবুছী এবং হাত কপালে চুমু দেয়া প্রসঙ্গ
* কদম বুছী ৩৯৯

* হাতে চুমু দেয়া ৪০০
* চেহারা, কপাল ও মাথায় চুমু দেয়া ৪০০
❑ চিঠি-পত্রের সুন্নাত ও আদব সমূহ ৪০০
❑ **মজলিসের সুন্নাত ও আদব সমূহ** ৪০২
❑ কথা বলার সুন্নাত, আদব ও নিয়ম কানুন ৪০৩
❑ আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার তথা দাওয়াত, তাবলীগ এবং ওয়াজ-নছীহত ও বয়ান করার সুন্নাত, আদব ও শর্ত সমূহ ৪০৬
❑ কথা শ্রবণ করার আদব তরীকা ৪০৭
❑ তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে করণীয় ৪০৮
❑ হাসি-ফুর্তি ও রসিকতা সম্পর্কে বিধি-বিধান ৪০৯
❑ প্রশংসা বিষয়ক বিধি-বিধান ৪০৯
❑ হাঁচি সম্পর্কিত বিধি-বিধান ৪১০
❑ হাই সম্পর্কিত বিধি-বিধান ৪১১
❑ **পান করার সুন্নাত ও আদব সমূহ** ৪১১
❑ **খাওয়ার সুন্নাত ও আদব সমূহ** ৪১২
❑ পাত্র ও বরতনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ৪১৫
❑ মজলিসে খানার সুন্নাত ও আদব সমূহ ৪১৫
❑ মেহমানের করণীয় বিশেষ আমল সমূহ ৪১৬
❑ মেজবানের করণীয় বিশেষ আমল সমূহ ৪১৭
❑ হাদিয়া প্রদান করার আদব-তরীকা ৪১৮
❑ হাদিয়া গ্রহণ করার নিয়ম-পদ্ধতি ৪১৯
❑ **পোশাক-পরিচ্ছদের সুন্নাত, আদব ও বিধি-নিষেধ সমূহ**
* পোশাকের কাট-ছাঁট বিষয়ক ৪১৯
* পোশাকের রং বিষয়ক ৪২০
* পোশাকের সুতা ও বুনন বিষয়ক ৪২১
* উচ্চমান ও নিম্নমানের পোশাক বিষয়ক ৪২১
* পোশাক পরিধানের তরীকা বিষয়ক ৪২২
❑ জুতা/স্যাণ্ডেল সম্পর্কিত বিধি-বিধান ৪২৩
❑ আয়না-চিরুনির বিধি-বিধান ৪২৪
❑ তেল, প্রসাধনী ও সাজ-গোছের বিধি-বিধান ৪২৪
❑ সুরমা, আতর ও সেন্ট ব্যবহারের বিধি-বিধান ৪২৫
❑ অলংকারের বিধি-বিধান ৪২৫
❑ মেহেদি ও খেযাব (কলপ) সম্পর্কিত বিধি-বিধান ৪২৬

❑ ভালবাসা ও বন্ধুত্বের নীতিমালা ৪
❑ অমুসলিমদের সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক রাখতে হবে ৪
❑ অমুসলিমদের সাথে একত্রে পানাহার এবং তাদের হাতের তৈরী ও রান্না করা খাদ্য-খাবারের মাসআলা ৪
❑ সুপ্যারিশ সম্পর্কে নীতিমালা ৪
❑ বৈধ ও ভাল সুপারিশের জন্য শর্ত ৪
❑ সুপারিশ মন্দ এবং অবৈধ হয়ে যাওয়ার কারণ সমূহ ৪
❑ **শোয়া এবং ঘুমের সুন্নাত, আদব ও বিধি-নিষেধ সমূহ** ৪
* সপ্ন বিষয়ক বিধি-নিষেধ সমূহ ৪৩
* সহবাসের সুন্নাত, আদব ও বিধি-নিষেধ সমূহ ৪৩
* হায়েয নেফাস অবস্থার বিধি-নিষেধ সমূহ ৪৩
* জানাবাত (বে-গোসল) অবস্থার বিশেষ বিধি-নিষেধ সমূহ ৪৩
❑ **ঘরে প্রবেশের ওয়াজিব, সুন্নাত ও আদব সমূহ** ৪৩
❑ ঘর থেকে বের হওয়ার সুন্নাত ও আদব সমূহ ৪৩
❑ **চলার সুন্নাত ও আদব সমূহ** ৪৩
❑ **যানবাহনের সুন্নাত, আদব ও আমল সমূহ** ৪৪
❑ **সফরে যাওয়ার সুন্নাত, আদব ও বিধি-নিষেধ সমূহ** ৪৪
❑ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের আমল সমূহ ৪৪
❑ বিপদ-আপদ ও বালা-মুছীবতের সময় যা যা করণীয় ৪৪
❑ অন্যকে বিপদ-আপদ ও মুছীবত গ্রস্ত দেখলে যা যা করণীয় ৪৪
❑ নিজের ভাল অবস্থায় বা সুখের অবস্থায় যা যা করণীয় ৪৪
❑ অন্যের ভাল অবস্থা দেখলে যা যা করণীয় ৪৫
❑ **চিকিৎসা বিষয়ক বিধি-বিধান** ৪৫
❑ খতমে ইউনুস/খতমে শেফা ৪৫
❑ খতমে জালালী ৪৫
❑ খতমে বোখারী ৪৫
❑ খতমে খাজেগান ৪৫
❑ খতমে দুরূদে নারিয়া ৪৫
❑ আসবাব গ্রহণ বা বর্জন সম্পর্কে মাসায়েল ৪৫৩
❑ **রোগী শুশ্রূষার সুন্নাত ও আদব সমূহ** ৪৫৪
❑ রোগ অবস্থায় রোগীর যা যা করণীয় ৪৫৫
❑ মুমূর্ষ অবস্থায় রোগীর যা যা করণীয় ৪৫৭
❑ মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট যারা উপস্থিত থাকে তাদের যা যা করণীয় ৪৫৮

- ❑ মৃত্যু হওয়ার পর করণীয় — ৪৫৯
- ❑ **কাফন-দাফন**
- * কবর খননের নিয়ামবলী — ৪৬১
- * কাফনের কাপড় সংক্রান্ত বিষয় সমূহ — ৪৬১
- * কাফনের কাপড়ের পরিমাণ ও তৈরির বিবরণ — ৪৬২
- * মাইয়েতকে গোসল প্রদানের তরীকা — ৪৬২
- * কাফন পরিধান করানোর নিয়ম (পুরুষের) — ৪৬৪
- * কাফন পরিধান করানোর নিয়ম (মহিলার) — ৪৬৪
- ❑ **জানাযা নামাযের বিবরণ** — ৪৬৫
- ❑ জানাযা বহন করার নিয়ম সমূহ — ৪৬৭
- ❑ জানাযা বহন করার মোস্তাহাব তরীকা — ৪৬৭
- ❑ **দাফনের নিয়ম-পদ্ধতি** — ৪৬৮
- ❑ দাফনের পর যা যা করণীয় — ৪৬৯
- ❑ মাইয়েতের পরিবারের সাথে অন্যাদের যা যা করণীয় — ৪৭০
- ❑ কবরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিধি-নিষেধ — ৪৭১
- ❑ কবর জেয়ারতের আহকাম — ৪৭২
- ❑ ঈছালে ছওয়াব ও তার তরীকা — ৪৭৩

পরিবার নীতি

- ❑ পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার — ৪৭৪
- ❑ স্ত্রী অবাধ্য হলে তখন যা যা করণীয় — ৪৮০
- ❑ স্ত্রীকে শাসন করার পদ্ধতি ও মাসায়েল — ৪৮১
- ❑ স্ত্রীর প্রতি স্বামী রাগান্বিত হলে স্ত্রীর যা যা করণীয় — ৪৮৩
- ❑ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর রাগ এলে স্বামীর যা যা করণীয় — ৪৮৪
- ❑ স্ত্রীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে তার প্রতিকার — ৪৮৪
- ❑ স্বামীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে তার প্রতিকার — ৪৮৫
- ❑ স্বামীকে বশীভূত করার পদ্ধতি ও মাসায়েল — ৪৮৫
- ❑ শ্বশুর বাড়ীতে বসবাস ও সকলের সাথে মিলে মিশে থাকার নীতি — ৪৮৬
- ❑ পুত্র-বধূর প্রতি শ্বশুর শাশুড়ীর যা যা করণীয় — ৪৮৮
- ❑ **সন্তান লালন-পালন**
- * শিশুর শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত পরিচর্যা — ৪৮৯
- * শিশুর মানসিক পরিচর্যা — ৪৯২
- * শিশুদের আদর সোহাগ প্রসঙ্গ — ৪৯৪
- * সন্তানের নাম রাখা — ৪৯৪

* সন্তানকে কাপড়-চোপড়, খাদ্য-খাবার ও টাকা-পয়সা ইত্যাদি দেয়া সম্পর্কে কতিপয় নীতি ৪৯৫
* সন্তান ও শিশুদের শিক্ষা বিষয়ক নীতি ও মাসায়েল ৪৯৬
* সন্তানের দাবী দাওয়া ও জিদ পূরণ করার বিষয়ে কতিপয় নীতি ও মাসায়েল ৪৯৮
* শিশুদের শাসন করার পদ্ধতি ও মাসায়েল ৪৯৮
* সন্তানকে সচ্চরিত্রবান ও দ্বীনদার বানানোর তরীকা ৪৯৯
* কোন ক্রমেই সন্তানকে সুপথে আনতে না পারলে তখন কি করণীয় ৫০২
❑ যার সন্তান মারা যায় তার জন্য কিছু কথা ৫০৩
❑ যার কোন সন্তান হয় না তার জন্য কিছু কথা ৫০৩
❑ যার পুত্র সন্তান হয় না তার জন্য কিছু কথা ৫০৫
❑ সতীনের সন্তান বা স্ত্রীর ভিন্ন ঘরের সন্তানের জন্য যা করণীয় ৫০৫
❑ প্রসবকালীন সময়ের কয়েকটি মাসআলা ৫০৬
❑ প্রসূতি সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা ৫০৬
❑ জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে মাসায়েল ৫০৭
❑ গর্ভপাত ও এম,আর বিষয়ক মাসায়েল ৫০৯
❑ রান্না-বান্না সম্পর্কিত নীতিমালা ৫০৯
❑ যে সব পশু পক্ষী খাওয়া জায়েয ও হালাল ৫১০
❑ যে সব পশু পক্ষী খাওয়া জায়েয নয় ৫১০
❑ হালাল পশু পক্ষীর যা যা খাওয়া নাজায়েয ৫১১
❑ মাছ ও পানির অন্যান্য প্রাণী সম্পর্কিত মাসায়েল ৫১১
❑ জবাই করার মাসায়েল ৫১২
❑ ঘর সাজানো গোছানো ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মাসায়েল ৫১৩

সমাজনীতি

❑ সমাজ সংস্কার ও নতুন সমাজ গঠনের জন্য যা যা করণীয় ৫১৩
❑ সমাজে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য যা যা করণীয় ৫১৪
❑ নেতার গুণাবলী ৫১৫
❑ নেতার দায়িত্ব ও কর্তব্য ৫১৬
❑ সামাজিক অপরাধ প্রতিকারের জন্য যা যা করণীয়-- ৫১৬
❑ পঞ্চায়েত কোন সামাজিক অপরাধের কি শাস্তি দিতে পারেন -- ৫১৭

রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি

❑ রাজনীতি করা ও রাজনৈতিক দলে যোগ দেয়ার বিধান ৫১৮
❑ হরতাল ও অবরোধ সম্পর্কিত বিধি-বিধান ৫১৮
❑ অনশন ধর্মঘট প্রসঙ্গ ৫১৯
❑ সরকারের আনুগত্য বা সরকার উৎখাতের আন্দোলন সম্পর্কে বিধি-বিধান ৫১৯

- বিবদমান পক্ষসমূহের যা যা করণীয় ও যা যা বর্জনীয় ৫২০
- বিবাদ নিরসন ও ঐক্য সংহতি সৃষ্টির জন্য যা যা করণীয় ৫২১
- নির্বাচনে পদপ্রার্থী হওয়া সম্পর্কে শরীয়তের বিধান ৫২২
- ভোটের ক্যানভ্যাস ও নির্বাচনী প্রচার কার্য সম্পর্কে বিধি-বিধান ৫২২
- ভোট প্রদান সম্পর্কে শরীয়তের বিধান ৫২৩
- খলীফা/ রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৫২৪
- কোন পদে লোক নিয়োগের নীতিমালা ৫২৫
- অমুসলিম রাষ্ট্রে সরকারী পদ গ্রহণ সম্পর্কে বিধান ৫২৬
- কয়েকটি বিশেষ রাষ্ট্রনীতি ৫২৬
- মাশওয়ারা বা পরামর্শ বিষয়ক নীতিমালা ৫২৭

পঞ্চম অধ্যায়

আখলাকিয়্যাত

- **কয়েকটি আত্মিক গুণ ও তা অর্জনের পন্থা**
* এখলাস ও সহীহ নিয়ত ৫৩০
* তাকওয়া ও খোদাভীতি ৫৩০
* ছবর ৫৩১
* হিলম বা সহনশীলতা ৫৩১
* তাফবীয বা নিজেকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করা ৫৩১
* রেযা বিল কাযা বা আল্লাহর ফয়সালায় রাযী থাকা ৫৩২
* তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা) ৫৩২
* শোকর ৫৩৩
* তাওয়াযু' (বিনয়/নম্রতা) ৫৩৩
* খুশু খুযূ' (স্থিরতা ও একাগ্রতা) ৫৩৪
* খাওফ বা আল্লাহর ভয় ৫৩৫
* রজা বা আল্লাহর রহমতের আশা ৫৩৫
* আল্লাহর মহব্বত ও শওক ৫৩৫
* হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগয ফিল্লাহ ৫৩৬
* দেশাত্মবোধ বা দেশ প্রেম ৫৩৭
* গায়রত বা আত্মমর্যাদা বোধ ৫৩৭
* যুহ্দ বা দুনিয়ার মোহ ত্যাগ ৫৩৮
* মোরাকাবা (আল্লাহর ধ্যান) ৫৩৮
* কানায়াত (অল্পেতুষ্টি) ৫৩৯
* ফিক্র (চিন্তা-ভাবনা) ও মুহাছাবা (হিসাব-নিকাশ) ৫৩৯

❑ **কয়েকটি মনের রোগ এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায়**

* রিয়া বা লোক দেখানোর মনোভাব ... ৫৩৯
* হুব্বে জাহ (প্রশংসা ও যশ-প্রীতি) ... ৫৪০
* দুনিয়া এবং মালের মহব্বত ... ৫৪১
* বুখ্‌ল বা কৃপণতা ... ৫৪১
* হিরছ বা লোভ লালসা ... ৫৪২
* এশ্‌রাফে নফ্‌ছ ... ৫৪২
* তাকাব্বুর বা অহংকার ... ৫৪২
* উজ্‌ব বা আত্মগর্ব ... ৫৪৩
* রাগ বা গোস্বা ... ৫৪৪
* বুগ্‌য (বিদ্বেষ/মনোমালিন্য) ও স্বভাব সংকুচন ... ৫৪৫
* হাছাদ (হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা) ও গেবতা ... ৫৪৫
* বদগোমানী বা কু-ধারণা রোগ ... ৫৪৬
* গোনাহের প্রতি আকর্ষণ ... ৫৪৭
* অবৈধ প্রেম ... ৫৪৭

❑ **কয়েকটি বদ অভ্যাস ও পাপ এবং তা বর্জনের উপায়**

* গান বাদ্য শ্রবণ ... ৫৪৮
* অশ্লীল উপন্যাস, কবিতা ও নভেল নাটক পাঠ ... ৫৪৯
* সিনেমা, বাইস্কোফ ও অশ্লীল ছায়াছবি দর্শন ... ৫৪৯
* মদ, গাজা, ভাং, আফিম, হেরোইন প্রভৃতি নেশা ... ৫৪৯
* বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা ও তামাক সেবন ... ৫৫০
* অপব্যয় ... ৫৫০
* অমিতব্যয় ... ৫৫০
* যেনা ... ৫৫১
* হস্তমৈথুন ... ৫৫২
* বালক মৈথুন ... ৫৫২
* বদনজর ... ৫৫২
* গীবত (অপরের দোষ চর্চা) ... ৫৫৩
* চোগলখোরী (কোটনাগিরি) ... ৫৫৪
* তোষামোদ বা চাটুকারিতা ... ৫৫৪
* গালি-গালাজ ও অশ্লীল কথা বলা ... ৫৫৫
* রসিকতা ও ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ করা ... ৫৫৫
* রুক্ষ কথা বলা ... ৫৫৫

* মিথ্যা বলা ... ৫৫৬
* বেশী কথা বলা ... ৫৫৬
* খেলাধূলা করা ও দেখা ... ৫৫৭

❑ **কয়েকটি খেলা সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা**

* দাবা ও ছক্কা পাঞ্জা ... ৫৫৮
* তাশ, পাশা, চৌদ্দগুটি ইত্যাদি ... ৫৫৮
* ফুটবল ও ক্রিকেট ... ৫৫৮
* কেরাম বোর্ড, ফ্লাস ও ঘোড় দৌড় ... ৫৫৮
* জুয়া ... ৫৫৮

❑ **কয়েকটি উত্তম চরিত্র**

* সততা ও সত্যবাদিতা ... ৫৫৯
* আমানতদারী ... ৫৫৯
* সদ্ব্যবহার ... ৫৫৯
* আত্মীয়তা রক্ষা করা ... ৫৬০
* অতিথি পরায়ণতা ... ৫৬০
* ভ্রাতৃত্ব ও স্নেহ-মমতা ... ৫৬০
* ত্যাগ ও বদান্যতা ... ৫৬১
* উদারতা ... ৫৬১
* হায়া বা লজ্জাশীলতা ... ৫৬২
* বড়কে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা ... ৫৬২
* ছোটকে স্নেহ করা ... ৫৬২
* ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন ... ৫৬৩
* ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা ... ৫৬৩
* অঙ্গীকার রক্ষা করা ... ৫৬৩
* পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ... ৫৬৪

❑ আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ... ৫৬৪
❑ আধ্যাত্মিক সংশোধন ও আমল আখলাক হাছিলের জন্য পীর বা শায়খে তরীকতের প্রয়োজনীয়তা ... ৫৬৪
❑ কামেল ও খাঁটি পীরের আলামত ... ৫৬৬
❑ কয়েকটি বিশেষ আমল, যার প্রতি যত্নবান হলে অন্যান্য বহু আমলের পথ খুলে যায় ... ৫৬৬
❑ কয়েকটি বিশেষ গুনাহ যা থেকে বিরত থাকলে প্রায় সকল গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ করা যায় ... ৫৬৭
❑ **যিকিরের সুন্নাত ও আদব সমূহ** ... ৫৬৮
❑ কয়েকটি বিশেষ যিকির ... ৫৬৯
❑ দুরূদ শরীফের বিধি-বিধান প্রসঙ্গ ... ৫৬৯

❏ **তওবা এস্তেগফারের নিয়ম পদ্ধতি** ... ৫৭০
❏ তওবার জন্য যে পাঁচটি কাজ করতে হবে ... ৫৭১
❏ কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে করণীয় আমল সমূহ ... ৫৭১
❏ কুরআনের আদব ও আযমত সম্পর্কিত আরও কয়েকটি বিধান ... ৫৭৫
❏ **তাজবীদের বয়ান** ... ৫৭৫
* মাখরাজের বর্ণনা ... ৫৭৬
* ছিফাতের বর্ণনা ... ৫৭৭
* ১৮টি ছিফাতের মধ্যে কোন্ কোন্ হরফে কি কি ছিফাত পাওয়া যায় তার একটি নকশা ... ৫৮০
* নূন সাকিন/তানবীনকে পড়ার নিয়ম ... ৫৮১
* মীম সাকীনকে পড়ার নিয়ম ... ৫৮২
* ওয়াজিব গুন্নাহর বিবরণ ... ৫৮৩
* মদ-এর বিবরণ ... ৫৮৩
* ل এবং الله (আল্লাহ) শব্দ পড়ার নিয়ম ... ৫৮৫
* ر পুর কিম্বা বারীক পড়ার নিয়ম ... ৫৮৫
* ক্বল্‌ক্বলার আহকাম ... ৫৮৬
* সাক্‌তাহ -এর বর্ণনা ... ৫৮৬
* ওয়াক্‌ফ বা থামার নিয়মনীতি ... ৫৮৭
* ওয়াক্‌ফের চিহ্ন সমূহ ... ৫৮৭
* যেসব স্থানে লেখা হয় এক রকম পড়তে হয় অন্য রকম ... ৫৮৯
❏ তিলাওয়াতের সাজদা ... ৫৯০
❏ গ্রন্থপঞ্জী ... ৫৯৩

মজলিসে দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ-এর আমীর হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম)-এর কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ اَمَّا بَعْدُ!

সমস্ত পৃথিবীর মালিক আল্লাহ পাক। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। তাঁর কোন শরীক নেই। এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করে সকলের উপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন। আর উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে শ্রেষ্টত্ব বজায় রাখার যথাযথ ব্যবস্থা স্বরূপ পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন। প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্ব শেষ নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাঁর একান্ত মেহনত এবং অবিরাম চেষ্টার ফলে চরম বর্বরতার অবসান ঘটে সভ্যতার স্বর্ণযুগ সৃষ্টি হয় এবং এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ব মানবতার উৎকর্ষ সাধন, ইহকাল পরকালের প্রকৃত শান্তি, নিরাপত্তা এবং সফলতা অর্জন -এর এক মাত্র পথ হচ্ছে ইসলাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি সঠিক ঈমান স্থাপন করা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। এর কোন বিকল্প নেই।

এ কথাও আজ সুস্পষ্ট যে, মানুষ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা থেকে যে পরিমাণ দূরে সরে রয়েছে সে পরিমাণই ধ্বংসের ছোবলে আক্রান্ত হয়েছে, হচ্ছে এবং হয়ে চলেছে। কেবল মুসলমানরাই নয় বরং সমস্ত বিধর্মীরাও এ ধ্রুব সত্য অনুধাবনে সক্ষম হয়েছে। তাই দেখা যায় যে, এক শ্রেণীর কুচক্রীরা ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে নির্মূল করে দেয়ার যতই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ততই বিধর্মীদের মধ্যে ইসলামী জীবন বিধান গতিশীল এবং সম্প্রসারিত হচ্ছে, অসংখ্য অমুসলিম ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে চলেছে।

এই মুহূর্তে ইসলামী জীবন বিধান এবং ইসলামী হুকুম আহকামের ব্যাপক এবং নিখুঁত প্রচার প্রসারের বিশেষ প্রয়োজন, প্রয়োজন সম-সাময়িক আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার গবেষণামূলক সঠিক উত্তর এবং জ্ঞান চর্চার। একথা সর্বজন স্বীকৃত

যে, ব্যাপক প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে জ্ঞানগর্ভ রচনা এবং বই পুস্তকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে মুসলিম মনীষীদের অবদান তুলনাহীন। সর্বযুগে সর্ববিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী বিষয়াদির উপর ছোট বড় এত অধিক পরিমাণ কিতাবাদি এবং বই পুস্তক রচিত হয়েছে যার নজির অন্য কোন ধর্মে বিরল।

তবে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে ইসলাম মোতাবিক স্বীয় জীবন গড়ে তোলার জন্য এতসব ঘাটাঘাটি করা অতি সহজ ব্যাপার নয়। জ্ঞানের এবং সময়ের স্বল্পতার সাথে সাথে ভাষাগত জটিলতাও অনেক ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে বাংলা ভাষায় বেহেশতী জেওর সহ অনেক কিতাবাদি বই পুস্তক এ ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রাখছে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এদেশের প্রেক্ষাপট, এখানকার তাহজীব তামাদ্দুন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার চাহিদা আর বিশেষতঃ আধুনিক বিষয়াদির নিরিখে আকায়েদ, ইবাদাত, মুআমালাত, মুআশারাত এবং আখলাকিয়াতের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব রচনার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। আর ছিল বলেই আমি এ বিষয়ের উপর প্রাথমিক কাজও শুরু করেছিলাম, কিন্তু ব্যস্ততা এবং সময়ের স্বল্পতার কারণে কাজে বিলম্ব হতে থাকে। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা হাফেজ হেমায়েত উদ্দীন সাহেব আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং আস্থাভাজন ব্যক্তি। তাঁরই ব্যবস্থাপনায় আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে পবিত্র কুরআন প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে চলেছে। তাঁর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করার পর আমি অবগত হই যে, তিনি উল্লেখ্য বিষয়াদির উপর কাজ করে যথেষ্ট অগ্রসর হয়ে আছেন। তাই তাঁকেই কাজটিকে দ্রুত সমাপ্তির জন্য অনুরোধ করি এবং সম্ভাব্য সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেই।

আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত তিনি অত্যন্ত সঠিক সুন্দরভাবে অনুরূপে উক্ত কিতাব রচনার কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। যার বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নরূপঃ

(১) আকায়েদ, ইবাদাত, মুআমালাত, মুআশারাত এবং আখলাকিয়াতের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সংযুক্ত করেছেন।

(২) আধুনিক মাসলা-মাসায়েল এবং সমসাময়িক বিষয়াদির উপর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন।

(৩) সহজ সরল ভাষায় অত্যন্ত সুন্দর সঠিক ও সাবলীলভাবে মাসলা-মাসায়েল উপস্থাপন করেছেন।

(৪) তুলনামূলক অপ্রসিদ্ধ মাসলা-মাসায়েলের বরাত উল্লেখ করেছেন যাতে প্রয়োজনে কেউ মূল বরাত দেখে নিতে পারেন।

(৫) প্রত্যেকটা ক্ষেত্রের দুআ দরূদও সংশ্লিষ্ট স্থানে উল্লেখ করেছেন।

(৬) প্রত্যেকটা ক্ষেত্রের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত মোস্তাহাব ও আদাব সব ধরনের আহকাম বর্ণনা করেছেন যেন মানুষ সবগুলো জেনে নিজেদের জীবনকে পূর্ণভাবে ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজাতে পারে।

"মজলিসে দাওয়াতুল হক" আল্লাহ পাকের যাবতীয় হুকুম আহকাম ও তাঁর রাসুলের সুন্নাতের পুরাপুরি অনুসরণ অনুকরণ এবং আমর বিল মারূফের সাথে সাথে নাহি আনিল মুনকারের কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। দেশের সর্বত্র পবিত্র কুরআনের পরিশুদ্ধ তেলাওয়াত, সুন্নাতের তালীম, আযান একামতের আমলী মশক, ফরজ ওয়াজিবের সাথে সাথে সুন্নাত, মুস্তাহাব ও আদবের অনুশীলনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। এ সমূহ বিষয়ের উপর জরুরী প্রবন্ধ এবং বই পুস্তক রচনা এবং প্রকাশের ব্যবস্থাও গ্রহণ করছে।

ইসলামের সর্ব বিষয়ে আর বিশেষ করে বর্তমান আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট সমস্যাবলীর সঠিক সমাধানে "আহকামে যিন্দেগী" কিতাবটি বিশেষ অবদান রাখবে বলে মজলিসে দাওয়াতুল হক কিতাবটি প্রকাশে ব্রতী হয়েছে।

আল্লাহ পাক এ গ্রন্থখানির দ্বারা মুসলিম উম্মাহকে তাদের জীবনের সার্বিক দিক পূর্ণ শরীয়তের আলোকে গঠন করার কাজে সহযোগিতা দান করুন এই কামনা করছি।

"আহকামে যিন্দেগী" নামক এ গ্রন্থখানির ন্যায় বড় বড় বিষয় সহ জীবনের বহু খুঁটিনাটি ব্যবহারিক বিষয় নিয়ে সমৃদ্ধ ও ব্যাপক ভিত্তিক কোন একক গ্রন্থ আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। তাই উপমহাদেশ সহ বিশ্বের সর্বত্র প্রচার প্রসারের উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানির উর্দূ, আরবী ও ইংরেজী অনুবাদ হওয়া আবশ্যক মনে করি। কোন আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ কাজে এগিয়ে আসলে ইসলামের একটি বড় খেদমত হবে নিঃসন্দেহে। আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন এবং সকলের মেহনতকে কবূল করুন। আমীন!

মাহমূদুল হাসান

আমীর– মজলিসে দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ।

মুহতামিম–জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া

যাত্রাবাড়ী, ঢাকা– ১২০৪

তাং ৬-৯-৯৮ ইং

লেখকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ اَمَّا بَعْدُ !

ইসলাম মানব জীবনের একটি মুকাম্মাল হেদায়াত ও পূর্ণ দিক নির্দেশনা। মানব জীবনের সর্ব বৃহৎ বিষয় থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের ব্যাপারেও ইসলামের দিক নির্দেশনা ও নীতিমালা রয়েছে। জীবনের এমন কোন বিষয় নেই যেখানে ইসলাম নিরব; এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে ইসলামের নীতি ও দিক নির্দেশনা অনুপস্থিত। উম্মতের ফুকাহা, উলামা, বুযুর্গানে দ্বীন ও মনীষীগণ কুরআন এবং হাদীছ থেকে চয়ন করে এসব নীতিমালা ও দিক নির্দেশনাবলী বিভিন্ন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন, যেন মানুষ সেগুলো জেনে সে অনুযায়ী তার পূর্ণ জীবন ঢেলে সাজাতে পারে এবং যেন মানুষ এভাবে পূর্ণ মুসলমান হতে পারে। যে পূর্ণ মানে সেই তো পূর্ণ মুসলমান।

মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিষয় সম্পর্কে উম্মতের এসব লেখনী শত শত গ্রন্থে এবং বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে; যার সবটা বোঝা এবং সবটা সংগ্রহ করা সকলের পক্ষে দুঃসাধ্যও বটে। এ প্রেক্ষিতে প্রয়োজন ছিল একটি গ্রন্থেই সহজ সরল ভাষায় সব ধরনের তথ্য এবং জীবনের সব আহকাম যথাসাধ্য একত্রিত ভাবে পেশ করার। এরই ভিত্তিতে 'আহকামে যিন্দেগী' নামক এ গ্রন্থটি রচনা ও সংকলনের প্রয়াস।

একটি গ্রন্থেই জীবনের সব কিছু নিয়ে আলোচনা করা ও যাবতীয় হুকুম-আহকাম বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে বয়ান করা সম্ভব নয় তা সকলেরই বোধগম্য। তাই এ গ্রন্থে বিরল বিষয়াদি বাদ দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যেই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে এবং আলোচনা সংক্ষিপ্ত ভাবে করা হয়েছে, দার্শনিক ও বিবরণ মূলক আলোচনার বাহুল্য বর্জন পূর্বক ব্যবহারিক ও আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়কেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়–কিছু ঈমান আকীদার সাথে সম্পর্কিত, কিছু ইবাদাতের সাথে সম্পর্কিত, কিছু মুআমালাত তথা লেন-দেন ও কায়-কারবারের সাথে সম্পর্কিত, কিছু মুআশারাত তথা পারস্পরিক আচার ব্যবহার, পারস্পরিক অধিকার ও সমাজ সামাজিকতার সাথে সম্পর্কিত, আর কিছু আখলাকিয়াত তথা তায্‌কিয়া বা আধ্যাত্মিক সংশোধন ও চরিত্রের সাথে সম্পর্কিত। আলোচ্য গ্রন্থে জীবনের যাবতীয় হুকুম আহকামের বর্ণনাকে এ ভাবেই বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রের দুআ-দুরূদ এবং যিকির-আযকারও সংশ্লিষ্ট স্থানে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। গ্রন্থটির ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গি সহজ সাবলীল রাখা হয়েছে, যাতে সর্বস্তরের মানুষ এ থেকে সহজে উপকৃত হতে পারেন।

প্রত্যেকটা মাসআলার সাথে দলীল ও বরাত উল্লেখ করলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাবে এবং বর্ণনার সবলীলতা বিনষ্ট হবে– এই আশংকায় সাধারণ, প্রচলিত এবং সুবিদিত মাসায়েলের দলীল বা বরাত উল্লেখ করা হয়নি। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তুলনামূলক অপ্রসিদ্ধ মাসআলার শুধু বরাত উল্লেখ করেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। দুআ-দুরূদ ইত্যাদির তর্জমা বর্ণনা করে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাইনি। কেউ তার প্রয়োজন বোধ করলে উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নিতে পারবেন। আর দুআ-দুরূদ ইত্যাদির বাংলা উচ্চারণ লিখে দেইনি এ কারণে যে, এতে যারা আরবী পড়তে জানেন না তাদের আরবী পড়া না শিখে চলতে থাকাকে সমর্থন বা আরও দীর্ঘায়িত করা হয়। তদুপরি বাংলা উচ্চারণ দেখে কখনই শুদ্ধ পড়া সম্ভব নয় এবং অশুদ্ধ পড়লে অনেক ক্ষেত্রে তা গোনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যারা আরবী পড়তে জানেননা, তাদের প্রতি অনুরোধ–আরবী পড়া শিখে নিন, এটা খুব কঠিন বিষয় নয়– একজন ওস্তাদের কাছে আন্তরিকতা সহকারে অল্প কিছু দিন মেহনত করলেই ইনশাআল্লাহ সহীহভাবে পড়া শিখতে পারবেন। মনে রাখবেন–সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে শিখা ফরয। কুরআন সহীহ শুদ্ধ ভাবে পড়তে শিখার জন্য এবং নামাযের কেরাত, দুআ ইত্যাদি সহীহ শুদ্ধ করার মাধ্যমে বিশুদ্ধ নামায পড়ার জন্য এতটুকু কষ্ট স্বীকার করা কি কর্তব্য নয়? এক্ষেত্রে সহযোগিতা নেয়ার জন্য গ্রন্থের শেষে বর্ণিত তাজবীদের বর্ণনা দেখে নেয়া যাবে।

গ্রন্থটি রচনা ও সংকলনের কাজে হাত দেয়ার পর মজলিসে দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ-এর আমীর হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (দামাত বারাকাতুহুম)-

এর সাথে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে তিনি নিজেই এরূপ একটি গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেছেন বলে জানান। তবে আমার রচনা ও সংকলনের কাজ অনেক দূর অগ্রসর জেনে আমাকে এটি পূর্ণ করার জন্য উৎসাহিত করেন এবং নিজের পরিকল্পনাকে স্থগিত করেন। তিনি গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন, দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং সর্বশেষে পুরো গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন। সর্বোপরি মজলিসে দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ–এর পক্ষ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। এসব কিছুর জন্য আমি তাঁর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রইলাম।

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি খানা দেশের আরও বেশ কয়েকজন সুযোগ্য আলেম ও মুফতীকে দেখিয়ে যাচাই বাছাই করানো হয়েছে, তন্মধ্যে বিশিষ্ট মুহাদ্দিস বন্ধুবর মাওলানা আবু সাবের আব্দুল্লাহ ও বিশিষ্ট মুফতী স্নেহভাজন শাগরেদ মাওলানা মুহিউদ্দীন মা'সূম-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তাঁদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। এতদসত্ত্বেও যদি কোন মুহাক্কিক আলেমের দৃষ্টিতে কোন মাসআলায় বা কোন বিষয়ে ভুল-ক্রটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে আমাদেরকে তা অবহিত করার অনুরোধ রইল। বিশেষ ভাবে যুগ ও আধুনিক অবস্থার পেক্ষাপটে যে সব নতুন গবেষণা প্রসূত মাসায়েল সন্নিবেশিত হয়েছে তার ক্ষেত্রে সুচিন্তিত ও অধিকতর তাহকীক সমৃদ্ধ ভিন্ন মত থাকলে এবং তা আমাদেরকে অবহিত করার কষ্ট স্বীকার করলে বা অন্য কোন ভাবে তা জানতে পারলে পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধনী পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থখানিকে আমার ও মুসলমান ভাই বোনদের যিন্দেগী গঠন ও নাজাতের ওছীলা করুন। আমীন!

মুহাঃ হেমায়েত উদ্দীন

তাং ১৭-৭-৯৮ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রসঙ্গ

আলহাম্‌দু লিল্লাহ! আহকামে যিন্দেগী কিতাব খানা উলামায়ে কেরামের নিকটও গ্রহণযোগ্যতা এবং তাঁদের নেক দুআ লাভের সৌভাগ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে। উলামায়ে কেরামের মাশওয়ারা অনুযায়ী আরও কিছু মাসআলার বরাত উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে, কয়েকটি মাসআলায় কিঞ্চিত পরিবর্তন এবং বহুস্থানে প্রয়োজনীয় সংযোজন সাধন করা হয়েছে। বিশেষ ভাবে প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম অধ্যায়ে বেশ কিছু নতুন বিষয়ের সংযোজন উল্লেখ করার মত। বিন্যাসের সৌন্দর্যের দাবিতে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে বেশ কিছু পরিচ্ছেদকে অগ্রপশ্চাত করা হয়েছে। আর সাধারণ পাঠকদের চাহিদা অনুসারে তাদের পড়ার সুবিধার জন্য আরবী লেখনীগুলির সাইজ কিছুটা বড় করে দেয়া হয়েছে এবং দুআ দুরূদ ইত্যাদির অর্থ সংযোজন করা হয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে কিতাবখানার কলেবর কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বের মুদ্রণ প্রমাদও যথাসাধ্য সংশোধন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি- এই সংশোধিত ও পরিবর্ধিত কিতাবখানি সর্বতোভাবে পাঠক মহলের নিকট বরণীয় হবে।

আল্লাহ তাআলা এই কিতাবখানি দ্বারা উম্মতকে আরও অধিক ফায়দা পৌছান এবং এটাকে আমার নাজাতের ওছীলা করুন- এই দুআ করি। আমীন!

বিনীত
মুহাঃ হেমায়েত উদ্দীন
২১-৪-২০০০ইং

ইল্‌ম হাছিল (জ্ঞান অর্জন) করা সম্পর্কিত প্রাথমিক কিছু কথা

ইল্‌ম কাকে বলে ঃ

ইল্‌ম-এর শাব্দিক অর্থ জ্ঞান। ইসলামের পরিভাষা অনুসারে কুরআন হাদীছ তথা ইসলামের জ্ঞানকেই ইল্‌ম বলা হয়। ইল্‌মের সাথে সাথে আমলও কাম্য- আমল বিহীন ইল্‌ম ইল্‌ম হিসেবে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য নয়।

ইল্‌ম হাছিল করার গুরুত্ব ঃ

আবশ্যক পরিমাণ ইল্‌ম হাছিল করা প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর উপর ফরযে আইন। আর ফরয তরক করা কবীরা গোনাহ। আবশ্যক পরিমাণ (যা প্রত্যেকের উপর ফরযে আইন) বলতে বোঝায়- নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয বিষয় এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় লেন-দেন ও কায়-কারবার সম্পর্কিত বিষয়াদির মাসআলা- মাসায়েল ও হুকুম-আহকাম জানা। আবশ্যক পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত ইল্‌ম যা অন্যের উপকারার্থে প্রয়োজন তা হাছিল করা ফরযে কেফায়া অর্থাৎ, কতক লোক অবশ্যই এরূপ থাকতে হবে যারা দ্বীনের সব বিষয়ে সমাধান বলে দিতে পারবেন, নতুবা সকলেই ফরয তরকের পাপে পাপী হবে। তাই প্রতি এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিজ্ঞ আলেম থাকা আবশ্যক।

ইল্‌মের ফজীলত ঃ

* যাদেরকে ইল্‌ম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা উন্নীত করবেন। (আল্ কুরআন)

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলতেনঃ ইল্‌মে দ্বীন চর্চার একটি মজলিস ষাট বৎসর নফল ইবাদাত করা অপেক্ষাও অধিক উৎকৃষ্ট। (এলমের ফজীলত)

* হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেনঃ ইল্‌মে দ্বীনের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা এক হাজার রাকআত নফল অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট, আর এর একটি অধ্যায় শিক্ষা দেয়া একশত রাকআত নফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। (এলমের ফজীলত)

* আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনী বুঝ (ধর্মীয় জ্ঞান) দান করেন। (বোখারী ও মুসলিম)

ইল্‌ম হাছিল করার পদ্ধতি ঃ

সাধারণত তিন পদ্ধতিতে ইল্‌ম হাছিল করা যায় (এক) নিয়মিত কোন উস্তাদ থেকে (দুই) দ্বিনী কিতাবাদি পাঠ করে (তিন) কারও থেকে ওয়াজ নছীহত বা

দ্বিনী আলোচনা শুনে কিম্বা জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই তিনটি পদ্ধতির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা রয়েছে। তা হল ঃ

(এক) উস্তাদ নির্বাচনের নীতিমালা ঃ

১. উস্তাদ হক্কানী ব্যক্তি হতে হবে অর্থাৎ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী হতে হবে, কোন বাতিল মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে উস্তাদ বানানো যাবে না।

২. উস্তাদের চিন্তাধারা ঠিক থাকতে হবে। নতুবা ছাত্রের চিন্তাধারাও সঠিক হয়ে গড়ে উঠবে না।

৩. উস্তাদের মধ্যে ইল্‌ম অনুযায়ী আমল থাকতে হবে।

৪. উস্তাদ আদর্শবান ব্যক্তি হতে হবে এবং তার আখলাক-চরিত্র উন্নত মানের হতে হবে।

(দুই) গ্রন্থ পাঠের নীতিমালা ঃ

১. কোন দ্বীনী বিষয় শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে পাঠ করার জন্য যখন কোন কিতাব (গ্রন্থ) নির্বাচন করতে হবে তখন সর্ব প্রথম দেখতে হবে কিতাব খানার লেখক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কিনা, তিনি ভাল জাননেওয়ালা ব্যক্তি কিনা। যার লেখা কিতাব পাঠ করে ইল্‌ম হাছেল করা হবে তিনিও উস্তাদের পর্যায়ভুক্ত; অতএব পূর্বের পরিচ্ছেদে উস্তাদ নির্বাচনের যে নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে কিতাবখানার লেখক সেই নীতিমালায় উত্তীর্ণ কি না তা দেখে নিতে হবে।

২. বিজ্ঞ আলেম নন– এমন ব্যক্তির জন্য কোন বাতেল পন্থী ও বাতেল মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের লিখিত বই পাঠ করা ঠিক নয়। এরূপ ব্যক্তিদের জন্য বিধর্মীদের কিতাব যেমন তাওরাত, ইঞ্জীল ইত্যাদি পাঠ করাও জায়েয নয়। অনেকে যুক্তি দিয়ে থাকেন– আমরা পাঠ করে ভালটা গ্রহণ করব, মন্দটা গ্রহণ করব না, তাহলে কি অসুবিধা? এ যুক্তি এ জন্য গ্রহণ যোগ্য নয় যে, ভাল/মন্দ সঠিক ভাবে বিচার করার মত পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব থাকায় তিনি হয়ত মন্দটাকেই ভাল ভেবে গ্রহণ করে বিভ্রান্তি ও গুমরাহী-র শিকার হয়ে যেতে পারেন।

৩. কোন ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করে কোন বিষয় সন্দেহ পূর্ণ মনে হলে বা অস্পষ্ট মনে হলে কিম্বা ভাল ভাবে বুঝতে না পারলে দ্বিনী ইল্‌ম সম্বন্ধে বিজ্ঞ আলেম ব্যক্তি থেকে সেটা ভাল ভাবে বুঝে নিতে হবে।

৪. অনেকে দু'চার খানা দ্বীনী পুস্তক পাঠ করেই দ্বীন সম্পর্কে ইজতেহাদ বা গবেষণা শুরু করে দেন, অথচ ইজতেহাদ বা গবেষণা করার জন্য যে শর্ত সমূহ এবং পর্যাপ্ত জ্ঞানের প্রয়োজন তা তার মধ্যে অনুপস্থিত। এটা নিতান্তই বালখিল্যতা। নিজের অজানার বহর সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণেই এরূপ মতি বিভ্রাট ঘটে থাকে। এরূপ লোকদের গ্রন্থ পাঠ গুমরাহীর কারণ হতে পারে।

৫. গ্রন্থের মধ্যে কোথাও কোন মাসআলা বা বর্ণনা যদি নিজেদের মাযহাবের খেলাফ মনে হয়, তাহলে সে অনুযায়ী আমল করা যাবে না। জানার জন্য সেটা পড়া যাবে কিন্তু আমল করতে হবে নিজেদের ইমামদের মাযহাব ও মাসায়েল অনুযায়ী। প্রয়োজন বোধ হলে নিজেদের মাযহাব সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিজ্ঞ আলেম থেকে জেনে নেয়া যাবে। মাযহাব অনুসরণ প্রসঙ্গে দেখুন ৩৭ পৃষ্ঠা।

৬. দ্বিনী কিতাব (গ্রন্থ)-এর আদব রক্ষা করতে হবে।

(তিন) কার্ ওয়াজ-নছীহত বা দ্বিনী আলোচনা শোনা হবে– এ সম্পর্কে নীতিমালা ঃ

১. সর্ব প্রথম দেখতে হবে তার আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তা-ধারা সহীহ কিনা এবং তিনি হক পন্থী কিনা। নিজের জানা না থাকলে কোন আলেম থেকে তার সম্পর্কে জেনে নিতে হবে।

২. জেনে নেয়ার পরও তার কোন বক্তব্য সন্দেহ পূর্ণ মনে হলে কোন বিজ্ঞ আলেম থেকে সে সম্পর্কে তাহকীক করে নিতে হবে। তাহকীক করার পুর্বে সে অনুযায়ী আমল করা যাবেনা বা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে না।

ইল্‌ম হাছিল করার জন্য যা যা শর্ত ও করণীয় ঃ

১. নিয়ত সহীহ করে নিতে হবে অর্থাৎ, আমল করা ও আমল করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার নিয়তে ইলম হাছিল করতে হবে। জ্ঞান অর্জন করে মানুষের সঙ্গে তর্কে বিজয়ী হওয়া বা অহংকার প্রদর্শন কিম্বা সম্মান অর্জন প্রভৃতি নিয়ত রাখা যাবে না।

২. কিছু জানি না– এরূপ মনোভাব নিয়ে ইল্‌ম সন্ধানে থাকতে হবে। জানার জন্য আগ্রহ এবং মনে ব্যাকুলতা থাকতে হবে।

৩. দ্বীনী ইলমের আযমত (সম্মানবোধ) অন্তরে রাখতে হবে। এই ইল্‌ম শিক্ষা করে কী হবে– এরূপ হীনমন্যতা পরিহার করতে হবে।

৪. গোনাহ থেকে মুক্ত থাকতে হবে, কেননা পাপীদের অন্তরে সঠিক ইল্‌ম প্রবেশ করে না।

৫. উস্তাদ ও কিতাবের আদব রক্ষা করতে হবে। উস্তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে এবং উস্তাদের হক আদায় করতে হবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৩৭০ পৃষ্ঠা।

৬. উস্তাদের জন্য দুআ করতে হবে। কিতাব পাঠ করে জ্ঞান অর্জন করা হলে সেই কিতাবের লেখকের জন্যও দুআ করা কর্তব্য।

৭. ইল্‌মের জন্য মেহনত করতে হবে।

৮. যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত বার বার উস্তাদকে জিজ্ঞেস করে কিম্বা বারবার পড়ে সেটা পরিষ্কার করে নিতে হবে।

৯. ইল্‌ম বৃদ্ধির জন্য এবং ভালভাবে বুঝে আসার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে।

১০. ইল্‌ম অর্জন করে এই ইল্‌ম অন্যকে শিক্ষা দেয়া এবং এই ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করার জন্য অন্যকে দাওয়াত দেয়ার নিয়তও রাখতে হবে।

শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি ঃ

এ সম্পর্কে ছাত্রের করণীয় এবং উস্তাদের করণীয় শীর্ষক দুইটি পরিচ্ছেদে পরোক্ষভাবে আলোচনা এসে গিয়েছে। দেখুন ৩৭০-৩৭৩ পৃষ্ঠা।

ইল্‌মের জন্য সফরের মাসআলা ঃ

সফরের কারণে যদি মাতা-পিতা বা স্ত্রী সন্তানাদির ভরণ-পোষণ বা জীবনের আশংকা হয় অর্থাৎ, তার সম্পদ না থাকে এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের মত কেউ না থাকে, তাহলে ইল্‌ম অর্জন করার জন্য কোন অবস্থাতেই সফর করতে পারবে না, চাই ফরযে আইন পর্যায়ের ইল্‌ম হাছিল করার জন্য হোক বা ফরযে কেফায়া পর্যায়ের ইল্‌ম হাছিল করার জন্য হোক। আর তাদের ব্যাপারে এরূপ আশংকা না থাকলে মাতা-পিতা বা স্ত্রীর নিষেধাজ্ঞা মানবে না। তবে সন্তান যদি দাড়ি বিহীন বালক হয় আর পিতা-মাতা তার চরিত্র নষ্ট হওয়ার আশংকায় সফর করতে নিষেধ করেন তাহলে সে নিষেধাজ্ঞা মান্য করা জরুরী কিম্বা যদি সফরের কারণে সন্তানের জীবনের আশংকা থাকে তাহলেও সন্তানকে মাতা-পিতার নিষেধাজ্ঞা মানতে হবে। আর মোস্তাহাব পর্যায়ের ইলম অর্থাৎ, গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করার পর্যায়ের ইলম হাছিল করার জন্য সর্বাবস্থায় মাতা-পিতার আনুগত্য করা উত্তম। আর স্ত্রীর আনুগত্য করা না করা তার ইচ্ছা– উভয়টার অবকাশ রয়েছে।

স্ত্রীর ভরণ–পোষণ ও চার মাসে অন্ততঃ একবার তার সঙ্গে মিলন স্ত্রীর অধিকার এবং এটা স্বামীর উপর ওয়াজেব। এ অধিকার আদায়ে ত্রুটি না হলে ইলমের জন্য সফর করা জায়েয কিম্বা স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় তার এ অধিকার ছেড়ে দিয়ে স্বামীকে সফরে যাওয়ার অনুমতি দেয় তাহলেও সফর করা জায়েয হবে। অবশ্য এত সব সত্ত্বেও যদি স্ত্রীর ব্যাপারে চারিত্রিক ফেতনার আশংকা হয় তাহলে সফরে থাকা জায়েয নয়।

(ماخوذ از احسن الفتاوی ج: ۱)

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জাগতিক বিদ্যা অর্জন সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

বর্তমান যুগের পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, বিদ্যুৎ বিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান, নক্ষত্র বিজ্ঞান, মনস্তত্ব বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলি শিক্ষা করা যদি ইসলামের উৎকর্ষ সাধন ও মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তা বৈধ, কেননা ভাল উদ্দেশ্যে তা শিক্ষা করা হচ্ছে। এর বিপরীত কোন মন্দ উদ্দেশ্যে এগুলি শিক্ষা করা বৈধ নয়। ফেকাহর পরিভাষায় এগুলিকে 'হারাম লেগায়রিহী' বলে– 'হারাম লে আয়নিহী' নয় অর্থাৎ, প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলি নিজে হালাল, জায়েয ও মোবাহ, কিন্তু অন্য হারাম কাজের ওছীলা ও মাধ্যম হওয়ার কারণে তা হারাম হয়ে যায়। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্য ভাল হলে এগুলিই তখন অনেক নেকীর কাজে পরিণত হয়। (ইংরেজী পড়িবনা কেন? মূল– হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী, অনুবাদ হযরত মাওঃ শামছুল হক ফরিদপুরী) এরই ভিত্তিতে মাওলানা থানবী (রহঃ) লিখেছেন (উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট্য দ্রঃ) "যদি কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে সততা সহকারে মানব সমাজের সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে রাস্তা, পুল, ঘর/বাড়ি তৈরি করে মানুষের উপকার করতে পারে, চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা করে মানুষের সেবা করতে পারে, তাহলে তা উচ্চ দরের নেকীর কাজ ও ছওয়াবের কাজ হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে চোরামী ধোঁকাবাজী করে, ব্লাক মার্কেটিং করে, আমানতে খেয়ানত করে, মানুষের বাড়ি-ঘর, পুল, রাস্তা ইত্যাদি নষ্ট করে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ে গরীব রোগীদের সেবার পরিবর্তে শুধু অর্থগৃধ্নুতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গরীবদের রক্ত শোষণ এবং গরীবদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, নতুন আবিষ্কারের মেশিন দ্বারা নিরীহ মানুষদের হত্যা করে, অর্থ শোষণ করে তাদেরকে কঙ্কালসার করে দেয়, তবে সেটা কুরআন হাদীসের সাধারণ সূত্র অনুসারে হারাম হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

তাক্‌লীদ ও মাযহাব অনুসরণ প্রসঙ্গ

প্রত্যেক মুসলমানের উপর মূলতঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ করা ফরয। কুরআন এবং হাদীছের অনুসরণের মাধ্যমেই এ ফরয আদায় হবে। কিন্তু সরাসরি যারা কুরআন হাদীসের ভাষা-আরবী বোঝেন না, কিম্বা আরবী ভাষা বুঝলেও কুরআন হাদীস যথাযথ ভাবে অনুধাবন ও তা থেকে মাসলা-মাসায়েল চয়ন ও ইজতেহাদ করার জন্য আরবী ব্যাকরণ, আরবী অলংকার, আরবী সাহিত্য, উসূলে ফেকাহ, উসূলে হাদীছ, উসূলে তাফসীর ইত্যাদি যে সব আনুসঙ্গিক শাস্ত্রগুলো বোঝা প্রয়োজন নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সেগুলো পাঠ করেননি বা পাঠ করলেও গভীরভাবে এসব বিদ্যায় পারদর্শী হতে পারেননি, তাদের পক্ষে সরাসরি সব মাসলা-মাসায়েল কুরআন হাদীছ থেকে চয়ন ও ইজতেহাদ (গবেষণা) করে বের করা যেমন সম্ভব নয় তেমনি তা নিরাপদও নয় বরং গভীর বুৎপত্তি ও দক্ষতার অভাবে অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর শিকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই স্বাভাবিক। তাই এসব শ্রেণীর লোকদের জন্য বিস্তারিত মাসলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধানের জন্য এমন কোন বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই, যিনি উপরোক্ত বিদ্যাসমূহে পারদর্শী ও দক্ষ হওয়ার ফলে সরাসরি সব মাসলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধান কুরআন হাদীছ থেকে চয়ন ও ইজতেহাদ করে বের করতে সক্ষম। এরূপ বিজ্ঞ ও ইজতেহাদের ক্ষমতা সম্পন্ন আলেম তথা মুজতাহিদ ইমামের শরণাপন্ন হওয়া এবং তিনি কুরআন-হাদীছ থেকে চয়ন ও ইজতেহাদ করে সব মাসলা-মাসায়েল ও বিধি-বিধান যেভাবে বলেন তার অনুসরণ করাকেই বলা হয় উক্ত ইমামের তাকলীদ করা বা উক্ত ইমামের মাযহাব অনুসরণ করা। তাকলীদ করা তাই উপরোক্ত শ্রেণী সমূহের লোকদের জন্য ওয়াজিব এবং যে ইমামেরই হোক এরূপ যে কোন এক জনেরই তাকলীদ করা ওয়াজিব। এক এক মাসআলায় এক এক জনের অনুসরণ করা এবং যে মাযহাবের যেটা সুবিধাজনক মনে হয় সেটা অনুসরণ করার অবকাশ নেই এবং সেরূপ করা জায়েযও নয়, কারণ তাতে সুবিধাবাদ ও খাহেশাতের অনুসরণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তার ফলে গোমরাহী-র পথ উন্মুক্ত হয়।

ইতিহাসে অনুরূপ মুজতাহিদ ইমাম অনেকেই অতিবাহিত হয়েছেন। তবে তন্মধ্যে বিশেষভাবে চারজন ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছেন এবং তাঁদের চয়ন ও ইজতেহাদকৃত মাসলা-মাসায়েল তথা তাঁদের মাযহাব ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে। তাই আমরা চার ইমাম ও চার মাযহাব-এর কথা শুনে থাকি। উক্ত চার জন ইমাম হলেন হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ), হযরত ইমাম শাফিয়ী (রহঃ), হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) ও হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)। তাঁদের মাযহাবকেই যথাক্রমে হানাফী মাযহাব, শাফিয়ী মাযহাব, মালেকী মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাব বলা হয়ে থাকে। এ সব মাযহাবই হক, তবে অনুসরণ যে কোন একটারই করতে হবে, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। উপমহাদেশের মুসলমান সহ পৃথিবীর অধিক সংখ্যক মুসলমান হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর তথা হানাফী মাযহাব-এর অনুসারী।

ঈমান হচ্ছে সমস্ত আমলের বুনিয়াদ–যার ঈমান নেই
তার কোন আমল কবূল হয় না।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ

যারা কাফের (অর্থাৎ, যাদের ঈমান ঠিক নেই) তাদের আমল সমূহ
মরুভূমির মরীচিকার ন্যায়। (সূরা নূরঃ ৩৯)

প্রথম অধ্যায়

ঈমান ও আকাইদ

কয়েকটি পরিভাষার অর্থ ঃ

* **ঈমান ঃ** "ঈমান" শব্দের শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস করা, স্বীকার করা, ভরসা করা, নিরাপত্তা প্রদান করা ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলা হয় রাসূল (সঃ) কর্তৃক আনীত ঐ সকল বিষয়াদি যা স্পষ্ট ভাবে এবং অবধারিত রূপে প্রমাণিত, সে সমুদয়কে রাসূল (সঃ)-এর প্রতি আস্থাশীল হয়ে বিশ্বাস করা এবং মুখে তা স্বীকার করা (যদি স্বীকার করতে বলা হয়) আর কুরআন হাদীছ এবং সাহাবায়ে কেরাম ও উম্মতের সর্বসম্মত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্মের অবধারিত (বদীহী) বিষয় গুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করা। সংক্ষেপে ও সাধারণ ভাবে ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়।

* **মু'মিন** ঃ যার মধ্যে ঈমান আছে তাকে মু'মিন বলা হয়।

* **ইসলাম** ঃ "ইসলাম" শব্দের শাব্দিক অর্থ মেনে নেয়া, আনুগত্য করা। শরীয়তের পরিভাষায় ইসলাম বলা হয় (ঈমান সহ) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে মেনে নেয়া। সংক্ষেপে ও সাধারণ ভাবে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) কর্তৃক আনীত ধর্মকে ইসলাম বলা হয় বা ধর্মীয় কর্মকে ইসলাম বলা হয়।

বিঃ দ্রঃ 'ঈমান' ও 'ইসলাম' শব্দ দুটো সমার্থবোধক ভাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

* **মুসলমান/মুসলিম** ঃ 'ইসলাম' ধর্ম অনুসারীকে মুসলমান বা মুসলিম বলা হয়।

* **কুফ্র** ঃ যে সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখাকে ঈমান বলা হয়, প্রকাশ্যে তার কোন কিছুকে মুখে অস্বীকার করা বা তার প্রতি অন্তরে অবিশ্বাস রাখা হল কুফর।

* **কাফের** ঃ যার মধ্যে কুফ্র থাকে সে হল 'কাফের'।

* **শির্ক** ঃ আল্লাহর যাত (সত্তা) তাঁর ছিফাত (গুণাবলী) এবং তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক বা অংশীদার বানানো হল শির্ক।

* **মুশ্রিক** ঃ যে শির্ক করে তাকে বলা হয় মুশ্রিক।

* **নেফাক/ মুনাফেকী** ঃ মুখে ঈমান প্রকাশ করা, প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করা অথচ অন্তরে কুফর প্রচ্ছন্ন রাখা−এরূপ কপটতাকে বলা হয় নেফাক বা মুনাফেকী।

* **মুনাফেক** ঃ যে মুনাফেকী করে তাকে বলা হয় মুনাফেক।

* **মুল্হিদ/ যিন্দীক** ঃ যে মৌখিক ভাবে ও প্রকাশ্যে ইসলাম এবং ঈমান-এর অনুসারী কিন্তু নামায, রোযা, হজ্, যাকাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বদীহী ও অবধারিত বিষয় গুলোর এমন ব্যাখ্যা দেয়, যা কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা বিরুদ্ধ, এরূপ লোক প্রকৃত মু'মিন মুসলমান নয়, কুরআনের পরিভাষায় তাকে বলা হয় মুল্হিদ আর হাদীছের পরিভাষায় তাকে বলা হয় যিন্দীক। কারও কারও ব্যাখ্যা মতে সব ধরনের ধর্ম বিরোধী বা মুশরিকদেরকেও যিনদীক বলা হয়। যারা দাহ্রী বা নাস্তিক, তাদেরকেও যিনদীক বলা হয়ে থাকে।

* **মুরতাদ** ঃ ইসলাম ধর্মের অনুসারী কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করলে কিম্বা ঈমান পরিপন্থী কোন কথা বললে বা কাজ করলে তাকে মুরতাদ বলে। সংক্ষেপে মুরতাদ অর্থ ধর্মত্যাগী।

* **ফাসেক** ঃ প্রকাশ্যে যে ব্যক্তি গোনাহে কবীরা করে বেড়ায় তাকে বলে ফাসেক। আবার ব্যাপক অর্থে সব ধরনের অবাধ্যকে ফাসেক বলা হয়, এ হিসেবে একজন কাফেরকেও ফাসেক বলা হতে পারে, যেহেতু সেও অবাধ্য।

* **আকীদা ঃ** "আকীদা"-এর শাব্দিক অর্থ কোন বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলামের পরিভাষায় আকীদা অর্থ দৃঢ় ও মজবুত ঈমান, অকাট্য প্রমাণ ভিত্তিক খবরাখবর ও বিষয়াবলীর প্রতি মনের অটল বিশ্বাস। "আকীদা" শব্দের বহুবচন হল আকাঈদ। **এ'তেকাদ** শব্দটিও আকীদা অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এতেকাদ শব্দের বহুবচন এ'তেকাদাত।

* **আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ঃ** এর জন্য দেখুন ৬৫ পৃষ্ঠা।

যে সব বিষয়ে ঈমান রাখতে হয়

১. "আল্লাহ"-এর উপর ঈমান ঃ

আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান বলতে মৌলিক ভাবে তিনটি বিষয় বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়াকে বুঝায় ঃ

(ক) আল্লাহর সত্তা ও তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা।

(খ) আল্লাহর ছিফাত অর্থাৎ গুণাবলীতে বিশ্বাস করা। আল্লাহর গুণাবলী তাঁর গুণবাচক নাম সমূহে ব্যক্ত হয়েছে। (দেখুন ৪৯-৫০ পৃষ্ঠা)

(গ) তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করা। এই তাওহীদ বা একত্ব আল্লাহর সত্তার ক্ষেত্রে যেমন, তাঁর গুণাবলী ও ইবাদতের ক্ষেত্রেও তেমন অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা যেমন এক-তাঁর সত্তায় কেউ শরীক নেই, তেমনি ভাবে তাঁর গুণাবলীতেও কেউ শরীক নেই এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে, ইবাদতে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা যাবেনা।

তাওহীদের বিপরীত হল শির্‌ক। অতএব একাধিক মা'বূদে বিশ্বাস করা শির্‌ক। যেমন অগ্নিপূজক সম্প্রদায় কল্যাণের মা'বূদ হিসেবে 'ইয়াযদান' এবং অকল্যাণের মা'বূদ হিসেবে 'আহরামান'-কে বিশ্বাস করে। এটা শির্‌ক। এমনিভাবে খৃষ্টানরা তিন খোদা মানে। হিন্দুগণ ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণুকে পালনকর্তা এবং মহাদেবকে সংহারকর্তা বলে মানে; এভাবে তারা একাধিক ভগবানে বিশ্বাসী। এছাড়াও তারা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করে, এটা শির্‌ক।

এমনি ভাবে আল্লাহর গুণাবলীতে কোন সৃষ্টিকে শরীক করা, যেমন মানুষের কোন কল্যাণ সাধন কিম্বা বিপদ মোচন ইত্যাদি বিষয়ে কোন সৃষ্টিকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মনে করা, এটা শির্‌ক।

এমনি ভাবে আল্লাহর সাথে ইবাদতে কাউকে শরীক করাও শির্‌ক, যেমন জলের (অর্থাৎ গঙ্গার), সূর্যের, রামের, যীশুর, দেবতা ইত্যাদির পূজাঁ করা শির্‌ক।

ফেরেশতা সম্বন্ধে ঈমান ঃ

ফেরেশতা সম্বন্ধে এই বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ এক প্রকার নূরের মাখলূক সৃষ্টি করেছেন যারা পুরুষও নয় নারীও নয়। যারা কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপু থেকে মুক্ত। যারা নিষ্পাপ। আল্লাহর আদেশের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম তারা করে না। তারা বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারে। তারা সংখ্যায় অনেক। আল্লাহ তাদেরকে বিপুল শক্তির অধিকারী বানিয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করে বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন– কতিপয় আযাবের কাজে, কতিপয় রহমতের কাজে নিযুক্ত আছে, কতিপয় আমলনামা লেখার কাজে নিযুক্ত, তাদেরকে "কিরামান কাতিবীন" বলা হয়। এমনি ভাবে সৃষ্টির বিভিন্ন কাজে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ নিয়োজিত করে রেখেছেন।

ফেরেশতাদের মধ্যে চারজন সর্বপ্রধান ঃ

(এক) **জিব্রাইল ফেরেশতা ঃ** তিনি ওহী ও আল্লাহর আদেশ বহন করে নবীদের নিকট আনতেন। এছাড়া আল্লাহ যখন যে নির্দেশ প্রদান করেন তা কর্তব্যরত ফেরেশতার নিকট পৌঁছান।

(দুই) **মীকাঈল ফেরেশতা ঃ** তিনি মেঘ প্রস্তুত করা ও বৃষ্টি বর্ষানো এবং আল্লাহর নির্দেশে মাখলূকের জীবিকা সরবরাহের দায়িত্বে নিযুক্ত।

(তিন) **ইসরাফীল ফেরেশতা ঃ** তিনি রূহ সংরক্ষণ ও সিঙ্গায় ফুৎকার দিয়ে দুনিয়াকে ভাঙ্গা ও গড়ার কাজে নিযুক্ত।

(চার) **আযরাঈল ফেরেশতা ঃ** জীবের প্রাণ হরণের কাজে নিযুক্ত তিনি। তাকে 'মালাকুল মউত'ও বলা হয়। রূহ কব্‌য করার সময় তাকে কারও কাছে আসতে হয়না বরং সারা পৃথিবী একটি গ্লোবের ন্যায় তার সামনে অবস্থিত, যার আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে যায় নিজ স্থানে থেকেই তিনি তার রূহ কব্‌য করে নেন। তবে মৃত ব্যক্তি নেককার হলে রহমতের ফেরেশতা আর বদকার হলে আযাবের ফেরেশতা মৃতের নিকট এসে থাকেন এবং মৃত ব্যক্তির রূহ নিয়ে যান।

৩. নবী ও রাসূল সম্বন্ধে ঈমান ঃ

জীন ও ইনছানের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ আসমান থেকে যে কিতাব প্রেরণ করেন, সেই কিতাবের ধারক বাহক বানিয়ে, সেই কিতাব বুঝানো ও ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য তথা আল্লাহর বাণী হুবহু পৌঁছে দেয়ার জন্য এবং আমল করে আদর্শ দেখানোর জন্য আল্লাহ নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং জীন ও মানব জাতির নিকট তাঁদেরকে প্রেরণ করেছেন। তাঁদেরকে বলা হয় নবী বা পয়গম্বর। এই নবীদের মধ্যে বিশেষভাবে যারা নতুন কিতাব প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদেরকে বলা হয় রাসূল, আর যারা নতুন কিতাব প্রাপ্ত হননি বরং পূর্ববর্তী নবীর কিতাব প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদেরকে শুধু নবী বলা হয়। তবে সাধারণ ভাবে নবী, রাসুল, পয়গম্বর সব শব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নবী ও রাসূলদের প্রতি ঈমান রাখার অর্থ হল প্রধানতঃ নিম্নোক্ত বিষয়াবলীতে বিশ্বাস রাখা।

১. নবীগণ নিষ্পাপ-তাঁদের দ্বারা কোন পাপ সংঘটিত হয় না।

২. নবীগণ মানুষ, তাঁরা খোদা নন বা খোদার পুত্র নন বা খোদার রূপান্তর (অবতার) নন বরং তাঁরা খোদার প্রতিনিধি ও নায়েব-আল্লাহর বাণী অনুসারে জ্বিন ও মানুষ জাতিকে হেদায়েতের জন্য তাঁরা দুনিয়াতে প্রেরিত হন।

৩. নবীগণ আল্লাহর বাণী হুবহু পৌঁছে দিয়েছেন।

৪. নবীদের ছিলছিলা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর শেষ হয়েছে।

৫. আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং তিনি খাতামুন্নবী অর্থাৎ, তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না। অন্য কেউ নবী হওয়ার দাবী করলে সে ভণ্ড এবং কাফির।

৬. নবীগণ কবরে জীবিত। আমাদের নবী (সঃ)ও কবরে জীবিত আছেন। তাঁর রওজায় সালাম দেয়া হলে তিনি শুনতে পান এবং উত্তর প্রদান করে থাকেন। অন্য কোন স্থানে থেকে নবীর প্রতি দুরূদ সালাম পাঠ করা হলে নির্ধারিত ফেরেশতারা নবী (সঃ) -এর নিকট তা পৌঁছে দেন।

৭. হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত যত পয়গম্বর এসেছেন, তাঁদের সকলেই হক ও সত্য পয়গম্বর ছিলেন, সকলের প্রতিই ঈমান রাখতে হবে। তবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আগমনের পর অন্য নবীর শরীয়ত রহিত হয়ে গিয়েছে, এখন শুধু হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর শরীয়ত ও তাঁর আনুগত্যই চলবে।

৮. নবীদের দ্বারা তাঁদের সততা প্রমাণিত করার জন্য অনেক সময় অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। এসব অলৌকিক ঘটনাকে 'মু'জেযা' বলে। মু'জেযায় বিশ্বাস করাও ঈমানের অঙ্গীভূত।

৪. আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে ঈমান ঃ

আল্লাহ তা'আলা মানব ও জ্বিন জাতির হেদায়াত এবং দিক নির্দেশনার জন্য নবীদের মাধ্যমে তাঁর বাণীসমূহ পৌঁছে দিয়ে থাকেন। এই বাণী ও আদেশ নিষেধের সমষ্টিকে বলা হয় কিতাব। আল্লাহ তা'আলা যত কিতাব দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তার মধ্যে অনেকগুলো ছিল ছহীফা অর্থাৎ, কয়েক পাতার কিতাব। এক বর্ণনা মতে সর্বমোট ১০৪ খানা কিতাব প্রেরণ করা হয়। তন্মধ্যে চারখানা হল বড় কিতাব। যথা ঃ

(এক) **তাওরাত বা তৌরীত ঃ** যা হযরত মূছা (আঃ)-এর উপর নাযেল হয়।

(দুই) **যবূর** ঃ যা হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর নাযেল হয়।

(তিন) **ইঞ্জীল** ঃ যা হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপর নাযেল হয়। উল্লেখ্য যে, আল্লাহর প্রেরিত আসল ইঞ্জীল দুনিয়াতে কোথাও নেই। বর্তমানে ইঞ্জীল বা বাইবেল নামে যে গ্রন্থ পাওয়া যায় তা মূলতঃ হযরত ঈসা (আঃ) কে আল্লাহ তা'আলা উর্ধ্ব আকাশে উঠিয়ে নেয়ার বহু বৎসর পর কিছু লোক রচনা ও সংকলন করেছিল। তারপর যুগে যুগে বিভিন্ন পাদ্রী ও খৃষ্টান পণ্ডিতগণ তাতে বহু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করেছে। ফলে এটিকে কোন ক্রমেই আর আসমানী ইঞ্জীল বলে মেনে নেয়া যায় না বরং এ হল মানুষের মনগড়া, বিকৃত এবং মানব রচিত ইঞ্জীল–অসমানী ইঞ্জীল নয়।

(চার) **কুরআন** ঃ যা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর নাযেল হয়। কুরআনকে আল-কুরআন, আল-কিতাব, ফুরকান এবং আল-ফুরকানও বলা হয়।

* আল্লাহর কিতাব বা আসমানী কিতাব সম্বন্ধে ঈমান রাখার অর্থ হল প্রধানতঃ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশ্বাস করা ঃ

১. এ সমস্ত কিতাব আল্লাহর বাণী, মানব রচিত নয়।

২. আল্লাহ যেমন অবিনশ্বর ও চিরন্তন, তাঁর বাণীও তদ্রূপ অবিনশ্বর ও চিরন্তন। কুরআন নশ্বর-সৃষ্টি নয়।

৩. আসমানী কিতাব সমূহের মধ্যে কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ।

৪. কুরআন সর্বশেষ কিতাব-এর পর আর কোন কিতাব নাযেল হবে না। কেয়ামত পর্যন্ত কুরআনের বিধানই চলবে। কুরআনের মাধ্যমে অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিধান রহিত হয়ে গিয়েছে।

৫. কুরআনের হেফাজতের জন্য আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন, কাজেই এর পরিবর্তন কেউ করতে পারবে না। কুরআনকে সর্বদা অবিকৃত বলে বিশ্বাস করতে হবে।

৫. আখেরাত সম্বন্ধে ঈমান ঃ

আখেরাত বা পরকাল সম্বন্ধে বিশ্বাস করার অর্থ হল- মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে কবর ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়, হাশর– নশর ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং জান্নাত জাহান্নাম ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়– যেগুলো সম্পর্কে ঈমান আনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে– তার সব কিছুতেই বিশ্বাস করা। অতএব এ পর্যায়ে মোটামুটি ভাবে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীতে বিশ্বাস রাখতে হবে।

(এক) **কবরের সওয়াল জওয়াব সত্য** ঃ কবরে প্রত্যেক মানুষের সংক্ষেপে কিছু পরীক্ষা হবে। মুনকার ও নাকীর নামক দু'জন ফেরেশতা কবরবাসীকে প্রশ্ন

করবে তোমার রব কে? তোমার দ্বীন ধর্ম কি? তোমার রাসূল কে? সে নেককার হলে এ প্রশ্নাবলীর উত্তর সঠিকভাবে দিতে সক্ষম হবে। তখন তার কবরের সাথে এবং জান্নাতের সাথে দুয়ার খুলে যোগাযোগ স্থাপন করে দেয়া হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে সুখে বসবাস করতে থাকবে। আর সে নেককার না হলে (অর্থাৎ কাফের বা মুনাফেক হলে) প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরেই সে বলবে هاه هاه لا ادرى অর্থাৎ . হায় হায় আমি জানি না! তখন জাহান্নামের ও তার কবরের মাঝে দুয়ার খুলে দেয়া হবে এবং বিভিন্ন রকম শাস্তি তাকে দেয়া হবে।

(দুই) **কবরের আযাব সত্যঃ** কবর মূলত ঃ শুধু নির্দিষ্ট কোন গর্তকে বলা হয় না, কবর বলতে আসলে বোঝায় মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে হাশরের ময়দানে পুনর্জীবিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালীন জগতকে। এ জগতকে কবর জগত, আলমে বরযখ বা বরযখের জগত বলা হয়। মৃত্যুর পর মানুষের মরদেহ যেখানেই যেভাবে থাকুক না কেন সে কবর জগতের অধিবাসী হয়ে যায় এবং বদকার হলে তার উপর আযাব চলতে থাকে। কবরের এ আযাব মূলতঃ হয় রূহের উপর এবং রূহের মাধ্যমে দেহও সে আযাব উপলব্ধি করে থাকে। তাই দেহ যেখানেই যেভাবে থাকুক না কেন, জ্বলে পুড়ে ছাই বা পঁচে গলে মাটি হয়ে যাক না কেন, তার যে অংশ অবশিষ্ট থাকবে সেটুকু আযাব উপলব্ধি করবে। আর মৌলিক ভাবে আযাব যেহেতু রূহের উপর হবে, তাই কবরের আযাব হওয়ার জন্য এই দেহ অবশিষ্ট থাকাও অপরিহার্য নয়।

(তিন) **পুনরুত্থান ও হাশর ময়দানের অনুষ্ঠান সত্য ঃ** কিয়ামতের সময় শিংগায় ফুঁক দেয়ার পর সবকিছু নেস্ত-নাবূদ হয়ে যাবে। আবার আল্লাহর হুকুমে এক সময় শিংগায় ফুঁক দেয়া হলে আদি অন্তের সব জ্বিন, ইনছান ও যাবতীয় প্রাণী পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে।

(চার) **আল্লাহর বিচার ও হিসাব নিকাশ সত্য ঃ** পুনর্জীবিত হওয়ার পর সকলকে আল্লাহ তা'আলার বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

(পাঁচ) **নেকী ও বদীর ওজন সত্য ঃ** কিয়ামতের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্য মীজান বা দাড়িপাল্লা (মাপযন্ত্র) স্থাপন করা হবে এবং তার দ্বারা নেকী বদী ওজন করা হবে ও ভাল-মন্দ এবং সৎ-অসতের পরিমাপ করা হবে।

(ছয়) **আমল নামার প্রাপ্তি সত্য ঃ** কিয়ামতের ময়দানে আমল নামা উড়িয়ে দেয়া হবে এবং প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে গিয়ে পড়বে এবং প্রত্যেকে তার জীবনের ভাল-মন্দ যা কিছু করেছে সব তাতে লিখিত অবস্থায় পাবে। নেককারের আমলনামা তার ডান হাতে গিয়ে পৌছবে, আর বদকারের বাম হাতে আমল নামা গিয়ে পড়বে।

(সাত) **হাউযে কাউছার সত্য ঃ** এই উম্মতের মধ্যে যারা পূর্ণভাবে সুন্নাতের পায়রবী করবে, কিয়ামতের ময়দানে রাসূল (সঃ) তাদেরকে একটি হাউয থেকে

পানি পান করাবেন, যার ফলে আর তাদেরকে পিপাসায় কষ্ট দিবে না। এই হাউযকে বলা হয় হাউযে কাউছার।

(আট) **পুলসিরাতকে বিশ্বাস করা ঃ** হাশরের ময়দানের চতুর্দিক জাহান্নাম দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবে। এই জাহান্নামের উপর একটি পুল স্থাপন করা হবে, যা চুলের চেয়ে সরু এবং তলোয়ারের চেয়ে ধারালো হবে। এটাকে বলা হয় পুলসিরাত। সকলকেই এই পুল পার হতে হবে। এই পুলসিরাত হল দুনিয়ার সিরাতে মুস্তাকীমের স্বরূপ। দুনিয়াতে যে যেভাবে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর চলেছে, সে সেভাবে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে–কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ চোখের পলকে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, কেউ দৌড়ে, কেউ হেটে, আবার কেউ হামাগুড়ি দিয়ে। মোট কথা, যার যে পরিমাণ নেকী সে সে রকম গতিতে উক্ত পুল পার হবে। আর পাপীদেরকে জাহান্নামের আংটা জাহান্নামের মধ্যে টেনে ফেলে দিবে।

(নয়) **শাফায়াত সত্য একথা বিশ্বাস করা ঃ** পরকালে রাসূল (সঃ), আলেম, হাফেজ প্রমুখদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে সুপারিশ করার ক্ষমতা দেয়া হবে। রাসূলে কারীম (সঃ) অনেক প্রকারের শাফায়াত বা সুপারিশ করবেন। তন্মধ্যে ঃ

(১) হাশরের ময়দানের কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য। হাশরের ময়দানের কষ্টে সমস্ত মাখলূক যখন পেরেশান হয়ে বড় বড় নবীদের কাছে আল্লাহর নিকট এই মর্মে সুপারিশ করার আবেদন করবে, যেন আল্লাহ পাক বিচারকার্য সমাধান করে হাশরের ময়দানের কষ্ট থেকে সকলকে মুক্তি দেন, তখন সকল নবী অপারগতা প্রকাশ করবেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা সেদিন অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন। অবশেষে রাসূল (সঃ) সেই সুপারিশ করবেন। এটাকে 'শাফায়াতে কুব্‌রা' বা বড় সুপারিশ বলা হয়।

(২) কোন কোন কাফেরের আযাব সহজ করার জন্য। যেমন রাসূলের চাচা আবু তালেবের জন্য এরূপ সুপারিশ হবে।

(৩) কোন কোন মুমিনকে জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য।

(৪) যে সব মুমিন বদ আমল বেশী হওয়ার কারণে জাহান্নামের যোগ্য হয়েছে– এরূপ মুমিনদের কতকের মাগফেরাতের জন্য।

(৫) কোন কোন মুমিনকে বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করানোর জন্য।

(৬) বেহেশতে মুমিনদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য।

(৭) আ'রাফ তথা জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত প্রাচীরে যারা অবস্থান করবে তাদের মুক্তির জন্য।

(দশ) **জান্নাত বা বেহেশতকে বিশ্বাস করা ঃ** আল্লাহর নেক বান্দাদের জন্য আল্লাহ এমন সব নেয়ামত তৈরী করে রেখেছেন যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি, কারও অন্তরে তার পূর্ণ ধারণাও আসতে পারেনা। এই সব মহা

নেয়ামতের স্থান হল জান্নাত বা বেহেশত। জান্নাত কোন কল্পিত বিষয় নয় বরং সৃষ্ট রূপে তা বিদ্যমান আছে এবং অনন্ত কাল বিদ্যমান থাকবে। মুমিনগণও অনন্তকাল সেখানে থাকবেন। জান্নাত বা বেহেশ্‌ত আটটি। যথা ঃ (১) জান্নাতুল খুল্‌দ (২) দারুস সালাম (৩) দারুল কারার (৪) জান্নাতু আদ্‌ন (৫) জান্নাতুল মা'ওয়া (৬) জান্নাতুন নাঈম (৭) জান্নাতু ইল্লিয়্যীন বা দারুল মুকামাহ (৮) জান্নাতুল ফিরদাউস।

(এগার) **জাহান্নাম বা দোযখকে বিশ্বাস করা ঃ** পাপীদেরকে আল্লাহ আগুন ও আগুনের মধ্যে অবস্থিত সাপ, বিচ্ছু, শৃঙখল প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্তির উপকরণ দ্বারা আযাব দেয়ার জন্য যে স্থান প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাকে বলা হয় জাহান্নাম বা দোযখ। দোযখ আল্লাহর সৃষ্ট রূপে বিদ্যমান রয়েছে এবং অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে। কাফেররা অনন্তকাল তাতে অবস্থান করবে।

জাহান্নামের সাতটি স্তর বা দরজা থাকবে। একেক স্তরের শাস্তির ধরন হবে একেক রকম। অপরাধ অনুসারে যে যে স্তরের উপযোগী হবে তাকে সে স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। এ স্তরগুলোর পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। যথা ঃ (এক) জাহান্নাম (দুই) লাযা (তিন) হুতামা (চার) সায়ীর (পাঁচ) সাকার (ছয়) জাহীম (সাত) হাবিয়া।

৬. তাকদীর সম্বন্ধে ঈমান ঃ

ষষ্ট যে বিষয়ে ঈমান রাখতে হয়, তা হল তাকদীরের বিষয়ে ঈমান। "তাকদীর" অর্থ পরিকল্পনা বা নক্‌শা। আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সৃষ্টি করার পূর্বে সৃষ্টি জগতের একটা নকশাও লিখে রেখেছেন, সবকিছুর পরিকল্পনাও লিখে রেখেছেন, এই নকশা ও পরিকল্পনাকেই বলা হয় তাকদীর। এই পরিকল্পনা এবং নকশা অনুসারেই সবকিছু সংঘটিত হয় এবং হবে। অতএব ভাল মন্দ সবকিছুই আল্লাহর তরফ থেকে এবং তাকদীর অনুযায়ী সংঘটিত হয়– এই বিশ্বাস রাখতে হবে। ভাল এবং মন্দ উভয়টার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এই বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য । এর বিপরীত কেউ যদি ভাল বা 'সু'-র জন্য একজন সৃষ্টিকর্তা আর মন্দ বা "কু"-র জন্য অন্য একজন সৃষ্টিকর্তা মানে তাহলে সেটা ঈমানের পরিপন্থী কুফর ও শির্‌ক হয়ে যাবে। যেমন অগ্নিপূজারীগণ কল্যাণ ও 'সু'-র সৃষ্টিকর্তা 'ইয়াযদান" এবং অকল্যাণ ও "কু"-র সৃষ্টিকর্তা "আহ্‌রামান'-কে মানে। হিন্দুগণ 'সু'-র সৃষ্টিকর্তা লক্ষ্মীদেবী এবং 'কু'-র সৃষ্টিকর্তা শনি দেবতাকে মানে। এটা কুফর ও শির্‌ক।

এখানে এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, সবই যখন আল্লাহর পরিকল্পনা অনুসারে হয়, তখন আমলের প্রয়োজন কি, যা হওয়ার তা তো হবেই? এ প্রশ্ন করা যাবে না এ জন্য যে, আল্লাহ তাআলা কর্ম জগতের নক্‌শায় লিখে রেখেছেন যে, যদি

মানুষ ইচ্ছা করে তাহলে এরূপ আর যদি ইচ্ছা না করে তাহলে এরূপ। এমনিভাবে আল্লাহ মন্দ-এর সৃষ্টিকর্তা হলেও তিনি দায়ী নন বরং মানুষ মন্দ করার জন্য দায়ী এ কারণে যে, তাকে আল্লাহ ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, সে নিজের ক্ষমতা ও ইচ্ছা শক্তি মন্দের জন্য ব্যয় করল কেন? এরপরও তাকদীর সম্পর্কে এরূপ প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে এবং মনে তাকদীর ও ভাগ্য সম্পর্কে নানান প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, এরূপ প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন, কেননা তাকদীরের বিষয়টি এমন এক জটিল রহস্যময় যার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করা মানব মেধার পক্ষে সম্ভব নয় এবং তা উদঘাটনের চেষ্টা করাও নিষিদ্ধ। আমাদের কর্তব্য হল তাকদীরে বিশ্বাস করা, আর আল্লাহ পাক আমলের দায়িত্ব দিয়েছেন তাই আমল করে যাওয়া।

তাকদীর সম্বন্ধে ঈমান রাখার অর্থ হল নিম্নোক্ত বিষয়াবলীতে বিশ্বাস রাখা ঃ

১. সব কিছু সৃষ্টি করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা সব কিছু লিখে রেখেছেন।

২. সব কিছু ঘটার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার অনাদি-জ্ঞান সে সম্পর্কে অবহিত এবং তাঁর জানা ও ইচ্ছা অনুসারেই সবকিছু সংঘটিত হয়।

৩. তিনি ভাল ও মন্দ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তবে মন্দ সৃষ্টির জন্য তিনি দোষী নন বরং যে মাখলূক মন্দ উপার্জন করবে সে দোষী, কেননা মন্দ সৃষ্টি মন্দ নয় বরং মন্দ উপার্জন হল মন্দ। মন্দ সৃষ্টি এজন্য মন্দ নয় যে, তার মধ্যেও বহু রহস্য এবং বহু পরোক্ষ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই ভাল কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং মন্দ কাজে তিনি অসন্তুষ্ট।

৪. আল্লাহ তা'আলা কলম দ্বারা লওহে মাহ্ফূজে (সংরক্ষিত ফলকে) তাকদীরের সবকিছু লিখে রেখেছেন। তাই লওহ, কলম ও লওহে যা কিছু লিখে রাখা হয়েছে সব কিছুতে বিশ্বাস রাখা তাকদীরে বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত।

৫. মানুষ একদিকে নিজেকে অক্ষম ভেবে নিজেকে দায়িত্বহীন মনে করবে না এই বলে যে, আমার কিছুই করার নেই তাকদীরে যা আছে তা-ই তো হবে! আবার তাকদীরকে এড়িয়ে মানুষ খোদার সৃষ্টির বাইরেও কিছু করে ফেলতে সক্ষম- এমনও মনে করবে না।

৬. মানুষের প্রতি আল্লাহর যত হুকুম ও আদেশ নিষেধ রয়েছে, তার কোনটি মানুষের সাধ্যের বাইরে নয়। কোন অসাধ্য বিষয়ে আল্লাহ কোন হুকুম ও বিধান দেননি।

৭. আল্লাহ তাআলার উপর কোন কিছু ওয়াজেব নয়, তিনি কাউকে কিছু দিতে বাধ্য নন, তাঁর উপর কারও কোন হুকুম চলেনা, যা কিছু তিনি দান করেন সব তাঁর রহমত ও মেহেরবানী মাত্র।

আল্লাহর ছিফাত বা গুণ প্রকাশক ৯৯টি নাম

১. اَلرَّحْمٰنُ (আর্ রহমানু)- অত্যন্ত দয়াময়;
২. اَلرَّحِيْمُ (আর্ রাহীমু)- পরম দয়ালু;
৩. اَلْمَالِكُ (আল-মালিকু)- অধিপতি;
৪. اَلْقُدُّوْسُ (আল-কুদ্দূসু)- পবিত্র;
৫. اَلسَّلَامُ (আস্ সালামু)- শান্তিময়;
৬. اَلْمُؤْمِنُ (আল-মু'মিনু)- নিরাপত্তা বিধায়ক;
৭. اَلْمُهَيْمِنُ (আল-মুহাইমিনু)- রক্ষক;
৮. اَلْعَزِيْزُ (আল-আযীযু)- পরাক্রমশালী;
৯. اَلْجَبَّارُ (আল-জাব্বারু)- প্রবল;
১০. اَلْمُتَكَبِّرُ (আল-মুতাকাব্বিরু)- মহিমান্বিত;
১১. اَلْخَالِقُ (আল-খালিকু)- স্রষ্টা;
১২. اَلْبَارِئُ আল-বারিউ)- উদ্ভাবনকর্তা;
১৩. اَلْمُصَوِّرُ (আল-মুসাওয়িরু)- আকৃতিদাতা;
১৪. اَلْغَفَّارُ (আল-গাফ্ফারু)- পরম ক্ষমাশীল;
১৫. اَلْقَهَّارُ (আল-কাহ্হারু)- মহাপরাক্রান্ত;
১৬. اَلْوَهَّابُ (আল-ওয়াহ্হাবু)- মহাদাতা;
১৭. اَلرَّزَّاقُ (আররয্যাকু)- রিযক্‌দাতা;
১৮. اَلْفَتَّاحُ (আল-ফাত্তাহ)- মহাবিজয়ী;
১৯. اَلْعَلِيْمُ (আল-আলীমু)- মহাজ্ঞানী;
২০. اَلْقَابِضُ (আল-কাবীযু)- সংকোচনকারী;
২১. اَلْبَاسِطُ (আল-বাসিতু)- সম্প্রসারণকারী;
২২. اَلْخَافِضُ (আল-খাফিযু)- অবনমনকারী;
২৩. اَلرَّافِعُ (আর্-রাফিউ)- উন্নয়নকারী;
২৪. اَلْمُعِزُّ (আল-মুইয্যু)- সম্মানদাতা;
২৫. اَلْمُذِلُّ (আল-মুযিল্লু)- অপমানকারী;
২৬. اَلسَّمِيْعُ (আস্ সামীউ)- সর্বশ্রোতা;
২৭. اَلْبَصِيْرُ (আল-বাছীরু)- সম্যক দ্রষ্টা;
২৮. اَلْحَكَمُ (আল-হাকামু)- মীমাংসাকারী;
২৯. اَلْعَدْلُ (আল-আদলু)- ন্যায়নিষ্ঠ;
৩০. اَللَّطِيْفُ (আল-লাতীফু)- সূক্ষ্ম;
৩১. اَلْخَبِيْرُ (আল-খবীরু)- সর্বজ্ঞ;
৩২. اَلْحَلِيْمُ (আল-হালীমু)- সহিষ্ণু;
৩৩. اَلْعَظِيْمُ (আল-আযীমু)- মহিমাময়;
৩৪. اَلْغَفُوْرُ (আল-গাফূরু)- পরম ক্ষমাকারী;
৩৫. اَلشَّكُوْرُ (আশ্ শাকূরু)- গুণগ্রাহী;
৩৬. اَلْعَلِيُّ (আল-আলিয়্যু)- অত্যুচ্চ;
৩৭. اَلْكَبِيْرُ (আল-কাবীরু)- সুমহান;
৩৮. اَلْحَفِيْظُ (আল-হাফীযু)- মহারক্ষক;
৩৯. اَلْمُقِيْتُ (আল-মুকীতু)- আহার্যদাতা;
৪০. اَلْحَسِيْبُ (আল-হাসীবু)- হিসাব গ্রহণকারী;
৪১. اَلْجَلِيْلُ (আল-জালীলু)- মহিমান্বিত;
৪২. اَلْكَرِيْمُ (আল-কারীমু)- অনুগ্রহকারী;
৪৩. اَلرَّقِيْبُ (আর্ রাকীবু)- পর্যবেক্ষণকারী;
৪৪. اَلْمُجِيْبُ (আল-মুজীবু)- কবূলকারী;
৪৫. اَلْوَاسِعُ (আল-ওয়াছিউ)- সর্বব্যাপী;
৪৬. اَلْحَكِيْمُ (আল-হাকীমু)- প্রজ্ঞাময়;
৪৭. اَلْوَدُوْدُ (আল-ওয়াদূদু)- প্রেমময়;
৪৮. اَلْمَجِيْدُ (আল-মাজীদু)- গৌরবময়;
৪৯. اَلْبَاعِثُ (আল-বা'ইছু)- পুনরুত্থানকারী;
৫০. اَلشَّهِيْدُ (আশ্ শাহীদু)- প্রত্যক্ষকারী;

৫১. اَلْحَقُّ (আল-হাক্কু)- সত্য;

৫৩. اَلْقَوِيُّ (আল-কাবীয়্যু)- শক্তিশালী;

৫৫. اَلْوَلِيُّ (আল-ওয়ালিয়্যু)- অভিভাবক;

৫৭. اَلْمُحْصِي (আল-মুহ্সীউ)- হিসাব গ্রহণকারী;

৫৯. اَلْمُعِيْدُ (আল-মুঈদু)- পুনঃসৃষ্টিকারী;

৬১. اَلْمُمِيْتُ (আল-মুমীতু)- মৃত্যুদাতা;

৬৩. اَلْقَيُّوْمُ (আল-কায়্যূমু)- স্বপ্রতিষ্ঠ সংরক্ষণকারী;

৬৫. اَلْمَاجِدُ (আল-মাজিদু)- মহান;

৬৭. اَلْاَحَدُ (আল-আহাদু)- এক, অদ্বিতীয়;

৬৯. اَلْقَادِرُ (আল-কাদীরু)- শক্তিশালী;

৭১. اَلْمُقَدِّمُ (আল-মুকাদ্দিমু)- অগ্রবর্তীকারী;

৭৩. اَلْاَوَّلُ (আল-আওয়ালু)- প্রথম অর্থাৎ অনাদি;

৭৫. اَلظَّاهِرُ (আয্ যাহিরু)- প্রকাশ্য;

৭৭. اَلْوَالِيُ (আল-ওয়ালীউ)- অধিপতি;

৭৯. اَلْبَرُّ (আল-বাররু)- কৃপাময়;

৮১. اَلْمُنْتَقِمُ (আল-মুনতাকিমু)- শাস্তিদাতা;

৮৩. اَلرَّؤُوْفُ (আর্ রাউফু)- দয়ার্দ্র;

৮৫. ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (যুল জালালি ওয়াল ইকরাম) মহিমাময় মহানুভব;

৮৭. اَلْجَامِعُ (আল-জামিউ)- একত্রকরণকারী;

৮৯. اَلْمُغْنِي (আল-মুগ্নীয়ু)- অভাব মোচনকারী;

৯১. اَلضَّارُّ (আয্ যাররু)- অকল্যাণের মালিক;

৯৩. اَلنُّوْرُ (আন্ নূরু)- জ্যোতির্ময়;

৯৫. اَلْبَدِيْعُ (আল-বাদীউ)- নমূনা বিহীন সৃষ্টিকারী;

৯৭. اَلْوَارِثُ (আল-ওয়ারিসু)- স্বত্বাধিকারী;

৯৯. اَلصَّبُوْرُ (আস্ সাবূরু)- ধৈর্যশীল;

৫২. اَلْوَكِيْلُ (আল-ওয়াকীলু)- কর্মবিধায়ক;

৫৪. اَلْمَتِيْنُ (আল-মাতীনু)- দৃঢ়তা সম্পন্ন;

৫৬. اَلْحَمِيْدُ (আল-হামীদু)- প্রশংসিত;

৫৮. اَلْمُبْدِئُ (আল-মুবদীউ)- আদি স্রষ্টা;

৬০. اَلْمُحْيِي (আল-মুহয়ী)- জীবনদাতা;

৬২. اَلْحَيُّ (আল-হায়্যু- চিরঞ্জীব;

৬৪. اَلْوَاجِدُ (আল-ওয়াজিদু)- প্রাপক;

৬৬. اَلْوَاحِدُ (আল-ওয়াহিদু)- একক;

৬৮. اَلصَّمَدُ (আস্ সমাদু)- অনপেক্ষ;

৭০. اَلْمُقْتَدِرُ (আল-মুকতাদিরু)- ক্ষমতাশালী;

৭২. اَلْمُؤَخِّرُ (আল-মুআখখিরু)- পশ্চাদবর্তীকারী;

৭৪. اَلْاٰخِرُ (আল-আখিরু)- শেষ অর্থাৎ অনন্ত;

৭৬. اَلْبَاطِنُ (আল-বাতিনু)- গুপ্ত;

৭৮. اَلْمُتَعَالِي (আল-মুতা'আলীউ)-সর্বোচ্চ মর্যাদাবান;

৮০. اَلتَّوَّابُ (আত্-তাওয়াবু)- তওবা কবূলকারী;

৮২. اَلْعَفُوُّ (আল-'আফুউ)- ক্ষমাকারী;

৮৪. مَالِكُ الْمُلْكِ (মালিকুল মুল্ক)- সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক;

৮৬. اَلْمُقْسِطُ (আল-মুকসিতু)- ন্যায়পরায়ণ;

৮৮. اَلْغَنِيُّ (আল-গানীয়্যু)- অভাবমুক্ত;

৯০. اَلْمَانِعُ (আল-মানিউ')- প্রতিরোধকারী;

৯২. اَلنَّافِعُ (আন্ নাফিউ')- কল্যাণকারী;

৯৪. اَلْهَادِيُ (আল-হাদীউ)- পথ প্রদর্শক;

৯৬. اَلْبَاقِيُ (আল-বাকীউ)- চিরস্থায়ী;

৯৮. اَلرَّشِيْدُ (আর্ রশীদু)- সত্যদর্শী;

পবিত্র কুরআন ও হাদীছে এ ছাড়া আল্লাহ তাআলার আরও কিছু গুণবাচক নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন–

১. اَلرَّبُّ (আর্ রাব্বু)– প্রতিপালক; ২. اَلْمُنْعِمُ (আল্ মুন্ইমু)– নিয়ামত দানকারী; ৩. اَلْمُعْطِي (আল্ মু'তী)– দাতা; ৪. اَلصَّادِقُ (আস্ সাদিকু)– সত্যবাদী; ৫. اَلسَّتَّارُ (আস্ সাত্তারু)– গোপনকারী।

* 'আল-আছমাউল হুছনা'-র যথাযথ বাংলা অনুবাদ হয় না। এখানে যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা ইংগিত মাত্র। আল-আছমাউল হুছনার মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক গুণাবলী আল্লাহ্র জন্য সত্তাগত, অনাদি-অনন্ত, ব্যাপক ও অসীম। আর মানুষের জন্য এগুলো আল্লাহ্ প্রদত্ত অস্থায়ী ও সীমিত।

* কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্র কতেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। যেমন– يَدٌ হাত, وَجْهٌ মুখমণ্ডল, عَيْنٌ চক্ষু। এগুলোর তাৎপর্য সম্বন্ধে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার যাত ও ছিফাত সম্পর্কে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) যা বলেছেন, তার উপর ঈমান রাখতে হবে। আল্লাহর এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত নয়, আল্লাহ যেমন তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তাঁর শান উপযোগী। এর চেয়ে বিস্তারিত আমাদের জানা নেই।

মুসলমানদের আরও কতিপয় আকীদা

মে'রাজ সম্বন্ধে আকীদা ঃ

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে আল্লাহ তা'আলা একদা রাত্রে জাগরিত অবস্থায় সশরীরে মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে যান। সেখান থেকে সাত আসমানের উপর এবং সেখান থেকেও আরও উপরে যতদূর আল্লাহর ইচ্ছা নিয়ে যান। সেখানে আল্লাহর সাথে রাসূল (সঃ) কথাবার্তা বলেন। তখনই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিধান দেয়া হয় এবং সেই রাতেই রাসূল (সঃ) আবার দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন। একে মে'রাজ বলে।

আরশ কুরছী সম্বন্ধে আকীদা ঃ

'আরশ' অর্থ সিংহাসন, আর 'কুরছী' অর্থ চেয়ার বা আসন। আল্লাহ যেমন, তাঁর আরশ এবং কুরছীও তেমনই শানের হয়ে থাকবে। সপ্তম আসমানের উপর আরশ ও কুরছী অবস্থিত। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আরশ কুরছী এত বিশাল যে, তা সমগ্র আকাশ ও জমীনকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ পাক কোন মাখলূকের ন্যায় উঠা বসা করেন না এবং তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নন। মাখলূকের কোন কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের সাথে আল্লাহর কোন কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের তুলনা হয় না। তারপরও তাঁর

আরশ কুরছী থাকার কি অর্থ, তা অনুধাবন করা মানব জ্ঞানের উর্ধ্বে। আমাদেরকে শুধু আরশ কুরছী সম্বন্ধে আকীদা বিশ্বাস রাখতে হবে।

আল্লাহর দীদার সম্বন্ধে আকীদা ঃ

আল্লাহর দীদার বা আল্লাহকে দেখা সম্বন্ধে ইসলামের আকীদা হল দুনিয়ায় থেকে জাগ্রত অবস্থায় এই চর্ম চক্ষুর দ্বারা কেউ আল্লাহকে দেখতে পারেনি এবং পারবেনা। তবে বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে গিয়ে আল্লাহর দীদার (দর্শন) লাভ করবেন। বেহেশতের অন্যান্য নিয়ামতের তুলনায় এই নেয়ামত (আল্লাহর দীদার) সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় মনে হবে। উল্লেখ্য যে, স্বপ্নে আল্লাহকে দেখা যায় তবে সেটাকে দুনিয়ার চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখা বলা হয় না।

কিয়ামতের আলামত সম্বন্ধে আকীদা ঃ

হাদীছে কিয়ামতের বহু ছোট ছোট আলামত বর্ণিত হয়েছে যা দেখে বোঝা যাবে যে, কিয়ামত তথা দুনিয়ার ধ্বংস হওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। এই সব আলামতের মধ্যে রয়েছে যেমনঃ লোকেরা ওয়াক্ফ ইত্যাদি খোদায়ী মালকে নিজের মালের মত মনে করে ভোগ করতে থাকবে, যাকাত দেয়াকে দণ্ড স্বরূপ মনে করবে, আমানতের মালকে নিজের মাল মনে করে তাতে হস্তক্ষেপ করবে, পুরুষ স্ত্রীর তাবেদারী করবে, মায়ের নাফরমানী করবে, পিতাকে পর মনে করবে, বন্ধু-বান্ধবকে আপন মনে করবে, খারাপ ও বদ লোকেরা রাজত্ব ও সরদারী করবে, অযোগ্য লোকেরা বিভিন্ন কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে, লোকেরা জুলুমের ভয়ে জালেমের তাযীম সম্মান করবে, নাচ গান ও বাদ্য-বাজনার প্রচলন খুব বেশী হবে ইত্যাদি। এগুলোকে বলা হয় কিয়ামতের 'আলামতে ছুগরা' বা কিয়ামতের ছোট ছোট আলামত।

কুরআন ও হাদীছে কিয়ামতের কিছু বড় বড় আলামত বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোকে 'আলামতে কুবরা' বা বড় বড় আলামত বলা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে হযরত মাহ্দীর আবির্ভাব, দাজ্জালের আবির্ভাব, আকাশ থেকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দুনিয়াতে অবতরণ, ইয়াজূজ-মাজূজের আবির্ভাব, দাব্বাতুল আর্দ-এর বহিঃপ্রকাশ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ইত্যাদি। হযরত মাহ্দীর আবির্ভাবের পর থেকে কিয়ামতের বড় বড় আলামত জাহির হওয়া শুরু হবে।

হযরত মাহ্দী (আঃ) সম্বন্ধে আকীদা ঃ

কিয়ামতের ছোট ছোট আলামত প্রকাশিত হওয়ার পর একটা সময় এমন আসবে, যখন কাফেরদের প্রভাব খুব বেশী হবে, চতুর্দিকে নাছারাদের রাজত্ব কায়েম হবে, খায়বারের নিকট পর্যন্ত নাছারাদের আমলদারী হবে। এমন সময়

মুসলমানগণ তাদের বাদশাহ বানানোর জন্য হযরত মাহ্দীকে তালাশ করবেন এবং এক পর্যায়ে কিছু সংখ্যক নেক লোক মক্কায় বায়তুল্লাহ শরীফে তওয়াফরত অবস্থায় হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে তাঁকে চিনতে পারবেন এবং তাঁর হাতে বায়আত করে তাঁকে খলীফা নিযুক্ত করবেন। এ সময় তাঁর বয়স হবে ৪০ বৎসর। ঐ সময় একটি গায়েবী আওয়াজ আসবে যে, "ইনিই আল্লাহর খলীফা–মাহ্দী।"

হযরত মাহ্দীর নাম হবে মুহাম্মাদ। তাঁর পিতার নাম হবে আবদুল্লাহ। তিনি ফাতেমা (রাঃ)-এর বংশোদ্ভূত অর্থাৎ সাইয়্যেদ বংশীয় হবেন। মদীনা তাঁর জন্ম স্থান হবে। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস হিজরত করবেন। তাঁর দৈহিক গঠন ও আখলাক চরিত্র রাসূল (সঃ)-এর অনুরূপ হবে। তিনি নবী হবেন না–তাঁর উপর ওহীও নাযেল হবে না। তিনি মুসলমানদের খলীফা হবেন এবং আধিপত্য বিস্তারকারী নাছারাদের বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনা করবেন এবং তাদের দখল থেকে শাম, কনস্ট্যান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) প্রভৃতি অঞ্চল জয় করবেন। তাঁর আমলে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং তাঁর আমলেই হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন। ঈসা (আঃ)-এর আগমনের কিছুকাল পর তিনি ইন্তেকাল করবেন।

দাজ্জাল সম্বন্ধে আকীদা ঃ

দাজ্জাল শব্দের অর্থ প্রতারক, ধোঁকাবাজ। আল্লাহ তা'আলা শেষ যমানায় লোকদের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য একজন লোককে প্রচুর ক্ষমতা প্রদান করবেন। তার এক চোখ কানা আর এক চোখ টেরা থাকবে, চুল কোঁকড়া ও লাল বর্ণের হবে, সে খাটো দেহের অধিকারী হবে। তার কপালে লেখা থাকবে ك ف ر অর্থাৎ কাফের, সকল মু'মিনই সে লেখা পড়তে পারবে। ইরাক ও শাম দেশের মাঝখানে তার অভ্যুত্থান হবে। সে ইয়াহুদী বংশোদ্ভূত হবে। প্রথমে সে নবুয়তের দাবী করবে। তারপর ইস্ফাহানে যাবে, সেখানে ৭০ হাজার ইয়াহূদী তার অনুগামী হবে, তখন সে খোদায়ী দাবী করবে। লোকেরা চাইলে সে বৃষ্টি বর্ষণ করে দেখাবে, মৃত্যুকে পর্যন্ত জীবিত করে দেখাবে, কৃত্রিম বেহেশত দোযখ তার সঙ্গে থাকবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার বেহেশত হবে দোযখ আর তার দোযখ হবে বেহেশত। সে আরও অনেক অলৌকিক কাণ্ড দেখাতে পারবে, যা দেখে কাঁচা ঈমানের লোকেরা তার দলভুক্ত হয়ে জাহান্নামী হয়ে যাবে। এক ভীষণ ফেৎনা ও এক ভীষণ পরীক্ষা হবে সেটা। দাজ্জাল একটা গাধার উপর সওয়ার হয়ে ঝড়ের বেগে সমগ্র ভূখণ্ডে বিচরণ করবে এবং মক্কা, মদীনা ও বায়তুল মুকাদ্দাস ব্যতীত (এসব এলাকায় সে প্রবেশ করতে পারবেনা– ফেরেশতাগণ

এসব এলাকার পাহারায় থাকবেন।) সব স্থানে ফেৎনা বিস্তার করবে। হযরত মাহ্‌দীর সময় তার আবির্ভাব হবে। সে সময় হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন এবং তাঁরই হাতে দাজ্জাল নিহত হবে। অভ্যুত্থানের পর দাজ্জাল সর্বমোট ৪০ দিন দুনিয়াতে থাকবে। দাজ্জালের ফেৎনা থেকে বাঁচার জন্য হাদীসে নিম্নোক্ত দুআ শিক্ষা দেয়া হয়েছে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট দাজ্জালের ফেৎনা থেকে পানাহ চাই।

হযরত ঈসা (আঃ) এর পৃথিবীতে অবতরণ সম্বন্ধে আকীদা ঃ

দাজ্জাল ও তার বাহিনী বায়তুল মুক্বাদ্দাসের চুতর্দিকে ঘিরে ফেলবে এবং মুসলমানগণ আবদ্ধ হয়ে পড়বে। ইত্যবসরে একদিন ফজরের নামাযের একামত হওয়ার পর হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে ফেরেশতাদের উপর ভর করে অবতরণ করবেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্ব দিকের মিনারার নিকট তিনি অবতরণ করবেন এবং হযরত মাহ্‌দী উক্ত নামাযের ইমামতি করবেন। নামাযের পর হযরত ঈসা (আঃ) হাতে ছোট একটা বর্শা নিয়ে বের হবেন। তাঁকে দেখেই দাজ্জাল পলায়ন করতে আরম্ভ করবে। হযরত ঈসা (আঃ) তার পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং "বাবে লুদ" নামক স্থানে গিয়ে তাকে নাগালে পেয়ে বর্শার আঘাতে বধ করবেন।

মুসলমানদের আকীদা অনুযায়ী হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন, তিনি স্বাভাবিক মৃত্যু বরণও করেননি কিম্বা ইয়াহুদীরা তাঁকে শূলীতে চড়িয়ে হত্যাও করতে পারেনি। তিনি আকাশে জীবিত আছেন। তিনি উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী দাজ্জালের আবির্ভাবের পর দুনিয়াতে আগমন করবেন এবং ৪০ বৎসর কাল রাজত্ব পরিচালনা করার পর ইন্তেকাল করবেন। তাঁকে আমাদের নবী (সঃ)-এর রওযা শরীফের মধ্যে নবী (সঃ) এর পার্শ্বেই দাফন করা হবে। হযরত ঈসা (আঃ) নবী হিসেবে আগমন করবেননা বরং তিনি আমাদের নবী (সঃ)-এর উম্মত হিসেবে আগমন করবেন এবং এই শরীয়ত অনুযায়ীই তিনি জীবন যাপন ও খেলাফত পরিচালনা করবেন।

ইয়াজূজ মাজূজ সম্বন্ধে আকীদা ঃ

দাজ্জালের ফেতনা ও তার মৃত্যুর পর আসবে ইয়াজূজ ও মাজূজের ফেতনা। ইয়াজূজ মাজূজ অত্যন্ত অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মানুষ। তাদের সংখ্যা অনেক বেশী হবে। তারা দ্রুত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং ভীষণ উৎপাত শুরু করবে, হত্যা এবং লুটতরাজ চালাতে থাকবে। (তারা বর্তমানে কোন দশের কোথায়

কিভাবে অবস্থিত, কি তাদের বর্তমান পরিচয়–তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহীগণ মাওলানা হেফজুর রহমান রচিত কাছাছুল কোরআন পাঠ করতে পারেন) তখন হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহর হুকুমে তূর পবর্তে আশ্রয় নিবেন। অন্য মুসলমানরা নিজ নিজ দুর্গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিবে। হযরত ঈসা (আঃ) ও মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। আল্লাহ তা'আলা মহামারীর আকারে রোগ ব্যাধি প্রেরণ করবেন। বর্ণিত আছে– সেই রোগের ফলে তাদের গর্দানে এক ধরনের পোকা সৃষ্টি হবে, ফলে অল্প সময়ের মধ্যে ইয়াজূজ মাজুজের গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে। তাদের অসংখ্য মৃত দেহের পচা দুর্গন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে, তখন ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের দুআয় আল্লাহ তা'আলা এক ধরনের বিরাটকায় পাখী প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মত। তারা মৃতদেহ গুলো উঠিয়ে নিয়ে সাগরে বা যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা ফেলে দিবে। তারপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আকাশের এক ধরনের ধোঁয়া সম্বন্ধে আকীদা ঃ

হযরত ঈসা (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর কয়েকজন নেককার লোক ন্যায়পরায়ণতার সাথে রাজত্ব পরিচালনা করবেন। তারপর ক্রমান্বয়ে ধর্মের কথা কমে যাবে এবং চতুর্দিকে বে-দ্বীনী শুরু হয়ে যাবে। এ সময় আকাশ থেকে এক ধরনের ধোঁয়া আসবে, যার ফলে মুমিন মুসলমানের সর্দির মত ভাব হবে এবং কাফেররা বেহুশ হয়ে যবে। ৪০ দিন পর ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের আকীদা ঃ

তার কিছুদিন পর একদিন হঠাৎ একটি রাত তিন রাতের পরিমাণ লম্বা হবে। মানুষ ঘুমাতে ঘুমাতে ত্যাক্ত হয়ে যাবে, গবাদি পশু বাইরে যাওয়ার জন্য চিৎকার করতে শুরু করবে। তারপর সূর্য সামান্য আলো নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে উদয় হবে। তখন থেকে আর কারও ঈমান বা তওবা কবূল হবে না। সূর্য মধ্য আকাশ পর্যন্ত এসে আবার আল্লাহর হুকুমে পশ্চিম দিকে গিয়েই অস্ত যাবে। তারপর আবার যথারীতি পূর্বের নিয়মে পূর্বদিক থেকে উদয় এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যেতে থাকবে।

দাব্বাতুল আর্‌দ সম্বন্ধে আকীদা ঃ

পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের কিছু দিন পর মক্কা শরীফের সাফা পাহাড় ফেটে অদ্ভূত আকৃতির এক জন্তু বের হবে। একে বলা হয় দাব্বাতুল আর্‌দ (ভূমির জন্তু) এ প্রাণীটি মানুষের সঙ্গে কথা বলবে। সে অতি দ্রুতবেগে সারা পৃথিবী ঘুরে আসবে। সে মুমিনদের কপালে একটি নূরানী রেখা টেনে দিবে, ফলে

তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যাবে এবং বেঈমানদের নাকের অথবা গর্দানের উপর সীল মেরে দিবে, ফলে তাদের চেহারা মলিন হয়ে যাবে। সে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরকে চিনতে পারবে। এ জন্তুর আবির্ভাব কিয়ামতের সর্বশেষ আলামত সমূহের অন্যতম। এ জন্তুটির আকার-আকৃতি সম্পর্কে ইবনে কাছীরে বিভিন্ন রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে, যার অধিকাংশই নির্ভারযোগ্য নয়।

(معارف القرآن ج ٦)

কিয়ামতের পূর্বক্ষণে দুনিয়ার অবস্থা ও কিয়ামত সংঘটন সম্বন্ধে আকীদা ঃ

দাব্বাতুল আরদ গায়েব হয়ে যাওয়ার পর দক্ষিণ দিক থেকে একটি আরাম দায়ক বায়ু প্রবাহিত হবে। তাতে ঈমানদারদের বগলে কিছু অসুখ হবে এবং তারা মারা যাবে। দুনিয়ায় কোন ঈমানদার ব্যক্তি ও আল্লাহ আল্লাহ করার বা আল্লাহর নাম নেয়ার কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। সারা দুনিয়ায় হাব্শী কাফেরদের রাজত্ব চলবে। তারা বায়তুল্লাহ শরীফকে শহীদ করে ফেলবে। কুরআন শরীফ দেল থেকে এবং কাগজ থেকে উঠে যাবে। তারপর হঠাৎ একদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং কিয়ামত সংঘটিত হবে। সিঙ্গার ফুঁকে প্রথম প্রথম হালকা আওয়াজ হবে। পরে এতে কঠোর ও ভীষণ হবে যে সমস্ত লোক মারা যাবে। জমীন ও আসমান ফেটে যাবে। পূর্বে যারা মরে গেছে তাদের রূহও বেহুশ হয়ে যাবে। সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে।

ঈছালে ছওয়াব সম্বন্ধে আকীদা ঃ

"ঈছালে ছওয়াব" অর্থ ছওয়াব রেছানী বা ছওয়াব পৌছানো। মৃত মুসলমানদের জন্য কৃত নামায, রোযা, দান-সদকা, তাসবীহ-তাহলীল, তিলাওয়াত ইত্যাদি শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের ছওয়াব পৌছে থাকে। এক মতে ফরয ইবাদতের দ্বারাও ঈছালে ছওয়াব করা যায়। এতে নিজের জিম্মাদারীও আদায় হবে, মৃতও ছওয়াব পেয়ে যাবে। (امداد الفتاوى ج / ٥ واحسن الفتاوى ج / ٤)

দুআর মধ্যে ওছীলা প্রসঙ্গে আকীদা ঃ

দুআ কবূল হওয়ার জন্য নবীদের বা কোন জীবিত বা মৃত নেককার লোকের ওছীলা দিয়ে কিম্বা কোন নেক কাজের ওছীলা দিয়ে দুআ করা জায়েয বরং তা মোস্তাহাব। (احسن الفتاوى ج / ١ فى رسالة نيل الفضيلة بسوال الوسيلة وامداد الفتاوى ج / ٥)

জীন সম্বন্ধে আকীদা ঃ

আল্লাহ তা'আলা আগুনের তৈরী এক প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন, যারা আমাদের দৃষ্টির অগোচর, তাদেরকে জীন বলে। তাদের মধ্যে ভাল মন্দ সব রকম হয়। তাদের সন্তানাদিও হয়। তাদের মধ্যে বেশী প্রসিদ্ধ এবং বড় দুষ্ট হল ইবলীস অর্থাৎ, শয়তান। জীন মানুষের উপর আছর করতে পারে।

কারামত, কাশ্‌ফ, এল্‌হাম ও পীর বুযুর্গ সম্বন্ধে আকীদা ঃ

* বুযুর্গ এবং ওলী আউলিয়াদের দ্বারা আল্লাহ সে সব অসাধারণ কাজ দেখিয়ে থাকেন, তাকে বলা হয় কারামত। আর জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় তারা যে সব ভেদের কথা জানতে পারেন বা চোখের অগোচর জিনিসকে দেলের চোখে দেখতে পারেন, তাকে বলা হয় কাশ্‌ফ ও এল্‌হাম। বুযুর্গদের কারামত ও কাশ্‌ফ এল্‌হাম সত্য। মৃত্যুর পরও কোন বুযুর্গের কারামত প্রকাশিত হতে পারে।

* কারামত ও কাশ্‌ফ এল্‌হাম হয়ে থাকে বুযুর্গ এবং ওলীদের দ্বারা। বুযুর্গ এবং ওলী বলা হয় আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে আর শরীয়তের বরখেলাফ করে কেউ আল্লাহর প্রিয় তথা ওলী বা বুযুর্গ হতে পারে না, অতএব যারা শরীয়তের বরখেলাফ করে যেমন নামায রোযা করে না, গাঁজা, শরাব বা নেশা খায়, বেগানা মেয়েলোককে স্পর্শ করে বা দেখে, গান বাদ্য করে ইত্যাদি, তারা কখনও বুযুর্গ নয়। তারা যদি অলৌকিক কিছু দেখায় তাহলে সেটা কারামত নয় বরং বুঝতে হবে হয় সেটা যাদু বা কোনরূপ তুকতাক ও ভেল্কিবাজী, কিম্বা যে কোন রূপ প্রতারণা। অনেক সময় শয়তান এসব লোকদেরকে গায়েব জগতের অনেক খবর জানিয়ে দেয়, যাতে করে এটা শুনে মূর্খ লোকেরা তাদের ভক্ত হয়ে যায় এবং এভাবে তারা বিভ্রান্তির শিকার হয়। এসব দেখে তাদের ধোঁকায় পড়া যাবে না।

* কাশফ এবং এলহাম যদি শরীয়তের মোয়াফেক হয় তাহলে তা গ্রহণ যোগ্য, অন্যথায় তা গ্রহণযোগ্য নয়।

* কোন বুযুর্গ বা পীর সম্বন্ধে এই আকীদা রাখা শির্‌ক যে, তিনি সব সময় আমাদের অবস্থা জানেন।

* কোন পীর বুযুর্গকে দূর দেশ থেকে ডাকা এবং মনে করা যে তিনি জানতে পেরেছেন–এটা শিরক। কোন পীর বুযুর্গ গায়েব জানেন না, তবে কখনও কোন বিষয়ে তাদের কাশফ এলহাম হতে পারে, তাও আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

* কোন পীর বুযুর্গের হাতে বায়আত হলে তিনি নাজাতের ব্যবস্থা করবেন– এরূপ আকীদা রাখা গুমরাহী বরং তাঁরা ঈমান ও আমলের পথ দেখাবেন আর এই ঈমান ও আমলই হবে নাজাতের ওছীলা।

* কোন পীর বুযুর্গের মর্যাদা– চাই সে যতবড় হোক– কোন নবী বা সাহাবী থেকে বেশী বা তাঁদের সমানও হতে পারে না।

অলী, আবদাল, গওছ, কুতুব ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা ঃ

বুযুর্গানে দ্বীন লিখেছেন যে, মানব জগতে বার প্রকার আউলিয়া বিদ্যমান রয়েছে। যথা ঃ

১. **কুতুব** ঃ তাঁকে কুত্বুল আলম, কুত্বুল আকবার, কুত্বুল এরশাদ ও কুত্বুল আক্তাবও বলা হয়। আলমে গায়েবের মধ্যে তাঁকে আবদুল্লাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর দুইজন উযীর থাকেন, যাদেরকে ইমামাইন বলা হয়। ডানের উযীরের নাম আবদুল মালেক এবং বামের উযীরের নাম আবদুর রব। এতদ্ব্যতীত আরও বার জন কুতুব থাকেন, সাতজন সাত একলীমে থাকেন, তাদেরকে কুত্বে এক্লীম বলা হয়। আর পাঁচ জন ইয়েমেনে থাকেন, তাদেরকে কুত্বে বেলায়েত বলা হয়। এই নির্দিষ্ট কুতুবগণ ব্যতীত অনির্দিষ্ট কুতুব প্রত্যেক শহরে এবং প্রত্যেক গ্রামে থাকেন এক এক জন করে।

২. **ইমামাইন** ঃ ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

৩. **গওছ** ঃ গওছ থাকেন মাত্র একজন। কেউ কেউ বলেছেন কুতুবকেই গওছ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন গওছ ভিন্ন একজন, তিনি মক্কা শরীফে থাকেন।

৪. **আওতাদ** ঃ আওতাদ চারজন, পৃথিবীর চার কোণে চার জন থাকেন।

৫. **আবদাল**ঃ আবদাল থাকেন ৪০ জন।

৬. **আখ্ইয়ার** ঃ তারা থাকেন পাঁচশত জন কিম্বা সাতশত জন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তারা ভ্রমণ করতে থাকেন। তাদের নাম হোছাইন।

৭. **আব্রার** ঃ অধিকাংশ বুযুর্গানে দ্বীন আবদালগণকেই আবরার বলেছেন।

৮. **নুকাবা** ঃ নুকাবা আলী নামে ৩০০ জন পশ্চিম দেশে থাকেন।

৯. **নুজাবা** ঃ নুজাবা হাছান নামে ৭০ জন মিসরে থাকেন।

১০. **আমূদ** ঃ আমূদ মুহাম্মদ নামে চার জন পৃথিবীর চার কোণে থাকেন।

১১. **মুফাররিদ** ঃ গওছ উন্নতি করে ফর্দ বা মুফাররিদ হয়ে যান। আর ফর্দ উন্নতি করে কুত্বুল অহ্দাৎ হয়ে যান।

১২. **মাকতুম** ঃ মাকতুম শব্দের অর্থ পুশিদা বা লুকায়িত। অর্থ যেমন তারাও তেমনিই পুশিদা থাকেন।

উল্লেখ্য যে, অলীদের এই প্রকার এবং এই বিবরণ সম্বন্ধে কুরআন হাদীসে খুলে কিছু বলা হয়নি, শুধু বুযুর্গানে দ্বীনের কাশ্ফের দ্বারা এটা জানা গিয়েছে। আর কাশফ যার হয় তার জন্য সেটা দলীল–অন্যদের জন্য সেটা দলীল হয় না। অতএব এগুলো নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি না করাই শ্রেয়।

(تعليم الدين থেকে গৃহীত)

মাজার সম্বন্ধে আকীদা ঃ

"মাজার" শব্দের অর্থ জিয়ারতের স্থান। সাধারণভাবে বুযুর্গদের কবর- যেখানে জিয়ারত করা হয়-তাকে মাজার বলা হয়। সাধারণভাবে কবর জিয়ারত দ্বারা বেশ কিছু ফায়দা হয় যেমন কলব নরম হয়, মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, আখেরাতের চিন্তা বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি। বিশেষভাবে বুযুর্গদের কবর জিয়ারত করলে তাদের রূহানী ফয়যও লাভ হয়। মাজারের এতটুকু ফায়দা অনস্বীকার্য, কিন্তু এর অতিরিক্ত সাধারণ মানুষ মাজার ও মাজার জিয়ারত সম্পর্কে এমন কিছু গলত ও ভ্রান্ত আকীদা রাখে, যার অনেকটা শিরক-এর পর্যায়ভুক্ত, যেগুলো অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যেমন ঃ

মাজার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সমূহ ঃ

১. মাজারে গেলে বিপদ-আপদ দূর হয়।
২. মাজারে গেলে আয়-উন্নতিতে বরকত হয়।
৩. মাজারে গেলে ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ বেশী হয়।
৪. মাজারে সন্তান চাইলে সন্তান লাভ হয়।
৫. মাজারে গেলে মকসূদ হাছেল হয়।
৬. মাজারে মান্নত মানলে উদ্দেশ্য পূরণ হয়।
৭. মাজারে টাকা-পয়সা, নযর-নিয়াজ দিলে ফায়দা হয়।
৮. মাজারে ফুল, মোমবাতি, আগরবাতি ইত্যাদি দেয়াকে ছওয়াবের কাজ মনে করা ইত্যাদি।

সাহাবীদের সম্বন্ধে আকীদা ঃ

* সকল সাহাবী আদিল অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী, মুত্তাকী, পরহেযগার, ন্যায়পরায়ণ এবং ইসলাম ও উম্মতের স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দানকারী। প্রত্যেক সাহাবীর মধ্যে হেদায়েতের নূর এবং আলো রয়েছে-কারও মধ্যে অন্ধকার নেই।

* সকল সাহাবী সমালোচনার উর্ধ্বে। তাঁদের সমালোচনা করা, দোষত্রুটি অন্বেষণ করা সম্পূর্ণ অমার্জনীয় অপরাধ। সাহাবীদের সমালোচনাকারীগণ ফাসেক ফাজের ও গুমরাহ।

* সাহাবীদের প্রতি মহব্বত ও ভক্তি শ্রদ্ধা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্যতম শিয়ার বা প্রতীক।

* প্রত্যেক সাহাবী সত্যের মাপকাঠি, সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ঈমানের কষ্টিপাথর, যার নিরিখে অবশিষ্ট সকলের ঈমান পরীক্ষা করা হবে। আমল এবং দ্বীনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁরা মাপকাঠি। সাহাবায়ে কেরাম হকের মাপকাঠি, তাঁদের নিরিখে নির্ণিত হবে পরবর্তীদের হক বা বাতিল হওয়া।

* যে সব ক্ষেত্রে সাহাবীদের মধ্যে দ্বিমত বা বাহ্যিক বিরোধ দেখা দিয়েছে, সে সব ক্ষেত্রেও প্রত্যেক সাহাবী হক ছিলেন। তাঁদের পারস্পরিক যুদ্ধ- বিগ্রহ এবং সংঘর্ষের ক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে কোন পক্ষের এজতেহাদী ভুলচুক থাকতে পারে তবে প্রত্যেকের নিয়ত সহীহ ছিল, ব্যক্তি স্বার্থ কিম্বা ব্যক্তিগত আক্রোশে তাঁরা সেটা করেননি বরং দ্বীনের খাতিরে এবং এখলাছের সাথেই করেছেন, এই আকীদা-বিশ্বাস রাখতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রেও যে কোন একজন বা এক পক্ষের অনুসরণ করলে হেদায়াত, মুক্তি ও নাজাত পাওয়া যাবে। কিন্তু একজনের অনুসরণ করে অন্যজনের দোষ চর্চা করা যাবে না। দোষ চর্চা হারাম হবে।

* সাহাবীদের মর্যাদা সমস্ত ওলী আউলিয়াদের উর্ধ্বে। উম্মতের সবচেয়ে বড় ওলী (যিনি সাহাবী নন) তার মর্যাদাও একজন নিম্ন স্তরের সাহাবীর মর্যাদার সমান হতে পারে না বরং সাহাবী আর সাহাবী নন-এমন দুই স্তরের মধ্যে মর্যাদার তুলনাই অবান্তর।

* সমস্ত সাহাবার মধ্যে চারজন সর্বপ্রধান। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম (১) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং তিনি প্রথম খলীফা। তারপর (২) হযরত ওমর (রাঃ)। তিনি দ্বিতীয় খলীফা। তারপর (৩) হযরত উসমান গনী (রাঃ)। তিনি তৃতীয় খলীফা (৪) হযরত আলী (রাঃ)। তিনি চতুর্থ খলীফা। খলীফা হওয়ার ক্ষেত্রে এই তারতীব হক ও যথার্থ।

* সকল সাহাবীর প্রতি আল্লাহ তা'আলা চির সন্তুষ্টির খোশ-খবরী দান করেছেন। বিশেষভাবে একসাথে নবী (সঃ) এর দ্বারা দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ পূর্বক তাঁদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। উক্ত দশজনকে আশারায়ে মুবাশ্শারাহ (সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন) বলা হয়। তাঁরা হলেন (১) আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) (২) ওমর (রাঃ) (৩) ওছমান (রাঃ) (৪) আলী (রাঃ) (৫) তালহা (রাঃ) (৬) যোবায়ের (রাঃ) (৭) আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) (৮) সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) (৯) সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) (১০) আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)।

এছাড়াও রসূল (সঃ) আরও কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে বিছিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

রাসূল (সঃ)-এর বিবি ও আওলাদগণের সম্বন্ধে আকীদা ঃ

রাসূল (সঃ)-এর আওলাদগণের মধ্যে হযরত ফাতেমা (রাঃ) এবং বিবিদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মর্তবা সবচেয়ে বেশী।

আস্‌বাব/বস্তুর ক্ষমতা সম্বন্ধে আকীদা ঃ

কোন আসবাব বা বস্তুর নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। কোন আসবাব বা বস্তুর নিজস্ব ক্ষমতা আছে– এরূপ বিশ্বাস করা শিরক। তবে বস্তুর মধ্যে যে ক্ষমতা দেখা যায় বা বস্তু থেকে যে প্রভাব প্রকাশ পায় তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত, তার নিজস্ব ক্ষমতা নয়। তাই আল্লাহ ক্ষমতা না দিলে বা তার স্বাভাবিক কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে না– আল্লাহ পাকের এরূপ ফয়সালা হলেই বস্তুর স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রভাব প্রকাশ পায় না। বস্তু সম্বন্ধে এ হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা। আসবাব গ্রহণের বিধান সম্পর্কে দেখুন ৪৫৩ পৃষ্ঠা।

রোগ সংক্রমণ সম্বন্ধে আকীদা ঃ

সাধারণতঃ ছোঁয়াচে রোগ বা সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে যে ধারণা রয়েছে সে সম্বন্ধে ইসলামের আকীদা হল– কোন রোগের মধ্যে সংক্রমণের নিজস্ব ক্ষমতা নেই। তাই দেখা যায় তথাকথিত সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত লোকের কাছে যাওয়ার পরও অনেকে আক্রান্ত হয় না, আবার অনেকে না যেয়েও আক্রান্ত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে সহীহ আকীদা হলঃ রোগের মধ্যে সংক্রমণ বা অন্যের মধ্যে বিস্তৃত হওয়ার নিজস্ব ক্ষমতা নেই। কেউ অনুরূপ রোগীর সংস্পর্শে গেলে যদি তার আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা হয়, সে ক্ষেত্রেই সে আল্লাহর হুকুমে আক্রান্ত হবে, অন্যথায় নয়। কিম্বা এরূপ আকীদা রাখতে হবে যে, এসব রোগের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ তা'আলা সংক্রমণের এই নিয়ম রেখে দিয়েছেন। তবে আল্লাহর ইচ্ছা হলে সংক্রমণ নাও ঘটতে পারে। অর্থাৎ, সংক্রমণের এ ক্ষমতা রোগের নিজস্ব ক্ষমতা নয়, এর পশ্চাতে আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা এবং তাঁর ইচ্ছার দখল থাকে। তবে ইসলাম প্রচলিত এসব সংক্রামক রোগে আক্রান্ত লোকদের নিকট যেতে নিষেধ করেছে বিশেষভাবে কুষ্ঠ রোগীর নিকট, এ কারণে যে, উক্ত রোগীর নিকট গেলে আর তার আক্রান্ত হওয়ার খোদায়ী ফয়সালা হওয়ার কারণে সে আক্রান্ত হলে তার ধারণা হতে পারে যে, উক্ত রোগীর সংস্পর্শে যাওয়ার কারণেই সে আক্রান্ত হয়েছে, এভাবে তার আকীদা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তা যেন হতে না পারে এজন্যেই ইসলাম এরূপ বিধান দিয়েছে। তবে কেউ মজবূত আকীদার অধিকারী হলে সে অনুরূপ রোগীর নিকট যেতে পারে। এমনিভাবে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত লোককেও সুস্থ এলাকার লোকদের নিকট যেতে নিষেধ করেছে, যাতে অন্য কারও আকীদা নষ্টের কারণ না ঘটে।

রাশি ও গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা ঃ

রাশি বলা হয় সৌর জগতের কতকগুলো গ্রহ নক্ষত্রের প্রতীককে। এগুলো কল্পিত। এরূপ বারটি রাশি কল্পনা করা হয় যথাঃ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। এগুলোকে বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের প্রতীক সাব্যস্ত করা হয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্র (অর্থাৎ, ফলিত জ্যোতিষ বা Astrology) -এর ধারণা অনুযায়ী এ সব গ্রহ নক্ষত্রের গতি, স্থিতি ও সঞ্চারের প্রভাবে ভবিষ্যত শুভ-অশুভ সংঘটিত হয়ে থাকে। নিউমারোলজি বা সংখ্যা জ্যোতিষের উপর ভিত্তি করে এই শুভ-অশুভ নির্ণয় তথা ভাগ্য বিচার করা হয়।

ইসলামী আকীদা অনুসারে গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে নিজস্ব কোন প্রভাব বা ক্ষমতা নেই। সুতরাং ভাগ্য তথা শুভ অশুভ গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবে ঘটে– এই আকীদা রাখা শিরক। গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এরূপ কোন প্রভাব থাকলে থাকতেও পারে কিন্তু তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। যা কিছু বলা হয় সবই কাল্পনিক। যদি প্রকৃতই এরূপ কোন প্রভাব থাকেও, তবুও তা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত–গ্রহ নক্ষত্রের নিজস্ব ক্ষমতা নয়। অতএব শুভ অশুভ মৌলিকভাবে আল্লাহরই ইচ্ছাধীন ও তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।

(آپ کے مسائل اور انکا حل ج /۱ ও فتح الملہم ج /۱ থেকে গৃহীত)

হস্ত রেখা বিচার সম্বন্ধে আকীদা ঃ

পামিস্ট্রি (Palmistry) বা হস্তরেখা বিচার বিদ্যার মাধ্যমে যে হাতের রেখা ইত্যাদি দেখে ভাগ্যের বিষয় ও ভূত-ভবিষ্যতের শুভ-অশুভ সম্পর্কে বিশ্লেষণ দেয়া হয়, ইসলামে এরূপ বিষয়ে বিশ্বাস রাখা কুফরী। (آپ کے مسائل اور انکا حل ج /۱)

রত্ন ও পাথরের প্রভাব সম্বন্ধে আকীদা ঃ

মণি, মুক্তা, হিরা, চুনি, পান্না, আকীক প্রভৃতি পাথর ও রত্ন মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে, মানুষের ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারে– এরূপ আকীদা বিশ্বাস রাখা মুশরিকদের কাজ, মুসলমানদের নয়। (آپ کے مسائل اور انکا حل ج /۱)

তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক সম্বন্ধে আকীদা ঃ

* তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকে কাজ হওয়াটা নিশ্চিত নয়–হতেও পারে নাও হতে পারে। যেমন দুআ করা হলে রোগ ব্যাধি আরোগ্য হওয়াটা নিশ্চিত নয়–আল্লাহর ইচ্ছা হলে আরোগ্য হয় নতুবা হয় না, তদ্রূপ তাবীজ এবং ঝাড় ফুঁকও একটি দুআ বরং তাবীজের চেয়ে দুআ বেশী শক্তিশালী। তাবীজ এবং ঝাড়-ফুঁকে কাজ হলেও সেটা তাবীজ বা ঝাড় ফূঁকের নিজস্ব ক্ষমতা নয় বরং আল্লাহর ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়ে থাকে।

* সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকই এজতেহাদ এবং অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত, কুরআন ও হাদীছে যার ব্যাপারে স্পষ্ট বলা হয়নি যে, অমুক তাবীজ বা অমুক ঝাড়-ফুঁক দ্বারা অমুক কাজ হবে। অতএব কোন তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁক দ্বারা কাঙ্খিত ফল লাভ না হলে এরূপ বলার বা এরূপ ভাবার অবকাশ নেই যে, কুরআন হাদীছ কি তাহলে সত্য নয় ?

* তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক কুরআন হাদীছের বাক্যাবলী দ্বারা বৈধ উদ্দেশ্যে করা হলে তা জায়েয। পক্ষান্তরে কোন কুফর শিরকের কথা থাকলে বা এরূপ কোন জাদু হলে তা দ্বারা তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক হারাম। এমনিভাবে কোন অবৈধ উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক করা হলে তাও জায়েয নয়, যদিও কুরআন হাদীছের বাক্য দ্বারা তা করা হয়।

* যে সব বাক্য বা শব্দ কিম্বা যে সব নকশার অর্থ জানা যায় না তা দ্বারা তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ নয়।

* কোন বিষয়ের তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন বা সময় রয়েছে বা বিশেষ কোন শর্ত ইত্যাদি রয়েছে- এরূপ মনে করা ঠিক নয়।

* তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁকের জন্য কারও এজাযত প্রাপ্ত হওয়া জরুরী- এরূপ ধারণাও ভুল।

* তাবীজ বা ঝাড়-ফুঁক দ্বারা ভাল আছর হলে সেটাকে তাবীজ দাতার বা আমেলের বুযুর্গী মনে করা ঠিক নয়। যা কিছু হয় আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়।

(ما خوذ از معارف القرآن – الشامی ج /٦ . مرقاة و اغلاط العوام)

নজর ও বাতাস লাগা সম্বন্ধে আকীদা ঃ

* হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী নজর লাগার বিষয়টি সত্য, জান-মাল ইত্যাদির প্রতি বদনজর লেগে তার ক্ষতি সাধন হতে পারে। আপনজনের প্রতিও আপন জনের বদনজর লাগতে পারে, এমনকি সন্তানের প্রতিও মাতা-পিতার বদনজর লাগতে পারে। আর বাতাস লাগার অর্থ যদি হয় জিন ভূতের বাতাস অর্থাৎ তাদের খারাপ নজর বা খারাপ আছর লাগা, তাহলে এটাও সত্য; কেননা জিন ভূত মানুষের উপর আছর করতে সক্ষম।

* কেউ কারও কোন ভাল কিছু দেখলে যদি ماشاء الله (মাশা আল্লাহ) বলে, তাহলে তার প্রতি তার বদনজর লাগে না। আর কারও উপর কারও বদনজর লেগে গেলে যার নজর লাগার সন্দেহ হয় তার মুখ, হাত (কনুই সহ) হাঁটু এবং এস্তেনজার জায়গা ধুয়ে সেই পানি যার উপর নজর লেগেছে তার উপর ঢেলে দিলে খোদা চাহেতো ভাল হয়ে যাবে। এ সম্পর্কিত আর একটি নিয়ম জানার

জন্য দেখুন ৪৯১ পৃষ্ঠা। বদনজর থেকে হেফাজতের জন্য কাল সুতা বাঁধা বা কালি কিম্বা কাজলের টিপ লাগানো ভিত্তিহীন ও কুসংস্কার।

কুলক্ষণ ও সুলক্ষণ সম্বন্ধে আকীদা ঃ

ইসলামী আকীদা মতে কোন বস্তু বা অবস্থা থেকে কুলক্ষণ গ্রহণ করা বা কোন সময়, দিন ও মাসকে খারাপ মনে করা বৈধ নয়। এমনিভাবে কুরআন হাদীছ দ্বারা স্বীকৃত নয়–এরূপ কোন লক্ষণ মানা বৈধ নয়। তবে কেউ কোন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা বা দুশ্চিন্তায় রয়েছে এরূপ মুহূর্তে ঘটনাক্রমে বা কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবে খুশী বা সাফল্য সূচক কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হলে কিম্বা এরূপ কিছু দৃষ্টিগোচর হলে সেটাকে সুলক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এটা মূলতঃ কোন শব্দ বা বস্তুর প্রভাবকে বিশ্বাস করা নয়–এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রহমতের আশাকে শক্তিশালী করা।

শরীয়তের আকীদা বিরুদ্ধ কয়েকটি লক্ষণ ও কুলক্ষণের তালিকা ঃ

১. হাতের তালু চুলকালে অর্থ-কড়ি আসবে মনে করা।
২. চোখ লাফালে বিপদ আসবে মনে করা।
৩. কুকুর কাঁদলে রোগ বা মহামারী আসবে মনে করা।
৪. এক চিরনিতে দু'জন চুল আঁচড়ালে উক্ত দু'জনের মধ্যে ঝগড়া লাগবে মনে করা।
৫. কোন বিশেষ পাখি ডাকলে মেহমান আসবে মনে করা।
৬. যাত্রা পথে পেছন থেকে কেউ ডাকলে যাত্রা খারাপ মনে করা।
৭. যাত্রা পথে হোঁচট খেলে বা মেথর দেখলে বা কাল কলসি দেখলে, কিম্বা বিড়াল দেখলে কুলক্ষণ মনে করা। অমুক দিন যাত্রা নাস্তি, অমুক দিন বিবাহ নাস্তি, অমুক দিন ভ্রমণ নাস্তি ইত্যাদি বিশ্বাস করা। মোটকথা কোন দিন সময় বা কোন মুহূর্তকে অশুভ মনে করা।
৮. যাত্রার মুহূর্তে কেউ তার সামনে হাঁচি দিলে কাজ হবে না– এরূপ বিশ্বাস করা।
৯. পেঁচা ডাকলে ঘর-বাড়ি বিরান হয়ে যাবে মনে করা।
১০. জিহ্বায় কামড় লাগলে কেউ তাকে গালি দিচ্ছে বা কেউ তাকে স্মরণ করছে মনে করা।
১১. চড়ুই পাখিকে বালুতে গোসল করতে দেখলে বৃষ্টি হবে মনে করা।
১২. দোকান খোলার পর প্রথমেই বাকি দিলে সারা দিন বাকি বা ফাঁকি যাবে মনে করা।
১৩. কোন লোকের আলোচনা চলছে, ইত্যবসরে বা কিছুক্ষণ পরে সে এসে পড়লে এটাকে তার দীর্ঘজীবি হওয়ার লক্ষণ মনে করা।

১৪. কোন ঘরে মাকড়সার জাল বেশী হলে উক্ত ঘরের মালিক ঋণগ্রস্থ হয়ে যাবে মনে করা।

১৫. আসরের পর ঘরে ঝাড়ু দেয়াকে খারাপ মনে করা।

১৬. ঝাড়ু দ্বারা বিছানা পরিষ্কার করলে ঘর উজাড় হয়ে যাবে মনে করা।

১৭. কোন বাড়িতে বাচ্চা মারা গেলে সে বাড়িতে গেলে নিজের বাচ্চাও মারা যাবে মনে করা।

১৮. ঝাড়ুর আঘাত লাগলে শরীর শুকিয়ে যাবে মনে করা।

১৯. কোন প্রাণী বা কোন প্রাণীর ডাককে অশুভ বা অশুভ লক্ষণ মনে করা।

বিঃ দ্রঃ এরূপ আরও বহু গলত আকীদা রয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করা হল। (اغلاط العوام ইত্যাদি থেকে গৃহীত)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সম্বন্ধে আকীদা ঃ

এক হাদীছে বলা হয়েছে অতিশীঘ্র আমার উম্মত তেহাত্তর ফের্কায় (দলে) বিভক্ত হয়ে পড়বে, তন্মধ্যে মাত্র একটি দল হবে মুক্তিপ্রাপ্ত (অর্থাৎ, জান্নাতী) আর বাকী সবগুলো ফের্কা হবে জাহান্নামী। জিজ্ঞাসা করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই মুক্তি প্রাপ্ত দল কারা ? রাসূল (সঃ) উত্তরে বললেনঃ তারা হল আমি ও আমার সাহাবীগণ যে মত ও পথের উপর আছি তার অনুসারীগণ। (তিরমিযী, ২য়)

এ হাদীছের মধ্যে যে মুক্তিপ্রাপ্ত বা জান্নাতী দল সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদেরকেই বলা হয় "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত।" নামটির মধ্যে 'সুন্নাত' শব্দ দ্বারা রাসূল (সঃ)-এর মত ও পথ এবং 'জামাআত শব্দ দ্বারা বিশেষভাবে সাহাবায়ে কিরামের জামাআত উদ্দেশ্য। মোটকথা– রাসূল (সঃ) এবং সাহাবায়ে কিরামের মত ও পথের অনুসারীদেরকেই বলা হয় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। ইসলাম ধর্মে বিভিন্ন সময়ে যে সব সম্প্রদায় ও ফের্কার উদ্ভব হয়েছে তন্মধ্যে সর্বযুগে এ দলটিই হল সত্যাশ্রয়ী দল। সর্বযুগে ইসলামের মৌলিক আকাইদ বিষয়ে হকপন্থী গরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম যেভাবে কুরআন, হাদীছ ও সাহাবায়ে কেরামের মত ও পথের অনুসরণ করে আসছে, এ দলটি তারই অনুসরণ করে আসছে। সর্বযুগে এ দলই হচ্ছে বৃহত্তম দল। সর্বযুগে এরা টিকে আছে। এর বাইরে যারা গিয়েছে, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বহির্ভূত বিপথগামী ও বাতিলপন্থী সম্প্রদায়। এরূপ বহু বাতিল সম্প্রদায় কালের অতল গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, যারা রয়েছে তারাও বিলীন হবে, হকপন্থী দল চিরকাল টিকে থাকবে।

ঈমান সম্পর্কিত কোন বিষয়ে মনে সন্দেহ জাগলে কি করণীয় ঃ

যে সব বিষয়ে ঈমান রাখতে হয়, সে সব বিষয়ে যদি কখনও মনে সন্দেহ এবং ওয়াছওয়াছা দেখা দেয়, যেমন মনে সন্দেহ দেখা দিল যে, (নাউযুবিল্লাহ) আসলেই খোদা বলে কেউ আছেন কি ? বা থাকলে তাকে কে সৃষ্টি করল, কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া তিনি হলেন কি করে ? কিম্বা সন্দেহ দেখা দিল যে, জান্নাত জাহান্নাম আসলেই আছে কি ? এরূপে আল্লাহ, রাসূল, কুরআন, পরকাল, তাকদীর ইত্যাদি যে কোন ঈমান সম্পর্কিত বিষয়ে মনে সন্দেহ আসলে তখন তিনটা আমল করণীয়। যথা ঃ

১. আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম পড়ে নেয়া।
২. আমান্‌তু বিল্লাহ (অর্থাৎ, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম) পড়ে নেয়া।
৩. উক্ত চিন্তা থেকে বিরত হয়ে অন্য কোন চিন্তা বা কাজে লিপ্ত হওয়া।

(مسلم ج ١/ ١)

ঈমান বাড়ে কমে কিভাবে ঃ

ঈমান বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ, ঈমানের মধ্যে নূর পয়দা হয় এবং ঈমান মজবুত হয় নিম্নোক্ত তরীকায় ঃ

১. ঈমানের আলোচনা দ্বারা।
২. ঈমানদারদের ছোহবত দ্বারা।
৩. আমল দ্বারা। (ঈমানের শাখাগুলোর উপর আমল দ্বারা)

পক্ষান্তরে ঈমান দুর্বল হয়ে যায় এবং ঈমানের নূর কমে যায়, এমন কি কখনও কখনও ঈমান নষ্ট হয়ে যায় নিম্নোক্ত কারণে ঃ

১. কুফ্‌র দ্বারা।
২. শির্‌ক দ্বারা।
৩. বিদআত দ্বারা।
৪. রছম ও কুসংস্কার পালন দ্বারা।
৫. গোনাহ দ্বারা।

ঈমানের শাখা

ঈমানের পরিচয়ের মধ্যে বলা হয়েছে কতকগুলো বিষয়কে অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং আমলে পরিণত করার সমষ্টি হল ঈমান। এ থেকে বোঝা গেল– ঈমানের কিছু বিষয় দেলের দ্বারা সম্পন্ন হয়, কিছু জবানের দ্বারা এবং কিছু হাত, পা ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা। এ সবগুলোকে ঈমানের শাখা বলা হয়। বড় বড় ইমামগণ হাদীছের ইঙ্গিত পেয়ে গবেষণা করে কুরআন হাদীছ থেকে ঈমানের ৭৭ টি শাখা নির্ণয় করেছেন। এর মধ্যে দেলের দ্বারা

সম্পন্ন হয় ৩০ টি। জবানের দ্বারা সম্পন্ন হয় ৭ টি, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পন্ন হয় ৪০ টি। আমলের সুবিধার জন্য সংক্ষেপে সবগুলো পেশ করা হল ঃ

দেলের দ্বারা যেগুলো সম্পন্ন হয় ঃ

১. আল্লাহর উপর ঈমান আনা।

২. আল্লাহ চিরন্তন ও চিরস্থায়ী, তিনি ব্যতীত সবকিছু তাঁর মাখলূক– একথা বিশ্বাস করা।

৩. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা।

৪. আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনা।

৫. আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বরদের প্রতি ঈমান আনা।

৬. তাকদীরের উপর ঈমান আনা।

৭. কেয়ামতের উপর ঈমান আনা।

৮. বেহেশতের উপর ঈমান আনা।

৯. দোযখের উপর ঈমান আনা।

১০. আল্লাহর সঙ্গে মহব্বত রাখা।

১১. কারও সাথে আল্লাহর জন্যই মহব্বত রাখা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কারও সাথে দুশমনী রাখা।

১২. রাসূল (সঃ)-এর সাথে মহব্বত রাখা।

১৩. এখলাস। (অর্থাৎ, সব কিছু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করা।)

১৪. তওবা অর্থাৎ, কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তা পরিত্যাগ করা এবং ভবিষ্যতে তা না করার জন্য সংকল্প করা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৫৭০ পৃষ্ঠা)

১৫. আল্লাহকে ভয় করা।

১৬. আল্লাহর রহমতের আশা রাখা।

১৭. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া।

১৮. হায়া বা লজ্জা।

১৯. শোকর।

২০. অঙ্গীকার রক্ষা করা।

২১. ছবর।

২২. বিনয় নম্রতা ও বড়দের প্রতি সম্মানবোধ।

২৩. স্নেহ-মমতা ও জীবের প্রতি দয়া।

২৪. তাকদীরের উপর রাজী থাকা।

২৫. তাওয়াক্কুল করা।

২৬. নিজেকে বড় এবং ভাল মনে না করা।

২৭. হিংসা বিদ্বেষ না রাখা।
২৮. রাগ না করা।
২৯. কারও অহিত চিন্তা না করা, কারও প্রতি কু-ধারণা না করা।
৩০. দুনিয়ার মহব্বত ত্যাগ করা।

জবানের দ্বারা যেগুলো সম্পন্ন হয় ঃ

১. কালেমায়ে তইয়্যেবা পড়া।
২. কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করা।
৩. ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা।
৪. ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়া।
৫. দুআ বা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা।
৬. আল্লাহর যিকির।
৭. বেহুদা কথা থেকে জবানকে হেফাজত করা।

বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা যেগুলো সম্পন্ন হয় ঃ

১. পবিত্রতা হাছেল করা।
২. নামাযের পাবন্দী করা।
৩. ছদকা, জাকাত, ফিতরা, দান-খয়রাত, মেহমনদারী ইত্যাদি।
৪. রোযা।
৫. হজ্ব।
৬. এ'তেকাফ (শবে কদর তালাশ করা এর অন্তর্ভুক্ত)।
৭. হিজরত করা, অর্থাৎ দ্বীন ও ঈমান রক্ষার্থে দেশ-বাড়ি ত্যাগ করা।
৮. মান্নত পুরা করা।
৯. কছম করলে তা পূরণ করা আর কছম ভঙ্গ করলে তার কাফফারা দেয়া।
১০. কোন কাফফারা থাকলে তা আদায় করা।
১১. ছতর ঢেকে রাখা।
১২. কুরবানী করা।
১৩. জানাযা ও তার যাবতীয় আনুষঙ্গিক কাজের ব্যবস্থা করা।
১৪. ঋণ পরিশোধ করা।
১৫. লেন-দেন ও কায়-কারবার সততার সাথে এবং জায়েয তরীকা মোতাবেক করা।
১৬. সত্য সাক্ষ্য দান করা। সত্য জানলে তা গোপন না করা।
১৭. বিবাহের দ্বারা হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা।
১৮. পরিবার-পরিজনের হক আদায় ও চাকর-নওকরদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।

১৯. মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।
২০. ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা।
২১. আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।
২২. উপর ওয়ালার অনুগত হওয়া, যেমন চাকরের প্রভুভক্ত হওয়া।
২৩. ন্যায় ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করা।
২৪. মুসলমানদের জামাআতের সাথে থাকা ও হক্কানী জামাআতের সহযোগিতা করা, তাদের মত পথ ছেড়ে অন্যভাবে না চলা।
২৫. শরীয়ত বিরোধী না হলে শাসনকর্তাদের অনুসরণ করা।
২৬. লোকদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ হলে তা মিটিয়ে দেয়া।
২৭. সৎ কাজে সাহায্য করা।
২৮. আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার করা তথা সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজে বাঁধা দেয়া।
২৯. জেহাদ করা। সীমান্ত রক্ষা করাও এর অন্তর্ভুক্ত।
৩০. হদ তথা শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি কায়েম করা।
৩১. আমানত আদায় করা। গনীমতের এক পঞ্চমাংশ আদায় করা এর অন্তর্ভুক্ত।
৩২. অভাব গ্রস্থকে কর্জ দেয়া।
৩৩. প্রতিবেশীর হক আদায় করা ও তাদেরকে সম্মান করা।
৩৪. লোকদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।
৩৫. অর্থের সদ্ব্যবহার করা।
৩৬. সালামের জওয়াব দেয়া ও সালাম প্রদান করা।
৩৭. যে হাঁচি দিয়ে 'আল হামদুলিল্লাহ' পড়ে তাকে 'ইয়ার হামুকাল্লাহ' বলা।
৩৮. পরের ক্ষতি না করা। কাউকে কোন রূপ কষ্ট না দেয়া।
৩৯. খেল-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক ও নাচ-গান থেকে দূরে থাকা।
৪০. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা।

নিম্নে কুফ্‌র, শির্‌ক, বিদআত, রছম ও গোনাহের বিষয়াদি সম্পর্কে বিবরণ পেশ করা হল, যেন এগুলো থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে ঈমানকে রক্ষা করা যায়।

কতিপয় কুফ্‌রী ও তার বিবরণ

* যে সব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হয় (৪১ পৃষ্ঠা থেকে ৪৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখুন) তার কোনটি অস্বীকার করা কুফ্‌রী।

* কুরআন হাদীছের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত কোন বিষয় অস্বীকার করা যেমনঃ নামায, রোযা ফরয হওয়াকে অস্বীকার করা, নামাযের সংখ্যা, রাকআতের

সংখ্যা, রুকু সাজদার অবস্থা, আযান, যাকাত, হজ্ব ইত্যাদি বিষয়-এর কোনটি অস্বীকার করা কুফরী।

* কোন মুসলমানকে কাফের আখ্যায়িত করা কুফরী। (احسن الفتاوى ج ١)

* কুরআন ও হাদীছের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত কোন বিষয়ের এমন ব্যাখ্যা দেয়া, যা কুরআন ও হাদীছের স্পষ্ট বিবরণের খেলাফ– এটাও কুফরী।

* কুফর ও ভিন্ন ধর্মের কোন শিআর বা ধর্মীয় বিশেষ নিদর্শন গ্রহণ করা কুফ্‌রী, যেমন হিন্দুদের ন্যায় পৈতা গলায় দেয়া, খৃষ্টানদের ক্রুশ গলায় ঝুলানো ইত্যাদি।

* কুরআনের কোন আয়াতকে অস্বীকার করা বা তার কোন নির্দেশ সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কুফ্‌রী।

* কুরআন শরীফকে নাপাক স্থানে ও ময়লা আবর্জনার মধ্যে নিক্ষেপ করা কুফ্‌রী।

* ইবাদত ও তা'যীমের নিয়তে কবরকে চুমু দেয়া কুফরী। ইবাদতের নিয়ত ছাড়া চুমু দেয়া গোনাহে কবীরা।

* দ্বীন ও ধর্মের কোন বিষয় নিয়ে উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কুফ্‌রী। এ জন্যেই নামায, রোযা নিয়ে উপহাস করা কুফরী। উপহাস ছলে রমজান মাসে দিনের বেলায় প্রকাশ্যে পানাহার করা কুফরী। ইসলামের পর্দা ব্যবস্থাকে তিরস্কার করা বা উপহাস করা কুফরী। দাড়ি নিয়ে উপহাস করা কুফরী ইত্যাদি।

* আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কোন হুকুমকে খারাপ মনে করা এবং তার দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা কুফরী।

* ফেরেশতাদের সম্পর্কে বিদ্বেষভাব পোষণ করা বা তাদের সম্পর্কে কটুক্তি করা কুফরী।

* হারামকে হালাল মনে করা এবং হালালকে হারাম মনে করা কুফরী।

* কারও মৃত্যুতে আল্লাহর উপর অভিযোগ আনা, আল্লাহকে জালেম সাব্যস্ত করা কুফরী।

* কাউকে কুফরী শিক্ষা দেয়া কুফ্‌রী।

* হারাম বস্তু পানাহারের সময় বিসমিল্লাহ বলা, যেনায় লিপ্ত হওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলা কুফ্‌রী।

* দ্বীনী ইল্‌মের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রদর্শন ও অবমাননাকর বক্তব্য প্রদান করা কুফরী।

* হক্কানী উলামায়ে কেরামকে দ্বীনী ইল্‌মের ধারক বাহক হওয়ার দরুন গালি দেয়া বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। এটাও কুফ্‌রী।

* কেউ প্রকাশ্যে কোন গোনাহ করে যদি বলে যে, আমি এর জন্য গর্বিত তাহলে সেটা কুফ্‌রী।

* আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর অবমাননা করা, আল্লাহ ও নবীকে গালি দেয়া এবং তাঁদের শানে বেয়াদবী করা কুফ্‌রী।

* যে জাদুর মধ্যে ঈমানের পরিপন্থী কুফর ও শিরকের কথাবার্তা বা কাজকর্ম থাকে তা কুফ্‌রী।

(ماخوذ از معارف القرآن۔ جواهر الفقه۔ احسن الفتاوی ج / ۱۔ امداد الفتاوی ج ۔ ۵ آپ کے مسائل اور انکا حل وغیرہ) ফাতাওয়া ও মাসায়েল

ঈমান পরিপন্থী কিছু আধুনিক ধ্যান-ধারণা

* জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মানা, জনগণকে আইনের উৎস মানা ঈমান পরিপন্থী। কেননা ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে আল্লাহকেই সর্বময় ক্ষমতার উৎস স্বীকার করা হয় এবং বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।

* প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণকেই সকল ক্ষমতার উৎস এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে আইন বা বিধানের অথরিটি বলে স্বীকার করা হয়, তাই প্রচলিত গণতন্ত্র-এর ধারণা ঈমান আকীদার পরিপন্থী ।

* সমাজতন্ত্রে নিখিল বিশ্বের কোন সৃষ্টিকর্তা বা খোদা আছে বলে স্বীকার করা হয় না, তাই নাস্তিকতা নির্ভর এই সমাজতন্ত্রের মতবাদে বিশ্বাস করা ঈমান আকীদা পরিপন্থী।

* গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি তন্ত্রমন্ত্রকে মুক্তির পথ মনে করা এবং একথা বলা যে, ইসলাম সেকেলে মতবাদ, এর দ্বারা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এই যুগে উন্নতি অগ্রগতি সম্ভব নয়– এটা কুফ্‌রী।

* "ধর্ম নিরপেক্ষতা"-এর অর্থ যদি হয় কোন ধর্মে না থাকা, কোন ধর্মের পক্ষ অবলম্বন না করা। কোন ধর্মকে সমর্থন দিতে না পারা, তাহলে এটা কুফ্‌রী মতবাদ। কেননা ইসলাম ধর্মে থাকতেই হবে, ইসলামের পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে, ইসলামী কার্যক্রমকে সমর্থন দিতেই হবে। আর যদি ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাকে প্রতিষ্ঠিত না করা, ইসলামী আইন ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়কে অস্বীকার করা, তাহলে সে ধারণাও ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী। কেননা, ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকলে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা ফরয। আর কোন ফরযকে অস্বীকার করা কুফ্‌রী। যদি ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ শুধু এতটুকু হয় যে, সকল ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্ম কর্ম পালন করতে পারবে, জোর জবরদস্তী কাউকে অন্য ধর্মে প্রবেশ করানো যাবে না, তাহলে এতটুকু ধারণা ইসলাম পরিপন্থী হবে না।

* ডারউইন-এর বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করা কুফ্‌রী অর্থাৎ, একথা বিশ্বাস করা যে, বিবর্তন অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হতে হতে এক পর্যায়ে বানর থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ বিশ্বাস ইসলাম ও ঈমান পরিপন্থী । ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে সর্ব প্রথম হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই মনুষ্য জাতির বিস্তৃতি ঘটেছে।

* ইসলাম মসজিদের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে, ইসলাম ব্যক্তিগত ব্যাপার, ব্যক্তিগত জীবনে এটাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে এটাকে টেনে আনা যাবে না- এরূপ বিশ্বাস করা কুফ্‌রী। কেননা, এভাবে ইসলামের ব্যাপকতাকে অস্বীকার করা হয়। ইসলামী আকীদা বিশ্বাস অনুযায়ী কুরআন হাদীছে তথা ইসলামে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্টীয় যাবতীয় ক্ষেত্রের সকল বিষয়ে শাশ্বত সুন্দর দিক নির্দেশনা রয়েছে।

* নামায, রোযা ,হজ্জ ,যাকাত, পর্দা করা ইত্যাদি ফরয সমূহকে ফরয তথা অত্যাবশ্যকীয় জরুরী মনে না করা এবং গান, বাদ্য, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি হারাম সমূহকে হারাম মনে না করা এবং এগুলোকে মৌলভীদের বাড়াবাড়ি বলে আখ্যায়িত করা কুফ্‌রী। কেননা কোন ফরযকে ফরয বলে অস্বীকার করা বা কোন হারাম কে জায়েয মনে করা কুফ্‌রী।

* টুপী, দাড়ি, পাগড়ী, মসজিদ, মাদ্রাসা, আলেম মৌলভী ইত্যাদিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, এগুলোকে হেয় দৃষ্টিতে দেখা, এগুলো নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা মারাত্মক গোমরাহী । ইসলামের কোন বিষয়- তা যত সামান্যই হোক- তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

* আধুনিক কালের নব্য শিক্ষিতদের কেউ কেউ মনে করে যে, কেবল মাত্র ইসলামই নয়- হিন্দু, খৃষ্টান, ইয়াহুদী, বৌদ্ধ নির্বিশেষে যে কোন ধর্মে থেকে মানবতা, মানব সেবা পরোপকার প্রভৃতি ভাল কাজ করলে পরকালে মুক্তি হবে। এরূপ বিশ্বাস করা কুফ্‌রী। একমাত্র ইসলাম ধর্ম অনুসরণের মধ্যেই পরকালীন মুক্তি নিহিত- একথায় বিশ্বাস রাখা ঈমানের জন্য জরুরী।

বিঃ দ্রঃ অত্র গ্রন্থে যে সব বিষয়কে কুফ্‌রী কলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, কারও মধ্যে তা পরিলক্ষিত হলেই তাকে কাফের বলে ফতুয়া দিয়ে দেয়া যাবে না। কেননা কুফ্‌রের মধ্যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যদিও সব স্তরের কুফ্‌রই গোমরাহী এবং যার মধ্যে তা পাওয়া যাবে সে পথভ্রষ্ট, গোমরাহ এবং আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বহির্ভূত, তবে কুফ্‌রের কোন্ স্তর পাওয়া গেলে কাউকে কাফের বলে ফতুয়া দেয়া যায় তা বিজ্ঞ উলামা ও মুফতীগণই নির্ণয় করতে পারেন। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের পক্ষে বিজ্ঞ উলামা ও মুফতীগণের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত নিজেদের থেকে কোন ফতুয়া বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা সমীচীন হবে না। কাউকে কাফের আখ্যায়িত করার জরুরী কয়েকটি মূলনীতি অত্র অধ্যায় (প্রথম অধ্যায়)-এর শেষে বর্ণনা করা হয়েছে।

কতিপয় শির্‌ক

* কোন বুযুর্গ বা পীর সম্বন্ধে এই আকীদা রাখা যে, তিনি সব সময় আমাদের অবস্থা জানেন। তিনি সর্বত্র হাজির নাযির।

* কোন পীর বুযুর্গকে দূর দেশ থেকে ডাকা এবং মনে করা যে তিনি জানতে পেরেছেন।

* কোন পীর বুযুর্গের কবরের নিকট সন্তান বা অন্য কোন উদ্দেশ্য চাওয়া।

* পীর বা কবরকে সাজদা করা।

* কোন বুযুর্গের নাম অযীফার মত জপ করা।

* কোন পীর বুযুর্গের নামে শিন্নি, ছদকা বা মান্নত মানা।

* কোন পীর বুযুর্গের নামে জানোয়ার যবেহ করা।

* কারও দোহাই দেয়া।

* কারও নামের কছম খাওয়া বা কিরা করা।

* আলীবখ্‌শ, হোছাইন বখ্‌শ ইত্যাদি নাম রাখা।

* নক্ষত্রের তাছীর (প্রভাব) মানা বা তিথি পালন করা,

* জ্যোতির্বিদ, গণক, ঠাকুর বা যার ঘাড়ে জিন এসেছে তার নিকট হাত দেখিয়ে অদৃষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। তাদের ভবিষ্যদ্বাণী ও গায়েবী খবর বিশ্বাস করা।

* কোন জিনিস দেখে কুলক্ষণ ধরা বা কুযাত্রা মনে করা, যেমন অনেকে যাত্রা মুখে কেউ হাঁচি দিলে কুযাত্রা মনে করে থাকে।

* কোন দিন বা মাসকে অশুভ মনে করা।

* মহররমের তাজিয়া বানানো।

* এ রকম বলা যে, খোদা রসূলের মর্জি থাকলে এই কাজ হবে বা খোদা রসূল যদি চায় তাহলে এই কাজ হবে।

* এরকম বলা যে, উপরে খোদা নীচে আপনি (বা অমুক)

* কাউকে "পরম পূজনীয়" লেখা।

* "কষ্ট না করলে কেষ্ট (শ্রীকৃষ্ণ) পাওয়া যায় না" বলা বা "জয়কালী নেগাহবান" ইত্যাদি বলা।

* কোন পীর বুযুর্গ, দেও পরী, বা ভূত ব্রাহ্মণকে লাভ লোকসানের মালিক মনে করা।

* কোন পীর বুযুর্গের দরগাহ বা কবরের চতুর্দিক দিয়ে তওয়াফ করা।

* কোন পীর বুযুর্গের দরগাহ বা বাড়ীকে কাবা শরীফের ন্যায় আদব-তাযীম করা। (ماخوذ از تعلیم الدین واحسن الفتاوی)

কতিপয় বিদআত

বিদআত অর্থ নতুন সৃষ্টি। শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত বলা হয় দ্বীনের মধ্যে কোন নতুন সৃষ্টিকে, অর্থাৎ দ্বীনের মধ্যে ইবাদত মনে করে এবং অতিরিক্ত ছওয়াবের আশায় এমন কিছু আকীদা বা আমল সংযোজন ও বৃদ্ধি করা, যা রাসূল (সঃ) সাহাবী ও তাবেয়ীদের যুগে অর্থাৎ, আদর্শ যুগে ছিল না। তবে যে সব নেক কাজের প্রেক্ষাপট সে যুগে সৃষ্টি হয়নি, পরবর্তীতে নতুন প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হওয়ায় নতুন আঙ্গিকে দ্বীনের কোন কাজ করা হয় সেটা বিদআত নয়, যেমন প্রচলিত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

নিম্নে কতিপয় বিদআতের বিষয় চিহ্নিত করে দেখানো হল ঃ

* কোন বুযুর্গের মাজারে ধুমধামের সাথে মেলা মিলানো।

* উরস করা।

* কাওয়ালী।

* জন্ম বার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা।

* মৃতের কুলখানী করা (অর্থাৎ, চতুর্থ দিনে ঈছালে ছওয়াব করা)

* মৃতের চেহলাম বা চল্লিশা করা।

* কবরের উপর চাদর দেয়া।

* কবরের উপর ফুল দেয়া।

* কবর পাকা করা।

* কবরের উপর গম্বুজ বানানো।

* কবরের দুই প্রান্তে কাঁচা ডাল লাগানো। তবে কোন কোন আলেম এটাকে জায়েয বলেছেন যদি মাঝে মধ্যে এটা করা হয় এবং স্থায়ী নিয়মে পরিণত করা না হয়।

* মাজারে চাদর, শামিয়ানা, মিঠাই ইত্যাদি নযরানা দেয়া।

* প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান।

* মীলাদ অনুষ্ঠানে কেয়াম করা।

* জানাযার নামাযের পর আবার হাত উঠিয়ে দুআ করা।

* জানাযার নামাযের পর জোর আওয়াজে কলেমা পড়তে পড়তে জানাযা বহন করে নিয়ে যাওয়া।

* দাফনের পর কবরের কাছে আযান দেয়া।

* ঈদের নামাযের পর মুসাফাহা ও মুআনাকা বা কোলাকুলি করা।

* আযানের পর হাত উঠিয়ে দুআ করা। (احسن الفتاوى ج /١)

* আযান ইকামতের মধ্যে রাসূল (সঃ)-এর নাম এলে বৃদ্ধা আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখে লাগানো। (احسن الفتاوى ج ١ وراه سنت)

* রমজানের শেষ জুমুআর খুতবায় বিদায় জ্ঞাপন মূলক শব্দ (যেমন আল-বিদা) যোগ করা। "জুমাতুল বিদা' বলে কোন ধারণা ইসলামে নেই।

* আমীন বলে মুনাজাত শেষ করা নিয়ম, অনেকে কালেমায়ে তইয়্যেবা বলতে বলতে মুখে হাত বুলান এবং মুনাজাত শেষ করেন—এটা কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়, এটা বিদআত। (احسن الفتاوی ج ۱)

* জানাযার উপর কালেমা ইত্যাদি লেখা বা ফুলের চাদর বিছানো।

(ماخوذ از تعلیم الدین ۔ آپ کے مسائل اور انکا حل ۔ راہ سنت ۔ احسن الفتاوی ج ۱ ۔ الفرقان وغیرھا)

কতিপয় রসম বা কুসংস্কার ও কুপ্রথা

* বিধবা বিবাহকে দুষণীয় মনে করা।

* বিবাহের সময় সামর্থ না থাকা সত্ত্বেও সমস্ত দেশাচার পালন করা এবং অযথা অপব্যয় করা।

* নছব বা বংশের গৌরব করা।

* কোন হালাল পেশাকে অপমানের বিষয় মনে করা। যেমন দপ্তরীর কাজ করা, মাঝিগিরী বা দর্জিগিরী করা, তৈল-লবণের দোকান করা ইত্যাদি।

* বিবাহ শাদিতে হিন্দুদের রছম পালন করা যেমন ফুল-কুলা দ্বারা বৌ বরণ করা, ভরা মজলিসে বউ-এর মুখ দেখানো, গীত গেয়ে স্ত্রী পুরুষ একত্রিত হয়ে বর কনেকে গোসল দেয়া ইত্যাদি।

* মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত কাপড়- চোপড়কে দুষণীয় মনে করা।

* বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালন করা (তবে শিকার ও পাহারার প্রয়োজনে কুকুর পালন করা বৈধ)

* বিবাহ-শাদী, খতনা ইত্যাদিতে হাদিয়া উপঢৌকন দেয়া। এসব উপঢৌকন প্রদানের পশ্চাতে ভাল নিয়ত থাকে না বা খারাপ নিয়ত থাকে, যেমন না দিলে অসম্মান হয়, দুর্নাম হয় বিধায় দেয়া হয় কিম্বা অমুক অনুষ্ঠানে তারা দিয়েছিল তাই দিতে হয় ইত্যাদি উদ্দেশ্যে মানুষ দিয়ে থাকে।

* বিবাহ-শাদিতে পদে পদে শত শত রছম ও কুসংস্কার পালিত হয়, এগুলো বর্জনীয়। প্রত্যেকটা পদে পদে শরীয়তের তরীকা কি তা জেনে বাকী সব পরিত্যাগ করা উচিত।

* শবে বরাতে হালুয়া রুটি করা, পটকা ফুটানো, আতশ বাজী করা।

* আশুরায় খিচুড়ি ও শরবত তৈরি এবং বন্টন।

* শবে বরাত ও শবে কদরে রাত্র জাগরণের জন্য ফরয ওয়াজিব থেকে বেশী গুরুত্ব সহকারে লোকদের সমবেত করার উদ্যোগ নেয়া।

* শাব্দিক অর্থে "ঈদ মুবারক" বলা খারাপ ছিল না, কিন্তু এটা রছমে পরিণত হয়েছে বিধায় পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

* ঈদগাহে বা মসজিদে যাওয়ার আগেই তাসবীহ বা জায়নামায দিয়ে স্থান দখল করে রাখা।

* মুয়াজ্জিনের জন্য জায়নামায বিছিয়ে স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা।

* মসজিদ, মাদ্রাসা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য বা ধর্মীয় অন্য কোন কাজের জন্য মজলিসের মধ্যে এমন ভাবে চাঁদা আদায় ও দান কালেকশন করা যে, মানুষ শরমে পড়ে বা চাপের মুখে পীড়াপীড়ির কারণে দান করে।

* বিপদ-আপদে যে কোন দান-সদকা করলে বিপদ দুরীভূত হয়, কিন্তু গরু ছাগল মোরগ প্রভৃতি কোন প্রাণীই জবাই করতে হবে–যেমন বলাও হয় জানের বদলে জান– এটা একটা রছম। জানের বদলে জান হওয়া জরুরী নয় বরং যে কোন ছদকা হলেই তা বিপদ দুরীভূত হওয়ার সহায়ক।

* তারাবীহ্তে কুরআন খতম হওয়ার দিন মিষ্টি বিতরণ।

* মাইয়েতের জন্য ঈছালে ছওয়াব করা দুআ করা শরীয়ত সম্মত বিষয়, কিন্ত সেটা সম্মিলিত হয়েই করতে হবে এরূপ বাধ্যবাধকতার পেছনে পড়াও রছমে পরিণত হয়েছে।

(ماخوذ از بهشتی زیور ۔ تعلیم الدین ۔ اصلاح الرسوم احسن الفتاوی وغیرھا)

কবীরা গোনাহ বা বড় গোনাহের তালিকা

১. শিরক।
২. মা-বাপের নাফরমানী করা অর্থাৎ, তাদের হক আদায় না করা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৩৬৬ পৃষ্ঠা)
৩. "কেতয়ে রেহমী" অর্থাৎ, যে সব আত্মীয়দের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তাদের সাথে অসদ্ব্যবহার করা ও তাদের হক নষ্ট করা।
৪. যেনা করা অর্থাৎ, নারীর সতীত্ব নষ্ট করা এবং পুরুষের চরিত্র নষ্ট করা। (দেখুন ৫৫১ পৃষ্ঠা)
৫. বালকদের সাথে কুকর্ম করা। (দেখুন ৫৫২ পৃষ্ঠা)
৬. হস্ত মৈথুন করা।
৭. প্রাণীর সাথে কুকর্ম করা।
৮. আমানতের খেয়ানত করা। (দেখুন ৫৫৯ পৃষ্ঠা)
৯. মানুষ খুন করা।
১০. মিথ্যা তোহমত বা অপবাদ লাগানো, বিশেষভাবে জেনার অপবাদ লাগানো।

১১. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।
১২. সাক্ষ্য গোপন করা, যখন অন্য কেউ সাক্ষ্য দেয়ার না থাকে।
১৩. যাদু দ্বারা কারও ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করা। (দেখুন ৬৩ পৃষ্ঠা)
১৪. যাদু শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়া।
১৫. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, ওয়াদা খেলাফ করা, কথা দিয়ে তা ঠিক না রাখা। (দেখুন ৫৬৩ পৃষ্ঠা)
১৬. গীবত করা (দেখুন ৫৫৩ পৃষ্ঠা)
১৭. স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে, মনীবের বিরুদ্ধে চারককে, উস্তাদের বিরুদ্ধে শাগরেদকে, রাজার বিরুদ্ধে প্রজাকে, কর্তার বিরুদ্ধে কর্মচারীকে ক্ষেপিয়ে তোলা।
১৮. নেশা করা। (দেখুন ৫৪৯ পৃষ্ঠা)
১৯. জুয়া খেলা। (দেখুন ৫৫৮ পৃষ্ঠা)
২০. সুদ অনেক প্রকারের আছে- সরল সুদ, চক্রবৃদ্ধি সুদ ইত্যাদি সর্বপ্রকারের সুদই মহাপাপ। সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের লেন-দেনে সাক্ষ্য দাতা ও সুদ বিষয়ক লেন-দেনের দলীল লেখক সকলের প্রতি রাসূল (সঃ) লা'নত করেছেন। সকলেরই কবীরা গোনাহ হয়।
২১. ঘুষ বা রেশওয়াত প্রদান ও গ্রহণের কারণে আল্লাহর অভিশাপ অবতীর্ণ হয়, এটা মহাপাপ। তবে জালেমের জুলুমের কারণে নিজের হক আদায় করার জন্য ঠেকায় পড়ে ঘুষ দিলে তা মহাপাপ নয়। কিন্তু ঘুষ দিয়ে কার্য উদ্ধার করার মনোবৃত্তি ভাল নয়। যাদের বেতন ধার্য আছে তারা কর্তব্য কাজ করে দিয়ে অতিরিক্ত যা কিছু নিবে সবই ঘুষ, চাই একটা সিগারেট হোক বা এক কাপ চা বা একটা পানই হোক।
২২. অন্যায়ভাবে কারও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি হরণ বা ভোগ দখল করা।
২৩. অনাথ, এতীম, নিরাশ্রয় বা বিধবার মাল গ্রাস করা।
২৪. খোদার ঘর যেয়ারতকারী তথা হজ্ব যাত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা।
২৫. মিথ্যা কছম করা।
২৬. গালি দেয়া। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৫৫৫ পৃষ্ঠা)
২৭. অশ্লীল কথা বলা।
২৮. জেহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা।
২৯. ধোকা দেয়া।
৩০. অহংকার করা। (দেখুন ৫৪২ পৃষ্ঠা)
৩১. চুরি করা।
৩২. ডাকাতি ও লুটতরাজ করা, এমনিভাবে পকেট মারা, ছিনতাই করা।

৩৩. নাচ, গান-বাদ্য, সিনেমা ইত্যাদি। (দেখুন ৫৪৮ ও ৫৪৯ পৃষ্ঠা)
৩৪. স্বামীর নাফরমানী করা। (দেখুন ৩৭৪ পৃষ্ঠা)
৩৫. জায়গা জমির আইল (সীমানা) নষ্ট করা।
৩৬. শ্রমিক থেকে কাজ পূর্ণ নিয়ে তার পূর্ণ মুজরি না দেয়া বা পূর্ণ মজুরি দিতে টাল-বাহানা করা।
৩৭. মাপে কম দেয়া।
৩৮. মালে মিশাল দেয়া।
৩৯. খরীদ্দারকে ধোকা দেয়া।
৪০. দাইয়্যূছিয়াত অর্থাৎ, নিজের বিবিকে বা অধীনস্ত কোন নারীকে পর পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেয়া, পর পুরুষের বিছানায় যেতে দেয়া, এসবের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।
৪১. চোগলখুরী করা। (দেখুন ৫৫৪ পৃষ্ঠা)
৪২. গণকের কাছে যাওয়া। (দেখুন ৬২ পৃষ্ঠা)
৪৩. মানুষ বা অন্য কোন জীবের ফটো আদর করে ঘরে রাখা।
৪৪. পুরুষের জন্য সোনার আংটি পরিধান করা।
৪৫. পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক পরিধান করা। (দেখুন ৪২১ পৃষ্ঠা)
৪৬. শরীরের রূপ ঝলকে– মেয়েলোকের জন্য এমন পাতলা পোশাক পরিধান করা।
৪৭. মহিলার জন্য পুরুষের পোশাক ও পুরুষের জন্য মহিলার পোশাক পরিধান করা।
৪৮. গর্বভরে লুঙ্গি, পায়জামা, জামা ও প্যান্ট পায়ের গিরার নীচে ঝুলিয়ে চলা। (দেখুন ৪২২ পৃষ্ঠা)।
৪৯. বংশ বদলানো অর্থাৎ পিতৃ পরিচয় বদলে দেয়া।
৫০. মিথ্যা মোকাদ্দমা করা, মিথ্যা মোকাদ্দমার পরামর্শ প্রদান, তদবীর ও পায়রবী করাও কবীরা গোনাহ।
৫১. মৃত ব্যক্তির শরীয়ত সম্মত অছীয়ত পালন না করা।
৫২. কোন মুসলমানকে ধোঁকা দেয়া।
৫৩. গুপ্তচরবৃত্তি করা, অর্থাৎ মুসলমান সমাজের এবং মুসলমান রাষ্ট্রের গুপ্ত ভেদ ও দুর্বল পয়েন্টের কথা অন্য সমাজের লোকের কাছে, অন্য রাষ্ট্রের কাছে প্রকাশ করা।
৫৪. কাউকে মেপে দিতে কম দেয়া এবং মেপে নিতে বেশী নেয়া।
৫৫. টাকা বা নোট জাল করা।
৫৬. ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরায় ত্রুটি করা।

৫৭. দেশের জরুরী রসদ, খাদ্য বা হাতিয়ার চোরাচালান বা পাচার করা।
৫৮. রাস্তা-ঘাটে, বা ছায়াদার কিম্বা ফলদার বৃক্ষের নীচে মল-মূত্র ত্যাগ করা।
৫৯. বাড়ি-ঘর, আনাচ-কানাচ, থালা, বাসন, কাপড়-চোপড় নোংরা ও গান্ধা করে রাখা।
৬০. হায়েয বা নেফাছ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা।
৬১. মলদ্বারে স্ত্রী সহবাস করা।
৬২. যাকাত না দেয়া।
৬৩. ইচ্ছা পূর্বক ওয়াক্তিয়া নামায কাযা করা।
৬৪. জুমুআর নামায না পড়া।
৬৫. বিনা ওজরে রোযা ভাঙ্গা।
৬৬. রিয়া তথা লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করা।
৬৭. জনগণের কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও দাম বাড়ানোর জন্য জীবিকা নির্বাহোপযোগী খাদ্য- দ্রব্য, জিনিসপত্র গোলাজাত করে রাখা।
৬৮. মানুষের কষ্ট হয় এমন খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি দেখে খুশী হওয়া।
৬৯. ষাড় বা পাঠার দ্বারা গাভী বা ছাগী পাল দিতে না দেয়া। পাল দেয়ার জন্য বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নয়।
৭০. প্রতিবেশীকে (ভিন্ন জাতির হলেও) কষ্ট দেয়া।
৭১. পাড়া প্রতিবেশীর ঝী-বৌকে কুনজরে দেখা।
৭২. মাল থাকা বা মাল উপার্জনের শক্তি থাকা সত্ত্বেও লোভের বশবর্তী হয়ে ছওয়াল করা।
৭৩. জনগণ চায় না তা সত্ত্বেও তাদের নেতৃত্ব দেয়া।
৭৪. কারণ ছাড়াই স্ত্রীর স্বামী সহবাসে অসম্মত হওয়া।
৭৫. পরের দোষ দেখে বেড়ানো।
৭৬. কারও জান, মাল বা ইজ্জতের হানি করা।
৭৭. নিজের প্রশংসা নিজে করা।
৭৮. বিনা দলীলে কারও প্রতি বদ গোমানী করা (দেখুন ৫৪৬ পৃষ্ঠা)
৭৯. ইলমে দ্বীনকে তুচ্ছ মনে করে ইলমে দ্বীন হাছেল না করা বা হাছেল করে আমল না করা।
৮০. এমন কোন কথা, যা রাসূল (সঃ) বলেননি বা এমন কোন কাজ, যা রাসূল (সঃ) করেননি- সে সম্পর্কে এরূপ বলা যে, রাসূল (সঃ) বলেছেন বা রাসূল (সঃ) করেছেন।
৮১. হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা। তবে মৃত্যুর সময় হজ্জের ওছীয়ত বা ব্যবস্থা সম্পন্ন করে গেলে পাপমুক্ত হতে পারবে।

৮২. কোন সাহাবীকে মন্দ বলা, সাহাবীদের সমালোচনা করা।
৮৩. হযরত আলী (রাঃ)-কে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে শ্রেষ্ঠ বলা।
৮৪. কোন নারীকে তার স্বামীর কাছে গমন ও স্বামীর হক আদায়ে বাঁধা দেয়া।
৮৫. কোন অন্ধকে ভুল পথ দেখিয়ে দেয়া।
৮৬. পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করা ও অশান্তি ছড়ানো, ফ্যাসাদ করা।
৮৭. কাউকে কোন পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করা ও পাপ কাজে সহযোগিতা করা।
৮৮. কোন গোনাহে ছগীরার উপর হটকারিতা করা।
৮৯. পেশাবের ছিটা থেকে সাবধান সতর্ক না থাকা।
৯০. কোন দান ছদকা করে বা হাদিয়া উপঢৌকন দিয়ে খোঁটা দেয়া।
৯১. অনুগ্রহকারীর না-শোকরী করা।
৯২. কোন মুসলমান ভাইকে ছুরি, চাকু, তলোয়ার ইত্যাদি লৌহ অস্ত্র দ্বারা ইশারা করে ভয় দেখানো।
৯৩. দাবা ও ছক্কা পাঞ্জা খেলা। আরও কতিপয় খেলা রয়েছে যা হারাম ও কবীরা গোনাহ। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৫৫৮ পৃষ্ঠা)
৯৪. বিনা জরুরতে লোকের সামনে সতর খোলা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ২৮৩ পৃষ্ঠা)
৯৫. মেহমানদের খাতির ও আদর যত্ন না করা।
৯৬. হাসি-ঠাট্টা করে কাউকে অপমানিত করা।
৯৭. স্বজন-প্রীতি করা।
৯৮. অন্যায় বিচার করা।
৯৯. নিজে ইচ্ছা করে, দাবী করে পদ প্রার্থী হওয়া বা পদ গ্রহণ করা। তবে কোন ক্ষেত্রে যদি এমন হয় যে, তিনিই একমাত্র উক্ত পদের যোগ্য, তিনি উক্ত পদ গ্রহণ না করলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির স্বার্থ নষ্ট হবে, তাহলে সে ক্ষেত্রে পদ চাওয়া হলে তা ভিন্ন কথা।
১০০. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা।
১০১. নিজের বিবি-বাচ্চার খবর-বার্তা না নিয়ে তাদেরকে নষ্ট হয়ে যেতে দেয়া।
১০২. খতনা না করা মহাপাপ (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ২৮৬ পৃষ্ঠা)
১০৩. অসৎ ও অন্যায় কাজ দেখে পারত পক্ষে তাতে বাঁধা না দেয়া। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪০৬ পৃষ্ঠা)
১০৪. জালেমদের প্রশংসা বা তোষামোদ করা।
১০৫. অন্যায়ের সমর্থন করা।
১০৬. আত্মহত্যা করা।
১০৭. স্বেচ্ছায় নিজের কোন অঙ্গ নষ্ট করা।

১০৮. স্ত্রী সহবাস করে গোসল না করা।

১০৯. প্রিয়জন বিয়োগে সিনা পিটিয়ে বা চিৎকার করে কাঁদা।

১১০. স্ত্রী পুরুষের নাভীর নীচের পশম, বগলের পশম বর্ধিত করে রাখা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ২৮৭ পৃষ্ঠা)

১১১. উস্তাদ ও পীরের সঙ্গে বেয়াদবী করা, হাফেজ ও আলেমের অমর্যাদা করা, তাদের সাথে বেআদবী করা।

১১২. প্রাণীর ছবি তৈরি করা বা ব্যবহার করা।

১১৩. শুকরের গোশত খাওয়া।

১১৪. কোন হারাম দ্রব্য ভক্ষণ করা।

১১৫. ষাঢ়, কবুতর বা মোরগ ইত্যাদির লড়াই দেয়া।

১১৬. কুরআন শরীফ পড়ে ভুলে যাওয়া। (কোন রোগের কারণে হলে তা ভিন্ন কথা) কেউ কেউ বলেছেন ভুলে যাওয়ার অর্থ এমন হয়ে যাওয়া যে, দেখেও আর পড়তে পারে না।

১১৭. কোন জীবকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে হত্যা করা কবীরা গোনাহ। তবে সাপ, বিচ্ছু, ভীমরুল ইত্যাদি কষ্টদায়ক জীব থেকে বাঁচার আর কোন উপায় না থাকলে ভিন্ন কথা।

১১৮. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।

১১৯. আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভীক হওয়া।

১২০. মৃত প্রাণী খাওয়া।

১২১. হালাল জীবকে আল্লাহর নামে জবাই না করে অন্য কারও নামে জবাই করে বা অন্য কোন উপায়ে মেরে খাওয়া।

১২২. অপব্যয় করা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৫৫০ পৃষ্ঠা)

১২৩. বখীলী বা কৃপণতা করা (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৫৪১ পৃষ্ঠা)

১২৪. রাজকীয় ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আইন সমর্থন না করে অনৈসলামিক আইন সমর্থন করা।

১২৫. ইসলামী আইন হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী রাষ্ট্রের আইন অমান্য করা বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা।

১২৬. ছোট জাত, ছোট পেশাদার বলে বা জোলা, তেলি, কুমার, কামার, বান্দীর বাচ্চা ইত্যাদি বলে কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা বা খোঁটা দেয়া।

১২৭. বিনা এজাযতে কারও বাড়ির ভেতরে বা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করা কিংবা তাকানো। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৩৯৩ পৃষ্ঠা)

১২৮. লুকিয়ে কারও কথা শোনা।

১২৯. ছুরত শেকেলের কারণে বা গরীব হওয়ার কারণে কোন মুসলমানকে টিট্‌কারি বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা।

১৩০. কোন মুসলমানকে কাফের বলা।

১৩১. কোন মুসলমানের সাথে উপহাস করা।

১৩২. একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করা।

১৩৩. কোন খাদ্যকে মন্দ বলা। (তবে রান্নার ত্রুটি বর্ণনা করা হলে তা খাদ্যকে মন্দ বলার অন্তর্ভুক্ত নয়।)

১৩৪. দুনিয়ার মহব্বত। (অর্থাৎ দ্বীনের মোকাবেলায় দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া।)

১৩৫. দাড়ি বিহীন বালকের প্রতি খাহেশাতের নজরে তাকানো।

১৩৬. গায়ের মাহরাম স্ত্রী লোকের নিকট একা একা বসা।

১৩৭. কাফেরদের রীতিনীতি পছন্দ করা।

(ماخوذ از فروع الایمان۔ تعلیم الدین۔ گناہ بے لذت نقلا عن اثار العشائر من الصغائر و الکبائر۔ وغیرها)

ছগীরা গোনাহের বিবরণ ও তার একটি তালিকা

নিম্নে ছগীরা বা ছোট গোনাহের একটি মোটামুটি তালিকা পেশ করা হল। তবে উল্লেখ্য যে, এই তালিকার মধ্যকার অনেক গোনাহকে অনেকে কবীরা গুনাহ বলেও আখ্যায়িত করেছেন। আবার পূর্বে উল্লেখিত কবীরা গোনাহের তালিকায় উল্লেখিত কোন কোন গোনাহকে ছগীরা গোনাহ বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। আসলে একটি গোনাহকে তার চেয়ে বড় গোনাহের তুলনায় ছোট বলা যায়, আবার তার চেয়ে ছোট গোনাহের তুলনায় তাকে বড় গোনাহও বলা যায়। আবার এক হিসেবে কোন গোনাহই ছোট নয়, কেননা সেটাওতো আল্লাহরই নাফরমানী। যেমন ছোট সাপও জীবন ধ্বংসকারী, বড় সাপও জীবন ধ্বংসকারী–এরূপ বিচারে কোন সাপই ছোট অর্থাৎ, অবহেলার নয়। অতএব এ দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন পাপকেই তুচ্ছ বা ছোট মনে করতে নেই। আর ছগীরা বা ছোট গোনাহের উপর হটকারিতা করলে তা কবীরা হয়ে দাঁড়ায়। যাহোক স্বাভাবিক ভাবে যেগুলোকে ছগীরা গোনাহ বলা হয় তার একটি মোটামুটি তালিকা এই ঃ

১. কোন মানুষ বা প্রাণীকে লা'নত (অভিশাপ) দেয়া।

২. না জেনে কোন পক্ষে ঝগড়া করা কিংবা জানার পর অন্যায় পক্ষে ঝগড়া করা।

৩. ইচ্ছাকৃত ভাবে নামাযে হাসা বা কোন বিপদের কারণে নামাজের মধ্যে ক্রন্দন করা।

৪. ফাসেক লোকদের সাথে উঠাবসা করা।

৫. মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়া।

৬. কোন মসজিদে নাপাক প্রবেশ করানো।
৭. মসজিদে পাগল বা এমন ছোট শিশুকে নিয়ে যাওয়া, যার দ্বারা মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে।
৮. পেশাব পায়খানার সময় কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে বসা।
৯. উলঙ্গ হয়ে গোসল করা, যদিও আটকা স্থানে এবং লোকদের অগোচরে হয়।
১০. কোন স্ত্রীর সাথে জেহার করলে কাফফারা আদায় করার পূর্বে তার সাথে সহবাস করা।

স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে তুমি আমার উপর আমার মাতার পৃষ্ঠ দেশের মত (অর্থাৎ, মাতার পিঠের মত হারাম) এরূপ বলাকে "জেহার" বলা হয়। ইসলামর্পূব কালে স্ত্রীকে নিজের ইপর হারাম করার এটি একটি বিশেষ পদ্ধতি ছিল। এরূপ বললে কাফ্ফারা আদায় করার পূর্বে স্ত্রী হালাল হবে না।

১১. সওমে বেসাল করা অর্থাৎ, এমনভাবে কয়েক দিন রোযা রাখা যে, মধ্যে ইফতারীও করবেনা।
১২. মাহরাম পুরুষ ব্যতীত নারীর জন্য সফর করা।
১৩. কেউ ক্রয়ের জন্য কথা-বার্তা বলছে বা বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে এখনও উত্তর মেলেনি এরই মধ্যে অন্য কারও দর বলা বা প্রস্তাব দেয়া।
১৪. বাইরে থেকে শহরে যে মাল আসছে সেটা শহরের বাইরে গিয়ে ক্রয় করা। (এভাবে মধ্যস্বত্ব ভোগীর কারণে শহরে এসে মালের দাম বৃদ্ধি পায়)
১৫. জুমুআর (প্রথম) আযান হওয়ার পর ক্রয়-বিক্রয় করা এবং অন্যান্য দুনিয়াবী কাজ করা। অবশ্য জুমুআর দিকে চলন্ত অবস্থায় বেচা-কেনা করলে তাতে পাপ হবে না, কারণ অনুরূপ ক্রয়-বিক্রয় জুমুআর নামাযের জন্য ব্যাঘাত ঘটায় না।
১৬. শখ করে কুকুর লালন-পালন করা। মালামাল ও ফসল সংরক্ষণের জন্য কিম্বা শিকারের উদ্দেশ্যে কুকুর পালন করা জায়েয।
১৭. অতি নগন্য বস্তু চুরি করা।
১৮. দাঁড়িয়ে পেশাব করা।
১৯. গোসল খানায় কিম্বা পানির ঘাটে পেশাব করা।
২০. নামাযে সাদল (سدل) করা অর্থাৎ, অস্বাভাবিক ভাবে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা।
২১. গোসল ফরয– এরূপ অবস্থায় আযান দেয়া।
২২. গোসল ফরয– এরূপ অবস্থায় বিনা ওজরে মসজিদে প্রবেশ করা।
২৩. গোসল ফরয– এরূপ অবস্থায় মসজিদে বসা।
২৪. নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রেখে দাঁড়ানো।

২৫. নামাযে লম্বা চাদর এমন ভাবে শরীরে জড়ানো যাতে হাত বের করা মুশকিল হয়।

২৬. নামাযে কাপড় অথবা শরীর নিয়ে খেলা করা অর্থাৎ, বিনা প্রয়োজনে কোন অঙ্গ নাড়াচাড়া করা বা কাপড় ওলট-পালট করা।

২৭. নামাযীর সামনে তার দিকে তাকিয়ে বসা বা দাঁড়ানো।

২৮. নামাযে ডানে বামে অথবা উপরের দিকে তাকানো।

২৯. মসজিদে দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলা।

৩০. ইবাদত নয় এরূপ কোন কাজ মসজিদে করা।

৩১. রোজা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে নিরাভরণ হয়ে জড়াজড়ি করা।

৩২. রোজা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেয়া। (যদি আরও আগে বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে)।

৩৩. নিকৃষ্ট মাল দ্বারা যাকাত আদায় করা।

৩৪. গলার পশ্চাদ্দিক থেকে প্রাণী জবেহ করা।

৩৫. পঁচা মাছ অথবা মরে ভেসে ওঠা মাছ খাওয়া।

৩৬. বিনা প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক দ্রব্যমূল্য নিদ্ধার্রণ করে দেয়া।

৩৭. বালেগা বোধ সম্পন্ন নারীর পক্ষে ওলীর ইজাযত ব্যতীত বিবাহ বসা (যদি ওলী অহেতুক বিবাহে বাঁধা দেয়ার না হয়)।

৩৮. "নেকাহে শেগার" করা। অর্থাৎ, এমন বিবাহ যাতে মহরে টাকা পয়সার পরিবর্তে নিজের মেয়েকে বিবাহ দেয়া হয়।

৩৯. স্ত্রীকে একের অধিক তালাক দেয়া।

৪০. স্ত্রীকে বিনা প্রয়োজনে বায়েন তালাক দেয়া (বরং রেজ্য়ী তালাক দেয়া উচিত।)

৪১. হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া। (খোলা তালাক দেয়া যায়। অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীকে স্বামী তালাক দিলে তাকে খোলা তালাক বলে।)

৪২. যে তুহরে সহবাস হয়েছে তাতে তালাক দেয়া। (দেখুন ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

৪৩. তালাকে রেজয়ী প্রদত্ত স্ত্রীকে সহবাস ইত্যাদি দ্বারা রুজু করা। (বরং প্রথমে মৌখিক ভাবে রুজু হওয়া চাই।)

৪৪. স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে ঈলা করা। 'ঈলা' বলা হয় কোন সময়সীমা নির্ধারণ করা ছাড়া অথবা চার মাস কিম্বা তারও বেশী সময়ের জন্য স্ত্রী গমন না করার শপথ করাকে। এরূপ শপথ করার পর চার মাসের মধ্যে শপথ ভঙ্গ করলে অর্থাৎ, স্ত্রী গমন করলে শপথ ভঙ্গ করার কাফফারা দিতে হবে এবং স্ত্রী বহাল থাকবে– তালাক হবে না। আর চার মাসের মধ্যে উক্ত স্ত্রী গমন না করলে চার মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে উক্ত স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।

৪৫. সন্তানদেরকে কোন মাল ইত্যাদি দেয়ার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা না করা (দেখুন ৯৬ পৃষ্ঠা)
৪৬. বিচারক কর্তৃক বাদী বিবাদী উভয় পক্ষের শুনানী ও তাদের প্রতি মনোযোগ প্রদানে সমতা রক্ষা না করা।
৪৭. কোন যিম্মী কাফেরকে কাফের বলে সম্বোধন করা। (যদি সে এরূপ সম্বোধনে কষ্টবোধ করে।
৪৮. বাদশার এনআম কবূল না করা।
৪৯. যার হালাল সম্পদের পরিমাণ কম-হারামের পরিমাণ বেশী, বিনা ওজরে তাহকীক ছাড়া তার দাওয়াত ও হাদিয়া গ্রহণ করা।
৫০. কোন প্রাণীর নাক কান প্রভৃতি কেটে দেয়া।
৫১. জবর দখলকৃত জমিতে প্রবেশ করা। এমনকি নামাযের জন্য হলেও।
৫২. কোন মুরতাদ বা অমুসলিম রাষ্ট্রের কাফেরকে তিন দিন পর্যন্ত তওবা করতঃ মুসলমান হওয়ার দাওয়াত প্রদান করার পূর্বে হত্যা করে দেয়া।
৫৩. নামাযে পাঠ করার জন্য কোন বিশেষ সূরা নির্ধারিত করা।
৫৪. নামাযে যে সাজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয় সেটাকে বিলম্বিত করা বা ছেড়ে দেয়া।
৫৫. বিনা প্রয়োজনে একাধিক মুরদাকে এক কবরে দাফন করা।
৫৬. জানাযার নামায মসজিদের ভেতর পড়া।
৫৭. ডানে কিম্বা বায়ে ফটো রেখে নামায পড়া বা ফটোর উপর সাজদা করা।
৫৮. স্বর্ণের তার দিয়ে দাঁত বাঁধাই করা।
৫৯. মৃত ব্যক্তির চেহারায় চুমু দেয়া।
৬০. ইসলাম বিরোধী কোন সম্প্রদায়ের নিকট অস্ত্র বিক্রয় করা।
৬১. বালেগদের জন্য নিষিদ্ধ -এমন কোন পোশাক শিশুদেরকে পরিধান করানো।
৬২. স্ত্রীর সাথে এমন কারও সামনে সংগম করা যে বোঝে এবং হুশ রাখে। যদিও সে ঘুমিয়ে থাকে। (খুব ছোট শিশুর বেলায় ভিন্ন কথা)
৬৩। কোন আমীর বা শাসকের অভ্যর্থনায় বের হওয়া।
৬৪. রাস্তায় এমন স্থানে দাঁড়ানো বা বসা, যাতে অন্যদের চলতে অসুবিধা হয়।
৬৫. আযান শোনার পর ওজর বা জরুরী কাজ ব্যতীত ঘরে বসে বসে একামতের অপেক্ষা করতে থাকা।
৬৬. পেট ভরার পরও অতিরিক্ত খাওয়া। (রোযা বা মেহমানের কারণে কিছু বেশী খাওয়া হলে তা ব্যতিক্রম)
৬৭. ক্ষুধা লাগা ছাড়াও খাওয়া। (রোগের অবস্থা ব্যতিক্রম)

৬৮. খুতবার সময় কথা বলা (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ১৭৬ পৃষ্ঠা)
৬৯. মসজিদে মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে সামনে যাওয়া।
৭০. মানুষের চলার পথে নাপাকী ফেলা।
৭১. মসজিদের ছাদে নাপাকী ফেলা।
৭২. নিজের সাত বৎসরের চেয়ে অধিক বয়স্ক ছেলের সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করা।
৭৩. অহেতুক কাজে ও কথায় সময় নষ্ট করা।
৭৪. কারও প্রশংসায় অতিরঞ্জন করা।
৭৫. কথা বলতে গিয়ে ছন্দ মিলানোর কসরৎ করা।
৭৬. হাসি-ফুর্তিতে সীমালংঘন করা।
৭৭. কারও গুপ্ত কথা ফাঁস করা।
৭৮. সাথী-সঙ্গী ও বন্ধু-বান্ধবদের হক আদায়ে ত্রুটি করা।
৭৯. ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আপন জন ও বন্ধু-বান্ধবকে জুলুম থেকে বিরত না রাখা।
৮০. বিনা ওজরে হজ্ব বা যাকাত আদায়ে বিলম্ব করা। কেউ কেউ এটাকে কবীরা গোনাহের তালিকাভুক্ত করেছেন।

(گناہ بے لذت থেকে গৃহীত)

মুসলমান হওয়ার বা মুসলমান বানানোর তরীকা

* কোন অমুসলমানকে মুসলমান হতে হলে বা তাকে মুসলমান বানাতে হলে তার গোসল করে নেয়া মোস্তাহাব, যদি হদছে আকবার থেকে পাক হয়, অর্থাৎ গোছল ওয়াজেব অবস্থায় না থাকে।

* যে মুসলমান হতে চায় সে কালেমায়ে তইয়্যেবা কিম্বা কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে। বোবা হলে ইশারায় তাওহীদ ও রেছালাতের স্বীকৃতি দিবে।

* কালেমার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার যে একত্ববাদ ও মুহাম্মাদ (সঃ)-এর যে রেছালাত (রাসূল হওয়া) সম্বন্ধে স্বীকৃতি রয়েছে, তা জেনে বুঝে মেনে নিতে হবে এবং দ্বিধাহীন চিত্তে তা গ্রহণ করতে হবে। কালেমার এই অর্থ ও বিষয়বস্তু উপলব্ধি ব্যতীরেকে কেবল মুখে মুখে কালেমা উচ্চারণ করে নিলেই সে আল্লাহর কাছে মুমিন ও মুসলমান বলে গণ্য হবে না। (دین کیا ہے)

কালেমায়ে তইয়্যেবা এই– لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই (অর্থাৎ, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদত ও বন্দেগী লাভের উপযুক্ত নয়) হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর (সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ) রাসূল।

কালেমায়ে শাহাদাত এই–

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

কালেমায়ে তাওহীদ এই ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ وَاحِدًا لَّا ثَانِيَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ ঃ (হে আল্লাহ!) তুমি ছাড়া কোন মাবূদ নেই; তুমি এক– তোমার দ্বিতীয় কেউ নেই। মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, মুত্তাকীদের ইমাম(সরদার), সমস্ত জাহানের প্রতিপালকের প্রেরিত মহামানব।

কালিমায়ে তামজীদ এই ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِىَ اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ .

অর্থ ঃ (হে আল্লাহ!) তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তুমি নূর। আল্লাহ নিজ নূর দ্বারা যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সব রাসূলের সর্দার এবং সর্বশেষ নবী।

* কালেমায়ে তইয়্যেবা, কালেমায়ে শাহাদাত, কালেমায়ে তাওহীদ, কালেমায়ে তামজীদ প্রভৃতি কালেমা সমূহ মুখস্ত করা জরুরী নয়, শুধু তার বিষয়বস্তুতে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট। (خير الفتاوى ج/١)

* অতঃপর তাকে ক্রমান্বয়ে ইসলামের জরুরী আকীদা ও আমলের বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে।

* যে কোন মুসলমান অন্য যে কোন অমুসলমানকে মুসলমান বানাতে পারে।

কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা (تكفير করা)-এর নীতি

১. যখন কেউ প্রকৃতই কাফের হয়ে যায়, তখন তাকে কাফের বলে ফতুয়া দিয়ে দেয়া মুফতীদের কর্তব্য, যাতে অন্য মুসলমান তার আকীদা বিশ্বাসের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যেতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে মুফতীদের এ কথার ভয় করা উচিত হবে না যে, মৌলভীরা শুধু ফতুয়াবাজী করে বেড়ায় বা নিজেদের মধ্যে কাদা ছুড়াছুড়ি করে।

২. যদি কেউ প্রকৃতঃই কাফের না হয়ে যায়, তাহলে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা মহাপাপ। এতে এরূপ ফতুয়া প্রদানকারী স্বয়ং নিজেই কাফের হয়ে যাবে। কাজেই কাফের ফতুয়া প্রদানের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে–এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া সংগত নয়।

৩. কোন মুসলমানের কোন কথা বা কাজ কুফর কি না– এ ব্যাপারে উভয় দিকের সম্ভাবনা থাকলে তাকে সেই কথা বা কাজের ভিত্তিতে কাফের বলে ফতুয়া দেয়া যাবে না, এমন কি কুফরের দিকটার সম্ভাবনা বেশী থাকলেও, এমনকি সেটা কুফর হওয়ার সম্ভাবনা ৯৯ ভাগ আর কুফর না হওয়ার সম্ভাবনা ১ ভাগ হলেও। তবে হাঁ একটি কথা বা একটি কাজও যদি এমন পাওয়া যায় যা নিশ্চিতই কুফ্‌রী, তাহলে তার কারণে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা হবে। (جواهر الفقه)

বিঃ দ্রঃ কয়েকটি কুফ্‌রীর বিবরণ পূর্বে ৬৯-৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

আমি জিন ও ইনসানকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (আল কুরআন)

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইবাদাত

কয়েকটি পরিভাষার ব্যাখ্যা ঃ

* **ফরয ঃ** যা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত এবং যা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনিশ্চিতরূপে করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে তাকে ফরয বলে। যেমন কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জেহাদ, ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা, সত্য কথা বলা ইত্যাদি। ফরয দুই প্রকার (এক) **'ফরযে আইন'**– যে কাজ প্রত্যেক বালেগ বুদ্ধিমান নর-নারীর উপর সমান ভাবে ফরয। যেমন পাঁচ ওয়াক্তের নামায, আবশ্যক পরিমাণ ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা ইত্যাদি। (দুই) **'ফরযে কেফায়া'**– যে কাজ কতক লোকে পালন করলে সকলেই গোনাহ থেকে বেঁচে যায়; কিন্তু কেউ পালন না করলে সকলেই ফরয তরকের জন্য পাপী হয়ে যায়। যেমন জানাযার নামায পড়া, মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন করা, আবশ্যক পরিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা ইত্যাদি।

* **ওয়াজিব** ঃ ওয়াজিব কাজ ফরযের ন্যায় অবশ্যকরণীয়। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, ফরয অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায় কিন্তু ওয়াজিব অস্বীকার করলে কাফের হয় না তবে ফাসেক হয়ে যায়। যেমন বেতরের নামায পড়া, কুরবানী করা, ফেৎরা দেয়া ইত্যাদি।

* **সুন্নাত** ঃ যে কাজ রাসূল (সঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ করেছেন তাকে সুন্নাত বলে। সুন্নাত দুই প্রকার (এক) **'সুন্নাতে মুয়াক্কাদা'**– যে কাজ রাসূল (সঃ) ও সাহাবীগণ সব সময় করেছেন, বিনা ওজরে কখনও ছাড়েননি। যেমন আযান, ইকামত, খতনা, বিবাহ ইত্যাদি। সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ওয়াজিবেরই মত গুরুত্বপূর্ণ, বিনা ওজরে তা ছাড়লে বা ছাড়ার অভ্যাস করলে পাপী হতে হয়। তবে ওজর বশতঃ কখনও ছুটে গেলে কাযা করতে হয় না। (দুই) **'সুন্নাতে গায়র মুয়াক্কাদা'**– যা রাসূল (সঃ) ও সাহাবীগণ করেছেন তবে ওযর ছাড়াও কোন কোন সময় তরক করেছেন। একে **'সুন্নাতে যায়েদা'** বা **'সুন্নাতে আদিয়া'** – ও বলে। এটা করলে ছওয়াব আছে কিন্তু না করলে আযাব হবে না।

* **মুস্তাহ্ছান** ঃ যাকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পূর্ববর্তী পরবর্তী উলামায়ে কেরাম ভাল মনে করেছেন।

* **মোস্তাহাব** ঃ যা রাসূল (সঃ) ও সাহাবীগণ করেছেন কিন্তু সব সময় করেননি–কোন কোন সময় করেছেন। এটা করলে ছওয়াব আছে না করলে পাপ নেই। মোস্তাহাবকে **'নফল'** এবং **'মানদূব'**ও বলা হয়।

* **হালাল** ঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে যেসব বস্তু ব্যবহার করা বৈধ তাকে হালাল বলা হয়। **জায়েয** ও হালাল সমার্থবোধক।

* **হারাম** ঃ হারাম হল ফরযের বিপরীত অর্থাৎ, যা নিষিদ্ধ হওয়াটা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। হারামকে হালাল মনে করলে কাফের হয়ে যায় আর বিনা ওজরে হারাম কাজ করলে কাফের হয় না তবে ফাসেক হয়ে যায়। হারাম কাজ বর্জন করা ফরয। **'না যায়েয'** ও 'হারাম' সমার্থবোধক।

* **মাকরূহ তাহরীমী** ঃ ওয়াজিবের বিপরীত, যা অস্বীকার করলে কাফের হয় না তবে ফাসেক হয়ে যায়। বিনা ওজরে মাকরূহ তাহরীমী করাও ফাসেকী।

* **মাকরূহ তানযীহী** ঃ যা না করলে ছওয়াব আছে করলে আযাব নেই।

* **মোবাহ** ঃ যা মানুষের ইচ্ছাধীন, যে ব্যাপারে আল্লাহ মানুষকে করা বা না করার স্বাধীনতা ও এখতিয়ার দিয়ে দিয়েছেন। যেমন মাছ মাংস খাওয়া, পানাহার করা, কৃষি কর্ম করা, ব্যবসা-বাণিজ্য করা, দেশ ভ্রমণ করা ইত্যাদি। তবে

মোবাহ কাজের সংগে যদি ভাল নিয়ত সংযুক্ত হয়, তাহলে তা ছওয়াবের কাজ হয়ে যায়। যেমন পানাহার করল এই নিয়তে যে, এতে শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তাহলে ইবাদত, ইসলামের খেদমত, জেহাদ ইত্যাদি ভাল ভাবে করা যাবে ইত্যাদি। পক্ষান্তরে মোবাহ কাজের সঙ্গে খারাপ নিয়ত যুক্ত হলে তা পাপের হয়ে যায়; যেমন কোথাও ভ্রমণে গেল বেগানা-নারী দর্শনের উদ্দেশ্যে বা না জায়েয কিছু দেখা ও করার জন্য, তাহলে এতে গোনাহ হবে।

নাপাকীর বর্ণনা

* যে সমস্ত নাপাকী চক্ষু দ্বারা দেখা যায় এবং যা থেকে শরীর, কাপড় ও খাদ্যবস্তু পাক রাখা উচিত তা দুই ধরনের ঃ

(১) নাজাছাতে গলীজা (যে নাপাকীর হুকুম শক্ত) (২) নাজাছাতে খফীফা (যার হুকুম কিছুটা হালকা)

* মানুষের মলমূত্র, মানুষ ও প্রাণীর রক্ত, বীর্য, মদ, সব ধরনের পশুর পায়খানা, সব ধরনের হারাম পশুর পেশাব এবং পাখীর মধ্যে শুধু হাঁস ও মুরগির বিষ্টা হল নাজাছাতে গলীজা বা শক্ত নাপাকী।

* গরু, মহিষ, বকরী ইত্যাদি সকল হালাল পশুর পেশাব, কাক চিল ইত্যাদি সকল হারাম পাখির বিষ্টা এবং ঘোড়ার পেশাব হল নাজাছাতে খফীফা।

* হাঁস, মুরগি ও পানিকড়ি ব্যতীত অন্যান্য হালাল পাখির বিষ্টা (যেমন কবুতর, চড়ুই, শালিক ইত্যাদির বিষ্টা) এবং বাদুর ও চামচিকার পেশাব পায়খানা পাক। এমনিভাবে মশা, মাছি, ছারপোকা এবং মাছের রক্তও পাক।

* নাজাছাতে গলীজার মধ্যে যেগুলো তরল, যেমন রক্ত পেশাব ইত্যাদি তা এক দেরহাম (গোলাকৃত ভাবে একটা কাঁচা টাকার অর্থাৎ হাতের তালুর নীচ স্থান পরিমাণের সমান) পর্যন্ত শরীর বা কাপড়ে লাগলে মাফ আছে অর্থাৎ, তা না ধুয়ে নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে, তবে বিনা ওজরে স্বেচ্ছায় এরূপ করা মাকরূহ। আর এক দেরহাম পরিমাণের চেয়ে বেশী হলে তা মাফ নয় অর্থাৎ, তা পাক না করে নামায পড়া জায়েয নয়।

* নাজাছাতে গলীজার মধ্যে যেগুলো গাঢ় যেমন গোবর, পায়খানা ইত্যাদি তা এক সিকি পরিমাণ পর্যন্ত (অর্থাৎ, ৪.৮৬ গ্রাম পর্যন্ত) কাপড় বা শরীরে লাগলে মাফ কিন্তু তার চেয়ে অধিক পরিমাণ লাগলে মাফ নয়। মাফ-এর অর্থ পূর্বে বয়ান করা হয়েছে।

* নাজাছাতে খফীফা শরীর বা কাপড়ে লাগলে যে অঙ্গে লেগেছে তার চার ভাগের এক ভাগের কম হলে মাফ আর পূর্ণ চার ভাগের এক ভাগ বা আরও বেশী হলে মাফ নয়। জামার হাতা, কলি, কাপড়ের আঁচল, পায়জামার দুই মুহরীর প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ (অংশ) বলে গণ্য হবে।

* নাজাছাত কম হোক বা বেশী হোক পানিতে পড়লে সেই পানি নাজাছাত বা নাপাক হয়ে যাবে– নাজাছাতে গলীজা পড়লে পানিও নাজাছাতে গলীজা হয়ে যাবে এবং নাজাছাতে খফীফা পড়লে নাজাছাতে খফীফা হবে। তবে প্রবাহিত পানিতে বা ১০০ বর্গহাত কিম্বা তার চেয়ে বড় কোন কুয়া হাউজ ইত্যাদিতে নাপাকী পড়লে তা নাপাক হবে না। তবে নাপাকী পড়ার কারণে তার রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত হয়ে গেলে নাপাক হয়ে যাবে। যে পানি দ্বারা কোন নাপাক জিনিস ধৌত করা হয় সে পানি নাপাক হয়ে যায়।

* মৃতকে যে পানি দ্বারা গোছল দেয়া হয় সে পানিও নাপাক।

* রাস্তা-ঘাটে বা বাজারে যে পানি বা কাদার ছিটা কাপড়ে কিম্বা শরীরে লাগে তাতে স্পষ্টতঃ কোন নাপাক জিনিস দেখা গেলে তা নাপাক আর স্পষ্টতঃ কোন নাপাক জিনিস দেখা না গেলে নাপাক নয়। এটাই ফতুয়া; তবে মুত্তাকী লোকদের জন্য– যাদের হাটে বাজারে যাওয়ার অভ্যাস কম, যারা সাধারণতঃ খুব পাক ছাফ থাকেন–তাদের শরীরে বা কাপড়ে এই পানি কাদা লাগলে তাতে কোন নাপাক জিনিস দেখা না গেলেও ধুয়ে নেয়া উচিত।

* পেশাবের অতি ক্ষুদ্র ফোটা যা চোখে দেখা যায় না তার কারণে শরীর কাপড় অপবিত্র হয় না। অনর্থক সন্দেহের কারণে ধৌত করার প্রয়োজন নেই।

* গাভী, বকরী দহন করার সময় যদি দুই একটি লেদা বা সামান্য গোবর দুধের মধ্যে পড়ে এবং সাথে সাথে তা বের করে ফেলা হয় তাহলে তা মাফ। কিন্তু যদি লেদা বা গোবর দুধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায়, তাহলে সম্পূর্ণ দুধ নাপাক হয়ে যাবে, তা খাওয়া জায়েয হবে না।

* উৎপন্ন ফসল মাড়াই করার সময় গরু অথবা অন্য কোন পশু তার উপর পেশাব করলে তা নাপাক হবে না। তবে মাড়াবার সময় ব্যতীত অন্য সময় পেশাব করলে নাপাক হয়ে যাবে।

* কুকুর, শুকর, বানর এবং বাঘ, চিতাবাঘ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর ঝুটা নাপাক। খাদ্য বা পানীয় বস্তুতে মুখ লাগিয়ে ত্যাগ করলে তাকে ঝুটা বা উচ্ছিষ্ট বলা হয়।

* বিড়ালের ঝুটা পাক, তবে মাকরূহ। কোন পানিতে বিড়াল মুখ দিয়ে থাকলে তা দ্বারা ওযূ করবে না। অবশ্য যদি অন্য পানি না পাওয়া যায় তবে ঐ পানির দ্বারাই ওযূ করবে। আর দুধ বা তরকারী ইত্যাদি খাদ্য খাবারের মধ্যে মুখ দিয়ে থাকলে যদি মালিক অবস্থাপন্ন হয় তাহলে তা খাবে না- খাওয়া মাকরূহ হবে। যদি গরীব হয় তবে তার জন্য তা খাওয়া মাকরূহ নয়। তবে বিড়াল যদি সদ্য ইঁদুর ধরে এসে তৎক্ষণাৎ কোন পানি বা খাদ্য খাবারে মুখ দেয় তবে তা নাপাক হয়ে যাবে। আর যদি কিছুক্ষণ দেরী করে নিজের মুখ চেটে চুষে পরিষ্কার করে তারপর মুখ দেয় তখন নাপাক হবে না- এখন পূর্বের মাসআলার ন্যায় মাকরূহ হবে।

* যে সব প্রাণী ঘরে থাকে যেমন সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, তেলাপোকা, টিকটিকি এবং মুরগি- যে গুলো সর্বত্র ছাড়া থাকে- এদের ঝুটা মাকরূহ তানযীহী। ইঁদুর যদি রুটির কিছু অংশ খেয়ে থাকে সেদিক দিয়ে কিছুটা ছিড়ে ফেলে অবশিষ্ট অংশ খাবে।

* হালাল পশু ও হালাল পাখীর ঝুটা পাক। ঘোড়ার ঝুটাও পাক। যে কোন রকম পোশা পাখী যদি মরা না খায় এবং তার ঠোটে কোন রকম নাপাকী থাকার সন্দেহ না থাকে তবে তাদের ঝুটাও পাক।

* হালাল পশু ও হালাল জানোয়ারের ঝুটা পাক। তাদের ঘামও পাক। যাদের ঝুটা মাকরূহ তাদের ঘামও মাকরূহ।

* মুসলমান অমুসলমান সব লোকের ঝুটা পাক, তবে কোন নাপাক বস্তু তার মুখে থাকা অবস্থায় পানি উচ্ছিষ্ট করলে ঐ পানি নাপাক হয়ে যাবে।

* জানা অবস্থায় বেগানা পুরুষের ঝুটা- খাদ্য ও পানি নারীর জন্য খাওয়া মাকরূহ। অনুরূপ বেগানা নারীর ঝুটাও পুরুষের জন্য মাকরূহ। অবশ্য না জানা অবস্থায় খেয়ে ফেললে মাকরূহ হবে না।

শরীর ও কাপড় পাক করার নিয়ম

* গাঢ় নাজাছাত (যা দেখা যায় যেমন পায়খানা, রক্ত) শরীর বা কাপড়ে লাগলে তা পাক করার নিয়ম হল নাজাছাতকে এমনভাবে ধৌত করবে যেন দাগ না থাকে। একবার বা দুইবার ধোয়ায় দাগ চলে গেলেও পাক হয়ে যাবে তবে তিনবার ধোয়া মোস্তাহাব। তিনবার ধোয়া সত্ত্বেও এবং নাজাছাত চলে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যদি কিছু দাগ বা দুর্গন্ধ থেকে যায় তাতে কোন দোষ নেই, সাবান প্রভৃতি লাগিয়ে দাগ বা দুর্গন্ধ দূর করা ওয়াজিব নয়।

* পানির মত তরল নাজাছাত শরীর বা কাপড়ে লাগলে তা পাক করার নিয়ম হল তিনবার ধৌত করা এবং প্রত্যেক বার কাপড় ভাল করে নিংড়ানো। তৃতীয়বার খুব জোরে নিংড়াতে হবে। ভালমত না নিংড়ালে কাপড় পাক হবে না।

* কাপড় বা শরীরে গাঢ় কিম্বা তরল নাজাছাত লাগলে ধোয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পাক করা যায় না। পানির দ্বারা ধুয়ে যেরূপ পাক করা যায় তদ্রুপ পানির ন্যায় তরল এবং পাক (যেমন গোলাপ জল, রস, সিরকা প্রভৃতি) জিনিস দ্বারাও ধুয়ে পাক করা যায়। কিন্তু যেসব জিনিস তৈলাক্ত তা দ্বারা ধুলে পাক হবে না যেমন দুধ, ঘি, তেল ইত্যাদি।

* ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়া হলে মেশিন যেহেতু নিয়ম মত কাপড় নিংড়াতে পারে না এবং নাপাক কাপড়ের সাথে পাক কাপড় একত্রে ভিজানোর কারণে পাক কাপড়ও নাপাক হয়ে যায়। অতএব ধোয়ার পূর্বে বা পরে নাপাক কাপড় গুলিকে পৃথকভাবে নিয়ম মত ধুয়ে পাক করে নিতে হবে।

* ধোপাগণ সাধারণতঃ অনেক কাপড় একসাথে ভিজিয়ে রাখে। এর মধ্যে কোন কাপড় নাপাক থাকলে পাক কাপড়গুলিও নাপাক হয়ে যাবে, তখন সবগুলিকে নিয়ম মত ধুয়ে পাক করা প্রয়োজন। ধোপাগণ সেরূপ করেন কি না তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তাই লণ্ড্রির মাধ্যমে কাপড় ধোলাই করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তবে একান্তই কেউ পাক কাপড় দিলে তা নাপাক হয়েছে ধরা হবে না। পক্ষান্তরে নাপাক কাপড় দিলে তা পাকও ধরা হবে না। ড্রাই ওয়াশ-এর হুকুমও অনুরূপ। (احسن الفتاوى ج/٢)

* দুইপাল্লা বিশিষ্ট কাপড়ের এক পাল্লা বা তুলা ভরা কাপড়ের এক দিক যদি নাপাক এবং অন্য পাল্লা বা অন্য দিক পাক হয় এমতাবস্থায় উভয় পাল্লা যদি একত্রে সেলাই করা হয় তাহলে পাক পাল্লার উপর নামায পড়া দুরস্ত হবে না। সেলাই করা না হলে নাপাক পাল্লা নীচে রেখে পাক পাল্লার উপর নামায পড়া দুরস্ত হবে তবে শর্ত এই যে, পাক পাল্লা এত মোটা হওয়া চাই যাতে পাক পাল্লার উপর থেকে নাপাকীর রং দেখা না যায় এবং গন্ধও টের না পাওয়া যায়।

* বিছানার এক কোণ নাপাক এবং বাকী অংশ পাক হলে পাক অংশে নামায পড়া দুরস্ত আছে।

* না ধুয়ে কাফেরদের কাপড়ে বা বিছানায় নামায পড়া মাকরূহ।

* তুলার গদি, তোষক অথবা লেপে যদি মল মূত্র বা অন্য কোন প্রকার নাজাছাত লাগে তাহলে পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে। যদি নিংড়ানো কঠিন হয়

তাহলে ভাল করে তিনবার পানি প্রবাহিত করতে হবে। প্রতিবার প্রবাহিত করার পর এমনভাবে রেখে দিবে যেন সমস্ত পানি ঝরে যায়, তারপর আবার পানি প্রবাহিত করবে, এভাবে তিন বার করলেই পাক হয়ে যাবে- তুলা ইত্যাদি বের করে ধৌত করার প্রয়োজন নেই।

আসবাব/দ্রব্য পাক করার নিয়ম

* যদি এমন জিনিসে নাজাছাত (নাপাকী) লাগে যা নিংড়ানো যায় না (যেমন থালা-বাসন,কলস, খাট, মাদুর, জুতা ইত্যাদি) তাহলে তা পাক করার নিয়ম হল একবার তা ধুয়ে এমনভাবে রেখে দিবে যেন সমস্ত পানি ঝরে যায় এবং পানির ফোটা পড়া বন্ধ হয়ে যায়, তারপর অনুরূপ আর একবার করবে, এভাবে তিনবার ধৌত করলে ঐ জিনিস পাক হয়ে যাবে।

* জুতা বা চামড়ার মোজায় গাঢ় বীর্য, রক্ত, পায়খানা, গোবর ইত্যাদি গাঢ় নাজাছাত লাগলে তা যদি মাটিতে খুব ভালমত ঘষে বা শুকনা হলে নখ বা ছুরি/চাকু দিয়ে খুঁটে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে ফেলা যায় এবং বিন্দুমাত্র নাজাছাত না থাকে তাহলেও তা পাক হয়ে যাবে- না ধৌত করলেও চলবে। কিন্তু পেশাবের ন্যায় তরল নাজাছাত লাগলে পূর্বোক্ত নিয়মে ধোয়া ব্যতীত পাক হবে না।

* আয়না, ছুরি, চাকু, স্বর্ণ রূপার অলংকার, থালা- বাসন, বদনা, কলস ইত্যাদি নাপাক হলে ভালমত মুছে ঘষে বা মাটি দ্বারা মেজে ফেললেও পাক হয়ে যায়। কিন্তু এই জাতীয় জিনিস নকশীদার হলে উপরোক্ত নিয়মে পানি দ্বারা ধৌত করা ব্যতীত পাক হবে না।

* নাপাক ছুরি, চাকু বা হাড়ি-পাতিল জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে পোড়ালেও পাক হয়ে যায়।

* কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তা নাপাক হয়ে যায়। তিন বার ধৌত করলেও তা পাক হয়ে যায় কিন্তু সাত বার ধোয়া উত্তম। আর একবার মাটি দ্বারা মেজে ফেললে আরও বেশী উত্তম।

জমিন পাক করার নিয়ম

* জমিন/ মাটিতে কোন নাজাছাত লাগলে তিন বার পানি প্রবাহিত করে দিলে তা পাক হয়ে যাবে।

* জমিন/ মাটির উপর কোন নাজাছাত লেগে যদি এমনভাবে শুকিয়ে যায় যে, নাজাছাতের কোন চিহ্নও না থাকে তবুও তা পাক হয়ে যায়-তার উপর নামায পড়া দুরস্ত আছে। তবে ঐ মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করা দুরস্ত নয়।

* ইট, সিমেন্ট বা পাথর প্রভৃতি দ্বারা পাকা স্থানও জমিনের হুকুমে, তবে শুধু খালি ইট বিছানো থাকলে তা পূর্বের নিয়মে ধোয়া ব্যতীত পাক হবে না।

* জমিনের সঙ্গে যে ঘাস লাগা আছে তাও জমিনেরই মত অর্থাৎ, শুধু শুকালে এবং নাজাছাতের চিহ্ন চলে গেলে পাক হয়ে যাবে এবং তার উপর নামায পড়া দুরস্ত হবে। কিন্তু কাটা ঘাস ধোয়া ব্যতীত পাক হবে না।

* গোবর দ্বারা লেপা জমিনের উপর পাক বিছানা না বিছিয়ে নামায পড়া দুরস্ত নয়।

খাদ্য দ্রব্য পাক করার নিয়ম

* মধু, চিনি, মিছরি, শিরা, তেল, ঘি, ডালডা ইত্যাদি নাপাক হলে তা পাক করার দুইটি নিয়ম ঃ

১. যে পরিমাণ তেল, শিরা ইত্যাদি, সেই পরিমাণ পানি তাতে মিশ্রিত করে আগুনে জাল দিবে। যখন সমস্ত পানি উড়ে যাবে তখন আবার ঐ পরিমাণ পানি মিশ্রিত করে জাল দিবে, এভাবে তিন বার করলে পাক হয়ে যাবে।

২. তেল ঘি ইত্যাদির সঙ্গে সমপরিমাণ পানি মিশ্রিত করে তাতে নাড়াচাড়া দিলে তেলটা উপরে উঠে আসবে; তারপর আস্তে আস্তে কোন উপায়ে উপর থেকে তেলটা তুলে নিয়ে আবার সমপরিমাণ পানি মিশ্রিত করে আবার অনুরূপ ভাবে তেলটা তুলে নিবে। এভাবে তিন বার করলে পাক হয়ে যাবে। যদি ঘি, ডালডা, তেল জমাট হয় তাহলে তাতে পানি মিশ্রিত করে রৌদ্রে বা আগুনের আঁচের উপর রাখবে। এভাবে গলে তেল ঘি ইত্যাদি উপরে ভেসে উঠলে তারপর উপরোক্ত নিয়মে তিন বার তুলে নিলে পাক হয়ে যাবে।

* দুধ বা তরকারী ইত্যাদি তরল জিনিসে বিড়াল মুখ দিলে তার মাসআলা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

* যে সব প্রাণীর ঝুটা হারাম বা মাকরূহ তারা যদি রুটি পাউরুটি ভাত ইত্যাদি শক্ত খাবারে মুখ দেয় বা খায় তাহলে মুখ দেয়ার স্থান থেকে কিছুটা ফেলে দিয়ে অবশিষ্ট অংশ খাওয়া যায়।

হাউজ বা ট্যাংকি পাক করার নিয়ম

* হাউজ বা ট্যাংকি যদি ১০০ বর্গ হাত বা তার চেয়ে বড় হয় তাহলে তাতে কোন নাপাকী পড়লে বা কোন প্রাণী তাতে মারা গেলে তার পানি নাপাক হয় না। আর ১০০ বর্গ হাতের চেয়ে ছোট হলে নাপাক হয়ে যায়। অবশ্য মাছ,ব্যাঙ, কচ্ছপ, কাঁকড়া ইত্যাদি জলজ প্রাণী মরলে তাতে পানি নাপাক হয় না। তবে এ

সব প্রাণীও যদি মরে পঁচে গলে যায়, তাহলে তার পানি পান করা বা এ দ্বারা খাদ্য পাকানো দুরস্ত নয়, যদিও ওযূ গোছল করা দুরস্ত আছে।

* সাধারণতঃ হাউজ বা ট্যাংকি দুই ধরনের হয়ে থাকে।

(১) আণ্ডার গ্রাউণ্ড ট্যাংকি, যাতে সরকারী পানির লাইনের মাধ্যমে পানি এসে ভরে। (২) ছাদে বা উপরে স্থাপিত ও নির্মিত ট্যাংকি, যার থেকে সব কামরায় ওযূ গোসল ইত্যাদির জন্য পানি পৌছানো হয়। এই উভয় ধরনের হাউজ বা ট্যাংকিতে এক দিকের পাইপ থেকে পানি আসছে অন্য দিকের পাইপ থেকে পানি সরছে– এমতাবস্থায় তাতে যদি কোন নাপাকী পড়ে তাহলে অধিকাংশ ফেকাহবিদের মতে সে ট্যাংকির পানি নাপাক হবে না, কারণ সেটা প্রবহমান পানির পর্যায়ভুক্ত। অবশ্য যদি উক্ত পানিতে নাপাকীর রং, গন্ধ বা স্বাদ পাওয়া যায় তাহলে যতটুকু পানিতে রং, গন্ধ বা স্বাদ পাওয়া যাবে ততটুকু পানি নাপাক হযে যাবে। অনুরূপভাবে যদি নাপাক বস্তুটি পানি উভয় দিক থেকে প্রবহকালে পতিত হয়ে কোন এক দিকের পাইপের পানি বন্ধ হওয়ার পরও তাতে পড়ে থাকে তাহলেও তখন পানি নাপাক হয়ে যাবে।

আর যদি কোন এক দিকের লাইনের পানি বন্ধ থাকা অবস্থায় নাপাকী পতিত হয় তাহলে অধিকাংশ ফকীহর মতে হাউজ/ ট্যাংকি নাপাক হয়ে যাবে। অতঃপর তাকে পাক করার দুইটি নিয়ম যথা ঃ

১. যদি হাউজ থেকে ফেলে দেয়ার মত কোন নাপাক বস্তু হয় তাহলে তা ফেলে দেয়ার পর হাউজের এক দিকের পাইপ থেকে পানি প্রবেশ করানো শুরু হবে এবং অন্যদিকের পাইপ থেকে পানি বের করা শুরু হবে। এরূপ করা শুরু করলেই সাথে সাথে হাউজ/ট্যাংকি, পানি সব পাক হযে যাবে। সম্পূর্ণ পানি বা কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি বের করা শর্ত নয়।

২. নীচের ট্যাংকি (আণ্ডার গ্রাউণ্ড ট্যাংকি) হলে সরকারী পাইপ থেকে পানি আসতে আসতে সেটি ভরে গিয়ে যখন মুখ থেকে পানি উপচে পড়া শুরু হবে তখন তা পাক হয়ে যাবে। আর উপরের ট্যাংকি হলে তা থেকে গোছলখানা ইত্যাদিতে যাওয়ার সব লাইন বন্ধ করে দিবে এবং তারপর মেশিনের সাহায্যে তাতে পানি ভরা (তোলা) শুরু করবে। যখন উপরের পাইপ বা মুখ থেকে পানি উপচে পড়া শুরু হবে তখন উপরের ট্যাংকি এবং তার সাথে সংযুক্ত সব পাইপ পাক হয়ে যাবে। তবে কোন কোন ফকীহ্র মতে তিন বার আবার কারও মতে এক বার নাপাক ট্যাংকি পানিতে ভরে রেখে পানি ফেলে দেয়া আবশ্যক। এই

মতভেদের প্রেক্ষিতে নাপাক বস্তু পতিত হওয়ার সময় হাউজে যে পরিমাণ পানি ছিল সেই পানি হাউজ থেকে বের করার পর হাউজটি পাক হয়েছে বলে মনে করা উত্তম।

(آلات جدیدہ کے شرعی احکام اوراحسن الفتاوی ج ۲)

নলকূপ পাক করার নিয়ম

* যদি নলকূপে নাপাক কাপড় ইত্যাদি এমন বস্তু পতিত হয় যা বের করা সম্ভব, তাহলে তা বের করার পর নাপাক বস্তু পতিত হওয়ার সময় নলকূপে যে পরিমাণ পানি ছিল তা বের করে ফেললে নলকূপ পাক হয়ে যাবে। পেশাব ইত্যাদি তরল নাপাকী পড়লেও এই পরিমাণ পানি বের করলে নলকূপ পাক হয়ে যাবে।

* যদি নলকূপে পায়খানা গোবর ইত্যাদি স্থুল নাপাক বস্তু পতিত হয়, তাহলে নাপাক বস্তুটি মাটিতে রূপান্তরিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করতে হবে। অতঃপর পূর্বের নিয়মে পানি বের করে নলকূপটি পাক করতে হবে।

(آلات جدیدہ کے شرعی احکام)

ইস্তেনজার (পেশাব/পায়খানার) সুন্নাত, আদব ও বিধি-নিষেধ সমূহ

* ইস্তেনজা খানায় প্রবেশের পূর্বে মাথা ঢেকে নেয়া মোস্তাহাব।
* টুপি বা কোন কিছু দ্বারা মাথা ঢাকার সময় বিসমিল্লাহ বলে নিবে।
* জুতা/স্যান্ডেল পরিধান পূর্বক ইস্তেনজা করা।
* জুতা স্যান্ডেল পরিধান করার সময় বিসমিল্লাহ বলে নিবে।
* প্রথমে ডান পায়ে জুতা/স্যান্ডেল পরবে।
* নামাযের কাপড় ব্যতীত অন্য কাপড়ে ইস্তেনজা করা উত্তম। অন্যথায় নাপাকী থেকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। (طحطاوی)
* বিসমিল্লাহ সহ ইস্তেনজা খানায় প্রবেশের দুআ পড়া। খোলা স্থান হলে কাপড় উঁচু করার সময় দুআ পড়তে হয়। আর মনে না থাকলে প্রবেশের পর বা কাপড় উঠানোর পর মনে মনে দুআ পড়া যায়, মুখে উচ্চারণ করে নয়। আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের নাম, ফেরেশতার নাম বা কুরআনের কিছু লিখিত বস্তু নিয়ে এস্তেনজায় যাওয়া মাকরূহ। অনুরূপ এগুলো মুখে উচ্চারণ করাও নিষিদ্ধ।
* বিসমিল্লাহ সহ ইস্তেনজায় প্রবেশের দুআটি এই–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! দুষ্ট পুরুষ জিন এবং দুষ্ট মহিলা জিনদের অত্যাচার থেকে তোমার পানাহ চাই।

* প্রথমে বাম পা দিয়ে এস্তেনজায় প্রবেশ করা।

* বসার সময় পা দানিতে প্রথমে ডান পা রাখবে এবং নামার সময় প্রথম বাম পা নামাবে। (তোহফায়ে আবরার)

* প্রয়োজনের অতিরিক্ত সতর না খোলা। (এর সহজ উপায় হল- বসতে বসতে কাপড় উঠানো। দাঁড়ানো অবস্থাতেই সতর খোলা নিষিদ্ধ)

* বসে ইস্তেনজা করা।

* বাম পায়ে ভর করে বসাই আদব। (نور الایضاح)

* উভয় পায়ের মাঝে বেশ ফাঁক রেখে বসা আদব। (طحطاوی)

* কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে না বসা। এমনিভাবে সূর্যের দিকে মুখ করে, বায়ুর বিপরীতে, চলার পথে, কবরস্থানে, ছায়াদার বা ফলদার গাছের নীচে, প্রবাহিত নদী নালায়, বদ্ধ পানিতে, বা মানুষ বসতে পারে এমন ঘাসের উপর ইস্তেনজা না করা।

* নজরকে সংযত রাখা অর্থাৎ, যৌনাঙ্গের দিকে, মল মূত্রের দিকে, এমনিভাবে আকাশের দিকে নজর না দেয়া এবং এদিক সেদিক বেশী না তাকানো।

* মলমূত্রের উপর থুথু, কফ, শিকনি না ফেলা। (شرعة الاسلام)

* ডান হাত দিয়ে যৌনাঙ্গ স্পর্শ না করা।

* ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা।

* বাম হাত দিয়ে ঢিলা/কুলুখ ব্যবহার করবে।

* পায়খানার পর তিন বার ঢিলা/কুলুখ ব্যবহার করা মোস্তাহাব।

* পেশাবের পর ঢিলা/কুলুখ নিয়ে হাটা চলা করে, কিম্বা কাশি দিয়ে বা নড়াচড়া করে, কিম্বা অভ্যাস অনুযায়ী যে কোন ভাবে পেশাবের কতরা বন্ধ হয়েছে এরূপ নিশ্চিত হতে হবে। মহিলাদের জন্য এটার প্রয়োজন নেই।

* প্রথম ঢিলা/কুলুখ পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে, দ্বিতীয়টি সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে, তৃতীয়টা পেছন দিক থেকে সামনের দিকে -এ নিয়মে ঢিলা/কুলুখ ব্যবহার করা অধিক পবিত্রতার অনুকূল। আর যদি অণ্ডকোষ ঝুলানো থাকে তাহলে প্রথমটা সামনের দিক থেকে আরম্ভ করা। মহিলাগণ সর্বদা প্রথমটা সামনের দিক থেকে শুরু করবে।

* পানি ব্যবহারের পূর্বে হাতের কবজি পর্যন্ত ধৌত করা। এক হাদীছের বর্ণনার ভিত্তিতে এ স্থলে উভয় হাত ধৌত করার একটি মতও পাওয়া যায়।

(مراقی الفلاح)

* তারপর পানি দ্বারা ধৌত করা সুন্নাত, নাপাকী এক দেরহামের (হাতের তালুর নীচ স্থান সমপরিমাণ বিস্তৃত) বেশী পরিমাণ স্থান ছড়িয়ে পড়লে পানি দ্বারা এস্তেনজা করা ওয়াজিব।

* পানি ব্যবহার করার সময় প্রথমে বাম হাতের মধ্যমা আঙ্গুল-এর পেট দ্বারা মর্দন করা, তারপর অনামিকা সহ প্রয়োজনে আরও দুই এক আঙ্গুল ব্যবহার করা। মহিলাগণ প্রথমেই দুই আঙ্গুল (মধ্যমা ও অনামিকা) ব্যবহার করবেন। (محیط و نور الایضاح)

* রোজা অবস্থায় না হলে পেছনের রাস্তা খুব ঢিলা করে বসে পানি ব্যবহার করা। (نور الایضاح)

* দুর্গন্ধ সম্পূর্ণ দূর না হওয়া পর্যন্ত পরিষ্কার করতে থাকবে।

* প্রথমে পেছনের রাস্তা তারপর সামনের রাস্তা ধৌত করা। (مراقی الفلاح) দুই রাস্তার মধ্যখানের স্থানটুকুও মধ্যমা বা কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা মর্দন করে ধৌত করা। (مفاتیح الجنان)

* সৌচ কার্যের পর মাটি বা সাবান ইত্যাদি দ্বারা পুনরায় হাত পরিষ্কার করে নেয়া উত্তম।

* রোযা অবস্থায় হলে সতর্কতার জন্য ওঠার পূর্বে কাপড় (বা এ জাতীয় কিছু) ব্যবহার করে কিম্বা বাম হাত দ্বারা বার বার ঘষে পেছনের রাস্তার পানি মুছে ফেলা উচিৎ। আর যাদের রোগের কারণে মলদ্বার বের হয়ে যায় তাদের জন্য জরুরী। রোযাদার না হলেও এরূপ করা মোস্তাহাব। (طحطاوی وشامی)

* যথা সম্ভব দ্রুত এস্তেনজা সেরে বের হয়ে আসা। (مراقی الفلاح)

* বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা বের করা সুন্নাত।

* বের হয়ে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّی الْاَذٰی وَعَافَانِیْ

অথবা শুধু غُفْرَانَكَ

অর্থ ঃ তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি কষ্টদায়ক বস্তুসমূহ আমার থেকে দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে শান্তি দান করেছেন।

* প্রথমে বাম পায়ের জুতা/স্যান্ডেল খোলা সুন্নাত।

উযূর ফরয, সুন্নাত, মোস্তাহাব ও আদব সমূহ

(ধারাবাহিক ভাবে উযূর আমল সমূহ বর্ণনা করা হল।)

* ওয়াক্ত আসার পূর্বেই উযূর সামান প্রস্তুত রাখা উত্তম। (مراقی الفلاح)
* মা'যূর নন– এমন ব্যক্তির পক্ষে ওয়াক্ত আসার পূর্বে উযূ করে নেয়া উত্তম।
* উযূর পূর্বে পেশাব পায়খানার হাজত থেকে ফারেগ হয়ে নেয়া উত্তম।

বসার মাসায়েল

* উঁচু স্থানে বসে উযূ করা আদব।
* পবিত্র স্থানে উযূ করা,
* কেবলামুখী হয়ে উযূ করা আদব।
* পানি ঢেলে নিতে হয়–এমন পাত্র হলে সে পানির পাত্রটি বাম দিকে রাখা আর পানি হাত দিয়ে তুলে নিতে হয়- এমন পাত্র হলে ডান দিকে রাখা আদব। (طحطاوی)

নিয়ত এবং উযূ শুরুর মাসায়েল

* নাপাকী দূর করার কিম্বা পবিত্রতা অর্জন করার বা নামায জায়েজ হওয়ার অথবা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার নিয়ত করবে। নিয়ত করা সুন্নাত।
* নিয়ত মুখেও উচ্চারণ করা মোস্তাহাব। (احسن الفتاوی ج/۲)
* নিয়ত আরবীতে হওয়া উত্তম। আরবীতে হওয়া জরুরী নয়।
* নিয়ত আরবীতে এভাবে করা যায়–

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِلصَّلَاةِ وَتَقَرُّبًا
اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى

অর্থ ঃ আমি নাপাকী দূর করার , নামায বৈধ করার এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার নিয়তে উযূ করছি।

* উযূর শুরুতে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়বে। (مراقی الفلاح)
* তারপর বিসমিল্লাহ পড়বে। বিসমিল্লাহ এভাবে পড়া উত্তম–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ (مراقی الفلاح)

অর্থ ঃ মহান আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তিনি আমাকে দ্বীন ইসলামের উপর রেখেছেন এজন্য।

* কোন ওযর না থাকলে উযূর মধ্যে অঙ্গ মর্দন করে দেয়ার ক্ষেত্রে অন্যের সহযোগিতা গ্রহণ না করাই আদব। কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পানি তুলে দিলে বা পানি ঢেলে দিলেও কোন দোষ নেই।

কবজি ধোয়ার মাসায়েল

* কালেমায়ে শাহাদাত পড়া। (মোস্তাহাব)
* বিসমিল্লাহ পড়া। (মোস্তাহাব)
* হাতের কবজি ধোয়ার দুআ পড়া। (মোস্তাহাব)[১]
* বিসমিল্লাহ সহ দুআটি এভাবে পড়া যায়−

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْيُمْنَ وَالْبَرَكَةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشُّؤْمِ وَالْهَلَكَةِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট মঙ্গল ও বরকত কামনা করি এবং অমঙ্গল ও ধ্বংস থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।
* তারপর উভয় হাতের কবজি ধৌত করা। তিনবার ধৌত করা সুন্নাত।
* তারপর দুরূদ শরীফ পড়া। (মোস্তাহাব)
* মেসওয়াক করা সুন্নাত। মেসওয়াক উযূ শুরু করার পূর্বেও করা যায়। মেসওয়াক না থাকলে কিম্বা মুখে ওযর থাকলে বা দাঁত না থাকলে আঙ্গুল দিয়ে হলেও ঘষে নেয়া।

কুলি করার মাসায়েল

* কালেমায়ে শাহাদাত পাড়া। (মোস্তাহাব)
* বিসমিল্লাহ পড়া। (মোস্তাহাব)
* কুলি করার দুআ পড়া। (মোস্তাহাব)
* বিসমিল্লাহ সহ দুআটি এভাবে পড়া যায়−

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সাহায্য কর যেন কুরআন তিলাওয়াত করতে, যিকির করতে ও শোকর আদায় করতে পারি।
* দুআ পড়ার পর কুলি করা। কুলি করা সুন্নাত এবং তিন বার কুলি করা সুন্নাত। তিনবারের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে তিনবার পানি নেয়া উত্তম।
* ডান হাতে কুলির পানি নেয়া। (মোস্তাহাব)
* রোযাদার না হলে গড়গড়া করা সুন্নাত।
* কুলি করার পর দুরূদ শরীফ পড়া মোস্তাহাব।

---

১. উল্লেখ্য যে, উযূর অঙ্গগুলো ধোয়া বা মসেহ করার যে সব দুআ বর্ণিত হয়েছে তা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এ গুলো পড়াকে সুন্নাত মনে করা যাবে না। তবে বুযুর্গানে দ্বীন এগুলো পাঠ করেছেন এবং করেন। তদুপরি এ দুআগুলোর অর্থ ভাল, এ হিসাবে এ গুলো পাঠ করাকে মোস্তাহাব বা উত্তম বলা হয়।

নাকে পানি দেয়ার মাসায়েল

* কালেমায়ে শাহাদাত পড়া। (মোস্তাহাব)
* বিসমিল্লাহ পড়া। (মোস্তাহাব)
* নাকে পানি দেয়ার দুআ পড়া।(মোস্তাহাব)
* বিসমিল্লাহ সহ দুআটি এভাবে পড়া যায়–

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِىْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرِحْنِىْ رَائِحَةَ النَّارِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি আমাকে জান্নাতের সুগন্ধি দান কর এবং জাহান্নামের গন্ধ আমার ভাগ্যে দিওনা।

* নাকে পানি দেয়া সুন্নাত।
* ডান হাত দিয়ে নাকে পানি দেয়া এবং বাম হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলা আদব। (طحطاوى)
* রোযাদার না হলে নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি টেনে নেয়া উত্তম।
* বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে নাকের মধ্যে পরিষ্কার করা আদব।
* এরূপ তিনবার নাকে পানি দেয়া এবং ঝেড়ে ফেলা সুন্নাত। তিনবারের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে তিনবার পানি নেয়া উত্তম।
* অতপর দুরূদ শরীফ পড়া। (মোস্তাহাব)

(بہشتی گوہر ۔ نماز مسنون و الفقه على المذاهب الاربعة)

মুখমণ্ডল ধৌত করার

* কালেমায়ে শাহাদাত পড়া (মোস্তাহাব)
* বিসমিল্লাহ পড়া। (মোস্তাহাব)
* মুখমণ্ডল ধৌত করার দুআ পড়া (মোস্তাহাব)
* বিসমিল্লাহ সহ দুআটি দুভাবে পড়া যায়–

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۔

অর্থ ঃ হে আল্লাহ , যে দিন (কতক) মানুষের চেহারা উজ্জ্বল এবং (কতক) চেহারা দুঃখ মলিন হবে, সে দিন আমার চেহারাকে উজ্জ্বল করো।

* মুখমণ্ডল ধৌত করা ফরয। কপালের উপরিভাগের চুলের গোড়া থেকে চিবুক (থুতনি) পর্যন্ত এবং দুই কানের লতি পর্যন্ত হল মুখমন্ডলের সীমানা।
* ডান হাতে পানি নিয়ে তার সাথে বাম হাত মিলিয়ে কপালের উপরিভাগ থেকে ধোয়া আরম্ভ করা আদব। (مراقى الفلاح)

মাসায়েল

* মুখে পানি আস্তে লাগানো। জোরে মারা মাকরূহ।
* পাতলা[১] দাড়ি হলে চামড়াতে পানি পৌছাতে হবে। আর ঘন দাড়ি হলে মুখের বেষ্টনীর ভিতরের দাড়ি ধৌত করতে হবে– চামড়াতে পানি পৌছানোর প্রয়োজন নেই।
* চেহারার বেষ্টনীর বাইরের ঝুলন্ত দাড়িতে মসেহ করা সুন্নাত।

(احسن الفتاوى)

* এরূপ তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করা সুন্নাত।
* প্রতিবার পুরো মুখ মণ্ডলে ভাল করে হাত বুলাবে।

দাড়ি খেলাল করার মাসায়েল

* ঘন দাড়ি খেলাল করা সুন্নাত। তিনবার মুখ ধৌত করার পর দাড়ি খেলাল করতে হবে। (طحطاوى)
* এক কোষ পানি নিয়ে দাড়ির নীচের ভাগের থুতনিতে লাগানো, তারপর খেলাল করা।
* ডান হাতের তালু সামনের দিকে রেখে গলার দিক থেকে দাড়ির নীচ দিয়ে উপর দিকে খেলাল করা নিয়ম, খেলাল তিন বারের বেশী করবে না।
* অবশেষে দুরূদ শরীফ পড়া মোস্তাহাব।

ডান হাত ধোয়ার

* কালেমায়ে শাহাদাত পড়া। (মোস্তাহাব)
* বিসমিল্লাহ বলা। (মোস্তাহাব)
* ডান হাত ধোয়ার দুআ পড়া। (মোস্তাহাব)
* বিসমিল্লাহ সহ দুআটি এই–

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ وَحَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ,আমার আমলনামা আমার ডান হাতে দিও এবং আমার হিসাব-নিকাশ সহজ করো।

* ডান হাত কনুই সহ ধৌত করা ফরয।
* আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে ধোয়া আরম্ভ করা সুন্নাত। (طحطاوى) এবং হাতের অগ্রভাগ নীচু করবে যাতে করে ধোয়া পানি আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে।[২]

---

১. দাড়ির উপর থেকে নজর করলে নিচের চামড়ার রং যদি বুঝা যায় তাহলে তা পাতলা দাড়ি বলে গণ্য হবে, অন্যথায় ঘন দাড়ি বলে গণ্য হবে।

২. এখানে কনুইর দিক থেকে ধোয়া আরম্ভ করার একটি মতও রয়েছে যেন আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে পানি গড়াতে পারে। তবে উপরোক্ত তরীকায় হাত ধোয়া হলে উভয় মতের উপর আমল হয়ে যায়।

মাসায়েল

* এভাবে তিন বার ধৌত করা। (সুন্নাত)
* প্রতিবার ধৌত করার সময় পুরো অঙ্গ ভাল ভাবে মর্দন করবে।
* হাতে আংটি থাকলে ভালভাবে নাড়াচাড়া করে ভিতরে পানি প্রবেশ করানো মোস্তাহাব। আর আংটি চাঁপা থাকলে অবশ্যই এরূপ করতে হবে। মহিলাদের নাকের অলংকার, চুড়ি ইত্যাদির বেলায়ও এই নিয়ম প্রযোজ্য।
* তিন বার হাত ধোয়ার পর দুরূদ শরীফ পড়বে। (মোস্তাহাব)

বাম হাত ধৌত করার মাসায়েল

* বাম হাত ধৌত করার ক্ষেত্রেও ডান হাতের ন্যায় উপরোক্ত নয়টি মাসআলা। তবে বাম হাত ধৌত করার দুআটি (বিসমিল্লাহ সহ) এই-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ وَلَا مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ , আমার আমলনামা দিওনা আমার বাম হাতে, আর না পেছন দিক থেকে ।

হাতের আঙ্গুল খেলাল করার মাসায়েল

* বাম হাত তিনবার ধৌত করার পর উভয় হাতের আঙ্গুল খেলাল করবে। এটা সুন্নাত। (ظهيرية)
* আঙ্গুল খেলাল করার তরীকা হলঃ এক হাতের আঙ্গুলগুলো অন্য হাতের আঙ্গুল সমূহের মধ্যে প্রবেশ করানো কিম্বা বাম হাতের আঙ্গুলগুলো এক সাথে ডান হাতের পিঠের দিক থেকে ডান হাতের আঙ্গুলগুলোতে প্রবেশ করানো। এমনিভাবে ডান হাতের আঙ্গুলগুলো দিয়ে বাম হাতের আঙ্গুল খেলাল করা।
* অবশেষে দুরূদ শরীফ পড়া মোস্তাহাব।

মাথা মসেহ করার

* কালেমায়ে শাহাদাত পড়া। (মোস্তাহাব)
* বিসমিল্লাহ পড়া। (মোস্তাহাব)
* মাথা মসেহ করার দুআ পড়া। (মোস্তাহাব)
* বিসমিল্লাহ সহ দুআটি এভাবে পড়া যায়-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, যে দিন তোমার আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবেনা, সে দিন তোমার আরশের ছায়াতলে আমাকে স্থান দিও।

মাসায়েল

* মাথা মসেহের জন্য নতুন পানি নেয়া সুন্নাত। (حاشية شرح وقاية)

* মাথা মসেহ করা। পুরো মাথায় মসেহ করা সুন্নাত। অন্ততঃ মাথার চারভাগের একভাগ মসেহ করা ফরয।

* মাথায় মসেহ করার তরীকা হলঃ দুই হাতের পুরো তালু আঙ্গুলের পেটসহ মাথার অগ্রভাগে রেখে পুরো মাথা জুড়ে পেছনের দিকে টেনে আনা।[১] মাথার অগ্রভাগ থেকে মসেহ শুরু করা সুন্নাত। (طحطاوى)

* উভয় হাত দ্বারা মাথা মসেহ করা সুন্নাত। এক হাত দ্বারা মসেহ করা সুন্নাতের খেলাফ। (فتاوى دار العلوم ج ١)

* অবশেষে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। (মোস্তাহাব)

কান মসেহের মাসায়েল

* কালেমায়ে শাহাদাত পড়া। (মোস্তাহাব)

* বিসমিল্লাহ পড়া। (মোস্তাহাব)

* কান মসেহের দুআ পড়া। (মোস্তাহাব)

* বিসমিল্লাহ সহ দুআটি এভাবে পড়া যায়–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ,যারা (তোমার) কথা শুনে মেনে চলে আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর।

* কান মসেহ করা (উভয় কান এক সাথে) সুন্নাত। (طحطاوى)

* উভয় হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের অগ্রভাগ কানের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে একটু নাড়াচাড়া দেয়া নিয়ম। (مراقى الفلاح)

* তর্জনী (শাহাদাত আঙ্গুল) এর অগ্রভাগ দ্বারা কানের ভিতরের দিক মসেহ করবে।

* বৃদ্ধ আঙ্গুলের পেট দ্বারা কানের পেছনের ভাগ মসেহ করবে।

* কান মসেহের জন্য নতুন পানি না নেয়া সুন্নাত। (شامى ج ١)

* অবশেষে দুরূদ শরীফ পড়া। (মোস্তাহাব)

---

১. মসেহ করার এই তরীকাটি সহজ। অন্য একটি তরীকাও বর্ণিত আছে, তা হল–উভয় হাতের তিন আঙ্গুলের পেট (শাহাদাত ও বৃদ্ধ আঙ্গুল ব্যতীত) মাথার অগ্রভাগের উপরে রেখে পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাবে। তারপর দুই হাতের তালু মাথার দুই পার্শ্বে রেখে পেছন দিক থেকে সামনে টেনে নিয়ে আসবে।

গর্দান মসেহের মাসায়েল	
	* কালেমায়ে শাহাদাত পড়া। (মোস্তাহাব) * বিসমিল্লাহ পড়া। (মোস্তাহাব) * গর্দান মসেহের দুআ পড়া। (মোস্তাহাব) * বিসমিল্লাহ সহ দুআটি এভাবে পড়া যায় – بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ - অর্থঃ হে আল্লাহ, আমার ঘাড়কে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। * অতঃপর গর্দান মসেহ করবে। (মোস্তাহাব) * উভয় হাতের তিন আঙ্গুলের পিঠ দ্বারা গর্দান মসেহ করবে। (كبيرى) * অবশেষে দুরূদ শরীফ পড়া। (মোস্তাহাব)

পা ধৌত করার মাসায়েল	
	* কালেমায়েত শাহাদাত পড়া। (মোস্তাহাব) * বিসমিল্লাহ পড়া। (মোস্তাহাব) * ডান পা ধোয়ার দুআ পড়া। (মোস্তাহাব) * বিসমিল্লাহ সহ দুআটি এভাবে পড়া যায়– بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ অর্থ ঃ হে আল্লাহ, যেদিন অনেক পা পুলসিরাত থেকে পিছলে যাবে সেদিন আমার পদযুগল স্থির রেখ। * ডান পা ধৌত করা। (ফরয) * পায়ের অগ্রভাগে পানি ঢালা সুন্নাত। * বাম হাত দিয়ে পা বিশেষভাবে পায়ের তলা মর্দন করা আদব। * তিনবার ধৌত করা। (সুন্নাত) * প্রতিবার পুরো অঙ্গ ভাল করে মর্দন করবে।

ডান পায়ের আঙ্গুল খেলাল করার মাসায়েল	
	* ডান পায়ের আঙ্গুল খেলাল করা। (সুন্নাত) * বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা খেলাল করা আদব। * ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে খেলাল আরম্ভ করা নিয়ম। * খেলাল করার সময় পায়ের আঙ্গুলের নীচ দিক থেকে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে খেলাল করা। (مراقى الفلاح) * অবশেষে দুরূদ শরীফ পড়া। (মোস্তাহাব)

বাম পা ধোয়া ও বাম পায়ের আঙ্গুল খেলাল করার মাসায়েল

* কালেমায়ে শাহাদাত পড়া। (মোস্তাহাব)

* বিসমিল্লাহ বলা। (মোস্তাহাব)

* বাম পা ধোয়ার দুআ পড়া। (মোস্তাহাব)

* বিসমিল্লাহ সহ দুআটি এভাবে পড়া যায়–

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِىْ مَغْفُوْرًا وَّسَعْيِىْ مَشْكُوْرًا وَّتِجَارَتِىْ لَنْ تَبُوْرَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমার গোনাহ মার্জনা কর, আমার চেষ্টাকে সাফল্য মন্ডিত কর এবং আমার (আখেরাতের) ব্যবসাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা কর।

* বাম পা ধৌত করা। (ফরয) ডান পায়ের ক্ষেত্রে বর্ণিত অপর আটটি আমল সহ। শুধু বাম পায়ের আঙ্গুল খেলাল করার সময় বৃদ্ধ আঙ্গুল থেকে কনিষ্ঠ আঙ্গুলের দিকে খেলাল করা নিয়ম।

* অবশেষে দুরূদ শরীফ পড়া। (মোস্তাহাব)

উযূর সব অঙ্গের জন্য প্রযোজ্য মাসায়েল ঃ

* উযূর অঙ্গগুলো ধোয়ার সময় জোড়া ও ভাজগুলোতে বিশেষ যত্ন সহকারে পানি পৌছাতে হবে।

* উযূর মাঝে মাঝে নিম্নোক্ত দুআ পড়া উত্তম–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ -

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমার পাপ ক্ষমা কর, আমার ঘরে প্রাচুর্য্য দান কর এবং আমার রিযিকে বরকত দাও।

* উযূর প্রয়োজন মোতাবেক পানি ব্যবহার করবে– কম বা বেশী করবে না।

* উযূর মধ্যে কোন জাগতিক কথা-বার্তা না বলা আদব।

* প্রত্যেক অঙ্গকে ফরয পরিমাণের চেয়ে কিছু বেশী ধৌত করা উত্তম। যেমন কনুইর উপরেও কিছুটা ধৌত করা। এটাকে اِطَالَةُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيْلِ (অর্থাৎ, উজ্জ্বলতা ও চমক বৃদ্ধি করা) বলে। কেননা, কেয়ামতের দিন উযূর অঙ্গগুলো উজ্জ্বল হবে।

উযূ শেষ হওয়ার পর করণীয় কয়েকটি আমল ঃ

* রোযাদার না হলে উযূর অবশিষ্ট পানি বা তার কিয়দংশ পান করা মোস্তাহাব। এ পানি পান করা অনেক রোগের শেফা। এ পানি কেবলামুখী হয়ে পান করা উত্তম। দাঁড়িয়ে এবং বসে উভয়ভাবে পান করা যায়।

(طحطاوى ونور الايضاح)

* এ পানি পান করার দুআ–

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِىْ بِشِفَائِكَ وَدَاوِنِىْ بِدَوَائِكَ وَاعْصِمْنِىْ مِنَ الْوَهْنِ وَالْاَمْرَاضِ وَالْاَوْجَاعِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমাকে শেফা দান কর তোমার শেফা দ্বারা, আমার চিকিৎসা করাও তোমার দাওয়াই দ্বারা এবং আমাকে রক্ষা কর দুর্বলতা, রোগব্যাধি ও ব্যথা-বেদনা থেকে।

* উযূর শেষে কালেমায়ে শাহাদাত পড়া মোস্তাহাব এবং এটা দাঁড়িয়ে, কেবলামুখী হয়ে, আকাশের দিকে নজর করে পড়া মোস্তাহাব।

(طحطاوى واحسن الفتاوى ج/٢)

* তারপর নিম্নোক্ত দুআটি পড়া মোস্তাহাব (দাঁড়িয়ে, কেবলামুখী হয়ে এবং আকাশের দিকে নজর করে)।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর, পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর, তোমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর যাদের থাকবে না কোন ভয় এবং যারা হবে না দুঃখীত।

* নিম্নোক্ত দুআটি পড়াও উত্তম (দাঁড়িয়ে কেবলামুখী হয়ে এবং আকাশের দিকে নজর দিয়ে)

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার স্বপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ (ইবাদতের যোগ্য) নেই। তোমার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার সামনে তওবা করছি।

* সূরা কদর পড়াও উত্তম । উযূর পর সূরা কদর একবার পড়লে সে সিদ্দীকিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (كنز العمال) দুইবার পড়লে তাকে শহীদের তালিকাভুক্ত করা হবে। আর তিনবার পড়লে নবীদের সঙ্গে তার হাশর হবে।

(ديلمى)

* উযূর পর রুমাল, তোয়ালিয়া, গামছা ইত্যাদি দ্বারা উযূর পানি অঙ্গ থেকে মুছে নেয়ায় ক্ষতি নেই। তবে খুব মর্দন করে নয় বরং উত্তম হল হালকাভাবে মুছে নেয়া। (احسن الفتاوى ج ٢)

* উযূর পর মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল উযূ নামায পড়ে নেয়া উত্তম। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ১৮২ পৃষ্ঠা।

বিঃ দ্রঃ উযূর মধ্যে প্রত্যেকটা অঙ্গের আমলের শুরুতে কালেমায়ে শাহাদাত পড়া, বিসমিল্লাহ পড়া এবং শেষে দুরূদ শরীফ পড়া মোস্তাহাব। কোন কোন ফকীহ এর যে কোন একটি পড়লেও চলবে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

যে সব কারণে উযূ মাকরূহ হয়

নিম্নলিখিত কার্যগুলো উযূতে করলে উযূ মাকরূহ হয় অর্থাৎ, করলে উযূ ভঙ্গ হয় না ছওয়াবও হয় না।

১. তারতীব অনুযায়ী উযূ না করলে।

২. অপবিত্র স্থানে বসে উযূ করলে।

৩. অতিরিক্ত পানি ব্যয় করলে।

৪. উযূতে রত থাকা অবস্থায় জাগতিক কথাবার্তা বললে। তবে কোন বিশেষ প্রয়োজনে দু একটি কথা বললে কোন আপত্তি নেই।

৫. মুখ অথবা অন্য কোন অঙ্গে জোরে পানি মারলে।

৬. মুখে পানি দেয়ার সময় গুরগুর শব্দ বেরিয়ে আসলে।

৭. তিন বারের অধিক কোন অঙ্গ ধৌত করলে কিংবা অঙ্গগুলো একবার ধুয়ে ধুয়ে মুছে ফেললে। তবে কোন কারণবশত: এরূপ করলে কোন দোষ নেই। বিনা কারণে করা ঠিক নয়।

৯. ডান হাতে নাক পরিস্কার করা।

১০. প্রথমে বাম হাত অথবা বাম পা ধৌত করা।

যে সব কারণে উযূ ভাঙ্গে না

কোন কোন কারণে উযূ ভঙ্গ হয় না, তবে সাধারণ্যে উযূ ভঙ্গ হয় বলে খ্যাত। যেমন ঃ

১. বসে বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে উযূ ভঙ্গ হয় না।

২. নামাযের সাজদায় তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লে উযূ ভঙ্গ হয় না। তবে তন্দ্রায় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের সাথে মিশে গেলে, যেমন কনুই উরুর সাথে মিশে গেলে অথবা উরু পেটের সাথে মিললে উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। তবে মেয়েলোক এর ব্যতিক্রম।

৩. নামাযের মধ্যে মুচকি হাসি দিলে উযূ ভঙ্গ হয় না।

৪. উযূ করার পর স্ত্রীলোক তার সন্তানকে দুধ পান করালে অথবা স্তন থেকে দুধ নিংড়িয়ে ফেললেও উযূ ভঙ্গ হয় না।

৫. স্বীয় অথবা স্ত্রীলোকের যৌনাঙ্গে দৃষ্টিপাত করলেও উযূ ভঙ্গ হয় না। তবে ইচ্ছাকৃত এরূপ করা ভাল নয়।

৬. পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের শরীর স্পর্শ করলে অথবা চুম্বন করলে উযূ ভঙ্গ হয় না।

৭. উযূ করার পর লজ্জাস্থানে হাত লাগলে উযূ নষ্ট হবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করা মাকরূহ।

৮. উযূ করার পর নখ কাটলে অথবা পায়ের চামড়া কাটলে অথবা উপড়ালে উযূ ভঙ্গ হয় না।

৯. বিড়ি সিগারেট সেবন করলে উযূ ভঙ্গ হয় না।

১০. সতর খুললে উযূ ভঙ্গ হয় না।

১১. কারও সতর দেখলে উযূ ভঙ্গ হয় না।

যে সব কারণে উযূ ভেঙ্গে যায়

১. প্রস্রাব, পায়খানা করা।

২. পিছনের রাস্তা দিয়ে বাতাস বেরিয়ে আসা।

৩. প্রস্রাব পায়খানা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু যেমন কেঁচো, ক্রিমি, পাথরকণা ইত্যাদি অথবা এগুলো ছাড়াও যদি অন্য কোন বস্তু পেশাব অথবা পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত হয়, তখন উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৪. শরীরের অন্য কোন স্থান থেকে রক্ত, পূঁজ ইত্যাদি বেরিয়ে গড়িয়ে গেলে।

৫. বমি ছাড়াও রক্ত, পিত্ত, খাদ্য অথবা পানি মুখ ভরে নির্গত হলে উযূ ভঙ্গ হবে। এ সমস্ত বস্তু অল্প অল্প করে কয়েক বার নির্গত হলেও উযূ ভঙ্গ হবে যদি সব বারেরটা একত্রে হলে মুখ ভরা পরিমাণ হত বলে মনে হয়।

৬. থুতুতে রক্তের পরিমাণ বেশী হলে কিংবা উযূ করার সময় দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত বেরিয়ে আসলে উযূ ভঙ্গ হবে। রক্তের পরিমাণ অল্প হলে কোন ক্ষতি নেই তবে রক্ত অধিক পরিমাণে হলে অর্থাৎ থুথু থেকে রক্তের পরিমাণ বেশী হলে রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত উযূ করতে পারবে না।

৭. বীর্য, মুযী অথবা হায়েযের রক্ত দেখা দিলে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এর বর্ণনা গোসল অধ্যায়ে করা হবে। উল্লেখ্য যে, বীর্য ও মুজীতে পার্থক্য আছে-যৌন সম্ভোগের সময় তৃপ্তি হওয়ার প্রাক্কালে অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে যা নির্গত হয় তা হলো বীর্য আর পুংলিঙ্গের চটপটে ভাব দ্বারা অথবা স্ত্রীলোককে চুম্বন করায় অথবা স্ত্রীলোকের নিকটবর্তী হওয়ায় অথবা কোন খারাপ ধারণার বশবর্তী হলে লিঙ্গের অগ্রভাগ দিয়ে পানির মত যে বস্তু বেরিয়ে আসে, তা হল মুযী। বীর্য বের হলে গোসল করা আবশ্যক হয় কিন্তু মুযী বের হলে গোসল করা আবশ্যক হয় না তবে উযু ভেঙ্গে যায়।

৮. স্ত্রীলোকের স্তন থেকে বুকের দুধ ব্যতীত অন্য বস্তু বেরিয়ে আসলে এবং ব্যথা হলে উযূ ভঙ্গ হবে।

৯. যোনির মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করালে উযূ ভঙ্গ হয়ে যায়।

১০. বেহুঁশ বা পাগল হলে।

১১. নামাযের মধ্যে এ রকম শব্দ সহকারে হাসা যে, পার্শ্বের লোক সে শব্দ শুনতে পায়।

মাযূর ব্যক্তির উযূর বয়ান

মাযূর কে? ঃ যার নাক বা অন্য কোন যখম থেকে অনবরত রক্ত বইতে থাকে বা অনর্গল পেশাবের ফোঁটা আসতে থাকে, এমনকি নামাযের সম্পূর্ণ ওয়াক্তের মধ্যে এতটুকু সময়ও বিরতি হয় না, যার মধ্যে সে শুধু উযূর ফরয অঙ্গুগুলো ধুয়ে সংক্ষেপে ফরয নামায আদায় করতে পারে, এরূপ ব্যক্তিকে মাযূর বলে।

মাযূর ব্যক্তির হুকুম ঃ মাযূর ব্যক্তিকে প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে নতুন উযূ করতে হবে। যে পর্যন্ত ঐ ওয়াক্ত থাকবে সে পর্যন্ত তার উযূ থাকবে অর্থাৎ, ঐ ওযরের কারণে উযূ যাবে না। তবে ঐ কারণ ছাড়া উযূ ভঙ্গের অন্য কোন কারণ ঘটলে উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

* মাযূর ব্যক্তি যে কারণে মাযূর হয়েছে সে কারণ বন্ধ থাকার সময় উযূ ভঙ্গের অন্য কোন কারণ ঘটায় যদি উযূ করে, তারপর মা'যূর যে কারণে হয়েছে সে কারণ ঘটে, তাহলেও উযূ চলে যাবে অবশ্য মা'যূর যে কারণে হয়েছে সে কারণে যে উযূ করবে সেই উযূ ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত থাকবে যদি উযূ ভঙ্গের অন্য কোন কারণ না পাওয়া যায়।

* যদি এই রক্ত ইত্যাদি (অর্থাৎ, যে কারণে মাযূর হয়েছে) কাপড়ে লাগে এবং এরূপ মনে হয় যে, নামায শেষ হওয়ার পূর্বে আবার লেগে যাবে, তাহলে ঐ রক্ত ধোয়া ওয়াজিব নয়। অন্যথায় ধুয়ে নিয়ে পাক কাপড়েই নামায পড়তে হবে। তবে রক্ত এক দেরহাম পরিমাণের কম হলে তা না ধুয়েও নামায হয়ে যাবে। হাতের তালুকে সম্পূর্ণ খুলে তাতে পানি রাখলে যে পরিমাণ স্থানে পানি থাকে তাকে এক দেরহাম-এর পরিমাণ বলা হয়। (বেহেশতি জেওর)

* মাযূর বলে গণ্য হওয়ার জন্য শর্ত হল পূর্ণ এক ওয়াক্ত (শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত) এমন অতিবাহিত হওয়া, যার মধ্যে সে ওযর থেকে এতটুকু বিরতি পায় না যাতে উযূর ফরযগুলো আদায় করে ফরয নামায পড়ে নিতে পারে। এরপর প্রতি ওয়াক্তে সারাক্ষণ সেই ওযর থাকা জরুরী নয় বরং ওয়াক্তের মধ্যে এক বারও যদি পাওয়া যায় তবুও সে মাযূর বলে গণ্য থাকবে। অবশ্য যদি এমন একটা ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়, যার মধ্যে একবারও সে ওযর দেখা যায়নি, তাহলে সে আর মাযূর থাকল না।

মেসওয়াকের মাসায়েল

মেসওয়াক-এর ভাল বিষয়ক ঃ

১. মেসওয়াক পীলু বা যয়তুনের ডালের হওয়া উত্তম।

২. মেসওয়াক কনিষ্ঠ আঙ্গুলের মত মোটা হওয়া উত্তম।

৩. মেসওয়াক প্রথমে এক বিঘত পরিমাণ লম্বা হওয়া উত্তম।

৪. মেসওয়াক নরম হওয়া মোনাছেব।

৫. মেসওয়াক কম গিরা সম্পন্ন হওয়া উত্তম।

৬. মেসওয়াকের ডাল কাঁচা হওয়া উত্তম।

মেসওয়াক ধরার তরীকা বিষয়ক ঃ

১. মেসওয়াক ডান হাতে ধরা মোস্তাহাব।

২. মেসওয়াক ধরার তরীকা হলঃ কনিষ্ঠ আঙ্গুল মেসওয়াকের নীচে, বৃদ্ধ আঙ্গুলের অগ্রভাগ মেসওয়াকের উপরের দিকে নীচে এবং অবশিষ্ট আঙ্গুলগুলো (মধ্যের তিন্ আঙ্গুল) মেসওয়াকের উপরে রাখবে।

মেসওয়াকের দুআ ও যিকির বিষয়ক ঃ

১. বিসমিল্লাহ বলে মেসওয়াক শুরু করবে।

২. মেসওয়াক শুরু করার সময় দুআ পড়া মোস্তাহাব। দুআটি এই-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سِوَاكِیْ هٰذَا مَحِيْصًا لِّذُنُوْبِیْ وَمَرْضَاةً لَّكَ وَبَيِّضْ بِهٖ وَجْهِیْ كَمَا بَيَّضْتَ اَسْنَانِیْ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, এই মিসওয়াক করাকে আমার পাপ মোচনকারী ও তোমার রেজামন্দীর ওছীলা বানাও, আর আমার দাঁতগুলিকে যেমনি তুমি সুন্দর করেছ, তেমনি আমার চেহারাকেও উজ্জ্বল কর।

মেসওয়াক করার তরীকা বিষয়ক ঃ

১. মেসওয়াক শুরু করার পূর্বে ভিজিয়ে নেয়া উত্তম।

২. প্রথমে উপরের দাঁতের ডান দিকে অতঃপর বাম দিকে, তারপর নীচের দাঁতের ডান দিকে অতঃপর বাম দিকে, তারপর দাঁতের ভিতরের দিকে অনুরূপ ভাবে ঘষতে হবে। (رد المحتار ج/١)

৩. এভাবে তিন বার ঘষা উত্তম। প্রতিবারেই নতুন পানি দিয়ে মেসওয়াক ধুয়ে নেয়া মোস্তাহাব। (شامی ج/١)

৪. মেসওয়াক দাঁতের অগ্রভাগে, উপর ও নীচের তালুর অগ্রভাগে এবং জিহবার উপরিভাগেও করা উত্তম।

৫. মেসওয়াক দাঁতের উপর চওড়াভাবে ঘষা নিয়ম। ইমাম গাযযালী (রহঃ) উপর নীচ-ভাবে ঘষার কথাও বলেছেন। কমপক্ষে চওড়াভাবে ঘষতে হবে। (مفاتيح الجنان نقلا عن احياء علوم الدين)

৬. শোয়া অবস্থায় মেসওয়াক করা মাকরূহ।

৭. মেসওয়াক করার পর মেসওয়াক ধুয়ে দাঁড় করিয়ে রাখবে। (الدر المختار)

বিঃ দ্রঃ মেসওয়াক না থাকলে মেসওয়াকের বিকল্প হিসেবে ব্রাশ ব্যবহার করা যায়। এতে মেসওয়াকের ডাল বিষয়ক সুন্নাত আদায় না হলেও মাজা ও পরিস্কার করার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (درس ترمذی) অন্যথায় হাত দিয়ে বা মোটা কাপড় দিয়ে দাঁত মেজে নিতে হবে। হাত দিয়ে মাজার তরীকা হলঃ ডান হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুল দিয়ে ডান পাশের দাঁতের উপরে অতঃপর নীচে, তারপর শাহাদাত (তর্জনী) আঙ্গুল দিয়ে বাম পাশের দাঁতের উপরে অতঃপর নীচে ঘষতে হবে। (طحطاوی)

গোসলের ফরয, সুন্নাত, মোস্তাহাব ও আদবসমূহ

(গোসলের যাবতীয় আমল ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হল)

* গোসলখানা নোংরা থাকলে কিম্বা গোসলখানার মধ্যে পায়খানা থাকলে বাম পা দিয়ে গোসলখানায় প্রবেশ করবে। আর তার মধ্যে পায়খানা না থাকলে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে যে কোন পা দিয়ে প্রবেশ করা যায়।

(احسن الفتاوى ج/٢)

* গোসলের জন্য কাপড় খোলার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ (عمل اليوم والليلة)

* তবে গোসলখানা নোংরা থাকলে বা গোসলখানার মধ্যে পায়খানা থাকলে এ দুআটি বাইরে থেকেই কাপড় খোলার সময় পড়বে। (احسن الفتاوى ٢/)

* গোসলের নিয়ত করা সুন্নাত। (رد المختار)

* নিয়ত এভাবে করা যায়–

نَوَيْتُ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ

অর্থাৎ, আমি জানাবাত থেকে পবিত্রতা হাছিল করার জন্য গোসলের নিয়ত করছি।

* বসে গোসল করা উত্তম। (احسن الفتاوى ج/٢)

* আড়াল স্থানে এবং ছতর ঢেকে গোসল করা মোস্তাহাব। আড়াল স্থান হলে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয তবে মোস্তাহাবের খেলাফ।

* কেবলামুখী হয়ে গোসল না করা উত্তম।

* গোসলের শুরুতে উভয় হাতের কবজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে। এটা সুন্নাত।

* তারপর পেশাব পায়খানার রাস্তা (তাতে নাপাকী না থাকলেও) ধৌত করা সুন্নাত।

* তারপর শরীরের অন্য কোন স্থানে নাপাকী থাকলে তা ধৌত করা সুন্নাত।

* তারপর নামাযের উযূর ন্যায় উযূ করবে। এই উযূর মধ্যে উযূর অঙ্গসমূহের দুআ পাঠ করাটা বিতর্কিত, তবে গোসলখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলে এবং তার মধ্যে পায়খানা না থাকলে দুআগুলো পাঠ করা যায়।

(احسن الفتاوى ج/٢ والفقه على المذاهب الاربعة)

গোসলের ফরযসমূহ ঃ

১. কুলি করা ফরয। রোযাদার না হলে গড়গড়া করা সুন্নাত এবং তিনবার এরূপ গড়াগড়া সহ কুলি করা সুন্নাত। দাঁতের মধ্যে খাদ্যকণা আটকে থাকলে তা অপসারণ করবে।

২. নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছানো ফরয। নাকের মধ্যে শুকনো ময়লা থাকলে তা-ও দূরীভূত করবে। তিনবার এরূপ পানি পৌঁছানো সুন্নাত।

৩. সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছানো ফরয। মহিলাদের নাকের ও কানের ছিদ্রে অলংকার না থাকলে তার মধ্যেও পানি পৌঁছাতে হবে। অলংকার থাকলে নাড়াচাড়া দিয়ে ছিদ্রের ভিতরে পানি প্রবেশ করাবে। চুলের বেণী ও খোপা খুলে সমস্ত চুল ভিজাতে হবে। তবে কোন গাম বা আঠালো বস্তু দ্বারা মহিলাদের চুল বেণী বা খোপা করে বাঁধানো থাকলে সে ক্ষেত্রে তা না খুলে গোড়ায় পানি পৌঁছাতে পারলেও চলবে। (বেহেশতি জেওর [বাংলা])

* গোসলের স্থানে পানি জমা হয়–এমন স্থানে গোসল করলে গোসলের পরে অন্যত্র সরে গিয়ে পা ধোয়া সুন্নাত।

* সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছানোর সুন্নাত তরীকা হলঃ প্রথমে ভিজা হাত দ্বারা সমস্ত শরীর ভিজিয়ে নিবে। (منية المصلي) তারপর তিনবার মাথায় পানি ঢালবে। তারপর তিনবার ডান কাঁধে পানি ঢালবে তারপর বাম কাঁধে তিনবার পানি ঢালবে। প্রতিবার পানি ঢেলে ভাল করে শরীর মর্দন করে পরিষ্কার করা সুন্নাত।

* গোসলের পর পানি মুছে ফেলার কিছু থাকলে তা দিয়ে শরীর মুছে ফেলবে।

* তারপর যথাসম্ভব দ্রুত কাপড় দ্বারা শরীর আবৃত করবে।

* গোসলখানা থেকে বের হওয়ার সময় যদি বাম পা দিয়ে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে ডান পা দিয়ে বের হবে।

* বের হওয়ার পর উযূর শেষে যে সব দুআ পড়া মোস্তাহাব এখানেও সেগুলো পড়বে।

* গোসলের পর কোন অঙ্গ ধোয়া হয়নি বা কোথাও শুকনো রয়ে গেছে মনে হলে শুধু সেটা ধুয়ে নিলেই চলবে, পুরো গোসল দোহরানোর প্রয়োজন নেই।

যে সব কারণে গোসল ফরয হয়ঃ

১. যৌন সম্ভোগ দ্বারা অথবা অন্য কোন কারণে জোশের সাথে মনী (বীর্য) বের হলে।

২. স্বপ্ন দেখুক বা না দেখুক রাতে অথবা দিনে ঘুমন্ত অবস্থায় বীর্যপাত হলে। তবে শয়নের কাপড়ে বা শরীরে মনীর চিহ্ন না দেখা গেলে গোসল ফরয হয় না।

৩. স্বামীর লিঙ্গের শুধু অগ্রভাগ অর্থাৎ খৎনার স্থানটুকু স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গে প্রবেশ করলে (যদিও কিছু বের না হয়)। যেমন সামনের রাস্তার এই হুকুম, তদ্রূপ মহাপাপ হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ পেছনের রাস্তায় প্রবেশ করায় তবুও এই হুকুম।

৪. স্ত্রী লোকের হায়েয হওয়ার পর যখন রক্ত বন্ধ হয় তখন গোসল ফরয হয়।

৫. স্ত্রীলোকের নেফাসের রক্তস্রাব বন্ধ হলে পাক হওয়ার জন্য গোসল ফরয হয়।

যে সব কারণে গোসল ফরয হয় না ঃ

১. যদি কোন রোগের কারণে ধাতু পাতলা হয়ে বা কোন আঘাত খেয়ে বিনা উত্তেজনায় ধাতু নির্গত হয় তাতে গোসল ফরয হয় না।

২. স্বামী স্ত্রী শুধু লিঙ্গ স্পর্শ করে যদি ছেড়ে দেয়– কিছু মাত্র ভিতরে প্রবেশ না করায় এবং মনীও বের না হয়, তাতে গোসল ফরয হয় না।

৩. শুধু মযী বের হলে তাতে কেবল উযূ ভঙ্গ হয় গোসল ফরয হয় না।

৪. ঘুম থেকে উঠার পর যদি স্বপ্ন স্মরণ থাকে কিন্তু কাপড়ে বা শরীরে কোন কিছু দেখা না যায় তবে তাতে গোসল ফরয হয় না।

৫. এস্তেহাযার রক্তের কারণে গোসল ফরয হয় না।

বিঃ দ্রঃ মনী ও মযী কাকে বলে তা পূর্বে ১১২ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে।

তাইয়াম্মুমের মাসায়েল

(ধারাবাহিকভাবে তাইয়াম্মুমের আমলসমূহ বর্ণনা করা হল)

* পানি না পাওয়ার কারণে যাকে তাইয়াম্মুম করতে হবে পানি পাওয়ার প্রবল ধারণা থাকলে মুস্তাহাব ওয়াক্ত পার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করা তার জন্য মোস্তাহাব। আর কেউ পানি দেয়ার ওয়াদা করলে অবশ্যই তাকে অপেক্ষা করতে হবে, যদিও ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আশংকা হয়।

* তাইয়াম্মুমের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত।

* মেসওয়াক করা উযূর ন্যায় তাইয়াম্মুমেরও সুন্নাত। (الفقه على المذاهب الاربعة)

* নিয়ত করা ফরয। (পবিত্রতা অর্জন করা বা নাপাকী দূর করার নিয়ত করবে। কিম্বা নামায, সাজদায়ে তিলাওয়াত প্রভৃতি এমন মৌলিক ইবাদতের নিয়ত করবে যা পবিত্রতা ব্যতীত সহীহ্ হয় না)

* নিয়ত মুখেও উচ্চারণ করা উত্তম।

এরূপ বাক্যে নিয়ত করা যায়–

نَوَيْتُ اَنْ اَتَيَمَّمَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِّلصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى

অর্থ ঃ আমি নাপাকি দূর করার, নামায বৈধ করার এবং আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করার উদ্দেশ্য তাইয়াম্মুমের নিয়ত করছি।

* নিয়ত করার পর পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু (যার উপর তাইয়াম্মুম করা যায়)-এর উপর উভয় হাতের তালু মারবে।

* হাত মারার সময় আঙ্গুলগুলো খোলা রাখা সুন্নাত।

* হাত মারার পর উভয় হাত ঐ স্থানে রাখা অবস্থায় এক বার সামনের দিকে এক বার পেছনের দিকে নিবে। (এটা সুন্নাত)

* হাত এমনভাবে ঝাড়বে, যেন আলগা ধুলা ঝরে যায়।

* পুরো মুখ ঐ হাত দ্বারা মসেহ করবে। (এটা ফরয)

* দাড়ি খেলাল করা সুন্নাত।[১]

* আবার মাটিতে অনুরূপভাবে হাত মারবে। (আঙ্গুলের মধ্যে ফাঁক রেখে)

* হাত সামনে এবং পেছনের দিকে নিবে। (এটা সুন্নাত)

* এখানেই (হাত মসেহের পূর্বেই) উযূর মত উভয় হাতের আঙ্গুল খেলাল করবে। এটা সুন্নাত। (طحطاوی)

* পূর্বের ন্যায় হাত ঝাড়বে।

* প্রথমে ডান হাত কনুই সহ মসেহ করবে।

* তারপর বাম হাত কনুই সহ মসেহ করবে। (হাত মসেহ করা ফরয)

* মসেহ করার সুন্নাত তরীকা হলঃ বাম হাতের চার আঙ্গুলের পেট (বৃদ্ধ আঙ্গুল ছাড়া) ডান হাতের চার আঙ্গুলের পিঠে রাখবে। তারপর ডান হাতের পিঠের উপর দিয়ে কনুইর দিকে টেনে নিয়ে যাবে। অতঃপর বাম হাতকে উল্টে বাম হাতের তালু এবং বৃদ্ধ আঙ্গুলের পেট দিয়ে ডান হাতের পেটের দিক থেকে হাত আঙ্গুলের দিকে এমনভাবে টেনে নিয়ে যাবে যেন বাম হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুলের পেট ডান হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুলের পিঠের উপর দিয়ে চলে যায়। অনুরূপভাবে ডান হাত দিয়ে বাম হাত মসেহ করবে।[২]

* আংটি, চুড়ি ইত্যাদিকে তার স্থান থেকে সরিয়ে এমনভাবে হাত মসেহ করবে যেন সব স্থানে মসেহ করা হয়।

* তাইয়াম্মুমের এই তারতীব রক্ষা করা সুন্নাত।

* তাইয়াম্মুমের মধ্যেও উযূর ন্যায় একের পর এক অঙ্গগুলো লাগাতার (অর্থাৎ, বেশী বিরতি না দিয়ে) করে যাওয়া সুন্নাত।

* তাইয়াম্মুম উযূর ন্যায়, তাই উযূর মধ্যে মুখ ও হাত ধোয়ার যে দুআ পড়া হয়, এমনিভাবে উযূর শেষে যে সব দুআ পড়া হয়, তাইয়াম্মুমের বেলায়ও সেগুলো পড়ার হুকুম একই হবে। (كتاب الاذكار)

---

১ হযরত ইমাম আবূ ইউসুফের মতে তাইয়াম্মুমের মধ্যে দাড়ি খেলাল করা সুন্নাত নয়। (مراقی الفلاح)

২ عنایہ গ্রন্থকার মসেহ করার এই তরীকা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত বলে দাবী করেছেন, অন্য অনেকে তা অস্বীকার করলেও এরূপ করা সুন্নাত তরীকার খেলাফ হবে বলে মন্তব্য করেননি। তবে যে কোন রূপে পুরো হাত মসেহ করা সম্পন্ন হলেই তাইয়াম্মুমের ফরয আদায় হয়ে যাবে সন্দেহ নেই।

কি কি বস্তু দ্বারা তাইয়াম্মুম করা জায়েয ঃ

পাক মাটি, কংকর, বালি, চুনা, মাটির তৈরী কাঁচা অথবা পাকা ইট, ধুলা-বালি, মাটি, পাথর, ইটের তৈরী দেওয়াল, পাকা বাসন, (তৈল লেগে না থাকলে)। লাকড়ী বা কাপড়ে অথবা অন্য কোন পাক বস্তুতে ধুলাবালি লেগে থাকলে এসব বস্তু দ্বারা তাইয়াম্মুম করা যাবে। (আলমগীরী ও দুররে মুখতার পৃঃ ২৫-২৬)

কোন্ অপবিত্রতায় তাইয়াম্মুম করা যায় ঃ

উপরে অপ্রকৃত নাপাকীর (নাজাছাতে হুকমী তথা বে-উযূ বে--গোসল হওয়ার অবস্থা) বর্ণনা করা হয়েছে। ছোট বড় যে কোন অপ্রকৃত নাপাকী অবস্থায় তাইয়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায়। তবে প্রকৃত নাপাকীর বেলায় তাইয়াম্মুম করলে যথেষ্ট হবে না বরং ধৌত করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, উযূ ও গোসলের জন্য এক রকম তাইয়াম্মুমই করতে হবে। এক তাইয়াম্মুমই উভয়ের জন্য যথেষ্ট হবে।

কখন তাইয়াম্মুম করতে হবে ঃ

নিম্নলিখিত কারণগুলো ব্যতীত তাইয়াম্মুম জায়েয নয় ঃ

১. পানি এক মাইল অথবা তদুর্ধ অথবা এর চেয়েও দূর হতে হবে।
২. পানির কূপ আছে, কিন্তু পানি উঠাবার কোন ব্যবস্থা না থাকলে।
৩. পানির নিকট কোন ক্ষতিকর প্রাণী অথবা কোন শত্রু থাকলে এবং কাছে গেলে কোন বিপদের আশংকা থাকলে।
৪. রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ অথবা মোটর গাড়ীতে আরোহণ অবস্থায় পানি না পাওয়া গেলে অথবা উযূ করার সুযোগ না থাকলে বা উযূ করতে গেলে গাড়ী ছেড়ে দেবার ভয় থাকলে। তবে রেলগাড়ী বা মোটরে তাইয়াম্মুমের জন্য শর্ত হল (এক) রেলগাড়ীর অন্য কোন ডাব্বায় (বগিতে) পানি নেই (দুই) পথিমধ্যে এক মাইলের (১.৮৩ কিঃ)-এর মধ্যে পানি অর্জন করা যাবে-এরূপ জানা নেই।
৫. পানি ব্যবহার করলে রোগ বৃদ্ধি অথবা রোগ সৃষ্টি অথবা স্বাস্থ্যের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ভয় হলে। অবশ্য এসব ব্যাপারে অনর্থক সন্দেহ করে তাইয়াম্মুম না করা চাই। তবে রোগ বৃদ্ধি পাবার অথবা রোগ সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে, যেমন সর্দি, কাশিতে আক্রান্ত লোক শীতকালে ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করলে ক্ষতি হয়, এমতাবস্থায় গরম পানি দিয়ে গোসল অথবা উযূ করা দরকার। গরম পানি সংগ্রহ করতে না পারলে অথবা গরম পানি ব্যবহার করলেও ক্ষতির আশংকা হলে তাইয়াম্মুম করবে।

৬. অল্প পানি থাকায় উযূ করলে পিপাসায় কষ্ট করতে হবে অথবা খাবার পাক করতে অসুবিধার সম্ভাবনা আছে।

৭. পানি আছে, কিন্তু নিজে উঠে গিয়ে পানি আনতে সক্ষম নয়, আর পানি এনে দেবার জন্য অন্য লোকও না পাওয়া যায়।

৮. যে নামাযের কাযা হয় না, উযূ অথবা গোসল করতে গেলে এমন নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা দেখা দিলে। যেমন দু ঈদের নামায, জানাযার নামায। এগুলোতে উযূ ব্যতীত তায়াম্মুম করা যায়। (ইসলামী ফেকাহ, আহছানুল ফাতাওয়া এবং আলমগীরী)

উল্লেখ্য, কোন লোকের গোসলের প্রয়োজন, কিন্তু গোসল করলে ক্ষতির আশংকা রয়েছে, উযূ করলে কোন ক্ষতি হবে না, তখন সে গোসলের জন্য তাইয়াম্মুম করে নিবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য নূতন করে উযূ করে নামায পড়বে। পানির পরিমাণ যদি অল্প হয় ও মাত্র একবার করে মুখ হাত ও পা ধৌত করা যায়, এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করবে না-- উযূর অংগগুলো একবার করে ধৌত করলেই হবে, উযূর সুন্নাত অর্থাৎ কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ছেড়ে দিতে হবে। তাইয়াম্মুম করে নামায আদায় করার পর কোন লোক জানতে পারল যে পানি নিকটেই আছে, তখন তাকে দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে না। পানি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে থাকলে তখন এ হুকুম প্রযোজ্য হবে নতুবা উযূ করে দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে। নামাযের শেষ ওয়াক্তে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে শেষ ওয়াক্তেই নামায পড়া মুস্তাহাব। যেমন রেলগাড়ী অথবা মোটরে আরোহণ করার পর জানতে পারল যে, নামাযের শেষ ওয়াক্তে রেলগাড়ী অথবা মোটর গাড়ী যথাস্থানে পৌছে যাবে যেখানে পানি আছে, তখন বিলম্ব করেই নামায পড়বে। তবে গাড়ী পৌছার ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাইয়াম্মুম করেই নামায পড়বে।

কোন লোক পানি অনুসন্ধান করে তাইয়াম্মুম করে নামায আদায় করল, অথচ নামাযের সময় থাকতেই পানি পাওয়া গেল, তখন তাকে দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে না। রেলগাড়ীতে বা উড়োজাহাজে ভ্রমণ করলে মাটি ও পানি না পাওয়া গেলে উযূ ও তাইয়াম্মুম ব্যতীত নামায পড়ে নিবে অর্থাৎ, নামাযের নিয়ত ছাড়া শুধু নামাযের মত উঠা-বসা ইত্যাদি করবে। এমনিভাবে কোন লোক জেলখানায় থাকাকালীন পানি ও মাটি না পেলে, উযূ ও তাইয়াম্মুমবিহীন অনুরূপভাবে নামাযের ন্যায় করবে। তবে উভয় অবস্থায় পানি পাওয়ার পর দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে। মানুষের সৃষ্ট কোন অপারগতায় কেউ উপনীত হলে এর হুকুমও পূর্ববৎ। যেমন কোন লোকের জেলখানায় থাকা অবস্থায় অন্য কেউ তার উযূর পানি বন্ধ করে দেয়, তখন সে উযূবিহীন নামায পড়বে।

কোন্ কোন্ কারণে তাইয়াম্মুম নষ্ট হয় ঃ

১. যে যে কারণে উযূ নষ্ট হয় তাইয়াম্মুমও ঐসব কারণে ভঙ্গ হয়।

২. যে সমস্ত কারণে গোসল ফরয হয় ঐ সমস্ত কারণে তাইয়াম্মুম নষ্ট হয়।

৩. যেসব কারণে তায়াম্মুম করা হয়েছিল, ঐসব কারণ রহিত হয়ে গেলে তাইয়াম্মুম ভংগ হয়ে যাবে।

৪. পানি পাওয়ার পর তাইয়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়।

হায়েয ও নিফাসের বর্ণনা

হায়েয কাকে বলে ঃ প্রতি মাসে বালেগা মেয়েদের যৌনাঙ্গ দিয়ে স্বাভাবিকভাবে যে রক্তস্রাব হয়, তাকে হায়েয বলে। কুরআন ও হাদীসে এই রক্তকে নাপাক বলা হয়েছে।

হায়েযের সময়সীমা ঃ হায়েযের সময়কাল কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত। সর্বোচ্চ সময় দশ দিন দশ রাত। কোন স্ত্রীলোকের তিন দিন তিন রাতের কম অথবা দশ দিন দশ রাতের অধিক রক্তস্রাব হলে তখন হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হবে না, তাকে ইস্তেহাযা বলা হবে।

হায়েযের মাসায়েল ঃ

* হায়েযের সময়সীমার মধ্যে লাল, হল্‌দে ও মেটে যে কোন প্রকার রং-এর রক্তকে হায়েযের রক্ত বলা হয়।

* সাধারণতঃ নয় বৎসরের পূর্বে এ রক্ত দেখা দেয় না। তৎপূর্বে এ ধরনের রক্ত দেখা দিলে তা হায়েযের রক্ত না হয়ে বরং ইস্তেহাযার রক্ত হিসেবে গণ্য হবে।

* কোন স্ত্রীলোকের সাধারণভাবে প্রত্যেক মাসে তিনদিন রক্তস্রাব হয় তার হায়েযের সময় সীমা তিনদিন ধরে নিতে হবে, এটাই তার অভ্যাস। কোন মাসে তার সাতদিন রক্তস্রাব হলে এও হায়েয মনে করতে হবে, কেননা হায়েযের সর্বোচ্চ সীমা দশ দিন। তবে পরবর্তী মাসগুলোতে তার রক্তস্রাব দশদিনের বেশী হলে যেমন বার দিন অথবা পনের দিন, তখন পূর্ববর্তী মাসে যে কয়দিন রক্ত এসেছিল ঐদিনগুলো হায়েয হিসেবে পরিগণিত হবে। অবশিষ্ট দিনগুলোকে ইস্তেহাযা ধরে নিতে হবে।

* তদ্রুপ যে স্ত্রীলোকের হায়েযের অভ্যাস হলো তিন দিন, কিন্তু একমাসে তার চার দিন স্রাব হলো। তার পরবর্তী মাসে পনের দিন স্রাব হলো। এমতাবস্থায় যেহেতু এক মাসে তার চার দিন রক্ত এসেছিল, সে জন্য তার অভ্যাস চার দিনই মনে করে নিতে হবে। অবশিষ্ট দিনগুলোর নামায কাযা করতে

হবে। তবে এ কাযা আদায় করার জন্য দশ দিন বিলম্ব করতে হবে। কেননা দশ দিন পর্যন্ত অভ্যাস পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু দশ দিন চলে যাবার পর পরিষ্কার ধরে নিতে হবে যে, চার দিনের চেয়ে যতগুলো দিন বেশী রক্তস্রাব হয়েছে সেগুলো ইস্তেহাযার রক্ত। আর যে মাসে তার আট দিন অথবা নয় দিন অথবা দশ দিন রক্তস্রাব হয়, তখন পূর্ববর্তী অভ্যাস ধর্তব্য হবে না। অবশ্য দশ দিনের বেশী রক্তস্রাব হলে ঐ চার দিনই তার মনে রাখতে হবে।

সারকথা এই যে, দশ দিন পার হয়ে গেলে অভ্যাসের অতিরিক্ত দিনগুলোর রক্তস্রাবকে নিঃসন্দেহে ইস্তেহাযা মনে করতে হবে। কিন্তু দশ দিনের মধ্যে রক্তস্রাবের অভ্যাস সর্বদা পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন, সর্বদা চার দিন রক্তস্রাব হতো, মুহররম মাসে পাঁচ দিন আসলো, আবার সফর মাসে বার দিন আসলো, তখন ঐ পাঁচ দিনই তার অভ্যাস মনে করতে হবে। কিন্তু সফর মাসে নয়দিন এসে থাকলে মনে করতে হবে যে, তার অভ্যাস পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।

নিফাস কাকে বলে ঃ সন্তান প্রসব হওয়ার পর স্ত্রীলোকের যে রক্তস্রাব হয় একে নিফাস বলে।

নিফাসের সময়সীমা ঃ নিফাসের সময়সীমা সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন। কমের কোন সীমা নেই।

নিফাসের মাসায়েল ঃ চল্লিশ দিনের কম সময়ের মধ্যে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে গোসল করে নিতে হবে। নিজকে পাক মনে করে নামায পড়া আরম্ভ করতে হবে। চল্লিশ দিনের বেশী রক্তপাত হলে চল্লিশ দিনের পর গোসল করে নিতে হবে। চল্লিশ দিনের অতিরিক্ত দিনগুলোর রক্তস্রাব ইস্তেহাযা হিসেবে ধরে নিতে হবে।

হায়েয ও নিফাসের আরও কতিপয় হুকুম ঃ

১. হায়েয ও নিফাসের পর সত্বর গোসল করে নামায আরম্ভ করতে হবে। রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার পর যত ওয়াক্তের নামায ছুটবে, তার জন্য পাপ হবে।

২. হায়েয ও নিফাস অবস্থায় নামায, রোযা ও কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি নিষিদ্ধ। অবশ্য নামায ও রোযার মধ্যে পার্থক্য এই যে, হায়েয অবস্থায় যে নামায ছুটে গিয়েছিল ঐগুলোর কাযা করতে হবে না, মাফ হয়ে গেল। তবে পবিত্র হওয়ার পর রোযার কাযা আবশ্যক। হায়েয ও নিফাস অবস্থায় যিক্‌র, দুরূদ, দুআ ও কুরআন শরীফে যে দুআ আছে এগুলো পড়া যায়। স্বামী-স্ত্রী একত্রে উঠা-বসা ও খানা-পিনা করতে পারে, তবে যৌন তৃপ্তি মেটাতে পারে না, শরীয়ত মতে তা হারাম, হেকিমী মতেও এমন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

ইস্তিহাযা কাকে বলে ঃ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হায়েয ও নিফাসের নির্দিষ্ট সময় থেকে কম অথবা বেশী সময়ের পর স্ত্রী-লোকের যৌনাঙ্গ থেকে যে রক্তস্রাব হয় তাকে ইস্তিহাযা বলে। এই রক্ত এরূপ যেমন নাক অথবা দাঁত দিয়ে রক্ত পড়া। রোগের কারণেই সাধারণত এরূপ হয়ে থাকে।

ইস্তেহাযার হুকুম ঃ

১. ইস্তিহাযা অবস্থায় নামায ত্যাগ করা যাবে না। তবে প্রত্যেক নামাযে নতুন করে উযূ করতে হবে। এক উযূ দ্বারা কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করতে পারবে না। অবশ্য কয়েক ওয়াক্তের কাযা নামায এক উযূ দ্বারা আদায় করা যাবে।

২. গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব দেখা দিলে ইস্তিহাযা হিসেবেই ধরে নিতে হবে। এতে নামায ছাড়া যাবে না।

পবিত্রতার সময়সীমা ও কিছু মাসায়েল ঃ

১. দু'হায়েযের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে কমপক্ষে পনের দিন পবিত্র থাকার সময়। অতিরিক্ত কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট নেই। কোন স্ত্রীলোকের তিন দিনের কম এক অথবা দু'দিন রক্তস্রাব হলে পুনরায় এক অথবা দু'দিন পাক থাকার পর আবারও যদি রক্তস্রাব দেখা দেয়, সবগুলোকে হায়েয ধরে নিতে হবে। যদি এসব গুলো হায়েযের সময়সীমা- দশ দিনের মধ্যে থাকে।

২. এক অথবা দু'দিন রক্তস্রাব দেখা দেয়ার পর পুনরায় পনের দিনের কম অর্থাৎ দশ বার দিন রক্তস্রাব বন্ধ রইল আবার রক্তস্রাব দেখা দিল, এমতাবস্থায় যত দিন অভ্যাস হবে ততদিন হায়েয গণনা করা হবে, অবশিষ্ট দিনগুলো ইস্তিহাযা হিসেবে ধরে নিতে হবে।

৩. যদি কোন স্ত্রীলোকের ধারাবাহিকভাবে পনের দিন রক্তস্রাব থাকে, তন্মধ্যে দশ দিন হায়েয গণনা করে অবশিষ্ট দিনগুলোতে গোসল ও উযূ করে নামায পড়তে হবে।

বিঃ দ্রঃ স্ত্রী লোকের জরায়ু প্রবাহনের ফলে যে রস নির্গত হয়, এতে গোসল করা আবশ্যক হয় না। তবে এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক নামাযের সময় নতুন উযূ করে নামায আদায় করে নিবে এবং উযূর পূর্বে ধৌত করে নিবে।

মোজায় মসেহ করার বয়ান

উযূ করার সময় মোজা পরিহিত থাকলে মোজা খুলে পা না ধুয়ে মোজার উপর মসেহ করে নিলেও চলে, তবে তার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে।

মোজায় মসেহের শর্তসমূহ ঃ

১. পা ধোয়ার পর মোজা পরিধান করবে। চাই পূর্ণ উযূ করার পর শেষে পা ধুয়ে মোজা পরিধান করুক কিম্বা আগেই পা ধুয়ে মোজা পরিধান করে তারপর উযূ ভঙ্গকারী কিছু ঘটার পূর্বেই উযূ পূর্ণ করে নেয়া হোক।

২. মোজা পায়ের টাখনু গিরা ঢাকা হতে হবে।

৩. মোজা এমন হতে হবে যা পরিধান করে উপর্যুপরি অন্ততঃ তিনমাইল পথ চলা যায়।

৪. একটি মোজায় পায়ের ছোট আঙ্গুলের তিন আঙ্গুল পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী ফাঁটা ছেড়া থাকতে পারবে না, চলার সময় এ পরিমাণ খুললেও চলবে না।

৫. মোজা এমন হতে হবে যা বাঁধা ছাড়াই পায়ের উপর আটকে থাকে।

৬. মোজা এমন হতে হবে যার ভিতর দিয়ে পানি ভেদ করে শরীরে লাগে না।

৭. কমপক্ষে হাতের ছোট আঙ্গুলের তিন আঙ্গুল পরিমাণ পায়ের অগ্রভাগ থাকতে হবে। অতএব কোন এক পা টাখনু গিরার উপর থেকে কাটা গেলে আর অপর পা ঠিক থাকলে সে অবস্থায় মোজায় মসেহ করা জায়েয হবে না।

৮. গোসল ফরয হলে মোজায় মসেহ করা জায়েয নয় বরং তখন মোজা খুলে পা ধৌত করতে হবে।

কোন্ ধরনের মোজায় মসেহ করা জায়েয ঃ

চামড়া, পশম, কাতান প্রভৃতির এমন পায়ের মোটা মোজা, যা অন্ততঃ পায়ের টাখনু গিরা ঢাকা হবে এবং বাঁধা ছাড়াই পায়ের উপর খাড়া থাকতে পারে এমন হবে, যা পায়ে দিয়ে অন্ততঃ তিন মাইল হাটা যাবে তাতে ফাটবে না এবং যা ভেদ করে পানি ভিতরে ঢুকবে না এবং যা দিয়ে পায়ের চামড়া দেখা যাবে না– এমন মোজার উপর মসেহ করা জায়েয। হাত মোজার উপর মসেহ করা জায়েয নয়।

মেজায় কত দিন মসেহ করা জায়েয ঃ

* শর'য়ী সফরের অবস্থায় তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত এবং এরূপ সফর না হলে এক দিন এক রাত পর্যন্ত মসেহ করা যায়। যে উযূ করে মোজা পরিধান করা হবে সে উযূ ভঙ্গ হওয়ার সময় থেকে এই তিন দিন তিন রাত ও এক দিন এক রাতের হিসাব ধরা হবে।

* বাড়িতে থাকা অবস্থায় মসেহ শুরু হয়েছিল এবং একদিন এক রাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সফর আরম্ভ হয়েছে, তাহলে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মসেহ করতে পারবে।

* পক্ষান্তরে সফরে থাকা অবস্থায় মসেহ শুরু করা হয়েছিল তারপর একদিন এক রাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বাড়িতে চলে এসেছে তাহলে এক দিন এক রাত হওয়ার পর আর বেশী মসেহ করতে পারবে না।

মোজায় মসেহের তরীকা ঃ

উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো পানিতে ভিজিয়ে উভয় পায়ের পাতার অগ্রভাগে রাখবে, যেন সম্পূর্ণ মোজার উপর আঙ্গুলগুলোর চাপ পড়ে। অতঃপর হাতের পাতা শূণ্য রেখে এবং আঙ্গুলগুলোর মাঝে সামান্য ফাঁক রেখে ক্রমশঃ আঙ্গুল গুলো টেনে পায়ের টাখনার দিকে আনবে। পুরো হাতের পাতা সহ মোজার উপর রেখে টেনে আনলেও দুরস্ত আছে।

যেসব কারণে মোজায় মসেহ ভঙ্গ হয়ে যায় ঃ

১. যে যে কারণে উযূ ভেঙ্গে যায় তাতে মসেহও ভেঙ্গে যায়।

২. উভয় মোজা বা একটি মোজা খুললেও মসেহ ভেঙ্গে যায়। এরূপ অবস্থায় উযূ থাকলে শুধু পা ধুয়ে আবার মোজা পরিধান করে নিলেই চলে, পুরো উযূ দোহরানোর প্রয়োজন হয় না।

৩. মসেহের মেয়াদ–তিন দিন তিন রাত বা এক দিন এক রাত পূর্ণ হয়ে গেলেও মসেহ ভেঙ্গে যায়। এরূপ ক্ষেত্রেও উযূ থাকলে শুধু পা ধুয়ে নিবে।

৪. মোজার ভিতর পানি ঢুকে সম্পূর্ণ পা বা পায়ের অর্ধেকের বেশী ভিজে গেলে। এ ক্ষেত্রেও উযূ থাকলে শুধু পা ধুয়ে নিবে।

৫. মাযুর ব্যক্তি যদি মসেহ করে, তাহলে ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর যেমন তার উযূ ভেঙ্গে যায় তদ্রূপ তার মসেহও ভেঙ্গে যাবে। তবে উযূ করার সময় এবং মোজা পরিধান করার সময় ওযর না থাকলে অন্যান্য সুস্থ লোকের ন্যায় সেও মসেহ করতে পারবে।

(ماخوذ از نور الایضاح - بہشتی زیور - والفقہ علی المذاہب الاربعۃ)

আযান ইকামতের মাসায়েল

* সমস্ত ফরযে আইন নামাযের জন্য পুরুষদের একবার আযান দেয়া সুন্নাতে মোআক্কাদায়ে কিফায়া। শুধুমাত্র জুমুআর জন্য দুই বার আযান দেয়া আবশ্যক।

* জেহাদ ইত্যাদি ধর্মীয় কাজে লিপ্ত থাকার দরুন বা গায়রে এখতিয়ারী (অনিচ্ছাকৃত) কোন কারণবশতঃ সর্বসাধারণের নামায কাযা হয়ে থাকলে সে নামাযের জন্যও উচ্চস্বরে আযান ইকামত বলা সুন্নাত।

* অলসতা বা বে-খেয়ালি বশতঃ নামায কাযা হয়ে থাকলে সে নামায যেহেতু চুপে চুপে পড়া উচিৎ, তাই তার জন্য আযান ইকামত উচ্চস্বরে নয় বরং চুপে চুপে বলতে হবে, যাতে অন্য লোকেরা নামায কাযা করার মত একটি গোনাহের কথা জানতে না পারে।

* কয়েক ওয়াক্তের নামায এক সঙ্গে কাযা করলে প্রথম ওয়াক্তের জন্য আযান দেয়া সুন্নাত আর বাকী ওয়াক্তগুলোর জন্য পৃথক পৃথক আযান দেয়া সুন্নাত নয় বরং মোস্তাহাব। তবে ইকামত সব ওয়াক্তের জন্যই পৃথক পৃথক সুন্নাত।

* সফর অবস্থায় কাফেলার সমস্ত লোক উপস্থিত থাকলে তাদের জন্য আযান দেয়া মোস্তাহাব, সুন্নাতে মোয়াক্কাদা নয়। তবে ইকামত সকলে উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় সুন্নাত।

* বাড়ীতে, দোকানে, মাঠে বা বিলে একাকী বা জামাআতে নামায পড়লে আযান দেয়া মোস্তাহাব এবং ইকামত দেয়া সুন্নাত।

* স্ত্রী লোকের আযান ইকামত বলা মাকরূহ।

(বেহেশতি জেওর থেকে গৃহীত)

আযানের শর্ত সমূহ

১. ওয়াক্ত হওয়ার পর আযান দিতে হবে-ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দিলে সে আযান সহীহ হবে না, ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনরায় আযান দিতে হবে।

২. আযান আরবী ভাষায় এবং যে সব শব্দে রাসূল (সঃ) থেকে শ্রুত ও বর্ণিত হয়েছে সেভাবে হতে হবে।

৩. আযানের শব্দ সমূহ দীর্ঘ বিরতি ব্যতীত একটি শেষ হওয়ার পর পরই অন্যটি বলতে হবে। একটির পর আর একটি বলার মাঝে এতটুকু বিরতি থাকবে যাতে শ্রোতা জওয়াব দিতে পারে।

৪. আযানের শব্দাবলী সহীহ তারতীবে আদায় করতে হবে। তারতীবের খেলাফ হলে আযান মাকরূহ হবে, সে আযান দোহরাতে হবে।

আযান ইকামতের সুন্নাত ও মোস্তাহাব সমূহ

১. মুআযযিনের ছোট-বড় সব নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া।

২. মুআযযিনের সজ্ঞান বালেগ হওয়া। বুঝমান বালক হলেও চলে, তবে মাকরূহ তানযীহী। আর পাগল বা অবুঝ বালক আযান দিলে সে আযান দোহরাতে হবে।

৩. তার আওয়াজ আকর্ষণীয় ও উচ্চ হওয়া।

৪. মুআযযিনের দ্বীনদার পরহেযগার হওয়া।

৫. মসজিদের বাইরে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া এবং ইকামত মসজিদের ভিতরে দেয়া। মসজিদের ভিতর আযান দেয়া মাকরূহ তানযীহী।[১] জুমুআর দ্বিতীয় আযানের হুকুম ভিন্ন–সেটা মসজিদের ভিতরেই হবে।

৬. কোন ওযর না থাকলে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া।

৭. কেবলা মুখী হয়ে আযান ইকামত দেয়া। তবে গাড়ি বা যান-বাহনে আযান দেয়ার সময় কেবলা মুখী না হলেও সুন্নাতের পরিপন্থী হবে না।

৮. আযান দেয়ার সময় দুই শাহাদাত আঙ্গুল দুই কানের ছিদ্রে প্রবেশ করানো মোস্তাহাব। কানের উপর হাত রেখে ছিদ্র বন্ধ করলেও চলে। ইকামতের মধ্যে কানে আঙ্গুল দেয়া জায়েয তবে সুন্নাত নয়।

৯. আযান ইকামত উভয়টিতে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةْ বলার সময় ডান দিকে মুখ ফিরানো এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ বলার সময় বাম দিকে মুখ ফিরানো সুন্নাত। সীনা বা পাঁ ঘুরবে না। মাইকে আযান ইকামত দিলেও এটা করা সুন্নাত। (احسن الفتاوى ج/٢)

১০. আযানের শব্দগুলো টেনে টেনে এবং থেমে থেমে বলা সুন্নাত আর ইকামতের শব্দগুলো জলদী জলদী বলা সুন্নাত।

১১. বিনা প্রয়োজনে এদিক ওদিক না দাঁড়িয়ে বরং ইমামের বরাবর পেছনে দাঁড়িয়ে ইকামত বলা উত্তম।

(بهشتى زيور شامى - الفقه على المذاهب الاربعة - احسن الفتاوى প্রভৃতি থেকে গৃহীত)

আযান ও ইকামতের মাঝে সময়ের ব্যবধান কতটুকু হবে ঃ

* সুন্নাত হচ্ছে আযান ও ইকামতের মাঝে এতটুকু সময়ের ব্যবধান করা, যাতে নিয়মিতভাবে যে সব মুসল্লী জামাআতে শরীক হয়ে থাকে তারা যেন জামাআতে শরীক হওয়ার জন্য মসজিদে এসে পৌঁছতে পারে।

* মাগরিবের নামাযের আযান ও ইকামতের মাঝে ছোট তিন আয়াত তিলাওয়াত পরিমাণ সময়ের ব্যবধান রাখতে বলা হয়েছে। (رد المحتار والعالمغيرية)

---

১. মসজিদের বাইরে এবং উঁচু স্থানে আযান দেয়ার উদ্দেশ্য হল আওয়াজ ছড়িয়ে দেয়া। বর্তমানে মাইকে আযান দেয়ার ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে এবং মসজিদের মধ্যে থেকেই সাধারণতঃ মাইকে আযান দেয়া হয়। যেহেতু মাইকে আযান দিলে আওয়াজ এমনিতেই দূরে পৌঁছে যায় এবং বাইরে উঁচু স্থানে আযান দেয়ার যে উদ্দেশ্য তা হাছিল হয়ে যায়– এ প্রেক্ষিতে মসজিদের ভিতরে থেকে আযান দিলে মাকরূহ হবে না বলে মনে হয়। তবে মসজিদের ভিতর এত জোরে আওয়াজ করাটা খেলাফে আদব মনে হয়, তাই সম্ভব হলে মসজিদের বাইরে থেকেই মাইকে আযানের ব্যবস্থা করা উত্তম। (احسن الفتاوى ج/٢)

আযান ও ইকামতের শব্দ সমূহ আদায় করার নিয়ম

শব্দ সমূহ	আদায় করার নিয়মাবলী
اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرْ আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرْ আল্লাহ সর্ব মহান, আল্লাহ সর্ব মহান।	'আল্লাহ' ও 'আকবার' শব্দের শুরুতে যে হামযাহ (আলীফ) রয়েছে, তা শক্তির সাথে শক্তভাবে আদায় হবে। আল্লাহ শব্দের 'লাম' প্রথমেই খুব মোটা করে পড়তে হবে। লামের উপর যে আলিফ রয়েছে তাতে মদ্দে তবায়ী مد طبعى হবে, এতে শুধুমাত্র এক আলিফ পরিমাণ টানতে হবে, 'হা'-র পেশ খুব স্পষ্ট অথচ পাতলা হবে, এবং واومده এর আভায দিয়ে আদায় করতে হবে। 'আকবার'-এর 'রা' সাকিন অথচ মোটা করে পড়তে হবে।
اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।	'আশ্হাদু'-র শীন উচ্চারণ কালে আওয়ায মুখের ভেতর ছড়িয়ে পড়বে, لا -এর মধ্যে مد فرعى منفصل হবে, যা তিন থেকে চার আলিফ পর্যন্ত টানা যাবে, اله শব্দের প্রথম আলিফের মধ্যে যে কোন প্রকার مد (টানা) করা থেকে বিরত থাকতে হবে, الا الله -র' মধ্যে আল্লাহ শব্দের লামের উপর যে আলিফ রয়েছে তাতে مد فرعى عارضى হবে, এটা পাঁচ আলিফ পর্যন্ত টানা জায়েয আছে। এর অতিরিক্ত টানা থেকে বিরত থাকতে হবে।
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।	ان শব্দের নূন, এবং محمد শব্দের তাশদীদ যুক্ত মীমের মধ্যে এক আলিফের অতিরিক্ত গুন্নাহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সীনের মধ্যে مد طبعى কাজেই এক আলিফের অতিরিক্ত টানা যাবে না। رسول শব্দের 'রা' মোটা হবে। الله শব্দের হুকুম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, (অর্থাৎ পাঁচ আলিফ পরিমাণ লম্বা করা যাবে)

শব্দ সমূহ	আদায় করার নিয়মাবলী
حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةْ নামাযের জন্য এসো। حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةْ নামাযের জন্য এসো	حي শব্দের তাশদীদ আদায় করার সময় দুই আলিফ পরিমাণ সময় বিলম্ব করতে হবে। অবশ্য 'ইয়া'-র যবর তাড়াতাড়ি আদায় করতে হবে, এর উপর যেন আওয়ায আটকে না যায়। الصلوة এর صادকে খুব মোটা করে পড়তে হবে। صلوةএর মধ্যে مد عا رضى -এর হুকুম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ পাঁচ আলিফ পরিমাণ লম্বা করা যাবে।
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ কল্যাণের জন্য এসো। حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ কল্যাণের জন্য এসো।	حي শব্দ কিভাবে আদায় করতে হবে, এবং فلاح শব্দের 'লামের' مد عا رضى-র হুকুম কি ? তা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمْ ঘুমের চাইতে নামায উত্তম। اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمْ ঘুমের চাইতে নামায উত্তম।	الصلوة শব্দের লামের পরে যে আলিফ আছে এতে مد طبعى হবে। কাজেই আলিফকে অতিরিক্ত লম্বা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। النوم -এর মধ্যে مد لين এতে قصر করা উত্তম, মদ করাও জায়িয আছে, যা সর্বোচ্চ পাঁচ আলিফ পরিমাণ লম্বা করা যায়।
اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرْ আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ	এর হুকুম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهْ আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই।	এর হুকুম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
(একামতের শব্দ) قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةْ নামায প্রস্তুত قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةْ নামায প্রস্তুত	قامت শব্দের কাফের পরে যে আলিফ আছে তাতে مد طبعى হবে অর্থাৎ এক আলিফ পরিমাণ লম্বা হবে। আর الصلوة শব্দের লামে মদ্দে আর্যী হবে। তবে ইকামতে জলদী জলদী করা উদ্দেশ্য, তাই অল্প টানতে হবে।

("আযান ইকামাতের ফাযায়েল মাসায়েল ও তাজবীদ" গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

আযান বলার সুন্নাত তরীকা

اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ দুই তাকবীর এক সাথে এক শ্বাসে বলা, উভয় اكبر শব্দের রা-তে সাকিন সহকারে- পেশ সহকারে মিলিয়ে নয়। অর্থাৎ, আল্লাহু আকবারুল্লাহু আকবার-বলবেনা, বরং রা-তে সাকিন পড়বে। রা-তে যবরও পড়া যায়।

اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ উপরোক্ত নিয়ম। শেষের اَللّٰهُ اَكْبَرْ ও এই নিয়মে।

অবশিষ্ট প্রত্যেকটা বাক্য এক এক শ্বাসে বলা এবং প্রত্যেকটা বাক্যের শেষে সাকিন করা ও থামা। (احسن الفتاوى ج/ ٢)

ইকামত বলার সুন্নাত তরীকা

শব্দ সমূহ	আদায় করার নিয়মাবলী
اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ	এই চার তাকবীর এক শ্বাসে এবং প্রত্যেকটা রা-তে সাকিন সহকারে বলা।
اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهْ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهْ	এই দুই বাক্য এক শ্বাসে এবং الله শব্দের হা-তে সাকিন সহকারে।
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهْ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهْ	উপরোক্ত নিয়ম।
حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةْ ـ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةْ	দুই বাক্য এক শ্বাসে এবং صلوة শব্দের ة-তে সাকিন সহকারে অর্থাৎ, হা সাকিন সহকারে।
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ ـ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ	দুই বাক্য এক সাথে এক শ্বাসে এবং হা-তে সাকিন সহকারে।
قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةْ ـ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةْ	দুই বাক্য এক শ্বাসে এবং صلوة শব্দের তা-তে সাকিন সহকারে অর্থাৎ, হা-সাকিন উচ্চারণ সহকারে।
اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهْ	এই দুই তাকবীর এবং লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এক শ্বাসে এবং উভয় اكبر-এর রা-ও শেষ الله শব্দের হা-সাকিন সহকারে।

(احسن الفتاوى ج/ ٢ থেকে গৃহীত)

আযানের ভুল সমূহ

(আযানের মধ্যে প্রচলিত ভুল সমূহ)

১. آللّٰهُ কে اَللّٰهُ (মদ করে) পড়া, অর্থাৎ, আল্লাহ শব্দের শুরুতে যে হামযাহ্ আছে; তা টেনে পড়া।

২. আল্লাহ (اَللّٰهُ) শব্দের লামকে এক আলিফের চেয়ে অতিরিক্ত টানা।

৩. আল্লাহ (اَللّٰهُ) শব্দের হা'র পেশ কে মাজহুল পড়া অর্থাৎ,আল্লাহো-পড়া।

৪. اَكْبَرُ কে آكْبَرُ (মদ করে) পড়া। অর্থাৎ, আকবারের শুরুতে যে হামযাহ্ আছে তা লম্বা করা।

৫. اَكْبَرْ কে اَكْبَارْ পড়া অর্থাৎ, বা'র পরে আলিফ বৃদ্ধি করা।

৬. اَكْبَرْ কে اَكْبَرُ পড়া অর্থাৎ, রা'র উপর পেশ বৃদ্ধি করা।

৭. اَكْبَرْ শব্দের রা' মোটা না করা।

৮. اَشْهَدُ কে اَشْهَدُ পড়া। (শুরুতে আলিফ বৃদ্ধি করা।)

৯. اَشْهَدُ শব্দের দালের পেশকে মাজহুল অর্থাৎ, আশহাদো পড়া।

১০. اَنْ এর নুনকে لَا এর লামের সাথে না মিলানো।

১১. لَا কে চার আলিফের চেয়ে বেশী লম্বা করা।

১২. اِلٰهَ শব্দের লামের খাড়া যবর (আলিফ)-কে এক আলিফের চেয়ে বেশী লম্বা করা।

১৩. اِلَّا اللّٰهُ শব্দের মধ্যে اَللّٰهُ -র আলিফকে পাঁচ আলিফের চেয়ে লম্বা করা।

১৪. مُحَمَّدًا এর তানবীন (দুই যবর) কে رَسُـــوْلُ اللّٰهِ ব্যাক্যের রা'র মধ্যে না মিলানো।

১৫. رَسُوْل শব্দের ওয়াও-কে এক আলিফের চেয়ে বেশী লম্বা করা।

১৬. رَسُـــوْلُ اللّٰهِ ব্যাক্যের মধ্যে الله শব্দের আলিফ কে পাঁচ আলিফের চেয়ে অতিরিক্ত লম্বা করা।

১৭. حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةْ কে حَيَّ لَا الصَّلٰوةْ পড়া (অর্থাৎ عَلٰى কে لَا পড়া।)

১৮. অথবা حَيَّ اَلَا الصَّلٰوةْ পড়া। (অর্থাৎ عَلٰى কে اَلَا পড়া।)

১৯. حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةْ-র মধ্যে اَلصَّلٰوةْ কে পাঁচ আলিফের অতিরিক্ত টানা।

২০. اَلصَّلٰوةْ শব্দের শেষে 'হা' কে (অর্থাৎ গোল'তা' কে যা ওয়াক্ফ অবস্থায় 'হা' হয়ে যায়) ফেলে দেয়া।

২১. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ কে حَيَّ لَا الْفَلَاحْ পড়া। (অর্থাৎ, عَلٰى কে لَا পড়া।)

২২. অথবা حَيَّ اَلَا الْفَلَاحْ পড়া (عَلٰى কে اَلَا পড়া।)

২৩. اَلْفَلَاحُ এর আলিফ কে পাঁচ আলিফের অতিরিক্ত টানা।
২৪. اَلْفَلَاحُ শব্দের শেষে 'হা' ফেলে দেয়া।
২৫. اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمُ এর মধ্যে الصلوة শব্দের লাম-কে এক আলিফের চেয়ে বেশী টানা।
২৬. اَلصَّلٰوةُ শব্দের 'তা'র পেশকে মাজহুল পড়া অর্থাৎ, আসলালাতো পড়া।
২৭. اَلصَّلٰوةُ শব্দের 'তা' লম্বা করা।
২৮. خَيْرٌ শব্দের 'ইয়া' কে মাজহুল অর্থাৎ, ও এর ন্যায় পড়া।
২৯. خَيْرٌ শব্দের 'রা' কে মোটা না করা।
৩০. اَلنَّوْمُ শব্দের واو কে পাঁচ আলিফের চেয়ে বেশী লম্বা করা।
৩১. اَلنَّوْمُ শব্দের واو কে মাজহুল পড়া অর্থাৎ, নাওম পড়া বরং পড়তে হবে নাঊম।
৩২. تَرَسُّلُ তারাচ্ছুল না করা। অর্থাৎ, দুই ব্যাক্যের মাঝে জওয়াব দেওয়ার পরিমাণ সময় না থামা। (আযান, ইকামাতের ফাযায়েল ও মাসায়েল-গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

ইকামতের ভুল সমূহ

১. اَكْبَرْ কে اَكْبَرُ পড়া, অর্থাৎ, আকবার শব্দের 'রা' -এর মধ্যে পেশ দেয়া।
২. اِلَّا اللّٰهْ কে اِلَّا اللّٰهُ পড়া। অর্থাৎ 'হা' কে পেশ দেয়া।
৩. رَسُوْلُ اللّٰهْ কে رَسُوْلُ اللّٰهِ পড়া। অর্থাৎ 'হা'-র মধ্যে যের দেয়া।
৪. حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةْ কে حَيَّ لَا الصَّلٰوةِ পড়া। অর্থাৎ عَلٰى কে لَا পড়া।
৫. اَلصَّلٰوةْ কে اَلصَّلٰوةِ পড়া। অর্থাৎ, 'তা' কে যের দেয়া।
৬. حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةْ কে حَيَّ اَلَا الصَّلٰوةْ পড়া। অর্থাৎ عَلٰى কে পড়া اَلَا পড়া।
৭. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ কে حَيَّ لَا اَلْفَلَاحْ পড়া। অর্থাৎ عَلٰى কে لَا পড়া।
৮. اَلْفَلَاحْ কে اَلْفَلَاحِ পড়া।। অর্থাৎ 'হা' কে যের দিয়ে পড়া।
৯. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ কে حَيَّ اَلَا الْفَلَاحْ পড়া। অর্থাৎ عَلٰى কে اَلَا পড়া।
১০. قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةْ কে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ পড়া। অর্থাৎ اَلصَّلٰوةْ এর 'তা' কে পেশ দিয়ে পড়া।
১১. প্রত্যেক শব্দে থামা।

বিঃ দ্রঃ আযান ও ইকামতের শব্দ সমূহকে মিলিয়ে (وصل) পড়তে হবে; কিন্তু শেষ অক্ষরে কোন হরকত প্রকাশ করা যাবে না। সব বাক্যের শেষ শব্দেই শেষে সাকিন তথা জযম হবে। (কানজুল উম্মা'লঃ ১ম খন্ড, পৃঃ ১৫১),
(আযান ইকামাতের ফাযায়েল ও মাসায়েল গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

আযান ও ইকামতের জওয়াব প্রসঙ্গ

* আযান ও ইকামতের জওয়াব দেয়া মুস্তাহাব। নারী পুরুষ সকলের জন্যই আযানের জওয়াব দেয়া মুস্তাহাব। যে মসজিদের মধ্যে রয়েছে তার জন্যও মুখে জওয়াব দেয়া মুস্তাহাব। পাক নাপাক সকলেরই জন্য আযানের জওয়াব দেয়া মুস্তাহাব। অবশ্য ঋতুবতী মহিলা ও নেফাসওয়ালী মহিলার জন্য আযানের জওয়াব দেয়ার হুকুম নেই।

* যে ব্যক্তি মসজিদের বাইরে রয়েছে তার জন্য ইজাবাত বিল্লিছান অর্থাৎ, মৌখিক জওয়াব (যে সম্পর্কে পূর্বে বলা হল) ছাড়াও ইজাবাত বিলকদম অর্থাৎ, মসজিদে জামাআতের জন্য গমন-এর মাধ্যমে জওয়াব দেয়া জরুরী। তবে অপারগতার ক্ষেত্রে শুধু মুখে জওয়াব দেয়াই যথেষ্ট হবে।

* কয়েক স্থানের আযান শোনা গেলে সর্বপ্রথম যে আযান শোনা যায় (নিজের মহল্লার হোক বা ভিন্ন মহল্লার) তার জওয়াব দিলেই যথেষ্ট। তবে সবটার জওয়াব দিতে পারলে ভাল।

* জুমুআর ছানী (দ্বিতীয়) আযানের জওয়াব দিতে হয় না, তবে মনে মনে মুখে উচ্চারণ ব্যতীত দেয়া যায়। (فتاوی دار العلوم)

* যদি কেউ আযানের জওয়াব না দিয়ে থাকেন এবং বেশীক্ষণ অতিবাহিত না হয়ে থাকে, তাহলে তখন জওয়াব দিবে।

* উযূ অবস্থায় আযান হলে উযূও করতে থাকবে আযানের জওয়াবও দিতে থাকবে। (فتاوی محمودیة ج/٢)

যে সব অবস্থায় আযানের জওয়াব দেয়া উচিৎ নয়ঃ

১. নামাযের অবস্থায়।

২. খুতবার সময়; জুমুআর খুতবা হোক বা বিবাহের খুতবা।

৩. হায়েয অবস্থায়।

৪. নেফাসের অবস্থায়।

৫. দ্বীনি ইল্‌ম বা শরীয়তের মাসআলা-মাসায়েল শিখবার বা শিক্ষা দেয়ার সময়। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াতের সময় আযান হলে তিলাওয়াত বন্ধ করে তার জওয়াব দেয়া উত্তম বলা হয়েছে। (فتاوی محمودیة ج/٢)

৬. স্ত্রী-সহবাস কালে।

৭. পেশাব-পায়খানার সময়।

৮. খানা খাওয়ার সময়।

আযান ও ইকামতের কোন্ বাক্যের কি জওয়াব হবে তার একটা নকশা পেশ করা হলঃ

আযান ও ইকামতের শব্দসমূহ এবং তার জওয়াবের শব্দসমূহ

আযান ও ইকামতের শব্দসমূহ	আযান ও ইকামতের উত্তরের শব্দসমূহ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ	اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (শুধু ইকামতের শব্দ)	اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا
اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (শুধু ফজরের আযানের শব্দ)	صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ	اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

* আযানের বাক্য গুলোর জওয়াব দেয়ার পর (আযান শেষ হওয়ার পর) দুরূদ শরীফ পড়বে। তারপর নিম্নোক্ত দুআ পড়া মোস্তাহাব–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۔

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহবান ও অনুষ্ঠিতব্য নামাযের রব, তুমি মুহাম্মাদ (সঃ) কে দান কর ওছীলা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁকে পৌঁছাও মাকামে মাহমূদে (প্রশংসনীয় স্থানে) যার ওয়াদা তুমি তাঁর সাথে করেছ, নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করনা।

* তারপর পড়বে-

وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۔ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلًا ۔

অর্থ ঃ আর আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক– তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি সন্তুষ্ট আল্লাহর প্রতি রব হিসেবে, ইসলামের প্রতি দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের প্রতি রাসূল হিসেবে।

* উপরোল্লিখিত দুআ (আযান পরবর্তী দুআ) পড়ার সময় হাত উঠানোর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। (احسن الفتاوى ج/٢)

আযানের সময়কার বিশেষ কয়েকটি আমল

* আযানের সময় (বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে) কথা-বার্তা না বলাই উত্তম। চুপ থাকাই মোস্তাহাব। (احسن الفتاوى ج/٢)

* আযান শুরু হওয়ার পর ইস্তেন্‌জায় লিপ্ত হবে না বা ইস্তেন্‌যাখানায় প্রবেশ করবে না। তবে নামাযের জামাআত ভঙ্গ হওয়ার আশংকা বা বিশেষ কোন ওযর দেখা দিলে ভিন্ন কথা। (فتاوى دار العلوم)

মসজিদে যাওয়ার সুন্নাত ও আদব সমূহ

১. শরীর পবিত্র করে নিবে।

২. কাপড় পবিত্র করে নিবে।

৩. ঘর থেকে উযূ করে মসজিদে যাবে, মসজিদে যেয়ে উযূ করার চেয়ে ঘর থেকে উযূ করে যাওয়া উত্তম।

৪. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বিসমিল্লাহ ও বের হওয়ার দুআ পড়বে। বিসমিল্লাহ সহ দুআটি এই ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থ ঃ আল্লাহর নাম নিয়ে বের হলাম। আল্লাহর উপর ভরসা, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি লাভ হয় না।

৫. ধীরস্থির ভাবে চলবে।

৬. গাম্ভীর্যের সাথে চলবে।

৭. চলার পথে হাসি-তামাশা, ক্রিড়া-কৌতুক ও অহেতুক কাজ থেকে বিরত থাকবে।

৮. চলতে চলতে এই দুআ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَّمِنْ اَمَامِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَّمِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ نُوْرًا ـ (كتاب الاذكار بحواله مسلم)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি দান কর আমার অন্তরে নূর এবং জবানে নূর। দান কর আমার শ্রবণ শক্তিভে নূর, দান কর আমার দৃষ্টিশক্তিতে নূর, দান কর আমার পশ্চাতে নূর এবং আমার সম্মুখে নূর, দান কর আমার উপরে নূর এবং আমার নীচে নূর। হে আল্লাহ, তুমি দান কর আমাকে নূর।

৯. প্রত্যেকটা কদমে কদমে ছওয়াব হবে-এই বিশ্বাস ও আশা মনে বদ্ধমূল রেখে পথ চলবে।

১০. পথ চলার অন্যান্য আমল পালন করবে। (সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা নং ৪৩৯)

১১. মসজিদ নজরে আসলে এই দুআ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَخَطَائِىْ وَعَمَدِىْ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি আমার ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত সকল গোনাহ খাতা মাপ করে দাও।

মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত ও আদব সমূহ

১. নত চোখে, ভীত মনে মসজিদে প্রবেশ করবে।
২. মসজিদে প্রবেশের পূর্বে জুতা খুলে নিবে। জুতা ভিতরে নিতে হলে ঝেড়ে পরিষ্কার পূর্বক নিবে।
৩. প্রথমে বাম পায়ের জুতা তারপর ডান পায়ের জুতা খুলবে।
৪. প্রবেশের পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়বে।
৫. দুরূদ ও সালাম পড়বে।
৬. দুআ পড়বে।

এই তিনটাকে একত্রে এভাবে পড়া যায়–

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমার সমস্ত গোনাহ মাফ কর এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও।

৭. প্রবেশ কালে এই দুআও পড়বে–

رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلاً مُبَارَكًا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ - (الفتاوى الظهيرية)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি কল্যাণকরভাবে আমাকে অবতরণ করাও, তুমি শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।

মসজিদের ভিতরের সুন্নাত ও আদব সমূহ

১. মসজিদে প্রবেশ করতঃ (নফল) এ'তেকাফের নিয়ত করবে।
২. শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার নিম্নোক্ত দুআ পড়বে ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - (كتاب الاذكار)

৩. যে বা যারা নামাযে রত নয় তাদেরকে এমনভাবে সালাম দিবে যেন নামাযে রত লোকের নামাযে ব্যাঘাত না ঘটে।
৪. মসজিদে কেউ না থাকলে বা অবসর কেউ না থাকলে এই বলে (আস্তে) সালাম দিবে ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ - (معارف القرآن)

৫. হারাম এবং মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে মসজিদে প্রবেশ পূর্বক দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ/ দুখূলুল মসজিদ নামায পড়বে। এই নামায বসার পূর্বেই পড়া উত্তম। এই নামায না পড়তে পারলে দুরূদ শরীফ পড়বে এবং নিম্নোক্ত দুআটি চার বার পাঠ করবে ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

(كتاب الاذكار وتنبيه الغافلين)

৬. উপরোক্ত যিকির সহ অন্যান্য যিকির বেশী বেশী করা উত্তম।

৭. মোনাছেব মত নেক কাজের কথা বলবে এবং গুনাহের কাজ দেখলে বাঁধা দিবে। এ দায়িত্ব মসজিদের বাইরেও রয়েছে তবে মসজিদে থাকাকালীন এর গুরুত্ব অধিক।

৮. মসজিদে বেচা-কেনা না করা।

৯. কাউকে বেচা-কেনা করতে দেখলে বলবে ঃ

لَا اَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ ـ (ترمذى)

অর্থাৎ, আল্লাহ যেন তোমার কেনা-বেচায় লাভ না দেন।

১০. কোন হারানো বস্তু তালাশের উদ্দেশ্যে মসজিদে ঘোষণা না দেয়া।

১১. কাউকে উপরোক্ত ঘোষণা করতে শুনলে বলবে ঃ

لَا رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا ـ (مسلم)

অর্থ ঃ আল্লাহ যেন ওটা তোমার কাছে ফিরিয়ে না দেন। মসজিদতো এ উদ্দেশ্যে বানানো হয়নি।

১২. আল্লাহর যিকির ব্যতীত আওয়াজ উঁচু না করা।

১৩. কোন শোরগোল না করা।

১৪. তলোয়ার বা ভীতিমূলক কিছু উন্মুক্ত না রাখা।

১৫. মসজিদে নিজের জন্য কিছু সওয়াল করা নিষেধ এবং এরূপ সওয়ালকারীকে কিছু প্রদান করা মাকরূহ (الفقه على المذاهب الاربعة) তবে কোন হাজতমান্দ ব্যক্তির সহযোগিতার জন্য অন্য কেউ বলে দিতে পারে।

(آپکے مسائل اور ان کا حل)

১৬. মসজিদে দুনিয়াবী কথা-বার্তা না বলা। তবে কারও সাথে সাক্ষাৎ হলে সংক্ষেপে হালপুরছী করা (হাল অবস্থা জিজ্ঞাসাবাদ করা) নিষেধ নয়।

১৭. মসজিদে রাজনৈতিক মিটিং সিটিং করা মসজিদের আদব এহতেরামের খেলাপ। (فتاوى رحيميه ج/٦)

১৮. মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে না যাওয়া।

১৯. মসজিদে কোন স্থান দখল নিয়ে ঝগড়া না করা।

২০. কেউ কোন স্থান থেকে প্রয়োজনে উঠে গিয়ে থাকলে এবং আবার সেখানে আসবে বুঝতে পারলে তার স্থান দখল না করা।

২১. কাতারের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে কারও উপর চাপ সৃষ্টি না করা।

২২. নামাযে রত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করা। (নামাযীর সোজা সামনে কেউ বসা থাকলে তিনি এক দিকে সরে যেতে পারেন)

২৩. মসজিদে কফ, থুথু, শিকনি না ফেলা বা কোনভাবে ময়লা আবর্জনা কিম্বা নাপাকী না ফেলা।

২৪. মসজিদে আঙ্গুল না ফোটানো।

২৫. মসজিদে বায়ুত্যাগ না করা উত্তম, প্রয়োজন হলে বাইরে এসে বায়ু ত্যাগ করবে।

২৬. শিশু এবং পাগলদেরকে মসজিদে না আনা।[১] (الفقه على المذاهب الاربعة)

২৭. মসজিদের মধ্যে যেনা, চুরি, হত্যা ইত্যাদির হদ্দ বা শাস্তি না দেয়া।

২৮. মসজিদে কিছু কুরআন, হাদীস, ফেকাহ ইত্যাদি দ্বীনী ইলমের তালীম করা উত্তম।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত ও আদব সমূহ

১. বের হওয়ার সময় দরজার/সিড়ির কাছে এসে বাইরে অপেক্ষমান শয়তান দলের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত দুআ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهٖ - (كتاب الاذكار)

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ইবলীছ ও তার বাহিনী থেকে পানাহ চাই।

২. বিসমিল্লাহ পড়বে।

৩. দুরূদ ও সালাম পড়বে।

৪. বের হওয়ার দুআ পড়বে।

এই তিনটাকে একত্রে এভাবে পড়া যায় ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ -

---

১. যে শিশু এবং পাগল দ্বারা মসজিদ নাপাক হওয়ার প্রবল ধারণা থাকে তাদেরকে মসজিদে নেওয়া মাকরূহ তাহরীমী। এরূপ ধারণা না হলেও মাকরূহ তানযীহী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমার সমস্ত গোনাহ মাফ কর এবং আমার জন্য তোমার অনুগ্রহের (বা রিযিকের) দরজাগুলো খুলে দাও।

শেষ দুআটি اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ -ও পড়া যায়।

৫. বাম পা আগে বের করবে।

৬. তারপর ডান পা বের করবে।

৭. ডান পায়ে আগে জুতা পরবে।

৮. তারপর বাম পায়ে জুতা পরবে।

বিঃ দ্রঃ মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ৩০৪-৩০৭ পৃষ্ঠা।

দুই রাকআত নামাযের আমলসমূহ

(দুই রাকআত নামাযে যা যা করতে হয় তার ধারাবাহিক বর্ণনা।)

দাঁড়ানো ও দাঁড়ানো অবস্থার আমলসমূহ

* পবিত্র স্থানে দাঁড়ানো ফরয।
* কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো ফরয।
* পা দুটো সোজা কেবলামুখী করে রাখা সুন্নাত।
* পায়ের মাঝখানে সামনে পেছনে সমান ফাঁক রাখবে যাতে পা সোজা কেবলামুখী হয়।
* দুই পায়ের মাঝখানে হাতের মিলিত চার আঙ্গুলের মত পরিমাণ ফাঁক রাখা মোস্তাহাব। (احسن الفتاوى ج ٣)
* নামাযের নিয়ত বাঁধার পূর্ব পর্যন্ত হাত ছাড়া অবস্থায় রাখবে। (বাঁধা মাকরূহ)
* উভয় পায়ের উপর সমান ভর করে দাঁড়াবে। এক পায়ের উপর সম্পূর্ণ ভর করে দাঁড়ানো মাকরূহ। (شامى ج ١)
* তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে এই দুআ পড়ে নেয়া উত্তম ঃ

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - (هدايه ج ١)

অর্থ ঃ আমি একাগ্রতার সাথে আমার মুখমন্ডল তাঁরই দিকে ফিরাচ্ছি, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। তবে এই দুআ পড়াকে সুন্নাত মনে করলে বেদআত হয়ে যাবে।

নিয়তের আমল সমূহ

* নিয়ত করা[১] ফরয।
* নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা উত্তম।
* নিয়ত আরবীতে বলা ভাল। (বেহেশতী জেওর) আরবীতেই নিয়ত করতে হতে-এমন জরুরী মনে করা ঠিক নয়।

হাত উঠানোর আমল সমূহ

* নিয়ত বাঁধার সময় কান পর্যন্ত হাত উঠানো সুন্নাতে মোয়াক্কাদা। হাত উঠানোর সময় পুরুষগণ চাদর পরিহিত থাকলে তার মধ্য থেকে হাত বের করবে। মহিলাগণ কাপড়ের মধ্য থেকে হাত বের করবে না। মহিলাগণ সিনা পর্যন্ত হাত উঠাবেন এমনভাবে যেন আঙ্গুলের অগ্রভাগ কাঁধ পর্যন্ত উঠে। (شرح منية)
* পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্য হাতের তালু আঙ্গুলের পেটসহ কেবলামুখী রাখা (উপর দিকে নয়) সুন্নাত।
* হাতের আঙ্গুল সমূহকে মিলাবেনা বরং আঙ্গুল সমূহের মাঝে স্বাভাবিক ফাঁক থাকবে, এটাই সুন্নাত।
* পুরুষের জন্য দুই বৃদ্ধ আঙ্গুলের অগ্রভাগ কানের লতির সাথে লাগানো মোস্তাহাব।

তাকবীরে তাহরীমা বলা ও হাত নামানোর আমল সমূহ

* আল্লাহু আকবার (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলে নিয়ত বাঁধবে। এই তাকবীর ফরয। এটাকে তাকবীরে তাহরীমা বলে।
* اَللّٰهُ এবং اَكْبَرُ শব্দ দুটোর আলিফ জোর দিয়ে উচ্চারণ করা এবং ' ہ ' কে সামান্য টানের আভাস দিয়ে উচ্চারণ করা উত্তম।
* হাত উঠিয়ে কানের লতির সাথে বৃদ্ধ আঙ্গুল স্পর্শ করার পর আল্লাহু আকবার বলতে শুরু করা উত্তম। হাত উঠাতে উঠাতে বা হাত উঠানো শুরু করার পূর্বেও আল্লাহু আকবার বলে নেয়া যায়।
* হাত বাঁধা সম্পন্ন হবে, আল্লাহু আকবার বলাও শেষ হবে-এরূপ করা উত্তম।
* কান থেকে হাত সোজা বাঁধার দিকে নিয়ে যাবে, হাত সোজা নীচের দিকে ছেড়ে দিবে না বা পেছনের দিকে ঝাড়া দিবে না।
* তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় স্বাভাবিক ভাবে সোজা দাঁড়ানো থাকবে-মাথা নীচের দিকে ঝুঁকাবে না।

---

১. নিয়তের ক্ষেত্রে প্রচলিত লম্বা চওড়া বাক্য বলা নিষ্প্রয়োজনীয়। ফরযের ক্ষেত্রে শুধু কোন ওয়াক্তের ফরয তার উল্লেখ এবং সুন্নাত নফলের ক্ষেত্রে শুধু নামাযের উল্লেখ করলেই যথেষ্ট। (احسن الفتاوى ج ٣)

হাত বাঁধার আমল সমূহ

* নাভীর নীচে হাত বাঁধা সুন্নাত (নাভীর পরেও রাখা যায়।)
* ডান হাতের তালু বাম হাতের পীঠের উপর রাখবে।
* ডান হাতের বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের কবজি ধরা সুন্নাত।
* ডান হাতের অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম হাতের পিঠের উপর স্বাভাবিক ভাবে রাখা থাকবে।

(মহিলাগণ সিনার উপর ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রেখে নিয়ত বাঁধবে। এটা সুন্নাত।)

* উভয় হাত পেটের সাথে কিছুটা চেপে ধরে রাখা।
* ছানা পড়া সুন্নাত। ছানা এই ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

সূরা ফাতেহার আমল সমূহ

* আউযূ বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রজীম পড়া সুন্নাত।
* বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়া সুন্নাত।
* সুরায়ে ফাতেহা পড়া ওয়াজিব।
* সূরা ফাতেহার প্রত্যেক আয়াতে ওয়াক্‌ফ করে পড়া উত্তম।
* সূরা ফাতেহার শেষে আমীন পড়া সুন্নাত।
* আমীন আস্তে বলা সুন্নাত। (درمختار ج/١)

সূরা/কেরাত মিলানোর

* সূরা/কেরাত মিলানোর পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া মোস্তাহাব।
* তারপর সূরা/কেরাত মিলানো ওয়াজিব।
* প্রতি পরবর্তী রাকাআতের সূরা/কেরাত তারতীব অনুযায়ী পড়া অর্থাৎ, সামনের থেকে কোন সূরা/কেরাত পড়া পেছন দিক থেকে না পড়া। এই তারতীব রক্ষা করা ওয়াজেব। এর বিপরীত করলে নামায মাকরূহ হবে তবে সাজদায়ে সহো ওয়াজিব হবে না।
* অধিক সহীহ মতানুসারে কমপক্ষে এতটুকু শব্দে কেরাত পড়া যেন নিজে শব্দ শুনতে পায়। তাকবীর ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ মাসআলা প্রযোজ্য।

আমল সমূহ

* সূরা اذا زلزلت থেকে সূরা নাছ পর্যন্ত এই ছোট সূরা গুলোর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী রাকআতে যেটা পড়া হয়েছে পরবর্তী রাকআতে একটা বাদ দিয়ে তার পরেরটা পড়বে না। ফরয এবং ওয়াজিব নামাযে এরূপ করা মাকরূহ। বাদ দিয়ে পড়তে হলে কম পক্ষে দু'টি বাদ দিয়ে তার পরেরটা পড়া যাবে।
* সূরা/কেরাত শেষ করার পর একটু বিরতি যোগে দম নিয়ে রুকুতে যাওয়ার তাকবীর বলা সুন্নাত। (درس ترمذی)

রুকুতে যাওয়ার আমল সমূহ

* রুকুতে যাওয়ার সময় আল্লাহু আকবার বলা সুন্নাত।
* আল্লাহু আকবার বলে হাত রুকুতে হাটুর দিকে নিয়ে যাবে। হাত সোজা ছেড়ে দিবেনা বা পেছনের দিকে ঝাড়া দিবে না।
* রুকুর জন্য ঝোঁকার সাথে সাথে আল্লাহু আকবার বলা শুরু করবে এবং রুকুতে সোজা স্থির হওয়ার সাথে বলা শেষ হবে। এটা সুন্নাত তরীকা।

রুকুর আমল

* রুকুতে পিঠ বরাবর রাখা সুন্নাত।
* কোমর এবং মাথা এক বরাবর রাখা-কোনটা উঁচু নীচু না রাখা সুন্নাত।
* পায়ের নলা সোজা খাড়া রাখা সুন্নাত– সামনে বা পেছনে ঝুঁকাবে না।
* পাজর থেকে বাহুকে পৃথক রাখবে।
* রুকুতে উভয় হাতের আঙ্গুল সমূহ ফাঁক করে রাখা সুন্নাত।
* শক্তভাবে হাটু ধরা সুন্নাত।
* উভয় হাতের কনুই সোজা রাখবে– ভাজ করে রাখবে না। মহিলাগণ উভয় হাতের আঙ্গুল সমূহ মিলিত রেখে হাটুর উপর হাত রাখবে, হাটু ধরবে না এবং হাতের বাহু পাজরের সাথে মিলিত রেখে অল্প ঝুঁকে রুকু করবে এবং হাটু সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখবে আর পিঠ সামান্য বাঁকা রাখবে। (احسن الفتاوی ج/٣)
* রুকূতে নজর উভয় পায়ের পাতা বা পায়ের আঙ্গুলের প্রতি নিবদ্ধ রাখা আদব।

সমূহ

* পুরুষগণ রুকুতে দুই টাখনুকে দাঁড়ানোর অবস্থার মত পৃথক রাখবে এবং নারীগণ মিলিয়ে রাখবে। (مجتبى ، جوهر)
* রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ[১] পড়া সুন্নাত। এই তাসবীহ তিন/পাঁচ/সাত এরূপ বেজোড় সংখ্যায় পড়া সুন্নাত।

রুকু থেকে উঠা এবং সোজা দাঁড়ানোর আমল

* سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ (অর্থাৎ, আল্লাহ শোনেন, যে তাঁর প্রশংসা করে।)

বলে রুকু থেকে উঠা সুন্নাত।

* সোজা হওয়ার সাথে حَمِدَهٗ বলা শেষ হবে। এটা সুন্নাত।
* রুকুর থেকে সোজা স্থির হয়ে দাঁড়ানো ওয়াজিব।
* সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (অর্থাৎ, হে আমাদের রব! সকল প্রশংসা তোমার জন্য।) বলা সুন্নাত।[২]

সাজদায় যাওয়ার আমলসমূহ

* সাজদায় যাওয়ার সময় আল্লাহু আকবার বলা সুন্নাত।
* সাজদায় জমীনে কপাল লাগানোর সাথে 'আকবার' বলা শেষ করবে। এটা সুন্নাত তরীকা।
* সাজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে উভয় হাটু একত্রে, তারপর উভয় হাত একত্রে, তার পর নাক এবং তারপর কপাল জমীনে রাখবে। এই তারতীব সুন্নাত।[৩]
* হাটু জমীনে লাগার পূর্বে কোমর মাথা সামনের দিকে ঝুঁকানো মাকরূহ বরং কোমর সোজা রাখবে। (احسن الفتاوى ج ٣)
* সাজদায় যাওয়ার সময় হাটুর উপর হাত দিয়ে ভর না করা, এতে হাটু মাটিতে লাগার পূর্বেই কোমর মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে যায়। তদুপরি অনেকে এটাকে সুন্নাত মনে করে বিধায় এ থেকে বিরত থাকা উচিত।
* সাজদায় যাওয়ার সময় কাপড় নাড়াচাড়া বা টানাটানি করবে না। এরূপ করা মাকরূহ।

---

১. আমার মহা রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

২. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলা আরও উত্তম। তার চেয়ে উত্তম اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলা এবং তার চেয়েও উত্তম হল اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলা। (در المختار/١)

৩. ওযরের সময় হাটুর পূর্বে হাত রাখতে হলে প্রথমে ডান হাত, তারপর বাম হাত, তারপর উভয় হাটু একত্রে রাখবে। (احسن الفتاوى ج ٣)

প্রথম সাজদার আমল সমূহ

* সাজদায় উভয় হাতের মাঝে চেহারার চওড়া পরিমাণ ফাঁক রাখবে।
* উভয় হাতের সমস্ত আঙ্গুল খুব মিলিয়ে রাখা সুন্নাত।
* উভয় হাতের সমস্ত আঙ্গুলের অগ্রভাগ কেবলামুখী রাখা সুন্নাত।
* উভয় হাতের মধ্যখানে বৃদ্ধ আঙ্গুলদ্বয়ের নখ বরাবর নাক রাখবে।
* নজর নাকের উপর রাখা আদব।
* দুই পায়ের টাখনু কাছাকাছি রাখবে-মিলাবে না।[১]
* উভয় পা খাড়া রাখবে।
* পায়ের আঙ্গুল সমূহ জমীনের সাথে চেপে ধরে যথা সম্ভব আঙ্গুলের অগ্রভাগ কেবলামুখী করে রাখবে।
* কপালের অধিকাংশ ও নাক জমীনের সংঙ্গে লাগিয়ে রাখা ওয়াজিব। (احسن الفتاوى ج / ٣)
* পুরুষগণ পেট রান থেকে, বাহু পাজর থেকে এবং কনুই জমীন থেকে পৃথক রাখবে।
* মহিলাগণ উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে এবং পেট দুই রানের সঙ্গে এবং বাহু পাজরের সঙ্গে মিলিয়ে ও কনুই পর্যন্ত হাত জমীনের সঙ্গে লাগিয়ে খুব চেপে সাজদা করবে।
* সাজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى (আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি) পড়া সুন্নাত। এই তাসবীহ তিন/পাঁচ/সাত-এরূপ বেজোড় সংখ্যায় পড়া সুন্নাত।

সাজদা থেকে উঠা এবং

* আল্লাহু আকবার বলে সাজদা থেকে উঠা সুন্নাত।
* প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর হাত জমীন থেকে উঠানো সুন্নাত।
* সোজা হয়ে বসার সাথে সাথে আকবার বলা শেষ করবে। এটাই সুন্নাত তরীকা।
* বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা সুন্নাত। মহিলাগণ দুই নিতম্বের উপর বসবে।
* পুরুষের জন্য ডান পা সোজা খাড়া রাখা সুন্নাত।
* ডান পা জমীনের সঙ্গে চেপে ধরে যথা সম্ভব ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করে রাখা সুন্নাত। মহিলাগণ উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে। (شرح منية)

---

১. সাজদাতে টাখনু মিলানো বা পৃথক রাখা সম্পর্কে হাদীসে উভয় রকমের বর্ণনা পাওয়া যায়। এতদ্বয়ের মাঝে সমন্বয় হল কাছাকাছি রাখবে। احسن الفتاوى গ্রন্থে কয়েকটি যুক্তির ভিত্তিতে এটাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

বসার আমল সমূহ

* বসার সময় হাতের আঙ্গুলগুলোর মাঝে সামান্য ফাঁক রাখা মোস্তাহাব। (شرح منية) মহিলাগণ আঙ্গুল মিলিয়ে রাখবে। (بهشتی زیور)
* হাতের আঙ্গুগুলো সোজা কেবলামুখী করে রাখা মোস্তাহাব। (شرح منية وشرح وقاية)
* হাতের আঙ্গুলগুলোর অগ্রভাগ হাঁটুর কিনারা বরাবর রাখবে।
* বসার সময় নজর কোলের উপর নিবদ্ধ রাখা আদব।
* দুই সাজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসা ওয়াজিব।
* দুই সাজদার মাঝখানে নিম্নোক্ত দুআ পড়া মোস্তাহাব ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ

অথবা

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ

দ্বিতীয় সাজদায় যাওয়ার এবং সাজদার মধ্যে উপরোক্ত আমল সমূহ (১৮টা) করা।

দ্বিতীয় সাজদা থেকে দাঁড়ানোর আমল সমূহ

* আল্লাহু আকবার বলে উঠা সুন্নাত।
* প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর হাত এবং তারপর হাটু জমীন থেকে উঠানো।
* ২য় সাজদা থেকে উঠে বসা ছাড়াই দাঁড়িয়ে যাওয়া সুন্নাত।
* হাটুর উপর হাতে ভর করে উঠা মোস্তাহাব। (احسن الفتاوی ج/۳)
* সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সাথে আকবার শব্দের উচ্চারণ শেষ করবে।

বৈঠকের

* তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব।
* তাশাহহুদ -এর মধ্যে اَشْهَدُ اَنْ বলতে বলতে হাতের হলকা বাঁধা অর্থাৎ, ডান হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুলের অগ্রভাগ এবং মধ্যমার অগ্রভাগকে মিলানো এবং কনিষ্ঠ ও অনামিকাকে হাতের তালুর সঙ্গে মিলানো। এটা মোস্তাহাব। 'লা ইলাহা' বলতে বলতে শাহাদাত অঙ্গুলিকে

আ ম ল স মূ হ

উপর দিকে উঠানো, এতটুকু উঠানো যেন তার অগ্রভাগ কেবলামুখী হয়ে যায়। 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় নীচের দিকে নামানো তবে বৈঠকের শেষ পর্যন্ত রানের সাথে না মিলিয়ে উঁচু করে রাখা নিয়ম। (احسن الفتاوی ج ۱) এই হলকা বৈঠকের শেষ পর্যন্ত রাখবে। (بہشتی زیور)

* দুরূদ শরীফ পড়া সুন্নাত।
* দুআয়ে মাছূরা পড়া মোস্তাহাব।

সা লা মে র আ ম ল স মূ হ

* اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ বলে উভয় দিকে সালাম ফিরানো ওয়াজিব। (احسن الفتاوی ج ۳)
* সালাম ফিরানোর সময় নজর কাঁধের উপর রাখা মোস্তাহাব।
* ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় ডান দিকের ফিরিশতাকে সালাম করার নিয়ত করবে। অনুরূপ বাম দিকে সালাম ফিরানোর সময় বাম দিকের ফিরিশতাকে সালামের নিয়ত করবে।
* উভয় সালাম চেহারা কেবলামুখী থাকা অবস্থায় থেকে শুরু করবে এবং কাঁধে নজর করে শেষ করবে।
* দ্বিতীয় সালামকে কম দীর্ঘ করা এবং আওয়াজ নীচু করা সুন্নাত।
* সালামের সময় ঘাড় এতটুকু ফিরানো যেন (পিছনে কেউ থাকলে) তার চেহারার উক্ত পাশ দেখতে পারে। (بدائع الصنائع ج ۱)

তিন/চার রাকআত নামাযের অতিরিক্ত আমল সমূহ ঃ

* তিন/চার রাকআত বিশিষ্ট নামায হলে দ্বিতীয় রাকআতের বৈঠকে শুধু তাশাহহুদ পড়ে তৃতীয় রাকআতের জন্য আল্লাহু আকবার বলে উঠবে। আর সুন্নাতে গায়র মোয়াক্কাদা বা নফল নামায হলে প্রথম বৈঠকে দুরূদ এবং দুআয়ে মাছূরাও পড়ে তারপর উঠা উত্তম। উল্লেখ্য যে, এ নিয়ম অনুযায়ী প্রথম বৈঠকে দুরূদ এবং দুআয়ে মাছূরা পড়ে উঠলে তৃতীয় রাকআতে সানা এবং সূরা ফাতেহার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়াও উত্তম।

* তিন/চার রাকআত বিশিষ্ট নামায ফরয হলে তৃতীয়/চতুর্থ রাকআতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়া উত্তম। আর ফরয ব্যতীত অন্যান্য নামাযে ৩য়/৪র্থ রাকআতে সূরা/কেরাত মিলানো ওয়াজিব।

* শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দুরূদ পড়া সুন্নাত এবং দুআয়ে মাছূরা পড়া মোস্তাহাব।

মুক্তাদী-র জন্য খাস মাসায়েল ঃ

* মুক্তাদী ইমামের পেছনে এক্তেদা করার নিয়ত করবে। এক্তেদার নিয়ত ব্যতীত মুক্তাদীর নামায সহীহ হয় না।

* ইমামের তাকবীরে তাহরীমা-'আল্লাহু আকবার' শেষ হওয়ার পূর্বে মুক্তাদীর তাকবীর যেন শেষ না হয়।

* ইমামের তাকবীরে তাহরীমা শেষ হওয়ার পর সাথে সাথে মুক্তাদীর তাকবীরে তাহরীমা বলা উত্তম।

* ইমাম সূরা/কেরাত শুরু করলে মুক্তাদী ছানা পড়বে না।

* মুক্তাদী **ইমামের** পেছনে সূরা ফাতেহা বা কেরাত কোনটা পাঠ করবে না। সূরা ফাতেহার পূর্বে শুরুতে পঠিতব্য বিসমিল্লাহও পাঠ করবে না।

* মুক্তাদী سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ না বলে তদস্থলে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলতে বলতে উঠবে। (شرح منية)

* সালাম ফিরানোর সময় ইমামের আসসালামু বলার পূর্বে মুক্তাদীর আসসালামু বলা যেন শেষ না হয়।

* ইমামের সালাম ফিরানোর পরপর সাথে সাথে মুক্তাদীর সালাম ফিরানো উত্তম।

* ইমাম ডান দিকে থাকলে ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় তাঁর নিয়তও করবে, বাম দিকে থাকলে বাম সালামে আর সোজা বরাবর থাকলে উভয় সালামেই তাঁর নিয়ত করবে।

মাসবূকের জন্য খাস মাসায়েল ঃ

(যে মুক্তাদী ইমামের সাথে সব রাকআতে শরীক হতে পারেনি, তাকে মাছবূক বলা হয়)

* ইমামের শেষ বৈঠকে মাছবূক তাশাহহুদ এমন ধীরে ধীরে পড়বে, যেন তার তাশাহহুদ শেষ হতে হতে ইমামের দুরূদ ও দুআয়ে মাছূরা শেষ হয়ে যায়। তবে আগেই তাশাহহুদ শেষ হয়ে গেলে তাশাহহুদের শেষ বাক্যটা (অর্থাৎ কালেমায়ে শাহাদাত) বারবার আওড়াতে পারে বা চুপচাপ বসে থাকতে পারে বা তাশাহহুদ পুনরায় পড়তে পারে। (فتاوى دار العلوم ج/٣)

* ইমাম সাজদায়ে সহো দিলে মাছবূকও সাজদায়ে সাহো করবে, তবে সাজদায়ে সহো-র সালাম ফিরাবে না।

* মাছবূক ইমামের সাথে শেষ সালাম ফিরাবে না। তবে ভুলে ফিরিয়ে ফেললে সাজদায়ে সহো দিবে।

* ইমাম উভয় দিকে সালাম ফিরানোর সামান্য পর মাছবূক অবশিষ্ট নামাজ পড়ার জন্য আল্লাহু আকবার বলে উঠে দাঁড়াবে। ইমামের এক সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীর উঠে দাঁড়ানো সুন্নাতের খেলাফ।

* মাছবূক অবশিষ্ট নামায পড়ার জন্য উঠে ছানা, আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়বে। প্রথমে কেরাত মিলানোর রাকআত/রাকআতগুলো, তারপর কেরাত বিহীন রাকআত/ রাকআতগুলো পড়বে। ইমাম যে সূরা/কেরাত পড়েছেন তার সাথে তারতীব রক্ষা করা মাছবূকের জন্য জরুরী নয়।

মাছবুক এক রাকআত ছুটে গেলে তা কিভাবে পড়বে ঃ

ইমাম উভয় ছালাম ফিরানোর পর মাছবূক আল্লাহু আকবার বলে উঠবে, ছানা পড়বে, আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতেহা পড়বে, তারপর বিছমিল্লাহ সহ সূরা মিলাবে এবং রুকূ সাজদা ও বৈঠক করে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবে।

মাছবূক দুই রাকআত ছুটে গেলে তা কিভাবে পড়বে ঃ

ইমাম উভয় ছালাম ফিরানোর পর মাছবুক আল্লাহু আকবার বলে উঠবে এবং পূর্ব বর্ণিত নিয়মে প্রথম রাকআত আদায় করবে। তিন রাকাআত বিশিষ্ট নামাজ হলে বৈঠক করে (বৈঠকে শুধু তাশাহহুদ পড়তে হবে) আর চার রাকআত বিশিষ্ট নামাজ হলে বৈঠক না করেই দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠবে। এ রাকআতে ছানা ব্যতীত এবং শুধু বিছমিল্লাহ সহ সূরা ফাতেহা ও সূরা/কেরাত মিলিয়ে রুকূ সাজদা ও বৈঠক করে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবে।

মাছবূক তিন রাকআত ছুটে গেলে তা কিভাবে পড়বে ঃ

মাছবূক যদি ইমামের সাথে এক রাকআত পায় এবং তিন রাকআত না পায়, তাহলে ইমামের উভয় সালাম ফিরানোর পর উঠে পূর্ববর্তী নিয়মে প্রথম রাকআত পড়বে এবং বৈঠক করে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠবে। দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কিরাত মিলাতে হবে এবং বৈঠক না করেই তৃতীয় রাকআতের জন্য উঠবে। তৃতীয় রাকআতে সূরা ফাতেহার সাথে সূরা কিরাত মিলাতে হবে না।

মাছবূক কোন রাকআত না পেলে কিভাবে পড়বে ঃ

মাছবূক যদি কোন রাকআত না পায় শুধু শেষ বৈঠকে এসে শরীক হয়, তাহলে ইমামের উভয় সালাম ফিরানোর পর উঠে একাকী যেভাবে নামায পড়া হয় সেভাবে পূর্ণ নামায আদায় করবে।

ইমামের জন্য খাস মাসায়েল ঃ

* উত্তম লেবাছ পরিধান করে নামায পড়ানো এবং পড়া উত্তম।

(فتاوی محمودیۃ ج ۲)

* ইমাম ইমামতের নিয়ত করবেন। নতুবা ইমামতের ছওয়াব অর্জিত হবে না।

* ইমামের জন্য সম্পূর্ণ মেহরাবের মধ্যে দাঁড়ানো মাকরূহ তানযীহী।

(فتاوی محمودیۃ ج ۷)

* ইমাম প্রত্যেক নামাযে উঠা বসা ইত্যাদির তাকবীর سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ও সালাম জোরে বলবেন। প্রয়োজনের চেয়ে খুব বেশী জোরে বলা মাকরূহ।

* জেহ্‌রী নামাযে (অর্থাৎ, মাগরেব ঈশা ফজর ইত্যাদি) প্রথম দুরাকআতে সূরা/ কেরাত জোরে পড়বেন।

* মুসল্লিদের মধ্যে অসুস্থ বা হাজতমান্দ লোক থাকলে হালকা কেরাত পড়বেন। তবে সুন্নাত পরিমাণ ছেড়ে নয়।

* রুকুর থেকে উঠার পর রব্বান্না লাকাল হাম্‌দ বলবেন না।

* ইমামের জন্য রুকূ সাজদার তাসবীহ তিন/ পাঁচবার এমনভাবে পড়া উত্তম, যেন মুক্তাদীগণ সাধারণভাবে তিনবার পড়তে পারে। তবে মুক্তাদীদের কষ্ট বোধ করার আশংকা না থাকলে অধিকও পড়তে পারেন।

* ইমাম দুই সাজদার মধ্যখানে বৈঠকে দুআ পড়বেন না তবে শুধু اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ -এতটুকু পড়তে পারেন।

* ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় ডান দিকের মুক্তাদী এবং বাম দিকে সালাম ফিরানোর সময় বাম দিকের মুক্তাদীদেরও নিয়ত করবেন।

* ফজর এবং আসর নামাযের সালামান্তে মুসল্লিদের দিকে ফিরে বসবেন। ডান দিক দিয়ে ফেরা এবং ডান দিকের মুসল্লিদের দিকে মুখ করে বসা উত্তম। তবে বাম দিক দিয়ে ফেরা কিম্বা পেছনের দিকে ফিরে সোজা পুর্বমুখী হয়ে বসাও জায়েয। (مراقی الفلاح)

* ফরয নামাযের পর অন্যত্র সরে সুন্নাত পড়া উত্তম।

দুআ/মুনাজাতের আদব ও আমল সমূহ

(ক) দুআ কবূল হওয়ার জন্য সর্বক্ষণ যা যা করণীয় ঃ

১। খাদ্য, পানীয়, পোশাক -পরিচ্ছদ ও আয়-উপার্জন হালাল হওয়া।

২। মাতা-পিতার নাফরমানী থেকে বিরত থাকা।

৩। আমর বিল' মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার তথা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করা।

৪। আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করা।

৫। কোন মুসলমানের সাথে অন্যায়ভাবে তিন দিনের বেশী কথা বন্ধ না রাখা।

৬। গীবত না করা। গীবতকারী ব্যক্তির দুআ কবূল হয় না।

৭। হাছাদ বা হিংসা না করা। হিংসুকের দুআ কবূল হয় না।

৮। বখীলী বা কৃপণতা না করা। কৃপণ ব্যক্তির দুআ কবূল হয় না।

৯। দুআ কবূল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া না করা।

১০। হৃদয় মরে গেলে দুআ কবূল হয় না। উল্লেখ্য-যিকির না করলে, বেশী হাসলে, বেশী কথা বললে হৃদয় মরে যায়।

(খ) দুআর সময় বসার আদব ঃ

১। কেবলামুখী হয়ে বসা।

২। হাঁটু গেড়ে বসা।

৩। আদব, তাওয়াযু ও বিনয়ের সাথে বসা।

৪। পাক-সাফ হয়ে বসা।

৫। উযূ সহকারে বসা।

৬। দুআর সময় আসমানের দিকে নজর না উঠানো।

(গ) দুআর সময় হাত উঠানোর নিয়মাবলী ঃ

১। সীনা বা কাঁধ বরাবর হাত উঠানো।

২। উভয় হাতের তালু আসমানের দিকে রাখা মোস্তাহাব।

৩। উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ কেবলা মুখী রাখা মোস্তাহাব।

৪। উভয় হাতের মাঝে সামান্য পরিমাণ ফাঁক রাখা মোস্তাহাব।

৫। উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে নয় বরং সামান্য ফাঁক সহকারে রাখা।

৬। দুআ শেষ পূর্বক বরকতের জন্য মুখে হাত বুলিয়ে নেয়া।

(ঘ) দুআ শুরু এবং শেষ করার বাক্য সমূহ ঃ

১। দুআর শুরু এবং শেষে আল্লাহর হাম্‌দ ও ছানা (প্রশংসা) বয়ান করা।

২। দুআর শুরু এবং শেষে দুরূদ ও সালাম পড়া।

বিঃদ্রঃ এ দুটি আমলের জন্য নিম্নোক্ত বাক্য দিয়ে দুআ শুরু করা যায় ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ। এবং শেষে নিম্নোক্ত বাক্য বলা যায়–

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

৩। 'আমীন' বলে দুআ শেষ করা।

(ঙ) দুআর সময় মনের অবস্থা যে রকম রাখতে হয় ঃ

১। এখলাসের সাথে খালেস মনে দুআ করা অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত কেউ তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে না-এই মনোভাব বদ্ধমূল রাখা।

২। স্বার্থহীন মনোভাব নিয়ে দুআ করা।

৩। আগ্রহ এবং অনুপ্রাণিত মনে দুআ করা।

৪। যথা সম্ভব মনোযোগ সহকারে দুআ করা।

৫। নাছোড় মনোভাব নিয়ে দুআ করা।

৬। দুআ কবূল হওয়ার দৃঢ় আশা রাখা।

(চ) চাওয়ার আদব সমূহ ঃ

১। আল্লাহর আসমায়ে হুছনা (উত্তম নাম) ও মহান গুণাবলী উল্লেখ পূর্বক চাইতে হয়।

২। প্রথমে নিজের জন্য, তারপর মাতা-পিতা ও অন্যান্য মুসলমান ভাইদের জন্য চাওয়া। ইমাম হলে জামাআতের সকলের জন্য চাইবেন।

৩। বারবার চাওয়া। অন্তত তিনবার। একই মজলিসে তিনবার বা তিন মজলিসে তিনবার। তবে তিনবার চাওয়ার এই নিয়ম একাকী দুআ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৪। নিম্ন স্বরে চাওয়া। তবে মজলিসের লোকদেরকে শুনানোর প্রয়োজনে জোর আওয়াজে দুআ করা যায়, কিন্তু যদি কোন নামাযী ব্যক্তির নামাযে ব্যাঘাত ঘটে, তাহলে তখন জোর আওয়াজে দুআ করা নিষিদ্ধ।

৫। কোন নেক কাজের উল্লেখ পূর্বক দুআ কবূল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন করা।

৬। আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং অন্যান্য নেককার ও বুযুর্গদের ওছীলায় দুআ কবূল হওয়ার প্রার্থনা করা।

(ছ) দুআর বিষয় বস্তু বিষয়ক আদব সমূহ ঃ

১। আখেরাত ও দুনিয়া উভয় জগতের প্রয়োজনসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে দুআ করা।

২। কোন পাপের বিষয় না চাওয়া।

৩। এমন বিষয়ে প্রার্থনা না করা, যার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে (যেমন নারী দুআ করবে না যেন সে পুরুষ হয়ে যায়, কিম্বা বেটে মানুষ লম্বা হওয়ার বা কাল মানুষ ফর্সা হওয়ার দূআ করবেনা ইত্যাদি)

৪। কোন অসম্ভব বিষয়ের দুআ না করা।

৫। নিজের মুখাপেক্ষিতা, প্রয়োজন ও অক্ষমতার বিষয় উল্লেখ করা।

(জ) দুআর ভাষা বিষয়ক আদব সমূহ ঃ

১। হযরত রাসূল (সঃ) থেকে বর্ণিত বা কুরআনে বর্ণিত ভাষায় দুআ করা।

২। কথার ছন্দ মিলানোর জন্য কসরত না করা।

৩। কবিতার মাধ্যমে দুআ করলে গানের ভঙ্গি থেকে বিরত থাকা।

দুআ সম্পর্কে আরও বিশেষ কয়েকটি কথা ঃ

* দুআ কবূল হওয়ার জন্য ওলী বা মুত্তাকী হওয়া শর্ত নয়-পাপীদের দুআও আল্লাহ কবূল করে থাকেন। অবশ্য আল্লাহর খাস বান্দাদের দুআ আল্লাহ বেশী কবূল করে থাকেন। অতএব আমি পাপী বা আমি নগণ্য—এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে দুআ করা ছেড়ে দেয়া সমীচীন নয়।

* কয়েকবার দুআ করে হতাশ হয়ে দুআ করা ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। কেননা মানুষের কল্যাণের জন্যই কখনো কখনো দুআ বিলম্বে কবূল করা হয়।

* দুআ কখনো বৃথা যায় না। কখনও এমন হয় যে, মানুষ যা দূআ করে হুবহু তা পায়। কখনও যা চাওয়া হয় তা না দিয়ে তার পরিবর্তে অন্য কোন নেয়ামত প্রদান করা হয় অথবা কোন বিপদকে তার থেকে হঠিয়ে দেয়া হয় বা দুআর ওছীলায় তার গোনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয় কিম্বা দুনিয়াতে যা চাওয়া হয় তা না দিয়ে পরকালের সঞ্চয় হিসেবে তা রেখে দেয়া হয়। মোটকথা– দুআ কখনো বৃথা যায় না, তবে তার কবূল হওয়ার প্রক্রিয়া এক নয়।

* সব সময়ই দুআ করা যায় তবে এমন কিছু সময় রয়েছে যখন দুআ করলে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে কবূল করে থাকেন।

দুআ কবূল হওয়ার বিশেষ কয়েকটি মুহূর্ত ঃ

১। ফরয নামাযের পর।

২। শেষ রাতে।

৩। রমযান মাসের দিবারাত্রির সব সময়, বিশেষভাবে ইফতারের সময়।

৪। কোন নেক কাজ সম্পাদনের পর।

৫। সফরের অবস্থায়। বিশেষভাবে যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে দ্বীনের রাস্তায় সফর হয়।

৬। শবে কদরে।

৭। আরাফার দিন।

৮। জুমুআর রাত।

৯। জুমুআর দিন বিশেষ কোন এক মুহূর্তে। অনেকের মতে এ সময়টি জুমুআর দিন আসরের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্যে রয়েছে।

১০। জুমুআর খুতবা শুরু হওয়া থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত, তবে খুতবা চলাকালীন দুআ করলে মনে মনে করতে হবে অথবা ইমাম খুতবার মধ্যে যে দুআ করবেন তাতে মনে মনে (মুখে কোন প্রকার শব্দ করা ছাড়া) আমীন বলবে।

কুরআনে বর্ণিত বিশেষ কয়েকটি মুনাজাত

(١) رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

(১) হে আমাদের রব, আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি তুমি আমাদেকে ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি রহম না কর, তাহলে অবশ্যই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। (সূরা আ'রাফঃ ২৩)

(٢) رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ـ

(২) হে আমাদের রব! আমাদের সকল গোনাহ্ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি দূর করে দাও। আর আমাদেরকে মৃত্যু দাও নেককার লোকদের সাথে। (সূরা আলু-ইমরানঃ ১৯৩)

(٣) رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ـ

(৩) হে আমাদের বর! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সমস্ত মুমিনকে ক্ষমা কর, যেদিন হিসাব কায়েম হবে। (সূরা ইবরাহীমঃ ৪১)

(٤) رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ـ

(৪) হে আমার রব! তাদের (মাতা-পিতা) উভয়ের প্রতি রহমত কর যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন। (বানী ইসরাঈলঃ ২৪)

(٥) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

(৫) হে আমাদের রব! আমাদেরকে হেদায়েত করার পর তুমি আমাদের অন্তর সমূহকে বক্র করে দিও না। তুমি তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কিছুর দাতা। (আলু-ইমরান ঃ ৮)

(٦) رَبِّ اجْعَلْنِى مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِى رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ـ

(৬) হে আমার রব! আমাকে এবং আমার সন্তানদেরকে নামায কায়েমকারী বানাও। (সূরাঃ ইবরাহীমঃ ৪০)

(٧) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ـ

(৭) হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আমাদের স্ত্রীদের থেকে এবং আমাদের সন্তানাদি থেকে আমাদেরকে শান্তি দান কর। আর মুত্তাকীদের জন্য আমাদেরকে নেতা (আদর্শ স্বরূপ) বানিয়ে দাও। (সূরা ফুরকানঃ ৭৪)

(٨) رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

(৮) হে আমাদের রব! তুমি দুনিয়াতেও আমাদেরকে কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও। আর জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। (বাকারাঃ ২০১)

(٩) رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

(৯) হে আমাদের রব। আমাদেরকে তুমি দান কর যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন তুমি আমাদেরকে অপমানিত করো না, নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না। (আলু ইমরানঃ ১৯৪)

(١٠) رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْلِيْ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ -

(১০) হে আমার পালনকর্তা! আমার বক্ষ উন্মোচন করে দাও (অর্থাৎ, মনোবল বৃদ্ধি করে দাও, জ্ঞান বহন করার উপযোগী বানিয়ে দাও এবং দ্বীন প্রচার কার্যে হীনমন্যতা এবং বিরোধিতার কারণে সৃষ্ট সংকোচবোধ দূর করে দাও) আমার কাজ সহজ করে দাও এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দাও, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। (তাহাঃ ২৫-২৮)

(١١) رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا -

(১১) হে আমার রব! তুমি আমার ইল্‌ম বৃদ্ধি করে দাও। (তাহাঃ ১১৪)

(١٢) رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

(১২) হে আমাদের রব! আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে যেন ঈর্ষা না হয়। হে আমাদের রব! নিশ্চয় তুমি বড় স্নেহশীল, করুণাময়। (হাশ্‌রঃ ১০)

(١٣) رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ -

(১৩) হে আমার রব! তুমি ক্ষমা কর এবং রহম কর, তুমিতো শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (মু'মিনূনঃ ১১৮)

(١٤) رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

(১৪) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও, তার শাস্তিতো নিশ্চিত ধ্বংস। (সূরা ফুরকান ঃ ৬৫)

(١٥) رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ

(১৫) হে আমার প্রতি পালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং আমাকে নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা শুআরা ঃ ৮৩)

(١٦) رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

(১৬) হে আমার রব! আমাকে জালেম সম্প্রদায় থেকে রক্ষা কর। (সূরা কাসাস ঃ ২১)

(١٧) رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ

(১৭) হে আমার প্রতিপালক! ফ্যাসাদী লোকদের মোকাবেলায় তুমি আমাকে সাহায্য কর। (সূরা আন্কাবূত ঃ ৩০)

(١٨) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

(১৮) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালেম লোকদের উৎপীড়নের পাত্র বানিওনা এবং তোমার রহমতে কাফের সম্প্রদায় থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। (সূরা ইউনুস ঃ ৮৫)

(١٩) رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ

(১৯) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মাঝে এবং আমাদের জাতির মাঝে সঠিক ফয়সালা করে দাও। তুমিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। (সূরা আ'রাফ ঃ ৮৯)

(٢٠) رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

(২০) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের থেকে কবূল কর, নিশ্চয়ই তুমি সব কিছু শুনতে পাও, সব কিছু জান। (সূরা বাকারা ঃ ১২৭)

হাদীসে বর্ণিত বিশেষ কয়েকটি মুনাজাত

(١) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى -

(১) হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়েত, তাকওয়া, অন্যায় থেকে বিরত থাকার তওফীক এবং মনের অভাববোধ না থাকা ও সম্পদের স্বচ্ছলতা প্রার্থনা করছি।

(٢) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

(২) হে আল্লাহ! আমার পূর্বের গোনাহ, পরের গোনাহ, প্রকাশ্যেকৃত গোনাহ এবং গোপনেকৃত গোনাহ আর আমার যত গোনাহ সম্পর্কে তুমি অবহিত আছ, সব ক্ষমা করে দাও। তুমি যাকে চাও আগে রহমতের তওফীক দাও এবং যাকে চাও তাকে পরে দাও। তুমি সব কিছুর ক্ষমতা রাখ।

(٣) اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّیْ

(৩) হে আল্লাহ! তুমি বড়ই ক্ষমাশীল, ক্ষমা করতে তুমি ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা করে দাও।

(٤) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا وَّرِزْقًا طَيِّبًا ـ

(৪) হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট চাই এমন ইলম যা উপকার দিবে, এমন আমল যা কবূল হবে এবং হালাল রিযিক।

(٥) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضٰى بِالْقَدْرِ

(৫) হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট সুস্থ্যতা, চারিত্রিক পবিত্রতা, সচ্চরিত্র এবং তাকদীরে রাজি থাকার তওফীক চাই।

(٦) اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِیْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِیْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِیْ مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِیْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِی الصُّدُوْرُ ـ

(৬) হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র করে দাও, আমার অন্তরকে মুনাফেকী থেকে, আমলকে রিয়া থেকে, যবানকে মিথ্যা থেকে এবং দৃষ্টিকে অন্যায় নজর থেকে। তুমিতো চোখের ফাঁকি এবং অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে খুবই ওয়াকেফহাল।

(٧) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِیْ يُبَلِّغُنِیْ حُبَّكَ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ نَّفْسِیْ وَمَالِیْ وَاَهْلِیْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ ـ

(৭) হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে চাই তোমার ভালবাসা এবং তোমাকে যে ভালবাসে তার ভালবাসা। আর এমন আমল, যে আমল আমাকে তোমার

ভালবাসায় উপনীত করবে। হে আল্লাহ! আমার জীবন, আমার ধন-সম্পদ এবং আমার পরিবার-পরিজনের চেয়ে এবং ঠাণ্ডা পানির চেয়েও তোমার ভালবাসাকে আমার কাছে অধিক প্রিয় বানিয়ে দাও।

(٨) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِيْ خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِيْ وَاجْعَلْ عَلَا نِيَتِيْ صَالِحَةً

(৮) হে আল্লাহ! আমার জাহিরী অবস্থার চেয়ে আমার বাতিনী অবস্থাকে সুন্দর বানিয়ে দাও আর জাহিরী অবস্থাকে দুরস্ত বানিয়ে দাও।

(٩) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔

(৯) হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানেরই মুক্তি ও নিরাপত্তা কামনা করছি।

(١٠) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔

(১০) হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই কুফরী থেকে, অভাব-অনটন থেকে এবং কবরের আযাব থেকে।

(مشكوة المصابيح থেকে গৃহীত)

আরও কতিপয় মুনাজাতের জন্য দেখুন ২৯৪ পৃষ্ঠা এবং ৫০২ পৃষ্ঠা।

নামাযে মনোযোগ সৃষ্টির জন্য যা যা করণীয়

১. নামাযে সূরা/কেরাত, দুআ, দুরূদ, ইত্যাদি যা যা পড়া হয় তার প্রত্যেকটা শব্দ শব্দ খেয়াল করে পড়া-বে খেয়ালীর সাথে মুখস্ত থেকে না পড়া। আর ইমামের সূরা/কেরাত শোনা গেলে সে ক্ষেত্রে মনোযোগের সাথে তা শোনা।

২. নামাযের প্রত্যেক রুকন ও কাজ মাসআলা অনুযায়ী হচ্ছে কি না– তার প্রতি খুব খেয়াল রেখে আদায় করা।

৩. আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছি, আল্লাহ আমার নামাযের সব কিছু দেখছেন, কিয়ামতের দিন এই নামাযের সব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব তাঁর কাছে দিতে হবে-এই ধ্যান জাগ্রত রাখা।

ওয়াক্তিয়া নামায

* প্রতিদিন মোট পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয। যথাঃ ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। বেতর নামায ওয়াজিব এবং এটা ইশার অধীন।

ফজরের নামায

* ফজরে দুই রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং দুই রাকআত ফরয।

ফজরের নামাযের ওয়াক্ত ঃ

সুবহে সাদেক থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত হল ফজরের নামাযের ওয়াক্ত। তবে আলো পরিষ্কার হওয়ার পর সূর্যোদয়ের এতটুকু পূর্বে নামায শুরু করা উত্তম যে, সুন্নাত পরিমাণ কেরাত সহকারে নামায আদায় করার পর যদি নামায ফাসেদ হওয়ার কারণে পুনরায় পড়তে হয়, তাহলে যেন পুনরায় মাসনূন কেরাত যোগে নামায আদায় করা যায়। অর্থাৎ, মোটামুটি সূর্যোদয়ের আধ ঘন্টা পূর্বে নামায শুরু করলে উত্তম হয়।

ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদার বিশেষ কয়েকটি বিধানঃ

* এ দুই রাকআত সুন্নাত যে কোন সূরা দিয়ে পড়া যায়, তবে নবী (সঃ) থেকে সূরা কাফিরূন ও সূরা এখলাস দ্বারা পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব বরকতের নিয়তে এরূপ করা যায়, তবে মাঝে মধ্যে অন্য সূরা দ্বারাও পড়বে যেন ঐ দুই সূরা দ্বারা পড়াই জরুরী-এরূপ বোধগম্য না হয়। (احسن الفتاوى ج ۳)

* ফজরের জামাআত শুরু হয়ে গেলেও যদি আশা থাকে যে, সুন্নাত পড়ে নিয়েও অন্ততঃ শেষ বৈঠকে তাশাহহুদে জামাআতের সাথে শরীক হতে পারবে, তাহলে সুন্নাত পড়ে নিবে। তবে এরূপ অবস্থায় সুন্নাত পড়তে হবে মসজিদের বাইরে (ভিতরে জামাআত হতে থাকলে বারান্দায় পড়া বাইরের হুকুমে) বা পিলার প্রভৃতির আড়ালে। আর যদি শেষ বৈঠকে তাশাহহুদেও শরীক হতে পারার আশা না থাকে কিম্বা সুন্নাত পড়ার মত অনুরূপ স্থান না পায়, তাহলে সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে এবং এরূপ ছেড়ে দেয়া সুন্নাত সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়া জায়েয নেই। সুর্যোদয়ের পর এবং সুর্য ঢলার পূর্বে পড়ে নেয়া উত্তম– জরুরী নয়। (احسن الفتاوى ج/۳) আর যদি ফজরের ফরয সহ সুন্নাত কাযা হয়ে থাকে এবং সূর্য ঢলার পূর্বেই কাযা আদায় করা হয় তাহলে সুন্নাত সহ কাযা করবে। (فتاوى دار العلوم ج/٤)

* যদি কোন দিন কোন কারণে সুন্নাত পড়ার সময় না থাকে শুধু ফরয পড়ার সময় থাকে, তাহলে শুধু ফরয পড়ে নিবে এবং সুন্নাত উপরোক্ত নিয়মে কাযা করে নিবে।

* এই দুই রাকআত সুন্নাতের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ رَكْعَتَىْ سُنَّةِ الْفَجْرِ

বাংলায় ঃ ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের নিয়ত করছি।

ফজরের দুই রাকআত ফরযের বিশেষ কয়েকটি বিধান ঃ

* সফর বা জরুরতের অবস্থা না হলে ফজরের নামাযে তেওয়ালে মুফাস্‌সাল অর্থাৎ, সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত সূরাগুলোর মধ্য থেকে কেরাত পড়া সুন্নাত।

* ফজরের দ্বিতীয় রাকআত অপেক্ষা প্রথম রাকআত লম্বা হওয়া উত্তম।

* জুমুআর দিন ফজরের প্রথম রাকআতে সূরা আলিফ-লাম-মীম সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা দাহ্‌র পড়া উত্তম।

* ফজরের দুই রাকআত ফরযের নিয়ত এভাবে করা যায়।

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ رَكْعَتَىْ فَرْضِ الْفَجْرِ

বাংলায় ঃ ফজরের দুই রাকআত ফরয নামাযের নিয়ত করছি।

জোহরের নামায

* জোহরে প্রথমে চার রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্‌কাদাহ, তারপর চার রাকআত ফরয, তারপর দুই রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

জোহরের ওয়াক্ত ঃ

সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলার পর থেকে প্রতিটা বস্তুর ছায়া (মূল ছায়া বাদে) দ্বিগুন হওয়া পর্যন্ত। তবে শীতের মওসুমে ওয়াক্তের শুরু ভাগে এবং গরমের মওসুমে দেরীতে পড়া উত্তম। প্রতিটা বস্তুর ছায়া সমপরিমাণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জোহরের মোস্তাহাব ওয়াক্ত। (বেহেশতি জেওরঃ ১ম)

জোহরের চার রাকআত সুন্নাতের বিশেষ বিধান সমূহ ঃ

* এই সুন্নাত শুরু করার পর ইমাম ফরযের জামাআত শুরু করলে দুই রাকআতের কম পড়া হয়ে থাকলে দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে। (এই দুই রাকআত নফল হয়ে যাবে) এবং এই সুন্নাত পরে পড়ে নিতে হবে। আর তৃতীয় বা চতুর্থ রাকআতে থাকলে সুন্নাত শেষ করে তারপর জামাআতে শরীক হবে।

* জামাআত শুরু হওয়ার পর এই সুন্নাত শুরু করবে না বরং জামাআতে শরীক হয়ে যাবে।

* ফরযের পূর্বে এই সুন্নাত পড়তে না পারলে ফরযের পর প্রথমে পরবর্তী দুই রাকআত সুন্নাত পড়ে নিবে তারপর এই চার রাকআত সুন্নাত পড়বে।

* এই চার রাকআত সুন্নাতের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ سُنَّةَ الظُّهْرِ -

বাংলায় ঃ জোহরের চার রাকআত সুন্নাতের নিয়ত করছি।

জোহরের চার রাকআত ফরযের বিশেষ মাসায়েল ঃ

* ফজরের ফরযের ন্যায় জোহরের ফরযের কেরাতও তেওয়ালে মুফাসসাল থেকে হওয়া সুন্নাত। তবে জোহরে তেওয়ালে মুফাসসালের মধ্যে তুলনামূলক ছোট সূরাগুলো পড়া সুন্নাত এবং উভয় রাকআতের কেরাত সমান হওয়া বা প্রথম রাকআতে সামান্য পরিমাণ বেশী হওয়া উভয় রকম করা যায়।

* জোহরের ফরযের নিয়ত এভাবে করা যায়−

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ فَرْضَ الظُّهْرِ

বাংলায় ঃ জোহরের ফরয নামাযের নিয়ত করছি।

আসরের নামায

* আসরে প্রথমে চার রাকআত সুন্নাতে গায়র মুয়াক্কাদা, তারপর চার রাকআত ফরয।

আসারের ওয়াক্ত ঃ

জোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আসরের সময়। তবে সূর্যের হলুদ হয়ে যাওয়ার পর আসরের ওয়াক্ত মাকরূহ হয়ে যায়। এর পূর্বে পর্যন্ত মোস্তাহাব ওয়াক্ত।

আসরের চার রাকআত ফরযের বিশেষ কয়েকটি মাসআলা ঃ

* সফর বা জরুরতের অবস্থা না হলে আসরের নামাযে আওছাতে মুফাসসাল অর্থাৎ, সূরা তারেক থেকে সূরা বাইয়্যেনা পর্যন্ত সূরাগুলোর মধ্য থেকে কেরাত পড়া সুন্নাত।

* আসরের ফরয নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়−

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ فَرْضَ الْعَصْرِ

বাংলায় ঃ আসরের ফরয নামাযের নিয়ত করছি।

মাগরিবের নামায

* মাগরিবে তিন রাকআত ফরয, তারপর দুই রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

মাগরিবের ওয়াক্ত ঃ

সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়া থেকে নিয়ে পশ্চিম আকাশের লালবর্ণ শেষ হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত (অর্থাৎ, প্রায় সোয়া ঘন্টা) তবে মাগরিবের নামায দেরী করে পড়া মাকরূহ। আযানের সাথে সাথেই মাগরিবের নামায পড়ে নেয়া উত্তম। (نماز مسنون ও বেহেশতি জেওর)

মাগরিবের তিন রাকআত ফরযের বিশেষ কয়েকটি মাসআলা ঃ

* মাগরিবের ফরযে কেছারে মুফাস্সাল অর্থাৎ, সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাছ পর্যন্ত সূরাগুলোর মধ্য থেকে কেরাত পড়া সুন্নাত।

* মাগরিবের ফরয নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ فَرْضَ الْمَغْرِبِ

বাংলায় ঃ মাগরিবের ফরয নামাযের নিয়ত করছি।

ইশার নামায

* ইশার নামাযে প্রথম চার রাকআত সুন্নাতে গারে মুয়াক্কাদা, তারপর চার রাকআত ফরয, তারপর দুই রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং দুই রাকআত সুন্নাতে গায়র মুয়াক্কাদা।

ইশার ওয়াক্ত ঃ

মতে মাগরিবের ওয়াক্তে বর্ণিত "পশ্চিমাকাশের লালবর্ণ" শেষ হওয়ার পর সাদা বর্ণ দেখা যায়, তারপর কালবর্ণ দেখা যায়, হযরত ইমাম আবূ হানীফার এখান থেকে শুরু করে সুবহে সাদিক পর্যন্ত ইশার ওয়াক্ত। কিন্তু রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মোস্তাহাব ওয়াক্ত, রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত মোবাহ ওয়াক্ত আর রাত্রের দ্বিপ্রহরের পর থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত ইশার মাকরূহ ওয়াক্ত।

ইশার চার রাকআত ফরযের বিশেষ কয়েকটি মাসআলা ঃ

* আওছাতে মুফাসসাল থেকে কেরাত পড়া সুন্নাত।

* ইশার ফরয নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ فَرْضَ الْعِشَاءِ

বাংলায় ঃ ইশার ফরয নামাযের নিয়ত করছি।

জামাআতের মাসায়েল

* পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায জামাআতের সাথে পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। অনেক মুহাক্কিক আলেমের মতে ওয়াজিব। বিনা ওজরে জামাআত তরক করা গোনাহ। যে বিনা ওজরে সর্বদা জামাআত তরক করে সে ফাসেক।

* পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামাযে ইমাম ব্যতীত একজন মুক্তাদী হলেও জামাআত হয়ে যায়। চাই সে একজন সমঝদার নাবালেগ হোক বা মেয়েলোক হোক।

* স্ত্রী লোক, নাবালেগ, ক্রীতদাস এবং যাদের জামাআত তরক করার ওযর রয়েছে তাদের উপর জামাআত ওয়াজিব নয়।

* জামাআত ছহীহ হওয়ার জন্য ইমামকে মুসলমান হতে হবে, ইমামকে বালেগ ও বোধমান হতে হবে। মুক্তাদীকে এক্তেদার নিয়ত করতে হবে এবং ইমাম ও মুক্তাদীর স্থান একই হতে হবে অর্থাৎ, ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে দুই কাতার পরিমাণ ব্যবধান বা গাড়ী চলার মত রাস্তার ব্যবধান থাকতে পারবেনা বা একজন সওয়ারীতে অন্য জন মাটিতে থাকতে পারবে না কিম্বা ইমাম মুক্তাদী ভিন্ন ভিন্ন যানবাহনে থাকলেও হবে না।

* একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামাআতের সাথে নামায পড়লে ২৫ বা ২৭ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যায়।

* মহিলাদের জন্য মসজিদ বা ঈদগাহে জামাআতে নামায পড়তে যাওয়া মাকরূহ ও নিষিদ্ধ। সাহাবাদের যুগ থেকেই এই নিষেধাজ্ঞা চলে আসছে।

(فتاوى دار العلوم ج: ٣ نقلا عن الدر المختار)

* যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন যাবত তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীরের) সাথে জামাআতে শরীক হয়ে নামায পড়বে, তার জন্য জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং মুনাফিকী থেকে মুক্ত থাকার পরওয়ানা লিখে দেয়া হবে। (তিরমিযী) ইমামের কেরাত শুরু করার আগ পর্যন্ত জামাআতে শরীক হলেও তাকবীরে উলা পেয়েছে ধরা হবে।

* জামাআত পাওয়ার আশায় মসজিদে এসে যদি দেখে জামাআত হয়ে গিয়েছে তবুও জামাআতের ছওয়াব পাওয়া যাবে।

* মসজিদে জামাআত হয়ে গেলে মসজিদের বাইরে জামাআত সহকারে নামায পড়তে পারলে উত্তম। এমনকি ঘরে এসে যারা নামায পড়েনি তাদেরকে নিয়ে জামাআত করবে। যদি শুধু স্ত্রীকে নিয়েও জামাআত করা যায় তবুও উত্তম। তবে স্ত্রী একা মুক্তাদী হলে তাকে পিছনে দাঁড়িয়ে দিতে হবে। আর কোন ভাবে অন্যত্র জামাআত করতে না পারলে ফরয নামায মসজিদেই পড়া উত্তম।

(فتاوى دار العلوم ج: ٣)

* হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে মসজিদে ফরয নামাযের জন্য ছানী জামাআত (অর্থাৎ, মসজিদে একবার জামাআত হয়ে গেলে আবার দ্বিতীয় বার ঐ মসজিদে ঐ নামাযের জন্য জামাআত) মাকরূহ তাহরীমী। তবে তিন অবস্থায় ছানী জামাআত বরং আরও অধিক জামাআত করা মাকরূহ নয়।

(১) যদি মসজিদ এমন হয় যার ইমাম মুয়াজ্জিন নির্দিষ্ট নেই। এরূপ অবস্থায় ছানী জামাআত করা যায়।

(২) যদি প্রকাশ্যে আযান ইকামত ছাড়া প্রথম জামাআত হয়ে থাকে।

(৩) যদি মসজিদের এলাকার নির্দিষ্ট মুছল্লী ও কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্যরা প্রথম জামাআত করে থাকে।

হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে এই তিন অবস্থা ছাড়াও সর্বাবস্থায় ছানী জামাআত করা যায়–মাকরূহ হবে না, যদি প্রথম জামাআত যে স্থানে হয়েছে সে স্থান পরিবর্তন করে (ঐ মসজিদেই) অন্য স্থানে ছানী (দ্বিতীয়) জামাআত করা হয়। অনেকে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) এর মতানুসারে ছানী জামাআত করে থাকেন, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর মত দলীলের দিক দিয়ে অধিক শক্তিশালী হওয়ার কারণে মুহাক্কিক আলেমগণ তাঁর মতানুসারেই ফতুয়া দিয়ে থাকেন। (فتاوى دار العلوم ج ٣ وبہشتی گوہر)

* একাকী ফরয নামায পড়ার পর যদি মসজিদে জামাআত হতে দেখা যায় তাহলে তাতে শরীক হওয়া যায়, যদি সেটা জোহর বা ঈশার জামাআত হয়। এরূপ অবস্থায় জামাআতের সাথে দ্বিতীয় বার যেটা পড়া হবে তা নফল বলে গণ্য হবে।

* যদি জোহরের চার রাকআত সুন্নাত শুরু করার পর জামাআত শুরু হয়ে যায় তাহলে তার মাসআলা পূর্বে ১৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে।

* যদি আসর বা ঈশার চার রাকআত সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা শুরু করার পর জামাআত শুরু হয়ে যায়, তাহলে দুই রাকআত পূর্ণ করার পূর্বে হলে দুই রাকআত পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে। পরে আর এই চার রাকআত বা অবিশিষ্ট দুই রাকআত পড়তে হবেনা। আর তৃতীয় রাকআত বা চতুর্থ রাকআতে থাকা অবস্থায় জামাআত শুরু হলে চার রাকআত পূর্ণ করে তারপর জামাআতে শরীক হবে।

* একাকী ফরয নামায শুরু করার পর ঐ নামাযের জামাআত শুরু হলে তখন ছয়টা অবস্থা যথা ঃ

(এক) যদি দুই বা তিন রাকআত ওয়ালা নামায হয় এবং যদি এখন সে দ্বিতীয় রাকআতের সাজদা না করে থাকে তাহলে তৎক্ষণাৎ (ডান দিকে এক সালাম ফিরিয়ে ঐ নামায শেষ করে) জামাআতে শরীক হয়ে যাবে।

(দুই) আর যদি দুই বা তিন রাকআত ওয়ালা নামাযের দ্বিতীয় রাকআতের সাজদা করে থাকে তাহলে ঐ নামাযই পূর্ণ করতে হবে। (জামাআতে শরীক হবে না।)

(তিন) যদি চার রাকআত ওয়ালা নামায হয় এবং প্রথম রাকআতের সাজদা না করে থাকে তাহলে তৎক্ষণাৎ ডান দিকে এক সালাম ফিরিয়ে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে।

(চার) কিন্তু যদি এক সাজদাও করে থাকে তবে দুই রাকআত পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে জামআতে শরীক হবে। তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত এই হুকুম।

(পাঁচ) যদি তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে এবং এখনও তৃতীয় রাকআতের সাজদা না করে থাকে তবে ঐ দণ্ডায়মান অবস্থায়ই সালাম ফিরিয়ে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে।

(ছয়) যদি তৃতীয় রাকআতের সাজদা করে থাকে বা আরও পরে থাকে তাহলে ঐ নামায পূর্ণ করে নিবে। (বেহেশতী জেওর)

জামাআত ছাড়ার ওযর সমূহ

যে সব ওযর থাকলে জামাআত তরক করা যায় সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। ছতর ঢাকা পরিমাণ কাপড় না থাকলে।

২। মুষলধারে বৃষ্টি বা প্রচণ্ড ঝড় তুফান হতে থাকলে এবং ছাতা না থাকলে ও কাপড়-চোপড় ভিজে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে। তবে এরূপ অবস্থায়ও কোন ভাবে হাজির হতে পারলে উত্তম।

৩। মসজিদে যাওয়ার পথে ভীষণ কাদা থাকলে এবং চলা কষ্টকর ও জুতা স্যাণ্ডেল নোংরা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে। তবে এরূপ হওয়া সত্ত্বেও হাজির হতে পারলে উত্তম।

৪। প্রচণ্ড শীতের কারণে মসজিদে গেলে রোগ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা বা রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে।

৫। মসজিদে গেলে ঘরের মাল- সামান চুরি হওয়ার আশংকা থাকলে।

৬। মসজিদে গেলে শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার আশংকা থাকলে।

৭। মসজিদে গেলে ঋণ দাতার সাক্ষাৎ ও তার মাধ্যমে উৎপীড়িত হওয়ার আশংকা থাকলে। অবশ্য তার ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য থাকলে এটা ওযর বলে গণ্য হবে না।

৮। রাতের বেলায় নামাযের সময় প্রবল ঝড় তুফান আসলে।

৯। অন্ধকার রাতে পথ দেখা না গেলে এবং আলোর ব্যবস্থা না থাকলে।

১০। রোগীর সেবায় রত ব্যক্তি জামাআতে গেলে যদি রোগী কষ্ট পায় বা চিন্তাযুক্ত হয়, তাহলে জামাআত তরক করা জায়েয।

১১। খাবার প্রস্তুত হয়েছে বা এখনই হচ্ছে আবার ক্ষুধাও এত বেশী যে, খানা না খেয়ে নামাযে দাঁড়ালে নামাযে মন বসবে না–খাবারের দিকে মন থাকবে–এমন হলে।

১২। নামাযের মনোযোগ নষ্ট হওয়ার মত পেশাব পায়খানার প্রচণ্ড বেগ থাকলে।

১৩। রোগের কারণে চলা ফেরা করতে না পারলে।

১৪। অধিক লেংড়া বা পা কাটা বা অন্ধ হলে। অবশ্য অন্ধ ব্যক্তি অনায়াসে মসজিদে পৌঁছতে সক্ষম হলে তার জন্য জামাআত ছেড়ে দেয়া উচিত নয়।

১৫। সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় জামাআতে গেলে কাফেলার সঙ্গীদের চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, বা ভ্রমণের যানবাহন সম্পূর্ণ তৈরী এবং জামাআতে গেলে যানবাহন চলে যাওয়ার ফলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে।

(مراقی الفلاح و شرح منیة)

কাতারের মাসায়েল

* মুক্তাদী একজন হলে ইমামের ডান পার্শ্বে ইমামের সমান বা কিঞ্চিত পিছনে দাঁড়াবে। ইমামের বাম দিকে বা সোজা পিছনে দাঁড়ানো মাকরূহ।

* মুক্তাদী দুই জন বা বেশী হলে ইমামের পিছনে কাতার বেঁধে দাঁড়াবে। যদি দুইজন হওয়া অবস্থায় ইমামের পাশে (একজন ডান পাশে একজন বাম পাশে) দাঁড়ায়, তাহলে মাকরূহ তানযীহী হবে আর দুইজনের বেশী হওয়া অবস্থায় ইমামের পাশে দাঁড়ালে মাকরূহ তাহরীমী হবে। (فتاوی رحیمیة وطحطاوی)

* দুইয়ের অধিক মুক্তাদী হলে ইমামের জন্য আগে দাঁড়ানো ওয়াজিব। অতএব একজন মুক্তাদীকে ডানপার্শ্বে নিয়ে নামায শুরু করার পর যদি আরও মুসল্লী আসে তাহলে প্রথম মোক্তাদীর পিছনে সরে আসা উচিত যাতে আগন্তুকদের নিয়ে পিছনে কাতার বাঁধতে পারে। যদি সে পিছনে না সরে তাহলেও আগন্তুক মুসল্লীগণ আস্তে হাত দিয়ে তাকে পিছনের দিকে টেনে আনবে। এরূপ না করে আগুন্তুক মুসল্লীও যদি ইমামের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে ইমাম সামনে জায়গা থাকলে আগে বেড়ে যাবে, তবে সাজদার জায়গা থেকে আগে বাড়বেন না। অনুরূপ ভাবে যদি পিছনে জায়গা না থাকে তাহলে মুক্তাদীর অপেক্ষা না করে ইমামেরই আগে বেড়ে যাওয়া উচিত।

* মুক্তাদী যদি একজন স্ত্রীলোক বা একটি নাবালেগা বালিকা হয় তাহলেও তাকে ইমামের পিছনে দাঁড়াতে হবে–ইমামের পার্শ্বে নয়।

* মুক্তাদীদের মধ্যে বালেগ পুরুষ, নাবালক, বালেগা নারী– এরূপ বিভিন্ন প্রকারের লোক থাকলে নিম্নোক্ত নিয়ম ও তারতীব অনুসারে কাতার বাঁধতে হবে। প্রথম পুরুষগণের, তারপর নাবালেগদের, তারপর বালেগা নারীদের, তারপর নাবালেগাদের।

* একজন মাত্র অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে থাকলে তাকে বয়স্কদের সাথে এক কাতারে দাঁড়িয়ে নিবে এবং একাধিক হলে বড়দের পিছনে তাদের জন্য পৃথক কাতারের ব্যবস্থা করবে।

*কোন কাতার পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর একজন মাত্র মুসল্লী আসলে তার জন্য একা একা ভিন্ন কাতারে দাঁড়ানো মাকরূহ। সে অন্য কারও আগমনের অপেক্ষা করবে। অন্য কেউ না আসলে ইমামের সোজা পিছনের লোকটিকে টেনে নিয়ে কাতার বেঁধে দাঁড়াবে। তবে পিছনে টেনে আনলে মাসআলা না জানার কারণে উক্ত লোকটির যদি এমন কোন কাজ করার সম্ভাবনা থাকে যাতে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে বা সে খারাব মনে করে, তাহলে টেনে আনবেনা, একা একাই দাঁড়িয়ে যাবে। (فتاوی دار العلوم ج/ ٣)

* কাতার সোজা করা এবং মিলি মিলে দাঁড়ানো জরুরী (গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত) এর জন্য মুসল্লীদের আদেশ ও হেদায়েত করা ইমামের দায়িত্ব এবং মুসল্লীদের তা মান্য করা কর্তব্য। তবে খুব বেশী চাপাচাপি করে কাউকে কষ্ট দেয়াও মোনাছেব নয়।

* আগের কাতারে জায়গা থাকতে পিছনের কাতারে দাঁড়ানো মাকরূহ।

* কাতার বাঁধার নিয়ম হল প্রথমে একজন ঠিক ইমামের পিছনে দাঁড়াবে, তারপর একজন ডানে একজন বামে– এরূপে ক্রমাগত কাতার পূর্ণ হবে।

* কাতার সোজা করার নিয়ম হল কাঁধে কাঁধে এবং পায়ের টাখনা গিরাকে বরবার করে দাঁড়ানো। (فتاوی دار العلوم ج/ ٣)

নামাযে লোকমা দেয়া ও নেয়ার মাসায়েল

(ভুল সংশোধন করে দেয়াকে লোকমা দেয়া বলা হয়)

* কেরাত বা উঠা বসায় ইমামের ভুল হলে মুক্তাদীগণ লোকমা দিতে পারেন চাই ফরয নামায হোক বা তারাবীহ্ ইত্যাদি যে কোন নামায হোক।

* ইমাম যদি এমন কোন লোকের লোকমা গ্রহণ করেন যে তার এক্তেদা করেনি তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। একমাত্র মুক্তাদীর লোকমাই গ্রহণ করা যায়।

* পেরেশান করার জন্য ভুল লোকমা দেয়া অন্যায়। যেমন তারাবীহতে এক হাফেজকে পেরেশান করার জন্য অন্য হাফেজ কোথাও কোথাও এরূপ করে থাকেন বলে শোনা যায়।

* ফরয পরিমাণ কেরাত পড়ার পর কেরাতে বেঁধে গেলে ইমামের রুকুতে চলে যাওয়া উচিত। (এরূপ অবস্থায় এদিক সেদিক থেকে পড়ে বা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে) মুক্তাদীকে লোকমা দেয়ার জন্য বাধ্য করা মাকরূহ (তানযীহী)। ফরয পরিমাণ কেরাত হয়ে যাওয়ার পর লোকমা দেয়াও অনুরূপ মাকরূহ। আর ফরয পরিমাণ কেরাতের পূর্বে বেঁধে গেলে অন্য স্থান থেকে কেরাত পড়বে।

(فتاوى دار العلوم ج/ ٢)

* ইমাম উঠার সময় বসে পড়লে বা বসার সময় উঠে গেলে 'সোবহানাল্লাহ' বলে লোকমা দেয়ার নিয়ম। অনেকে এ সব ক্ষেত্রে 'আল্লাহু আকবার' বলে লোকমা দিয়ে থাকেন, তাতেও নামাযের কোন ক্ষতি হয় না।

* ইমাম চুপে চুপে কেরাত পড়ার নামাযে যদি জোরে কেরাত শুরু করেন বা জোরে কেরাত পড়ার নামাযে চুপে চুপে পড়তে থাকেন, তাহলেও 'সোবহানাল্লাহ' বলে লোকমা দিতে হয়।

ইমাম নিযুক্ত করার নীতি ও মাসায়েল

* যোগ্য ও উপযুক্ত লোককে ইমাম নিযুক্ত করা মুসল্লীদের দায়িত্ব, যোগ্য লোক থাকতে অযোগ্যকে ইমাম নিয়োগ করলে গোনাহ্ হবে। একাধিক যোগ্য লোক থাকলে সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ করা কর্তব্য। সর্বাপেক্ষা যোগ্যকে বাদ দিয়ে অন্যকে নিযুক্ত করা সুন্নাতের খেলাফ।

* যদি একই পর্যায়ের গুণ ও যোগ্যতা বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক ব্যক্তি থাকেন, তাহলে অধিক সংখ্যক মুসল্লী যাকে মনোনীত করবে তিনিই ইমাম পদে নিযুক্ত হবেন।

১। ইমাম নিযুক্ত হওয়ার সবচেয়ে অগ্রগণ্য ব্যক্তি হলেন আলেম অর্থাৎ, যিনি নামাযের মাসায়েল ভাল জানেন, যদি তিনি ফাসেক না হন, কুরআন অশুদ্ধ না পড়েন এবং সুন্নাত পরিমাণ কেরাত তার মুখস্ত থাকে।

২। উপরোক্ত গুণে সমান থাকলে তারপর যার কেরাত ভাল অর্থাৎ, তাজবীদের নিয়ম অনুযায়ী যে কুরআন পড়তে সক্ষম।

৩। তারপর যার তাকওয়া বেশী অর্থাৎ, যিনি হারাম হালাল বেছে চলায় অধিক অভ্যস্ত।

৪। তারপর বয়সে যে বড়।

৫। তারপর যার আখলাক-চরিত্র অধিক উত্তম।

৬। তারপর যার চেহারা অধিক সুন্দর।

৭। তারপর যে বংশের দিক থেকে শরীফ।

৮। তারপর যার আওয়াজ অধিক ভাল।

৯। তারপর যার লেবাস পোশাক ভাল।

* যার মধ্যে একাধিক গুণ থাকবে সে এক গুণের অধিকারী অপেক্ষা অগ্রগণ্য হবে।

* একজন যদি বড় আলেম হন কিন্তু তার আমল ঠিক না হয় বা কিরাত অশুদ্ধ পড়েন এবং অন্য একজন বড় আলেম নন কিন্তু কেরাত শুদ্ধ পড়েন এবং আমল ভাল, তাহলে এই দ্বিতীয় জনই অগ্রগণ্য হবেন।

* কারও বাড়িতে জামাআত হলে বাড়িওয়ালাই ইমামতের জন্য অগ্রগণ্য। তারপর বাড়িওয়ালা যাকে বলবে সে অগ্রগণ্য। অবশ্য যদি বাড়িওয়ালা একেবারে অযোগ্য হয়, তাহলে অন্য যোগ্য ব্যক্তি অগ্রগণ্য হবে। একই স্থানে বাড়ির মালিক এবং উক্ত বাড়ির ভাড়াটিয়া উপস্থিত থাকলে ভাড়াটিয়াই মালিকের হুকুমে আসবে।

* নির্ধারিত ইমাম থাকলে সে-ই অগ্রগণ্য, তার অমতে অন্য কারও ইমামতি করার অধিকার নেই।

* ইসলামী রাষ্ট্র হলে মুসলমান বাদশাহ বা তার নির্বাচিত কর্মচারী উপস্থিত থাকতে অন্য কারও ইমামতের হক নেই।

* যার শাহওয়াত (যৌন উত্তেজনা) প্রবল, চিন্তা বিক্ষিপ্ত থাকার সম্ভাবনা—এরূপ অবিবাহিত লোকের চেয়ে যার বিবি আছে এরকম লোককে ইমাম নিয়োগ করা উত্তম। (فتاوى محمودية ج/٦)

যাদেরকে ইমাম বানানো মাকরূহ ঃ

যাদেরকে ইমাম বানানো এবং যাদের পিছনে নামায পড়া মাকরূহ তারা হল ঃ

১। ফাসেক, অর্থাৎ যে প্রকাশ্যে গোনাহে কবীরা করে বেড়ায়। এরূপ লোককে ইমাম নিযুক্ত করা মাকরূহ তাহরীমী।

২। বিদআতীকে ইমাম বানানো মাকরূহ তাহরীমী। অবশ্য ফাসেক ও বিদআতী ব্যতীত উপস্থিত লোকদের মধ্যে যদি অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি না থাকে অথবা তাকে ইমাম নিযুক্ত না করলে বা পূর্বে নিযুক্ত হয়ে থাকলে তাকে

বরখাস্ত করতে গেলে ফ্যাসাদ ও কলহ সৃষ্টির আশংকা থাকে তাহলে তার পিছনে নামায পড়া যাবে– এতে মুসল্লীদের গোনাহ হবে না। তবে যাদের কারণে এ ধরনের লোককে নিয়োগ দিতে হল বা বরখাস্ত করা গেল না তারা দায়ী হবে।

৩। অন্ধ বা রাতকানাকে ইমাম বানানো মাকরূহ তানযীহী। তবে এরূপ লোক যোগ্য হলে এবং পাক নাপাক সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে থাকলে এবং তার ইমামতে কারও আপত্তি না থাকলে তার ইমামত মাকরূহ নয়।

৪। ওলাদুযযিনা (যেনার সন্তান)-কে ইমাম বানানো মাকরূহ তানযীহী। অবশ্য সে ইল্‌ম ও তাকওয়ার অধিকারী হয়ে থাকলে এবং তার ইমামতে মুসল্লীদের আপত্তি না থাকলে মাকরূহ হবে না।

৫। যে সুশ্রী নব্য যুবকের এখনও দাড়ি ভালমত ওঠেনি তাকে ইমাম বানানো মাকরূহ (তানযীহী) যদি ফেতনার আশংকা থাকে।

বিত্‌র নামায ও তার মাসায়েল

* বিত্‌র নামায ওয়াজিব এবং তিন রাকাআত।

বিতর নামাযের সময়ঃ ইশার নামাযের পর থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত বিতর নামাযের সময়। তবে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের পরে পড়া উত্তম। কিন্তু যার শেষ রাতে উঠার অভ্যাস নেই বা উঠতে পারার বিশ্বাস নেই, তার জন্য ইশার পর বিতর পড়ে নেয়া উচিত। প্রথম রাতে পড়ে নিলে আর শেষ রাতে পড়ার অনুমতি নেই। (نماز مسنون)

* বিতর নামাযে সব রাকআতে সূরা ফাতেহার সাথে সূরা/কেরাত মিলানো ওয়াজেব। যে কোন সূরা/কেরাত মিলানো যায় তবে সূরা আ'লা, কাফেরূন ও ইখলাস দ্বারা পড়া উত্তম। মাঝে মধ্যে ব্যতিক্রমও করবে। (احسن الفتاوى ج/٣)

* বিতরে তৃতীয় রাকআতে সূরা মিলানোর পর তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে আবার হাত বেঁধে দুআয়ে কুনূত পড়তে হবে। তারপর রুকু সাজদা ও বৈঠক পূর্বক নামায শেষ করবে। দুআয়ে কুনূত পড়া ওয়াজেব। দুআয়ে কুনূত এই–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ
عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ

* দুআয়ে কুনূত মুখস্থ না থাকলে মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত তদস্থলে নিম্নোক্ত দুআটি পড়বে ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

অথবা اللهم اغفرلي তিনবার, কিম্বা يارب তিনবার পড়বে। (نماز مسنون عن كبيري)

* শুধু মাত্র রমজান মাসে বিতরের জামাআত করা মোস্তাহাব। এই জামাআতে ইমামের ন্যায় মুক্তাদীও দুআয়ে কুনূত পড়বে।

* বিতরের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ ثَلَاثَ رَكَعَاتِ الْوِتْرِ

বাংলায় ঃ তিন রাকআত বিতর পড়ছি।

জুমুআর নামায

* শুক্রবার দিন জোহরের পরিবর্তে জুমুআর নামায হয়ে থাকে। প্রথমে চার রাকআত "কাবলাল জুমুআ" সুন্নাতে মুআক্কাদা, তারপর জুমুআর খুতবা ফরয, তারপর দুই রাকআত ফরয, তারপর চার রাকআত "বা'দাল জুমুআ" সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, অতঃপর দুই রাকআত সুন্নাতে গায়র মুয়াক্কাদা।

* সব মৌসুমেই জুমুআর নামায ওয়াক্ত হওয়ার পর আগে ভাগেই পড়ে নেয়া মোস্তাহাব। (فتاوى دار العلوم)

* অসুস্থ ও মা'যূর ব্যক্তিদের জন্য মোস্তাহাব হল জুমুআর জামাআত হয়ে যাওয়ার পর জোহরের নামায পড়া (আযান ইকামত ও জামাআত ব্যতীত)। মহিলাগণ জুমুআর জামাআতের পূর্বেও জোহর পড়ে নিতে পারেন।

(احسن الفتاوى ج/٤)

* চার রাকআত কাবলাল-জুমুআর নিয়ত এভাবে করা যায়।

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ـ

বাংলায় ঃ চার রাকআত কাবলাল জুমুআ নামাযের নিয়ত করছি।

* জুমুআর দুই রাকআত ফরযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىِ الْفَرْضِ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ

বাংলায় ঃ জুমুআর দুই রাকআত ফরয নামায পড়ছি।

* চার রাকআত বা'দাল জুমুআ নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ـ

বাংলায় ঃ চার রাকআত বা'দাল জুমুআ নামাযের নিয়ত করছি।

জুমুআর জামাআত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত সমূহঃ

(১) আযাদ হওয়া–গোলামের উপর জুমুআ ওয়াজিব নয়।

(২) পুরুষ হওয়া–স্ত্রীলোকের উপর জুমুআ ওয়াজিব নয়।

(৩) মুকীম হওয়া–মুছাফিরের উপর জুমুআ ওয়াজিব নয়।

(৪) সুস্থ হওয়া–অসুস্থ ব্যক্তি যে জুমুআর মসজিদ পর্যন্ত নিজ ক্ষমতায় হেটে যেতে অক্ষম, তার উপর জুমুআ ওয়াজিব নয়। যে বৃদ্ধ ব্যক্তি বার্ধক্যের দরুন জামে মসজিদে হেটে যেতে অক্ষম কিম্বা অন্ধ, এদেরকেও রোগী মনে করা হবে। অবশ্য অন্ধকে কেউ ধরে নিয়ে যাওয়ার থাকলে তার উপর জুমুআ ওয়াজিব।

(৫) যে সব ওযরের কারণে পাঞ্জেগানা নামাযের জামাআত তরক করা জায়েয (দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ১৬৬) সে সব ওযর না থাকা-এরূপ কোন ওযর থাকলে জুমুআ ওয়াজিব হয় না।

(৬) পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার জন্য যে সব শর্ত রয়েছে তা মৌজুদ থাকা। যথাঃ বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া, বালেগ হওয়া, মুসলমান হওয়া।

* যাদের উপর জুমুআ ওয়াজিব নয় তারা জুমুআ পড়ে নিলে তাদের ফরযে ওয়াক্ত অর্থাৎ, জোহর আদায় হয়ে যাবে।

জুমুআ ছহীহ হওয়ার শর্তসমূহ ঃ

(১) শহর (ছোট হোক বা বড়) বা ছোট শহর তুল্য বড় গ্রাম হওয়া। উল্লেখ্য, যে গ্রামে ৩/৪ হাজার লোকের বসতি রয়েছে সেটাকে ছোট শহর তুল্য বড় গ্রাম ধরা হয়। সেখানে জুমুআ জায়েয। কিন্তু বন চর বা বিলের মধ্যে আবাদী থেকে অনেক দূরে কোন ছোট গ্রাম থাকলে সেখানে জুমুআ দুরস্ত নয়।

(২) জুমুআর নামায ও খুতবা জোহরের ওয়াক্তের মধ্যে হতে হবে।

(৩) খুতবা হওয়া শর্ত (খুতবা নামাযের পূর্বে হওয়া শর্ত)।

(৪) জামাআত হওয়া অর্থাৎ, খুতবার সময় থেকে ফরযের প্রথম রাকআতের সাজদা পর্যন্ত অন্ততঃ তিনজন বালেগ পুরুষ ইমামের সঙ্গে থাকতে হবে।

(৫) এজাযতে আম্মা থাকা। অর্থাৎ, যে স্থানে জুমুআর নামায পড়া হবে সেখানে সর্ব সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকা চাই। অতএব জেলখানা, কয়েদখানা, বন্ধ দুর্গ প্রভৃতি স্থানে জুমুআ দুরস্ত নয়।

জুমুআর খুতবার সুন্নাত, আদব ও মাসায়েল

খুতবার জরুরী বিষয় সমূহঃ

(১) খুতবা নামাযের পূর্বে হতে হবে।

(২) খুতবার নিয়ত থাকতে হবে।

(৩) খুতবা জোহরের ওয়াক্তের মধ্যে হতে হবে।

(৪) খুতবা কমপক্ষে এমন তিনজন লোকের সামনে হতে হবে যাদের দ্বারা জুমুআ কায়েম হয়।

(৫) খুতবা এবং নামাযের মাঝে কোন আজনবী (অসংশ্লিষ্ট) কাজের ব্যবধান ঘটতে পারবে না।

(৬) উভয় খুতবাই আরবী ভাষায় হওয়া জরুরী (অর্থাৎ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা) আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় খুতবা পড়া বা অন্য কোন ভাষায় পদ্য যোগ করা মাকরূহ তাহরীমী ও বেদআত। (فتاوى دار العلوم ج/ ٥، امداد الفتاوى ج/ ١ و نماز مسنون)

খুতবার সুন্নাত ও আদব সমূহ ঃ

(১) খুতবার মধ্যে আল্লাহর শোকর বর্ণিত হওয়া সুন্নাত।

(২) খুতবার মধ্যে আল্লাহর প্রশংসা বর্ণিত হওয়া সুন্নাত।

(৩) খুতবার মধ্যে তাওহীদ ও রেছালাতের সাক্ষ্য বর্ণিত হওয়া সুন্নাত।

(৪) খুতবার মধ্যে রাসূলের উপর দুরূদ পাঠ করা সুন্নাত।

(৫) খুতবার মধ্যে ওয়াজ নছীহত বয়ান করা সুন্নাত।

(৬) খুতবার মধ্যে দুই একটি আয়াত বা সূরা পাঠ করা সুন্নাত।

(৭) দুই খুতবা পড়া সুন্নাত। দ্বিতীয় খুতবায় উপরোক্ত বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি করা সুন্নাত।

(৮) দ্বিতীয় খুতবায় সমস্ত মুসলমান নর-নারীর জন্য দুআ ও এস্তেগফার করা সুন্নাত।

(৯) খুতবা অত্যন্ত লম্বা না করা সুন্নাত বরং নামাযের চেয়ে কম রাখবে।

(১০) ছানী (দ্বিতীয়) খুতবায় হুজুর (সঃ)-এর আওলাদ, সাহাবীগণ ও হুজুর (সঃ)-এর বিবি সাহেবাগণের প্রতি বিশেষতঃ খোলাফায়ে রাশেদীন এবং হযরত হামযা ও হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর জন্য দুআ করা মোস্তাহাব। সমসাময়িক মুসলমান বাদশার জন্য দুআ করা জায়েয কিন্তু তার মিথ্যা প্রশংসা করা মাকরূহ তাহরীমী।

* রমজান শরীফের শেষ জুমুআর খুতবায় আল বিদা জ্ঞাপন কিংবা বিদায় ও বিচ্ছেদমূলক বিষয় পড়া প্রমাণিত নয় বিধায় তা বিদআত।

(فتاوی دار العلوم ج/ ۵ وبہشتی گوہر)

খতীবের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি মাসায়েল

* খতীবের উযূ গোসলের হাজত থেকে পবিত্র হয়ে নেয়া সুন্নাত।

* খতীব মিম্বরে উঠে কিছুক্ষণ বসবেন, তারপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিবেন। এটাই সুন্নাত।

* খতীবের জন্য প্রথম খুতবার শুরুতে শুধু আউযুবিল্লাহ...... চুপে চুপে (জোরে নয়) বলা সুন্নাত। (احسن الفتاوی ج/ ٤)

* উপস্থিত মুসল্লীদের দিকে মুখ করে খুতবা দেয়া সুন্নাত। খুতবার সময় ডানে বামে সীনা ঘুরিয়ে রুখ করা নিষিদ্ধ, তবে শুধু ডানে বামে নজর করা যায়। আর তারগীব-তারহীবের বিষয় বস্তুর প্রেক্ষিতে আওয়াজ ও আন্দাজের মধ্যে পরিবর্তন জায়েয বরং সুন্নাত। (فتاوی رحیمیہ ج/ ۱)

* দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া সুন্নাত।

* মিম্বরের উপর খুতবা দেয়া সুন্নাত।

* লাঠি হাতে খুতবা দেয়া সুন্নাত (গায়র মুয়াক্কাদা)। মিম্বার থাকলেও এটা সুন্নাত। (فتاوی دار العلوم ج/ ۵) খুতবার বই হাতে থাকলে লাঠি বাম হাতে নেয়া উত্তম আর বই হাতে না থাকলে লাঠি ডান হাতে নেয়া উত্তম। (فتاوی رحیمیہ ج/ ۳) তবে মাঝে মধ্যে লাঠি নেয়া পরিত্যাগ করা উচিত, অন্যথায় বিদআত হয়ে যাবে। (احسن الفتاوی ج/ ٤)

* খতীবের জন্য মুখস্ত খুতবা দেয়া বা কিতাব কিংবা অন্য কিছু দেখে খুতবা পড়া সবটাই জায়েয।

* খতীবের জন্য দুই খুতবার মাঝখানে তিন আয়াত পড়া পরিমাণ সময় বসা সুন্নাত।

* লোকে শুনতে পারে এমন পরিমাণ আওয়াজের সাথে খুতবা পড়া সুন্নাত। কাছের লোকে শুনতে পারে অন্ততঃ এতটুকু জোরে বলা জরুরী।

* খতীব খুতবার সময়েও নেক কাজের আদেশ এবং বদ কাজের নিষেধ করতে বা মাসআলার কথা বলতে পারেন বরং মুনকার (বদকাজ) দেখলে মুখেই নিষেধ করা তার উপর ফরয। (احسن الفتاوی ج / ٤)

* খতীবের জন্য খুতবার পূর্বে মেহরাবের মধ্যে নামায পড়া মাকরূহ। পড়তে হলে মিম্বারের ডান দিকে পড়বে। (الفقه على المذاهب الاربعة)

* খতীবের জন্য কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে খুতবা দেয়া জরুরী নয়।

* খতীব খুতবা এবং একামতের মাঝখানে প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত ভাবে কোন মাসআলা বলতে পারেন। (احسن الفتاوی ج / ٤)

* খতীব খুতবার পূর্বে সংক্ষিপ্ত ভাবে ওয়াজ নছীয়ত করতে পারেন, এটা জায়েয বরং মোস্তাহাব, যদি মুসল্লীগণ চান। (فتاوی رحیمیه ج / ١)

খুতবার সময় শ্রোতাদের করণীয় আমলসমূহ

* জুমুআর দ্বিতীয় আযানের জওয়াব ও তার পরের দুআ জায়েয নেই। (فتاوی دار العلوم ج / ٥)

* যখন খতীব খুতবার জন্য দাঁড়াবেন, তখন থেকে খুতবার শেষ পর্যন্ত নামায পড়া বা কথা-বার্তা বলা মাকরূহ তাহরীমী। অবশ্য যে ব্যক্তি ছাহেবে তারতীব তার জন্য কাযা নামায পড়া জায়েয বরং ওয়াজিব।

* মনোযোগের সাথে খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। দূরত্বের কারণে খুতবার আওয়াজ শুনতে না পেলেও চুপ করে কান লাগিয়ে থাকা ওয়াজিব এবং যে কাজ বা কথা দ্বারা খুতবা শোনার ব্যাঘাত ঘটে তা মাকরূহ তাহরীমী। তখন হাটা, চলা, সালাম করা, সালামের জবাব দেয়া, তাসবীহ তাহলীল ইত্যাদি এমন কি মুখে মাসআলা বলাও নিষিদ্ধ। দান বাক্স চালানো নিষিদ্ধ। তবে কোন বদকাজ (মুনকার) দেখলে ইশারায় নিষেধ করা ফরয। (احسن الفتاوی ج / ٤)

* সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়ার মধ্যে খুতবা শুরু হলে তৃতীয় বা চতুর্থ রাকআতে থাকলে নামায পূর্ণ করে নিবে আর এর পূর্বে থাকলে দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরাবে। (احسن الفتاوی ج / ٣) এবং এ সুন্নাত পরে পড়ে নিবে।

* খুতবার সময় নামাযের হালতে বসা আদব এবং কেবলা মুখী হয়ে বসবে।

* খুতবার মধ্যে রাসূল (সঃ) এর নাম মোবারক আসলে মুখে নয় বরং মনে মনে দুরূদ শরীফ পড়া জায়েয।

তারাবীহ্-র নামায ও তার মাসায়েল

* রমজান মাসে ইশার নামাযের পর ইশার ওয়াক্তের মধ্যে যে বিশ রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়তে হয়, তাকে তারাবীহ্-র নামায বলে।

* তারাবীহ্-র নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

* বিশ রাকআত তারাবীহ্ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা-আট রাকআত নয়।

* তিারাবীহ্-র নামায জামাআতের সাথে পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কেফায়া। মহিলাদের তারাবীহ্-র জামাআত করা মাকরূহ তাহরীমী। (در مختار)

* প্রতি চার রাকআত তারাবীহ্-র পর এবং বিশ রাকআতের পর বিতরের পূর্বে চার রাকআত পরিমাণ বিশ্রাম করা মোস্তাহাব। জামাআতের লোকদের কষ্ট হওয়ার বা জামাআতের লোক সংখ্যা কম হওয়ার আশংকা হলে এত সময় বিশ্রাম করবে না বরং কম করবে। (بہشتی گوہر)

* এই বিশ্রামের সময় চুপ করে বসে থাকা, তাসবীহ তাহলীল, তিলাওয়াত, দুরূদ পড়া বা নফল নামায পড়া সবই জায়েয। আমাদের দেশে যে সোবহানা যিল মুলকে ওয়াল মালাকূতে....... তিনবার পড়ার প্রচলন আছে তাও জায়েয, তবে তা-ই পড়া জরুরী নয় বরং এই দুআ কোন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। এর চেয়ে سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ বারবার পড়তে থাকা উত্তম। এবং এসব দুআ চিৎকার করে নয় বরং নিরবে (কিম্বা স্বল্প শব্দে) পড়া মোনাছেব। (فتاوی دار العلوم ج / ٤)

* প্রত্যেক চতুর্থ রাকআতে মোনাজাত করা জায়েয আছে কিন্তু বিশ রাকআতের পর বিতরের পূর্বে দুআ করাই আফযল। (বেহেশতী জেওরঃ ১ম) তবে কোথাও প্রতি চার রাকআতের পর মুনাজাত করলে কঠোর ভাবে তাতে বাঁধা দেয়া কিম্বা না করা হলে মুসল্লীগণের পক্ষ থেকে ইমামকে করার জন্য হুকুম দেয়া সংগত নয়। (فتاوی دار العلوم ج / ٤)

* যদি কেউ মসজিদে এসে দেখেন ঈশার জামাআত হয়ে গিয়েছে এবং তারাবীহ শুরু হয়ে গিয়েছে তখন তিনি একা একা ইশা পড়ে নিয়ে তারপর তারাবীহ্-র জামাআতে শরীক হবেন। ইত্যবসরে যে কয় রাকআত তারাবীহ ছুটে গিয়েছে তা তিনি তারাবীহ ও বেতর জামাআতের সাথে আদায় করার পর পড়বেন।

খতম তারাবীহ্-র মাসায়েল ঃ

* রমজান মাসে তারাবীহ-র মধ্যে তারতীব অনুযায়ী একবার কুরআন শরীফ খতম করা (পড়া/শুনা) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

* তারাবীহ-র খতমের মধ্যে যে কোন একটি সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম জোরে পড়া চাই, নতুবা শ্রোতাদের খতম পূর্ণ হবে না।

* নাবালেগের পিছনে এক্তেদা করা দুরস্ত নয়, চাই ফরয নামাযে হোক বা তারাবীহ-র নামাযে হোক।

* ইচ্ছাকৃত ভাবে ভুল লোকমা দিয়ে হাফেজকে পেরেশান করা নিষিদ্ধ।

(فتاوی دار العلوم ج / ٤)

* তারাবীহ্তে এত দ্রুত তিলাওয়াত করা যে বুঝে আসে না– এরূপ তিলাওয়াত ছওয়াবের পরিবর্তে গোনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(فتاوی دار العلوم ج / ٤)

* হাফেজ সাহেব যদি ভুলে গিয়ে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে অথবা বৈঠকের সময় তাশাহহুদের আগে বা পরে চিন্তা করতে থাকেন এবং এর মধ্যে এক রুকন পরিমাণ (তিনবার সোবহানাল্লাহ বলার পরিমাণ) সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে সাজদায়ে সহো দিতে হবে। (فتاوی دار العلوم ج / ٤)

* কোন আয়াত ভুলে থেকে গেলে বা ভুল পড়া হয়ে থাকলে পরবর্তী দুগানায় বা পরবর্তী যে কোন দিন সেটা পড়ে নিতে হবে, নতুবা খতম পূর্ণ হবেনা।

(فتاوی دار العلوم ج / ٤)

* খতমের দিন তারাবীহ্-র মধ্যেই খতম করার পর শেষ রাকআতে সূরা বাকারার শুরু থেকে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত পড়া মোস্তাহাব। (فتاوی دار العلوم ج / ٤)

* তারাবীহ্-র মধ্যে খতমের সময় সূরা এখলাস তিনবার পড়া মাকরূহ। (অর্থাৎ, শরীয়তের বিশেষ নিয়ম মনে করে এরূপ আমল করা মাকরূহ)

* তারাবীহ্-র মধ্যে সূরা وَالضُّحٰى থেকে শেষ পর্যন্ত সূরা গুলোর পর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা মাকরূহ। নামাযের বাইরে এরূপ আমল করা যায়।

* তারাবীহ্-র বিনিময়ে পারিশ্রমিক দেয়া নেয়া জায়েয নয় তবে হাফেজ সাহেবের যাতায়াত ভাড়া ও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা বিধেয়।

(فتاوی دار العلوم ج / ٤)

ঈদুল ফিতরের নামায

* শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখের ঈদকে ঈদুল ফিতর এবং এই দিনে মুসলমাদের একত্রিত হয়ে শোকর আদায়ের জন্য যে দুই রাকআত নামায পড়া হয় তাকে ঈদুল ফিতরের নামায বলে।

* ঈদুল ফিতরের দুই রাকআত নামায ওয়াজিব।

* এই দুই রাকআতে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর বলা ওয়াজিব।

* খুতবা ব্যতীত জুমুআর নামাযের জন্য যে সব শর্ত, ঈদের নামাযের জন্যও সে সব শর্ত।

* ঈদুল আযহা-র তুলনায় ঈদুল ফিতরের জামাআত একটু দেরী করে পড়া সুন্নাত।

* ঈদের নামায মাঠে পড়া উত্তম। মহল্লার মসজিদেও জায়েয।

* কোন ওযর বশতঃ পয়লা শাওয়াল ঈদুল ফিতরের নামায পড়তে না পারলে ২রা শাওয়াল পড়ে নেয়া জায়েয, তবে বিনা ওযরে এরূপ করলে নামায হবে না।

* ঈদের নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়া পড়া উত্তম। (الفقه على المذاهب الاربعة)

* দুই রাকআত ঈদুল ফিতরের নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়-

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىِ الْوَاجِبِ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبَاتٍ ـ

বাংলায় ঃ ঈদুল ফিতরের দুই রাকআত নামায ছয়টি ওয়াজিব তাকবীর সহ আদায় করছি।

ঈদুল ফিতরের নামায পড়ার তরীকা ঃ

* আল্লাহু আকবার বলে নিয়ত বাঁধবে।

* তারপর ছানা পড়বে।

* তারপর নামাযের তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলবে এবং হাত ছেড়ে দিবে। অতঃপর তিনবার সোবহানাল্লাহ বলা যায় পরিমাণ বিলম্ব করে আবার অনুরূপ হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলবে ও হাত ছেড়ে দিবে। আবার অনুরূপ বিলম্ব পূর্বক হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার

বলে হাত বেঁধে নিবে এবং আউযূ বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা ও কেরাত ইত্যাদি সহকারে প্রথম রাকআত শেষ করে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠবে এবং সূরা ফাতেহা ও সূরা/কেরাত মিলিয়ে তারপর প্রথম রাকআতের ন্যায় অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলবে। এখানে তৃতীয় তাকবীরের পরও হাত ছাড়া অবস্থায় রাখবে। তারপর রুকুর তাকবীর বলে রুকুতে যাবে এবং যথা নিয়মে এই রাকআত শেষ করবে।

ঈদুল ফিতরের খুতবা ও তখনকার আমল সমূহ ঃ

* ঈদুল ফিতরের দুই খুতবা পাঠ করা সুন্নাত। এই খুতবাদ্বয় নামাযের পরে হওয়া সুন্নাত।

* এই খুতবা মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে পাঠ করা সুন্নাত।

* দুই খুতবার মাঝখানে জুমুআর খুতবার ন্যায় কিছুক্ষণ (তিন আয়াত পড়া পরিমাণ সময়) বসা সুন্নাত।

* এই খুতবা শোনা ওয়াজিব যেমন জুমুআর খুতবা শোনা ওয়াজিব। দূরত্বের কারণে খুতবা না শুনতে পেলে চুপ করে কান লাগিয়ে থাকা ওয়াজিব।

ঈদুল ফিতরের খুতবার মধ্যে যে সব বিষয় থাকবে ঃ

* জুমুআর খুতবার মধ্যে যে সব বিষয় থাকবে ঈদের খুতবার মধ্যেও সে সব বিষয় থাকবে। পার্থক্য এই যে, মিম্বরে উঠে না বসেই ঈদের খুতবা শুরু করা সুন্নাত এবং ঈদুল ফিতরের খুতবার মধ্যে ছদকায়ে ফিতর সম্বন্ধে বর্ণনা করতে হবে আর তাকবীর (আল্লাহু আকবর) বলে ঈদের খুতবা আরম্ভ করা সুন্নাত। প্রথম খুতবার শুরুতে তাকবীর নয় বার একাধারে এবং দ্বিতীয় খুতবার শুরুতে সাত বার একাধারে বলা আর সব শেষে মিম্বর থেকে অবতরণের সময় ১৪ বার একাধারে বলা মোস্তাহাব।(بہشتی گوہر واحسن الفتاوی ج/٤ بحوالہ در المختار ج/١)।

বিঃদ্রঃ ঈদের নামাযের (বা খুতবার) পরে দু'আ (মুনাজাত) করা যদিও নবী (সঃ) সাহাবী এবং তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন থেকে বর্ণিত ও প্রমাণিত নয়, কিন্তু অন্যান্য নামাযের পর যেহেতু দু'আ করা সুন্নাত, তাই ঈদের নামাযের পরও দু'আ করা সুন্নাত হবে। (بہشتی گوہر) আহছানুল ফাতাওয়া গ্রন্থকার (৪র্থ খণ্ড দ্রঃ) খুতবার পর কিম্বা নামায ও খুতবা উভয়টার পরও দু'আ করা যেতে পারে বলে যুক্তি পেশ করেছেন।

ঈদুল আযহার নামায

* জিলহজ্ব মাসের ১০ই তারিখের ঈদকে ঈদুল আযহা বলে। এই দিনও দুই রাকআত শোকরানা নামায পড়া ওয়াজিব। এটাই ঈদুল আযহার নামায।

* ঈদুল আযহার নামাযের মাসায়েল ঈদুল ফিতরের নামাযের ন্যায়। শুধু নিয়তের মধ্যে "ঈদুল ফিতর" শব্দের স্থলে "ঈদুল আযহা" শব্দ ব্যবহার করতে হবে। এবং ঈদুল ফিতরের নামাযের তুলনায় ঈদুল আযহার নামায একটু আগে ভাগে পড়ে নেয়া সুন্নাত। আর কোন ওযর বশতঃ ১০ই তারিখে এই নামায না পড়তে পারলে ১১ই বা ১২ই তারিখ পর্যন্তও পড়া যায়, তবে বিনা ওযরে ১০ই তারিখে না পড়া মাকরূহ।

* ঈদুল আযহার নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব। (দেখুন ২৯৯ পৃঃ) (احسن الفتاوى ج/٤)

ঈদুল আযহার খুতবা ও তখনকার আমল সমূহ

ঈদুল আযহার খুতবাও ঈদুল ফিতরের খুতবার ন্যায়। পার্থক্য এতটুকু যে, ঈদুল আযহার খুতবায় ছদকায়ে ফিতরের বর্ণনার স্থলে কুরবানী ও তাকবীরে তাশরীকের বিধান (২৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) বর্ণনা করতে হবে।

তাহাজ্জুদের নামায

* ঈশার নামাযের পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত যে নফল নামায পড়া হয় তাকে 'সালাতুল লাইল' বা 'তাহাজ্জুদের নামায' বলা হয়। নফল নামাযের মধ্যে এই প্রকার নফল অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ফযীলত সবচেয়ে অধিক।

* ঈশার নামাযের পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত তাহাজ্জুদের সময়। তবে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়া উত্তম।

* তাহাজ্জুদের নামায দুই থেকে বার রাকআত। নবী (সঃ) সাধারণতঃ আট রাকআত পড়তেন বিধায় এটাকেই উত্তম বলা হয়েছে। পারলে আট রাকআত নতুবা চার রাকআত আর তাও হিম্মত না হলে দুই রাকআত হলেও পাঠ করবে।

* তাহাজ্জুদের নামাযের কাজা নেই, তবে রাতে পড়তে না পারলে পরের দিন দুপুরের পূর্বে অনুরূপ পরিমাণ নফল পড়ে নেয়া উত্তম। (فتاوى دار العلوم ج/٤)

* তাহাজ্জুদের নামায যে কোন সূরা দিয়ে পাঠ করা যায়, তবে কেরাত লম্বা হওয়া উত্তম।

* দুই রাকআত তাহাজ্জুদের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ رَكْعَتَىِ التَّهَجُّدِ

বাংলায় ঃ দুই রাকআত তাহাজ্জুদের নিয়ত করছি।

তাহিয়্যাতুল উযূ নামায

* উযূ করার পর অঙ্গ শুকানোর পূর্বেই (শামী) দুই রাকআত নফল নামায পড়া উত্তম। এই নামাযকে "তাহিয়্যাতুল উযূ" বা 'শুকরুল উযূ'ও বলা হয়। এই নামাযের অনেক ফযীলত, এমনকি এই নামায আদায়কারীর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার কথাও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

* ফজরের নামাযের ওয়াক্তে বা কোন মাকরূহ কিম্বা হারাম ওয়াক্তে এই নামায পড়বে না।

* এই নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ رَكْعَتَىْ تَحِيَّةِ الْوُضُوْءِ

বাংলায় ঃ দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল উযূর নিয়ত করছি।

(মনে মনে নিয়ত করলেও চলে, তবে মুখে উচ্চারণ করা উত্তম)

দুখূলুল মসজিদ বা তাহিয়্যাতুল মসজিদ-এর নামায

* মসজিদে প্রবেশ করলে এবং মাকরূহ বা হারাম ওয়াক্ত না হলে মসজিদের তথা আল্লাহর তাযীমের উদ্দেশ্যে দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়তে হয়, এই নামাযকে 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' বা 'দুখূলুল মসজিদ' বলা হয়।

* এক দিনে একবার এই নামায পড়াই যথেষ্ট।

* মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বেই এই নামায পড়ে নেয়া উত্তম। আগে বসে তারপর এই নামায পড়লেও হয়, তবে তাতে ছওয়াব কমে যায়।

* ওয়াক্ত সংকীর্ণ থাকলে কিম্বা প্রবেশ করতঃ দ্রুত অন্য কোন সুন্নাত অথবা ফরয নামায পড়লে সেই ফরয বা সুন্নাতের দ্বারাও এই নামাযের হক আদায় হয়ে যায় এবং তার ছওয়াব লাভ হয়।

* ওয়াক্ত সংকীর্ণ বা নিষিদ্ধ (যেমন ফজরের ওয়াক্ত বা মাকরূহ ওয়াক্ত বা হারাম ওয়াক্ত) হওয়ার দরুন এই নামায পড়তে না পারলে এর বিকল্প হিসেবে নিম্নোক্ত দুআটি চারবার পড়ে নিবে ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

* তারপর একবার দুরূদ শরীফ পড়ে নিবে।

* এই নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ

বাংলায় ঃ দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদের/দুখূলুল মসজিদের নিয়ত করছি।

ইশ্‌রাক এর নামায

* সূর্য উদয়ের পর যে দুই বা চার রাকআত নফল নামায পড়া হয়, তাকে ইশ্‌রাক-এর নামায বলে। এই নামায দ্বারা এক হজ্ব ও এক উমরার ছওয়াব পাওয়া যায়।

* সূর্য উদয়ের আনুমানিক দশ/বার মিনিট পর[১] থেকে ইশ্‌রাকের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত ওয়াক্ত বাকী থাকে। তবে ওয়াক্তের শুরুতেই পড়ে নেয়া উত্তম।

* ফজরের নামায আদায়ের পর সেই স্থানেই বসে থেকে দুআ দুরূদ, যিকির-আযকার ও তাসবীহ তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকবে; দুনিয়াবী কোন কথা বা কাজে লিপ্ত হবে না এবং সময় হয়ে গেলে ইশ্‌রাকের নামায আদায় করবে। এভাবে ইশরাক এর নামায আদায় করাতে ছওয়াব বেশী। দুনিয়াবী কথাবার্তা বা কাজে লিপ্ত হয়ে গেলেও সময় হওয়ার পর ইশ্‌রাকের নামায আদায় করা যায় তবে তাতে ছওয়াব কিছু কমে যায়।

* ইশ্‌রাকের নামায যে কোন সূরা/কেরাত দিয়ে পড়া যায়।

* এই নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়-

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْاِشْرَاقِ

বাংলায় ঃ দুই রাকআত ইশ্‌রাক নামাযের নিয়ত করছি।

---

১. نماز مسنون ও احسن الفتاوى ج/ ٢ و ج/ ٣ এর বর্ণনা অনুযায়ী ইশ্‌রাকের ওয়াক্তের এই বিবরণ পেশ করা হল। যদিও সাধারণ ভাবে সূর্যোদয়ের ২৩ মিনিট পরের কথা প্রসিদ্ধ আছে।

চাশ্‌ত এর নামায

* আনুমানিক নয়/দশটার দিকে যে নফল নামায পড়া হয় তাকে ছালাতুয যোহা বা চাশ্‌তের নামায (বা আওয়াবীনের নামাযও) বলা হয়। এই নামায দুই রাকআত পাঠ করলে তাকে গাফেলদের তালিকাভুক্ত করা হয় না। চার রাকআত পাঠ করলে তাকে আবিদীন বা ইবাদতকারীদের তালিকাভুক্ত করা হয়। ছয় রাকআত পাঠ করলে ঐ দিন তার (নফল ইবাদতের) জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। আট রাকআত পাঠ করলে আল্লাহ তাকে আনুগত্যকারীদের তালিকাভুক্ত করেন, আর বার রাকআত পাঠ করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটা ঘর তৈরি করেন (مجمع الزوائد بحو الله طبرانى)

* ইশ্‌রাক আদায়ের পর থেকে দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত এই নামাযের ওয়াক্ত। তবে দিনের এক চতুর্থাংশ যাওয়ার পর অর্থাৎ, আনুমানিক নয়/ দশটার দিকে পড়া উত্তম।

* এই নামায দুই থেকে বার রাকআত। তবে রাসূল (সঃ) সাধারণতঃ চার রাকআত পাঠ করতেন। মাঝে মধ্যে বেশীও পাঠ করতেন।

* চাশ্‌ত এর নামায যে কোন সূরা/ কেরাত দিয়ে পড়া যায়।

* দুই রাকআত চাশ্‌তের নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ رَكْعَتَىِ الضُّحٰى

বাংলায় ঃ দুই রাকআত চাশ্‌তের নামাযের নিয়ত করছি।

যাওয়াল বা সূর্য ঢলার নামায

* দুপুরে পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলার পর যে চার রাকআত নফল আদায় করা হয় তাকে বলা হয় যাওয়ালের নামায বা সূর্য ঢলার নামায। রাসূল (সঃ) সর্বদা এই নফল আদায় করতেন। সূর্য ঢলার সময় আসমানের রহমতের দরজা খোলা হয় বিধায় তখন এই নফল পাঠের ফযীলত অধিক।

* রাসূল (সঃ) এক সালামেই এই চার রাকআত নফল আদায় করতেন। (نماز مسنون)

* চার রাকআত যাওয়াল নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ اَرْبَعَ رَكَعَاتِ الزَّوَالِ

বাংলায় ঃ চার রাকআত যাওয়াল নামাযের নিয়ত করছি।

আওয়াবীন নামায

* মাগরিবের ফরয এবং সুন্নাতের পর কমপক্ষে ছয় রাকআত এবং সর্বাপেক্ষা বিশ রাকআত নফলকে আওয়াবীনের নামায বলা হয়। হাদীসে এই ছয় রাকআত আওয়াবীনের ফযীলতে বার বৎসর ইবাদত করার ছওয়াব অর্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। অপর এক হাদীসে বিশ রাকআত পাঠ করলে জান্নাতে আল্লাহ তার জন্য একটা ঘর তৈরি করবেন বলা হয়েছে।

* দুই রাকআত আওয়াবীনের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْاَوَّابِيْنَ

বাংলায় ঃ দুই রাকআত আওয়াবীনের নিয়ত করছি।

সালাতুত তাছবীহ

* চার রাকআত নফল নামায যার প্রত্যেক রাকআতে سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ৭৫ বার এবং সর্বমোট ৪ রাকআতে ৩০০ বার এই তাসবীহ পাঠ করা হয়, এই নামাযকে সালাতুত্তাছবীহ বলে। এই নামায দ্বারা জীবনের ছোট বড় নতুন পুরাতন ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত গোপন প্রকাশ্য সব রকমের পাপ আল্লাহ মাপ করে দেন। রাসূল (সঃ) তাঁর চাচা আব্বাছ (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ চাচা! পারলে প্রতিদিন এই নামায পড়ুন, তা না পারলে প্রতি সপ্তাহে পড়ুন, তা না পারলে প্রতি মাসে না পারলে প্রতি বৎসরে, না হয় অন্ততঃ জীবনে একবার হলেও এই নামায পড়ুন।

* চার রাকআত সালাতুত তাছবীহ নফল নামাযের নিয়ত করতঃ যথারীতি সূরা ফাতেহার পর সূরা/কেরাত পাঠ করে তারপর দাঁড়ানো অবস্থাতেই উক্ত তাছবীহ ১৫ বার পড়বে, তারপর রুকূতে গিয়ে রুকুর তাছবীহ পড়ার পর উক্ত তাছবীহ ১০ বার, তারপর রুকূ থেকে উঠে 'রাব্বান্না লাকাল হাম্‌দ' বলার পর উক্ত তাছবীহ ১০ বার, তারপর সাজদায় গিয়ে সাজদার তাছবীহ বলার পর উক্ত তাছবীহ ১০ বার, সাজদা থেকে উঠে দুই সাজদার মাঝখানে বসে ১০ বার পড়বে। তারপর দ্বিতীয় সাজদায় অনুরূপ ১০ বার, তারপর দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে বসে ১০ বার পড়বে। এই হল ১ রাকআতে ৭৫ বার। এরপর (আল্লাহু আকবার বলা ব্যতীতই) দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠবে এবং এইরূপে দ্বিতীয় রাকআত পড়বে। যখন দ্বিতীয় রাকআতে আত্তাহিয়াতু .... পড়ার জন্য বসবে তখন আগে উক্ত তাছবীহ ১০ বার পড়বে তারপর আত্তাহিয়্যাতু ...... পড়বে। তারপর আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় রাকআতের জন্য উঠবে। অতঃপর

তৃতীয় রাকআত ও চতুর্থ রাকআতেও উক্ত নিয়মে উক্ত তাছবীহ পাঠ করবে[১]।কোন একস্থানে উক্ত তাছবীহ পড়তে সম্পূর্ণ ভুলে গেলে বা ভুলে নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে কম থেকে গেলে পরবর্তী যে রুকনেই স্মরণ আসুক সেখানে তথাকার সংখ্যার সাথে এই ভুলে যাওয়া সংখ্যাগুলোও আদায় করে নিবে। আর এই নামাযে কোন কারণে সাজদায়ে সহো ওয়াজিব হলে সেই সাজদা এবং তার মধ্যকার বৈঠকে উক্ত তাসবীহ পাঠ করতে হবে না। তাসবীহের সংখ্যা স্মরণ রাখার জন্য আঙ্গুলের কর গণনা করা যাবে না তবে আঙ্গুল চেপে চেপে স্মরণ রাখা যেতে পারে।

বিঃ দ্রঃ সালাতুত তাছবীহ পড়ার আরও একটি নিয়ম রয়েছে। তবে উপরোল্লিখিত নিয়মটি উত্তম।

দ্বিতীয় নিয়মে যদি কেউ পড়তে চায়, তাহলে নিয়ত বাঁধার পর প্রথম রাকআতে ছানা-সুবহানাকা .... পাঠ করার পর উক্ত দুআটি ১৫ বার এবং সূরা কেরাত শেষ করে রুকূর পূর্বে ১০ বার পড়বে। তারপর রুকুতে, রুকূ থেকে খাড়া হয়ে, প্রথম সাজদায়, দুই সাজদার মাঝখানে এবং দ্বিতীয় সাজদায় পূর্বের নিয়মে ১০ বার করে পড়বে। এ নিয়মে দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে বসে ১০ বার পড়তে হবে না বরং দ্বিতীয় সাজদা থেকে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকআতেও সূরা কেরাতের পূর্বে ১৫ বার এবং সূরা কেরাতের পর রুকূর পূর্বে ১০ বার করে উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে। এ নিয়মে প্রথম এবং শেষ বৈঠকে বসে আত্তাহিয়্যাতু-র পূর্বে ১০ বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করতে হবেনা।

* এই নামায একাকী পড়তে হয়-জামাআতের সাথে এই নামাজ পড়া দুরস্ত নয়। (نماز مسنون)

* মাকরূহ ওয়াক্ত ব্যতীত দিবা রাত্রির যে কোন সময়ে এই নামায পড়া যায়, তবে সবচেয়ে উত্তম হল সূর্য ঢলার পর পড়া, তারপর দিনে, তারপর রাত্রে। (فضائل ذكر)

* যে কোন সূরা দিয়ে এই চার রাকআত নামায পড়া যায় তবে কেউ কেউ বলেছেন, এই নামাযে সূরা আছর, কাউছার, কাফেরূন ও এখলাছ বা সূরা হাদীদ, হাশর, ছফ ও তাগাবুন পড়া ভাল। (বেহশতী জেওর, ১ম)

* এই চার রাকআত নামাযের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلَاةِ التَّسْبِيْحِ

বাংলায় ঃ চার রাকআত সালাতুত্তাছবীহের নিয়ত করছি।

---

১. তৃতীয় রাকআতের সাজদা থেকে উঠে তাসবীহ পড়ার পর ৪র্থ রাকআতের জন্য উঠার সময়ও আল্লাহু আকবার বলবে না। (احسن الفتاوى ج/٣)

এস্তেখারার নামায

* যখন কোন মোবাহ ও জায়েয কাজের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয় (ফরয ওয়াজিব কিম্বা নাজায়েয কাজের জন্য এস্তেখারা নেই।) যেমন কোথায় বিবাহ শাদী করব, বিদেশ যাত্রা করব কিনা, বা হজ্বে কোন তারিখ যাব (হজ্বে যাব কি না-এরূপ এস্তেখারা হয় না) ইত্যাদি বিষয়ে মন স্থির করতে না পারলে বিশেষ এক পদ্ধতিতে আল্লাহর নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করাকে এস্তেখারা বলে।

* এস্তেখারার তরীকা হলঃ দুই রাকআত নফল নামায পড়ে মনোযোগের সাথে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করা, তারপর মনের মাঝে যে দিকে অধিক ঝোঁক সৃষ্টি হয় কিম্বা যে বিষয়টা অধিক কল্যাণ জনক মনে হয়, তাতে কল্যাণ নিহিত রয়েছে মনে করে সেটা করা। এক দিনে মনের অবস্থা এরূপ না হলে সাত দিন করা। তারপরও মন কোন দিকে না ঝুঁকলে ভাল মন্দ বিবেচনা পূর্বক কাজ করে ফেললে এস্তেখারার বরকতে এবং আল্লাহর রহমতে মঙ্গল হবে।

বিঃ দ্রঃ এস্তেখারা রাতের বেলায় করা এবং এস্তেখারার পর শয়ন করা এবং স্বপ্নের মাধ্যমেই এস্তেখারার ফল জানা যাবে-এরূপ জরুরী নয়। এস্তেখারা যে কোন সময় করা যায়। এস্তেখারার পর শয়ন করাও জরুরী নয়–জাগ্রত অবস্থায়ও তার মন যে কোন এক দিকে ঝুঁকে যেতে পারে, আবার স্বপ্নের মাধ্যমেও কিছু জানতে পারে। (اغلاط العوام)

এস্তেখারার দুআ এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ۔

(এইখানে) هٰذَا الْاَمْرَ বলার সময় নিজের উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করবে)

خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ۔

(এইখানেও هٰذَا الْاَمْرَ বলার সময় নিজের উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করবে)

شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ ۔

* এস্তেখারার এই লম্বা দুআ মুখস্ত না থাকলে সংক্ষিপ্ত এই দুআটি পড়ে নিবে– اَللّٰهُمَّ خِرْلِيْ وَاخْتَرْلِيْ

* এস্তেখারার উপরোক্ত আরবীতে বর্ণিত দুআটি পড়া উত্তম, না পারলে মাতৃভাষায়ও দুআ করা যায়। (اغلاط العوام)

* এস্তেখারার নামায পড়ার সময় না পেলে শুধু দুআ পড়াই যথেষ্ট।

সালাতুল কাতল বা নিহত হওয়াকালীন নামায

কোন মুসলমান যদি অবগত হতে পারে যে, তাকে হত্যা করা হবে বা ফাঁসি দেয়া হবে, তার জন্য দুই রাকআত নফল নামায পড়ে নেয়া মোস্তাহাব। নামায পাঠ পূর্বক আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এই নামাযকে 'সালাতুল কাতল' বা নিহত হওয়াকালীন নামায বলে। এই নামাযের জন্য গোসল করে নেয়া মোস্তাহাব।

তওবার নামায

কারও থেকে কোন পাপ সংঘটিত হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ পবিত্রতা অর্জন করে দুই রাকআত নফল নামায পাঠ পূর্বক আল্লাহর নিকট অনুনয় বিনয় করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিজের পাপের প্রতি অনুতপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে না করার জন্য পোক্ত ইরাদা করবে, তাহলে আল্লাহ্ তার পাপকে ক্ষমা করবেন। এই নামাযকে 'সালাতুত্তাওবা' অর্থাৎ, তওবার নামায বলে। এই নামাযের জন্য গোসল করে নেয়া মোস্তাহাব।

সালাতুল হাজাত বা প্রয়োজনের মুহূর্তে নামায

আল্লাহর নিকট বা বান্দার নিকট বিশেষ কোন প্রয়োজন হলে কিম্বা শারীরিক মানসিক যে কোন পেরেশানী দেখা দিলে উত্তম ভাবে উযূ করে দুই রাকআত নফল নামায পড়বে। অতঃপর আল্লাহর হাম্দ ও ছানা (প্রশংসা) এবং দুরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহর নিকট দুআ করবে। বিশেষভাবে হাদীসে নিম্নোক্ত দুআ পাঠের কথা বর্ণিত আছে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ

كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

ভয়াবহ পরিস্থিতির নামায

* যখন কোন ভয়াবহ পরিস্থিতি আসে তখনও নামায পড়া সুন্নাত। যেমন ঝড়ের সময়, ভূমিকম্পের সময়, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের সময়, প্লাবনের সময়, কলেরা বসন্ত প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দেখা দিলে ইত্যাদি। তবে এই নামাযের জন্য জামাআত নেই– প্রত্যেকেই নিজে নিজে পৃথকভাবে পড়বে এবং নামায পড়ে আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে দুআ করবে।

* এই নামাযের জন্য গোসল করে নেয়া মোস্তাহাব।

মারাত্মক ধরনের বিপদে কুনূতে নাযেলার আমল

মারাত্মক ধরনের বিপদ বা ফেতনার সময় ফজরের নামাযে কুনূতে নাযেলার আমল করা রাসূল (সঃ) থেকে প্রমাণিত রয়েছে। যেমন– মুসলমানদের উপর শত্রুর আক্রমণ হলে বা যুদ্ধ লাগলে মুসলমানদের জন্য দু'আ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে বদদু'আ করার জন্য এ আমল করা হয়ে থাকে। ফজরের নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে রুকূর থেকে উঠার পর সোজা দাঁড়িয়ে হাত ছাড়া অবস্থায় কুনূতে নাযেলা পাঠ করা হয়। ইমাম কুনূত পাঠ করবেন আর মুক্তাদীগণ আস্তে আস্তে আমীন বলবেন। দু'আ পাঠ শেষ হলে যথারীতি সাজদা করা হবে। কুনূতে নাযেলা (-এর দুআ) এভাবে পাঠ করা যায় ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَ قِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَ لَا يُقْضٰي عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَيْتَ ـ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ لَا نَكْفُرُكَ وَ نُؤْمِنُ بِكَ وَ نَخْلَعُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ـ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ لَكَ نُصَلِّيْ وَ نَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَ نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

- اَللّٰهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَ يُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَ يُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَائَكَ - اَللّٰهُمَّ اغْفِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ اَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَ اَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ اجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَ الْحِكْمَةَ وَ ثَبِّتْهُمْ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَوْزِعْهُمْ اَنْ يُّوْتُوْا بِعَهْدِكَ الَّذِىْ عَاهَدْتَّهُمْ عَلَيْهِ وَ انْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَ عَدُوِّهِمْ اِلٰهَ الْحَقِّ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ - اَللّٰهُمَّ اَنْجِ ...... وَ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ - اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَ طْأَتَكَ عَلٰى .... وَ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ -

প্রথম শূন্য স্থানে যে ব্যক্তি বা যে সম্প্রদায়ের জন্য দু'আ করা হবে তার বা তাদের নাম আর দ্বিতীয় শূন্যস্থানে যে বা যাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করা হবে তার বা তাদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

সফরের নামায

* সফরের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দুই রাকআত এবং সফর থেকে ফিরে দুই রাকআত নামায পড়া মোস্তাহাব। একে সফরের নামায বলে।

* সফর থেকে ফিরে আগে মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায পড়বে তারপর বাড়ি যাবে। এরূপ করা মোস্তাহাব।

* সফরের মধ্যেও যদি কোন স্থানে কিছুকাল অবস্থান করার ইচ্ছা হয়, তবে সেখানে বসার পূর্বেই দুই রাকআত নামায পড়ে নেয়া মোস্তাহাব (বেহেশতি জেওরঃ ১ম)

কছরের নামায

* যদি কোন ব্যক্তি মোটামুটি ৪৮ মাইল (৭৭.২৪৬৪ অর্থাৎ, প্রায় সোয়া সাতাত্তর কিলোমিটার) রাস্তা অতিক্রম করে কোন স্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজ এলাকার লোকালয় থেকে বের হয়, তাকে শরীয়তের পরিভাষায় মুছাফির বলা হয়।

* মুছাফির ব্যক্তি পথিমধ্যে চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামায (অর্থাৎ ,জোহর, আসর ও ঈশার ফরয নামায)-কে দুই রাকআত পড়বে। একে কছরের নামায বলে। তিন রাকআত বা দুই রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামায, ওয়াজিব নামায এমনি ভাবে সুন্নাত নামাযকে পূর্ণ পড়তে হবে। এ হল পথিমধ্যে থাকাকালীন সময়ের বিধান। আর গন্তব্য স্থানে পৌঁছার পর যদি সেখানে ১৫ দিন বা তদুর্ধকাল থাকার নিয়ত হয় তাহলে কছর হবে না– নামায পূর্ণ পড়তে হবে। আর যদি ১৫ দিনের কম থাকার নিয়ত থাকে তাহলে কছর হবে। গন্তব্যস্থান নিজের বাড়ি হলে কছর হবে না চাই যে কয় দিনই থাকার নিয়ত হোক।

* মুছাফির ব্যক্তি মুকীম ইমামের পেছনে এক্তেদা করলে পূর্ণ নামাযই পড়তে হয়।

* মুছাফির ব্যক্তির ব্যস্ততা থাকলে ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্যান্য সুন্নাত ছেড়ে দেয়া দুরস্ত আছে। ব্যস্ততা না থাকলে সব সুন্নাত পড়তে হবে।

* যারা লঞ্চ, স্টীমার, প্লেন, বাস, ট্রাক ইত্যাদির চালক বা কর্মচারী, তারাও অনুরূপ দূরত্বের সফর হলে পথিমধ্যে কছর পড়বে। আর গন্তব্য স্থানের মাসআলা উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী হবে।

* ১৫ দিন বা তার বেশী থাকার নিয়ত হয়নি এবং পূর্বেই চলে যাব চলে যাব করেও যাওয়া হচ্ছে না-এভাবে ১৫ দিন বা তার বেশী থাকা হলেও কছর পড়তে হবে।

সালাতুত তালিবে ওয়াল মাতলূব

* যদি কোন ব্যক্তি শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে দ্রুত চলতে থাকে, তাহলে তার জন্য সেই চলন্ত অবস্থায় নামায পড়া জায়েয নয়, সওয়ারীতে থাকলে সওয়ারী থেকে অবতরণ করে তাকে নামায পড়তে হবে। এরূপ ব্যক্তির নামাযকে "সালাতুত্তালিব" বলে। (نماز مسنون)

* যদি কোন ব্যক্তি শত্রু কর্তৃক তাড়িত হয়ে দ্রুত পথ চলতে থাকে, তাহলে সওয়ারীতে থাকা অবস্থায় চলতে চলতে ইশারায় নামায পড়ে নিতে পারে। আর যদি পায়ে পথ চলতে থাকে বা পানিতে সাঁতরাতে থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় নামায জায়েয নয়। এরূপ ব্যক্তির নামাযকে "সালাতুল মাতলূব" বলে।

(نماز مسنون)

সালাতুল মারীয বা অসুস্থ ব্যক্তির নামায

* অসুস্থ থাকার কারণে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম না হলে বসে নামায পড়বে, বসে রুকু করবে এবং উভয় সাজদা করবে। রুকুর জন্য এতটুকু ঝুঁকবে যেন কপাল হাঁটুর কিনারা বরাবর হয়ে যায়।।

* রুকু সাজদা করার ক্ষমতা না থাকলে মাথার ইশারায় রুকূ সাজদা করবে। রুকুর তুলনায় সাজদার জন্য মাথা বেশী ঝুঁকাবে। সাজদার জন্য বালিশ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই বরং বালিশ ইত্যাদি উঁচু বস্তুর উপর সাজদা করা ভাল নয়।

* দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অনেক কষ্ট হলে বা রোগ বেড়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা থাকলে বসে নামায পড়া দুরস্ত আছে।

* যদি কেউ দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু রুকূ সাজদা করতে সক্ষম নয় তাহলে সে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে এবং রুকূ সাজদার জন্য ইশারা করতে পারে, তবে তার জন্য বসে নামায পড়া উত্তম। রুকূ সাজদার জন্য ইশারা করবে।

* যদি নিজ ক্ষমতায় বসতে সক্ষম না হয় কিছুতে হেলান দিয়ে বা টেক দিয়ে বসতে সক্ষম হয়, তাহলে হেলান দিয়ে বসে নামায পড়বে। হাঁটু খাড়া রাখতে পারলে খাড়া রাখবে নতুবা হাঁটুর তলে বালিশ দিয়ে হাঁটু উঁচু করে রাখবে যেন যথা সম্ভব কেবলার দিক থেকে পা ফিরে থাকে।

* যদি হেলান দিয়েও বসতে সক্ষম না হয় তাহলে মাথার নীচে বালিশ ইত্যাদি দিয়ে মাথা উঁচু করে কেবলামুখী করে দিয়ে নামায পড়বে। এরূপ অবস্থায় মাথা উত্তর দিকে দিয়ে ডান কাতে শুয়ে বা মাথা দক্ষিণ দিকে দিয়ে বাম কাতে শুয়ে কেবলার দিকে মুখ করেও নামায পড়া দুরস্ত আছে। এ সব অবস্থায়ই মাথার ইশারায় রুকূ সাজদা করবে।

* যদি মাথা দ্বারা রুকূ সাজদার জন্য ইশারা করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে চক্ষুর দ্বারা ইশারায় নামায আদায় হবে না। এরূপ অবস্থায় নামায ফরযও থাকে না। এরূপ অবস্থা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পর্যন্ত থাকলে ঐ নামাযগুলোর কাযা করতে হবে। আর পাঁচ ওয়াক্তের বেশী স্থায়ী হলে তার কাযাও করতে হবে না।

* কারও বেহুশ থাকা অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্তের বেশী নামায ছুটে গেলে তার কাযা করতে হবে না।

* দাঁড়িয়ে নামায শুরু করার পর যদি এমন হয়ে যায় যে, দাঁড়ানোর শক্তি রইল না, তাহলে অবশিষ্ট নামায বসে পড়বে। রুকূ সাজদা করতে পারলে করবে

নতুবা মাথার ইশারায় রুকূ সাজদা করবে। এমনকি বসতে না পারলে শুয়ে শুয়ে অবশিষ্ট নামায আদায় করে নিবে।

* কেউ বসে নামায শুরু করার পর নামাযের মধ্যেই দাঁড়ানোর শক্তি এসে গেছে, তাহলে অবশিষ্ট নামায দাঁড়িয়ে পূর্ণ করবে।

* যদি কেউ মাথার ইশারায় নামায পড়া শুরু করার পর বসে বা দাঁড়িয়ে রুকূ সাজদা করার মত শক্তি পায় তাহলে নতুন নিয়ত বেঁধে নতুন করে পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে– পূর্বের নামাযের নিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

* রোগী পেশাব পায়খানার পর পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করতে সক্ষম না হলে পুরুষ হলে তার স্ত্রী কিম্বা স্ত্রী হলে তার স্বামী পানির দ্বারা এস্তেঞ্জা করিয়ে দিলে ভাল। নতুবা নেকড়ার দ্বারা মুছে ঐ অবস্থায়ই নামায পড়ে নিবে। যদি নেকড়ার দ্বারা মুছবার মত শক্তি না থাকে (এবং পুরুষের স্ত্রী বা স্ত্রীর স্বামী না থাকে) তাহলেও ঐ অবস্থায় নামায পড়ে নিবে।

* রোগীর বিছানা যদি নাপাক হয় এবং বিছানা বদলাতে যদি রোগীর অতিশয় কষ্ট হয় বা ক্ষতি হয়, তাহলে ঐ বিছানাতেই নামায পড়ে নিবে।

* ডাক্তার চক্ষু অপারেশনের পর নড়াচড়া করতে নিষেধ করলে এমতাবস্থায় শুয়ে শুয়ে হলেও নামায পড়ে নিবে।

সালাতুল খাওফ বা ভয়কালীন নামায

* মানুষ বা হিংস্র প্রাণী বা অজগর ইত্যাদি শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার মুহূর্তে যে নামায পড়া হয়, তাকে বলে 'সালাতুল খাওফ' বা ভয়কালীন নামায।

* ভয়কালীন মুহূর্তে জামাআতে নামায পড়তে না পারলে একাকী নামায পড়ে নিবে। সওয়ারীতে বসা থাকলে আর নামতে না পারলে সওয়ারীতেই নামায পড়ে নিবে। তখন কেবলামুখী হওয়াও শর্ত নয়। আর যদি এতটুকুরও অবকাশ না পায় তাহলে তখন নামায পড়বে না– পরে অবস্থা শান্ত হলে কাযা করে নিবে।

* যে মুহূর্তে যুদ্ধ চলে তখন নামায পড়ার অবকাশ না পেলে বিলম্ব করবে এবং এ অবস্থায় ওয়াক্ত চলে গেলে পরে কাযা করে নিবে। (نماز مسنون)

* সকলে একত্রে জামাআতে নামায পড়তে না পারলে মুসলমানদেরকে দুইভাগে বিভক্ত করে আলাদা আলাদা জামাআত করে নিবে। তবে যদি দলে এমন কোন বুযুর্গ থাকেন যার পিছনে সকলেই নামায পড়তে চান এবং এক

জামাআত করতে চান তাহলে তার জন্যও নিয়ম রয়েছে, বিজ্ঞ আলেম থেকে সে নিয়ম জেনে নিবে।

* নৌকা জাহাজ ইত্যাদি ডুবে গেলে সন্তরণকালে যদি নামাযের ওয়াক্ত যাওয়ার মত হয় এবং কিছুকাল বয়া, বাঁশ, তক্তা ইত্যাদির সাহায্যে হাত পা সঞ্চালন বন্ধ রাখা সম্ভব হয়, তাহলেও সম্ভব হলে মাথার ইশারা দ্বারা নামায পড়ে নিতে হবে।

সালাতুল ফাতাহ্ বা বিজয়ের নামায

* মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সঃ) আট রাকআত নামায আদায় করেছিলেন, উলামায়ে কেরামের পরিভাষায় এটাকে সালাতুল ফাতাহ্ বা বিজয়ের নামায বলা হয়। মুসলমান আমীরগণও বিভিন্ন দেশ এবং নগরী বিজয়ের পর বিজয়ের শুকর স্বরূপ আট রাকআত নামায পড়তেন। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) মাদায়েন বিজয় ও খসরুর রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করতঃ এক সালামে আট রাকআত নামায আদায় করে ছিলেন।

(سیرۃ المصطفی ج ۳ نقلا عن البخاری وروض الانف)

শোকরের নামায

কোন বিশেষ নেয়ামত পাওয়ার বা কোন বিশেষ খুশীর খবর প্রাপ্ত হওয়ার মুহূর্তে শুকর স্বরূপ দুই রাকআত নামায পড়ার প্রমাণ রাসূল (সঃ) থেকে পাওয়া যায়। একে শোকরের নামায বলা হয়। একে 'সাজদায়ে শোকরও বলা হয়। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী "সাজদায়ে শোকর" কথাটির মধ্যে 'সাজদা' দ্বারা রূপক অর্থে নামায বোঝানো হয়েছে। শুকর স্বরূপ এই দুই রাকআত নামায পড়ে নিবে, শুধু সাজদা করা সুন্নাত নয়। (نماز مسنون) তবে সাধারণ ফতোয়া গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী উযূ সহকারে কেবলামুখী হয়ে একটা সাজদা দেয়ার মাধ্যমেও শোকর আদায় করা যায়।

সালাতুল কুছূফ (সূর্য গ্রহণের নামায)

* সূর্য গ্রহণের সময় মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে দুই রাকআত নামায পড়া সুন্নাত।

* সূর্য গ্রহণের নামাযের জন্য গোসল করা মোস্তাহাব।

* এই নামায জামাআতের সাথে পড়তে হয়। বাদশাহ, তাঁর নায়েব এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী মসজিদের ইমাম নিজ নিজ মসজিদে কুছূফের নামাজ পড়াতে

পারেন। এরূপ ইমাম না পাওয়া গেলে প্রত্যেকে একা একা পড়বে। আর স্ত্রী লোক নিজ নিজ গৃহে পৃথক পৃথক ভাবে এই নামায আদায় করবে।

* এই নামায সূরা বাকারার ন্যায় অনেক লম্বা কেরাত, লম্বা রুকূ ও লম্বা সাজদা সহকারে পড়া সুন্নাত।

* এই নামাযে কেরাত আস্তে পড়া উত্তম।

* নামায শেষে ইমাম কেবলামুখী হয়ে বসে বা লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ সূর্যের গ্রহণ সম্পূর্ণ না ছুটে ততক্ষণ পর্যন্ত দুআ করতে থাকবে। অবশ্য কোন নামাযের সময় এসে গেলে দুআ বন্ধ করে নামায পড়ে নিবে। (বেহেশতি জেওরঃ ১ম)

* সালাতুল কুছূফের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْكُسُوْفِ

বাংলায় ঃ দুই রাকআত কুছূফের নামায পড়ছি।

সালাতুল খুছূফ (চন্দ্র গ্রহণের নামায)

* চন্দ্র গ্রহণের সময়ও দুই রাকআত নামায পড়া সুন্নাত। তবে এই নামাযে জামাআত সুন্নাত নয় বরং প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে নামায পড়বে এবং নিজ ঘরে থেকে পড়বে। মসজিদে যাওয়াও সুন্নাত নয়।

* চন্দ্র গ্রহণের নামাযের জন্য গোসল করা মোস্তাহাব।

* দুই রাকআত সালাতুল খুছূফের নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْخُسُوْفِ

বাংলায় ঃ দুই রাকআত খুছূফের নামায পড়ছি।

এস্তেস্কার নামায

* যখন অনাবৃষ্টিতে লোকের কষ্ট হতে থাকে, তখন দুই রাকআত নামায আদায় পূর্বক আল্লাহর নিকট পানির জন্য দরখাস্ত করা এবং দুআ করা সুন্নাত। এই নামাযকে এস্তেস্কার নামায বলে।

* এস্তেস্কার মোস্তাহাব তরীকা এই যে, দেশের সমস্ত মুসলমান পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সহ সম্ভব হলে পায়ে হেটে গরীবানা লেবাস পোশাকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মাথা নীচু করে ময়দানে হাজির হবে। ময়দানে গমনের পূর্বেই খাঁটি অন্তরে

আল্লাহর নিকট তওবা এস্তেগফার করবে। কেননা পাপের দরুনই প্রায়শঃ বৃষ্টি বন্ধ হয় এবং অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কারও হক নষ্ট করে থাকলেও তা আদায় করে যাবে। ময়দানে সাথে কোন কাফেরকে নিবে না। জীব-জানোয়ার সাথে নেয়া যায়, তাতে আল্লাহর রহমত আকর্ষিত হবে। ময়দানে আযান ইকামত ব্যতীত দুই রাকআত নামায জামাআতের সাথে আদায় করবে। এই নামাযে কেরাত উচ্চস্বরে পাঠ করা হবে। নামাযের পর ঈদের খুতবার ন্যায় দুইটা খুতবা পাঠ করা হবে। তবে এই খুতবা পড়া হবে মাটিতে দাঁড়িয়ে এবং হাতে লাঠি বা তলোয়ার নিয়ে। খুতবার পর ইমাম কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উভয় হাত উঠিয়ে আল্লাহর নিকট পানির জন্য দুআ করবে। উপস্থিত সকলেও দুআ করবে। পরপর তিন দিন এরূপ করা মোস্তাহাব। এই তিন দিন রোযা রাখাও মোস্তাহাব। যদি ময়দানে পৌঁছার পূর্বেই কিম্বা তিন দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বৃষ্টি হয়ে যায় তবুও তিন দিন এরূপে পূর্ণ করা মোস্তাহাব। ময়দানে যাওয়ার পূর্বে সদকা খয়রাত করাও মোস্তাহাব।

* রাসূল (সঃ) চাদর মোবারক উল্টিয়েছেন, দুআর মধ্যে হাতের পিঠ আসমানের দিকে করেছেন এবং হাত এতটুকু উঁচু করেছেন যে, বগল দৃষ্টি গোচরে এসেছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে এগুলো করা জরুরী নয় তবে অবস্থা পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত ও শুভ লক্ষণ হিসেবে করা যেতে পারে।

* এস্তেস্কার নামাযের জন্য গোসল করে নেয়া মোস্তাহাব।

(بہشتی گوہر ۔ نماز مسنون و الفقه على المذاهب الاربعة)

নামাযের ফরয কি কি ঃ

নামাযে তেরটি ফরয। নামায আরম্ভ করার পূর্বে সাতটি ও নামায আরম্ভ করার পর ছয়টি কাজ ফরয। নামাযের পূর্বের সাতটিকে নামাযের শর্ত বলে আর মধ্যের গুলিকে নামাযের আরকান বলে। এই আরকান বা শর্ত সমূহের কোন একটিও ছুটে গেলে নামায হবে না।

নামাযের শর্ত সমূহ ঃ

১. সময় মত নামায পড়া। নামাযের সময় হবার পূর্বে নামায পড়লে নামায হবে না।

২. প্রকৃত অপ্রকৃত সর্ব প্রকার নাপাকী থেকে শরীর পবিত্র হতে হবে। অর্থাৎ উযূ না থাকলে উযূ করে নিতে হবে। গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করে নিতে হবে। শরীরে কোন নাপাকী লেগে থাকলে ধৌত করতে হবে।

৩. পোশাক-পরিচ্ছদ পাক হতে হবে। কাপড়ে গাঢ় অথবা পাতলা যে কোন প্রকারের নাপাকী লেগে থাকলে ধৌত করতে হবে।

৪. যে জায়গায় নামায পড়বে তা পাক হতে হবে।

৫. ছতর বা ঢাকবার স্থান ঢাকতে হবে অর্থাৎ, নামাযীর শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে নিতে হবে। পুরুষ এরূপ কাপড় পরিধান করবে যেন নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে যায়। স্ত্রীলোক এমন কাপড় পরিধান করবে যেন দু হাতের কব্জি দু পা ও মুখমণ্ডল ব্যতীত সমস্ত শরীর আবৃত হয়ে যায়। যে উড়না এত পাতলা যে, তাতে চুল দেখা যায় তাতে নামায হবে না। পুরুষের পায়ের গিট কাপড়ে ঢেকে গেলে নামায মাকরূহ হবে। স্ত্রীলোকের সমস্ত গিট অনাবৃত থাকলে নামায মাকরূহ হবে।

৬. কেবলার দিকে মুখ করতে হবে।

৭. নামাযের নিয়ত করতে হবে। হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা অমুক নামায পড়ছি বলে ইচ্ছে করলে এতেই যথেষ্ট হবে, তবে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা উত্তম, এতে হৃদয়ের আকর্ষণ বেড়ে যায়।

নামাযের আরকান ঃ

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা। অর্থাৎ, নামাযের নিয়ত করার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা।

২. কিয়াম করা ঃ অর্থাৎ, কোন অসুবিধা না থাকলে সোজা হয়ে দাঁড়ান।

৩. কেরআত পাঠ করা ঃ পবিত্র কুরআন থেকে কমপক্ষে তিনটি ছোট আয়াত অথবা একটি বড় আয়াত পাঠ করতে হবে।

৪. রুকূ করা।

৫. দু' সাজদা করা।

৬. শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ বিলম্ব করা।

নামাযের ওয়াজিব সমূহঃ

নামাযের কোন একটি ফরয কাজ ছুটে গেলে নামায হবে না। দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হবে। যেমন তাকবীরে তাহরীমা– আল্লাহু আকবার বলল না কিংবা সাজদা করল না, বা রুকু করতে ভুলে গেল। এ সমস্ত অবস্থায় নামায হবেই না। তবে নামাযের কোন একটি ওয়াজিব কাজ ভুলে ছুটে গেলে নামায পুরাপুরি ভঙ্গ হবে না। তবে নামাযের একটি কাজ বাদ পড়ায় এ ঘাটতি মোচন করার জন্যে শরীয়ত সাজদায়ে সাহো বা ভুলের সাজদা দেবার নিয়ম করেছে। এ সাজদা ওয়াজিব হলে সে সাজদা আদায় না করলে দ্বিতীয়বার নামায পড়ে নেয়া ওয়াজিব। ভুলের সাজদা (সাজদায়ে সাহো) আদায় করার নিয়মাবলী সামনে আলোচনা করা হবে।

নামাযের ওয়াজিবগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. ফরযের প্রথম দুই রাকআত কেরাত পাঠের জন্যে নির্দিষ্ট করা।

২. সূরা ফাতিহা পাঠ করা অর্থাৎ, ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকআতে এবং সুন্নাত ও নফল নামাযের সকল রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব।

৩. নফল অথবা বিতর নামাযের সমস্ত রাকাআতে সূরা ফাতিহা সহ কোন সূরা বা তিন আয়াত পাঠ করা ওয়াজিব এবং ফরয নামাযের শুধু প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতিহা সহ কোন সূরা বা তিন আয়াত পাঠ করা ওয়াজিব।

৪. প্রথমে ফাতিহা পড়া তারপর সূরা/কেরাত পড়া।

৫. নামাযের অঙ্গগুলো ক্রমাগত আদায় করা। অর্থাৎ, অমনোযোগিতা অথবা ভুলবশত: নামাযের এক অঙ্গ আদায় করার পর অন্য অঙ্গ আদায় করতে যদি তিন তাছবীহ পরিমাণ বিলম্ব হয়, তখন ভুলের সাজদা দেয়া ওয়াজিব হবে। দুআ ইত্যাদি পড়ার মধ্যে যত বিলম্বই হোক না কেন ভুলের সাজদা দিতে হবে না।

৬. কিয়াম, রুকূ, কেরাত ও সাজদার মধ্যে ধারাবাহিকতা ঠিক রাখতে হবে। অর্থাৎ, রুকুর আগে সাজদা অথবা সাজদার আগে কা'দা করলে ভুলের সাজদা দেয়া ওয়াজিব হবে।

৭. রুকূ ও সাজদার মধ্যে এতটুকু বিলম্ব করা যাতে একবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى অথবা سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পাঠ করতে পারে। অতি তাড়াতাড়ি করে রুকূ সাজদা করলে নামায হবে না।

৮. কওমা করা। অর্থাৎ রুকু করার পর সোজা হয়ে দাঁড়ান। এতে বহুলোক তাড়াহুড়া করে অর্থাৎ সোজা হয়ে না দাঁড়িয়েই সাজদায় চলে যায়, এরূপ করলে নামায হবে না।

৯. জলসা করা। অর্থাৎ এক সাজদা করার পর ভাল করে বসা, অতঃপর দ্বিতীয় সাজদা করা।

১০. প্রথম বৈঠকে অর্থাৎ তিন অথবা চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের দু' রাকআত পড়ার পর তাশাহহুদ পাঠ করতে পারা যায় এতটুকু সময় বসা।

১১. উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করা। অর্থাৎ দু রাকআত বিশিষ্ট নামাযে দ্বিতীয় রাকআতে, তিন রাকআত বিশিষ্ট নামাযে দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকআতে তাশাহহুদ পড়তে হবে।

১২. তা'দিলে আরকান। অর্থাৎ নামাযের অঙ্গগুলো ধীরস্থির ভাবে আদায় করা। কওমা, রুকূ, সাজদা ও জলসা ইত্যাদি শান্ত-শিষ্ট ভাবে আদায় করা। নামাযের দুআগুলোও ধীরস্থিরভাবে পড়তে হবে যেন কোন কিছু ছুটতে না পারে।

১৩. যে নামাযে কুরআন পাঠ আস্তে করার বিধান আছে, যেমন যোহর ও আসরের নামাযের কেরাত, আর যে নামাযে জোরে কেরাত পাঠ করার বিধান আছে, যেমন ফযর মাগরিব ও ইশা, এগুলোতে যথাক্রমে আস্তে ও জোরে পড়তে হবে।

১৪. 'আসসালামু আলাইকুম' বলে নামায শেষ করতে হবে।

১৫. বিতরের তৃতীয় রাকআতে দুআ কুনূত পড়া।

১৬. দু' ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলা। তবে জামাআত অতি বড় হলে তাকবীর ছুটে গেলে অথবা অন্য কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে ভুলের সাজদা দিতে হবে না।

নামায ভঙ্গের কারণসমূহ

যে সমস্ত কাজ দ্বারা নামায ভঙ্গ হয়ে যায় ও দ্বিতীয়বার নামায পড়তে হয়, এ কাজগুলো হল ঃ

১. ভুলে অথবা ইচ্ছা করে কথা বলা।

২. নামায রত অবস্থায় সালাম দেওয়া অথবা উত্তর দেওয়া।

৩. কেউ হাঁচি দিলে হাঁচির উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা। তবে নামাযে নিজের হাঁচি আসলে ভুল করে 'আলহামদুল্লািহ' বললে নামায হয়ে যাবে, কিন্তু ইচ্ছে করে এরূপ বলা ঠিক নয়।

৪. নামাযের বাইরে দুআ করা হলে তার উত্তরে 'আমীন' বলা।

৫. রোগ অথবা অন্য কোন দুঃসংবাদ শুনে 'ইন্নালিল্লাহ' বা অন্য কোন দুআ বলা।

৬. কোন সুসংবাদ শুনে 'আলহামদুলিল্লাহ' অথবা অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ করা।

৭. আশ্চর্যজনক কোন কথা শুনে 'সুবহানাল্লাহ' অথবা অন্য কোন বাক্য উচ্চারণ করা।

৮. উহ্ আহ্ করা বা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা।

৯. নামাযে থাকাকালীন নামাযের বাইরে কোন ব্যক্তির কুরআন পাঠে লোকমা দেয়া।

১০. নামাযের মধ্যে দেখে কুরআন পাঠ করা।

১১. কোন পুস্তক অথবা লিখিত বস্তু দেখে পাঠ করা। তবে মনে মনে লিখিত বস্তুর মর্ম বুঝে নিলে নামায ভঙ্গ হবে না, কিন্তু এরূপ করা ঠিক নয়।

১২. আমলে কাছীর করা অর্থাৎ, এমন কোন কাজ করা যা অন্য লোকে দেখলে নামাযী বলে বুঝতে না পারে যেমন দু'হাতে শরীর চুলকানো অথবা পরিধানের কাপড় দু'হাতে ঠিক করা।

১৩. বিনা প্রয়োজনে জোরে কাশি দেয়া অথবা গলা পরিষ্কার করা। ইমাম গলার আওয়াজ পরিষ্কার করার জন্য কাশি দিতে পারেন।

১৪. ইচ্ছে করে অথবা ভুল করে কোন বস্তু খাওয়া অথবা পান করা।

১৫. কুরআন পাঠে ভীষণভাবে অর্থ বিকৃত হয়ে যায় এমন ভুল পড়া।

১৬. নামাযের ভিতর হাটা, তবে প্রয়োজনে দুই এক কদম আগে পিছে সরা যায়। সাজদার জায়গা থেকেও আগে বেড়ে গেলে নামায হবে না।

১৭. কিবলার দিক থেকে অন্য দিকে সীনা ফিরানো। কোন কারণ ব্যতীত মুখ ফিরিয়ে নিলেও নামায মাকরূহ হয়ে যাবে।

১৮. এক চতুর্থাংশ ছতর এতটুকু সময় খুলে রাখা যতক্ষণে তিনবার সোবহানাল্লাহ বলা যায়।

১৯. আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন বস্তু চাওয়া যা মানুষের নিকট চাওয়া যায়। যেমন পানাহার ইত্যাদি।

২০. আল্লাহু এবং আকবার শব্দের আলিফ বা আকবার শব্দের বা-কে লম্বা করা।

২১. জানাযার নামায ব্যতীত অন্য নামাযে অট্টহাসি হাসা।

২২. ইমামের আগে রুকূ অথবা সাজদা করে নেয়া।

২৩. একই নামাযে নারী-পুরুষ একত্রে দণ্ডায়মান হওয়া, আর এই দাঁড়ান এতটুকু বিলম্ব হওয়া যার মধ্যে একবার সাজদা করা যেতে পারে।

২৪. তায়াম্মুমকারী পানি পেয়ে ফেললে।

২৫. পূর্ণ সাজদার মধ্যে উভয় পা যদি মোটেই মাটিতে লাগানো না হয়। তবে পা উঠে গেলে আবার মাটিতে রাখলে অসুবিধা নেই।

২৬. নামাযের মধ্যে সন্তান দুধ পান করলে। তবে দুধ বের না হলে নামায ভাঙ্গবে না, কিন্তু তিন বা ততোধিক বার টানলে দুধ বের না হলেও নামায ভেঙ্গে যাবে।

২৭. স্ত্রী নামাযে থাকা অবস্থায় স্বামী তাকে চুম্বন করলে।

নামাযের মাকরূহ সমূহ

যে সমস্ত কাজ দ্বারা নামায ভঙ্গ হয় না, তবে দুষণীয়, এ কাজগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. শরীরে চাদর না জড়িয়ে উভয় কাঁধে লটকিয়ে ছেড়ে দেয়া অথবা জামা কিম্বা শেরওয়ানীর হাতায় হাত না ঢুকিয়ে কাঁধে নিক্ষেপ করা, তেমনি মাফলারের উভয় দিক ছেড়ে দেওয়া।

২. কাপড় অথবা কপালে ধুলাবালি লাগার ভয়ে কাপড় টেনে ধরা অথবা মুখে ফুঁক দিয়ে ধুলাবালি সরানো। সাজদার জায়গায় পাথর কনা থাকলে হাত দিয়ে প্রয়োজনে দু' একবার সরালে কোন দোষ নেই।

৩. নিজের শরীর, কাপড় অথবা দাঁড়ি নিয়ে খেলা করলে। বহু লোক এরূপ করে থাকে, এ থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।

৪. এমন কাপড় পরিধান করে নামায পড়া যে কাপড় পরে বাজারে অথবা সভা-সমিতিতে যাওয়া অপছন্দনীয় বোধ হয়।

৫. মুখে এমন জিনিস রেখে নামায পড়া যে বস্তু রাখার ফলে কুরআন পাঠ করা কষ্টকর হয়।

৬. শৈথিল্য অথবা অমনযোগিতার দরুন মাথা খালি রেখে অথবা নাভির উপরে খোলা দেহে নামায পড়া। তবে কোন লোক বিনয়ের কারণে খালি মাথায় নামায পড়লে মাকরূহ হবে না, তবে মসজিদের মধ্যে এরূপ করা উচিত নয়, ঘরের মধ্যে করা যায়। মসজিদের ভিতর এরূপ করা হলে অন্য লোক এর গুরুত্ব বুঝতে পারবে না।

৭. আঙ্গুল মটকানো অথবা এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলে ঢুকিয়ে দেয়া।

৮. বিনা প্রয়োজনে কোমরে হাত ঢুকিয়ে দেয়া কিংবা বিনা প্রয়োজনে কোমরে হাত রাখা।

৯. সাজদায় দু' হাত কনুই পর্যন্ত বিছিয়ে দেয়া।

১০. এদিক সেদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।

১১. এমন লোকের দিকে মুখ করে নামায পড়া, যে ব্যক্তি তার দিকে মুখ করে আছে বা এমন স্থানে নামায পড়া যেখানে কেউ হাসিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা আছে।

১২. হাত অথবা মাথা দ্বারা ইঙ্গিত করে কারও কথার উত্তর দেয়া।

১৩. কোন অসুবিধা ব্যতীত হামাগুড়ি দিয়ে বসা বা দুই পা খাড়া রেখে বসা বা আসন গেড়ে বসা। কোন ওযর থাকলে যে রকম সম্ভব বসা চলে।

১৪. ইচ্ছে করে হাই তোলা অথবা হাই বন্ধ করার চেষ্টা না করা।

১৫. সামনের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও একাকী পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়া।

১৬. কোন প্রাণীর ছবি যুক্ত কাপড় পরা অবস্থায় নামায পড়া।

১৭. প্রথম রাকআত অপেক্ষা দ্বিতীয় রাকআতের কেরাত তিন আয়াত বা ততোধিক পরিমাণ লম্বা করা।

১৮. ইমামের পক্ষে একাকী কোন উঁচু স্থানে দাঁড়ানো। তবে এক বিঘত পরিমাণ পর্যন্ত উঁচুতে দাঁড়ালে কোন ক্ষতি নেই।

১৯. এমনভাবে চাদর জড়িয়ে নামায পড়া, যাতে হাত বের করতে অসুবিধে হয়।

২০. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মোচড়ানো।

২১. টুপী, পাগড়ী, অথবা রুমালের ভাঁজে সাজদা করা। অর্থাৎ এগুলো পরিধান করার পর সাজদার জন্য জায়গা খোলা রাখতে হবে।

২২. প্রথম রাকআত থেকে দ্বিতীয় রাকআত দীর্ঘ করা।

২৩. কোন নামাযে বিশেষ সূরা নির্দিষ্ট করে সব সময় সেটা পড়া।

২৪. কুরআনের রীতির বিপরীত কুরআন পাঠ করা। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের সূরাগুলো যে তারতীবে লিখা হয়েছে-এর ব্যতিক্রম পাঠ করা।'

২৫. পেশাব পায়খানার জোর অনুভূতি হওয়া সত্ত্বেও সে অবস্থায় নামায পড়া।

২৬. খুব ক্ষুধা অনুভব হলে এবং খাবার তৈরী হলে না খেয়ে নামায পড়া।

২৭. নামাযরত অবস্থায় ছারপোকা, মাছি ও পিপড়া মারা। তবে ছারপোকা অথবা পিপড়ায় কামড় দিলে তা ধরে ছেড়ে দেয়া যায়। কামড় না দিলে ধরাও মাকরূহ।

২৮. কনুই পর্যন্ত জামা ইত্যাদির হাতা গুটিয়ে নামায পড়া মাকরূহ।

যে সব অবস্থায় নামায ছেড়ে দেয়া যায়

কোন কোন অবস্থায় নিজেই নামায ছেড়ে দিতে হয়, ছেড়ে না দিলে কবীরা গোনাহ হয়। আবার কোন কোন অবস্থায় নামায ছেড়ে না দিলে সামান্য গোনাহ হয়। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. কোন অনিষ্টকারী প্রাণীর ভয় থাকলে। যেমন নামাযরত অবস্থায় সাপ সামনে আসলে নামায ছেড়ে দিয়ে মারতে হবে অথবা বিচ্ছু ও ভীমরুল কাপড়ের ভিতর ঢুকে গেলে তা দংশন করার ভয় থাকলে এ অবস্থায় নামায ছেড়ে দেবার অনুমতি রয়েছে। তদ্রূপ বিড়ালে মুরগি ধরলে অথবা ধরে ফেলার সম্ভাবনা থাকলে তখন নামায ভঙ্গ করা যায়।

২. যদি এমন কোন বস্তুর ক্ষতির আশংকা থাকে যার মূল্য অন্ততঃ সাড়ে ৪ রত্তি[1] রূপার সমান, যেমন চুলায় পাতিল থাকলে তা জ্বলে যাবার ভয় থাকলে আর এর মূল্য উক্ত পরিমাণ অথবা তার চেয়ে অধিক হলে তখন নামায ছেড়ে দিয়ে পাতিল নামিয়ে নিতে হবে। এভাবে কুকুর, বিড়াল ও বানর ঘরে ঢুকলে আটা, ডাল, দুধ, ঘি ইত্যাদি ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে নামায ছেড়ে দেয়া যাবে। মসজিদে অথবা ঘরে নামায পড়ছে অথচ কোন বস্তু ভুল বশতঃ এমন স্থানে রেখে এসেছে যেখান থেকে চুরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন নামায ছেড়ে দিয়ে আসবাবপত্র রক্ষা করবে। তবে নামাযীকে নামায আরম্ভ করার পূর্বেই এগুলো রক্ষা করার ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

৩. নামায পড়লে যান-বাহন ছেড়ে দেয়ার সম্ভাবনা থাকলে আর গাড়ীতে আসবাবপত্র ও শিশু সন্তান থাকলে বা গাড়ী চলে গেলে ক্ষতির আশংকা থাকলে নামায ছেড়ে দিতে পারবে।

৪. নামাযরত অবস্থায় পেশাব পায়খানার চাপ অসহ্য মনে হলে।

৫. নামাযরত অবস্থায় কাউকে বিপদ বা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন হলে নামায ছেড়ে দেয়া ফরয, নামায ছেড়ে না দিলে কঠিন গুনাহগার হবে। যেমন কোন অন্ধ যাচ্ছে এবং তার সম্মুখে কূপ অথবা গভীর গর্ত রয়েছে অথবা মোটরগাড়ী বা রেলগাড়ীতে পিষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় আছে, অথবা কারোর কাপড়ে আগুন লেগে তাতে জ্বলে যাবার অথবা পুড়ে যাবার উপক্রম হলে অথবা পানিতে কেউ ডুবে যাচ্ছে অথবা চোর অথবা শত্রু ভীষণভাবে প্রহার করছে এবং সে সাহায্যের জন্য ডাকছে– এসব অবস্থায় নামায ছেড়ে দিয়ে তাকে উদ্ধার করা কর্তব্য, তা না হলে গোনাহগার হবে।

৬. মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী কোন বিপদে পড়ে ডাকলে নামায ছেড়ে দিয়ে তাদের কাছে যাওয়া কর্তব্য। যেমন তাদের কেউ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল অথবা আঘাত পেল এবং তারা ডাকল, এমতাবস্থায় তাদের উদ্ধার করার জন্যে কেউ না থাকলে নামায ছেড়ে দিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করতে হবে। যদি তাদের কেউ পায়খানা অথবা পেশাব করতে যাচ্ছে, অথচ তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ নেই তাহলে নামায ছেড়ে দিয়ে তাকে সাহায্য করতে হবে। তবে তাকে সাহায্য করার লোক রয়েছে অথবা অনর্থক চীৎকার করছে, তখন নামায ছেড়ে দেয়া যাবে না। যদি সে নফল অথবা সুন্নাত নামায পড়তে থাকে আর সে নামায পড়ছে বলে তারা না জানে (বিপদের সময় ডাকুক কিংবা এমনি ডাকুক) তাহলে এমতাবস্থায় নামায ছেড়ে দিয়ে উত্তর দিতে হবে। তবে নামায পড়ছে বলে জ্ঞাত হলে এবং ডাকলে তখন কোন বিপদের ভয় না হলে নামায ছাড়া যাবে না, নতুবা ছেড়ে দিবে। (مراقی الفلاح مع الطحطاوی)

---

১. ৬ রত্তি-তে ১ আনা এবং ১৬ আনায় ১ ভরি হয়ে থাকে।

সাজদায়ে সহোর মাসায়েল

* নামাযের ওয়াজিবগুলোর মধ্যে কোন একটি বা কয়েকটি ভুলে ছুটে গেলে সাজদায়ে সহো ওয়াজিব হয়। সাজদায়ে সহো করতেও ভুলে গেলে নামায আবার পড়া ওয়াজিব। এমনিভাবে কোন ফরয ছুটে গেলে বা কোন ওয়াজিব ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলেও নামায আবার পড়তে হবে– সাজদায়ে সহো দিলে চলবে না। সাজদায়ে সহো করার নিয়ম হলঃ শেষ রাকআতে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়াতু ......) পড়ে ডান দিকে সালাম ফিরাবে তারপর নিয়ম মত দুটো সাজদা করে আবার তাশাহহুদ দুরূদ ও দুআয়ে মাছূরা পড়ে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

* ভুলবশতঃ এক রাকআতে দুই রুকূ বা তিন সাজদা করে ফেললে সাজদায়ে সহো ওয়াজিব হবে।

* ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকআতে সূরা মিলাতে ভুলে গেলে শেষের দুই রাকআতে সূরা মিলাবে বা যে কোন এক রাকআতে সূরা মিলাতে ভুলে গেলে শেষের যে কোন এক রাকআতে সূরা মিলাবে এবং উভয় অবস্থায় সাজদায়ে সহো করবে। এ নিয়মে শেষের দুই রাকআত বা এক রাকআতে সূরা মিলাতেও যদি ভুলে যায় তবুও সাজদায়ে সহো করলে নামায হয়ে যাবে।

* সূরা ফাতিহা পড়ে কোন্ সূরা মিলাবে এই চিন্তা করতে করতে যদি চুপ চাপ অবস্থায় তিনবার সোবহানাল্লাহ বলা পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে সাজদায়ে সহো ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে নামাযের যে কোন স্থানে ভুলে বা চিন্তা করার কারণে যদি কোন ফরয বা ওয়াজিব আদায় করতে তিন তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব হয়ে যায়, তাহলে সাজদায়ে সহো ওয়াজিব হবে।

* তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট ওয়াজিব বা ফরয নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে তাশাহহুদ এর পর ভুলবশতঃ দুরূদ পড়া শুরু করলে যদি اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ পর্যন্ত বা আরও বেশী পড়ে ফেলে তাহলে সাজদায়ে সহো ওয়াজিব হবে। এর কম পড়লে সাজদায়ে সহো ওয়াজিব হবে না। তবে সুন্নাত ও নফলে প্রথম বৈঠকে দুরূদ পড়াও জায়েয আছে; কাজেই তাতে দুরূদ পড়লে সাজদায়ে সহো ওয়াজিব হবে না।

* যে কোন নামাযের প্রথম বৈঠকে ভুলে পূর্ণ তাশাহহুদ দুই বার পড়লে বা তার এতটুকু অংশ দ্বিতীয়বার পড়লে যা তিন তাছবীহ পরিমাণ হয়ে যায় তাতে সাজদায়ে সহো ওয়াজিব হবে।

* তাশাহহুদের স্থলে ভুলে ছানা বা দুআয়ে কুনূত বা সূরা ফাতিহা পড়লে সাজদায়ে সহো ওয়াজিব হবে।

* ভুলে সূরা ফাতিহার স্থলে তাশাহহুদ পড়লে সাজদায়ে সহো ওয়াজিব হবে।

* দুআয়ে কুনূতের স্থলে সূরা ফাতিহা বা তাশাহহুদ পড়লে সাজদায়ে সহো ওয়াজিব হয় না।

* মাসবূক ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে ফেললে সাজদায়ে সহো ওয়াজিব হবে।

* ইমামের জন্য যে সব নামাযে কেরাত চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব তাতে যদি ইমাম ছোট তিন আয়াত পরিমাণ উচ্চস্বরে পড়ে বা উচ্চস্বরের নামাযে তিন আয়াত পরিমাণ চুপে চুপে পড়ে, তাহলে সাজদায়ে সহো ওয়াজিব হবে।

* ফরয নামাযের প্রথম বৈঠক না করেই যদি তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াতে উদ্যত হয় এবং শরীরের নীচের অর্ধেক সোজা হওয়ার পূর্বে বসে পড়ে তাহলে সাজদায়ে সহো করতে হবে না। আর নীচের অর্ধেক সোজা হয়ে গেলে আর বসবে না–তৃতীয় বা চতুর্থ রাকআত পড়ে শেষ বৈঠকে সহো সাজদা করবে। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর বসে তাশাহহুদ পড়লে গোনাহগার হবে তবে নামায হয়ে যাবে এবং সাজদায়ে সহো করতে হবে।

* সুন্নাত বা নফল নামাযের প্রথম বৈঠক না করে ভুলে উঠে গেলে তৃতীয় রাকআতের সাজদা না করা পর্যন্ত স্মরণ আসলে বসে যাবে। আর তৃতীয় রাকআতের সাজদা করার পর স্মরণ এলে বসবে না– চার রাকআত পূর্ণ করে বসবে এবং এই উভয় অবস্থায় সাজদায়ে সহো করলে নামায হয়ে যাবে।

* ফরয নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর ভুলে দাঁড়িয়ে গেলে শরীরের নীচের অর্ধেক সোজা হওয়ার পূর্বে বসে পড়লে সাজদায়ে সহো করতে হবে না। আর নীচের অর্ধেক সোজা হয়ে গেলেও বসে যাবে, এমনকি ঐ রাকআতের সাজদা করার আগ পর্যন্ত স্মরণ এলেও বসে পড়বে এবং বসে সাথে সাথে সাজদায়ে সহো করবে। আর যদি ঐ রাকআতের সাজদা করার পর স্মরণ হয় তাহলে আরও এক রাকআত মিলাবে; তাহলে প্রথম দুই/চার রাকআত ফরয এবং শেষ দুই রাকআত নফল হবে। এ অবস্থায় সাজদায়ে সহোও করতে হবে। আর যদি ঐ রাকআতে সালাম ফিরায় এবং সাজদায়ে সহো করে তাহলেও নামায হয়ে যাবে কিন্তু অন্যায় হবে। এ অবস্থায় প্রথম দুই/চার রাকআত ফরয হবে এবং শেষের এক রাকআত বৃথা যাবে।

* শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পূর্বে ভুলে উঠে গেলে শরীরের নীচের অর্ধেক সোজা হওয়ার পূর্বে বসে পড়লে সাজদায়ে সহো করতে হবে না। আর নীচের অর্ধেক সোজা হওয়ার পর স্মরণ এলেও বসে পড়বে এমন কি আর এক

রাকআতের সাজদা করার আগ পর্যন্ত স্মরণ এলেও বসে পড়বে এবং সাজদায়ে সহো করবে। কিন্তু আর এক রাকআতের সাজদা করে ফেললে আর বসবে না বরং আরও এক রাকআত মিলাবে এবং শেষে সাজদায়ে সহো করবেনা এ অবস্থায় সব রাকআত নফল হয়ে যাবে, ফরয পুনরায় পড়তে হবে।

নামাযের মধ্যে রাকআত নিয়ে সন্দেহ হলে তার মাসায়েল

* যদি নামাযের মধ্যে এরূপ সন্দেহ হয় যে, প্রথম রাকআত না কি দ্বিতীয় রাকআত? তাহলে যে দিকে মন ঝুঁকবে সে দিককে গ্রহণ করবে। যদি কোন এক দিকে মন না ঝুঁকে তাহলে এক রাকআতই (অর্থাৎ কমটাই) ধরতে হবে কিন্তু এই প্রথম রাকআতে বসে তাশাহহুদ পড়বে, কেননা হতে পারে প্রকৃত পক্ষে এটাই দ্বিতীয় রাকআত। দ্বিতীয় রাকআতেও বসে তাশাহহুদ পড়বে, তৃতীয় রাকআতেও বসে তাশাহহুদ পড়বে, (কেননা হতে পারে প্রকৃত পক্ষে এটাই চতুর্থ রাকআত) তারপর চতুর্থ রাকআতে সাজদায়ে সহো করবে।

* যদি কারও সন্দেহ হয় যে, দ্বিতীয় রাকআত না তৃতীয় রাকআত, তার হুকুমও এইরূপ– যদি মন কোন দিকে না ঝুঁকে তাহলে দ্বিতীয় রাকআত ধরে নিবে এবং এই রাকআতে বসে তাশাহহুদ পড়বে এবং এটা বেতর নামায হলে এ রাকআতেও দুআয়ে কুনূত পড়বে। তৃতীয় রাকআতেও বসবে। তারপর চতুর্থ রাকআতে সহো সাজদা সহকারে নামায শেষ করবে।

* যদি কারও সন্দেহ হয় যে, তৃতীয় রাকআত না চতুর্থ রাকআত, তাহলে তার হুকুম অনুরূপ–কোন দিকে মন না ঝুঁকলে তিন রাকআত ধরে নিবে কিন্তু এই তৃতীয় রাকআতেও বসে তাশাহহুদ পড়তে হবে। তারপর চতুর্থ রাকআতে সাজদায়ে সহো সহকারে নামায শেষ করবে।

* যদি নামায শেষ করার পর সন্দেহ হয় যে, এক রাকআত কম রয়ে গেল কিনা? তাহলে এই সন্দেহের কোন মূল্য দিবে না, নামায হয়ে গেছে। অবশ্য যদি সঠিক ভাবে স্মরণ আসে যে, এক রাকআত কম রয়ে গেছে তাহলে দাঁড়িয়ে আর এক রাকআত পড়ে নিবে এবং সাজদায়ে সহো সহকারে নামায শেষ করবে। কিন্তু যদি ইতিমধ্যে এমন কোন কাজ করে থাকে যাতে নামায ভঙ্গ হয়ে যায় (যেমন কেবলা থেকে ঘুরে বসে থাকে বা কথা বলে থাকে) তাহলে নতুন নিয়ত বেঁধে সম্পূর্ণ নামায দোহরায়ে পড়তে হবে। আর প্রথম অবস্থায়ও নতুন ভাবে নামায দোহরায়ে নেয়া উত্তম– জরুরী নয়।

বিঃ দ্রঃ রাকআতের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ হওয়ার ব্যাপার যদি কারও ক্ষেত্রে কদাচিৎ হয়ে থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রে পূর্বোল্লিখিত নিয়ম প্রযোজ্য হবে না বরং তাকে নতুন নিয়ত বেঁধে আবার নামায পড়তে হবে।

* সাজদায়ে সহো করার পরও যদি সাজদায়ে সহো ওয়াজিব হওয়ার মত আবার কোন ভুল হয়, তাহলে পুনর্বার সাজদায়ে সহো করতে হবে না– ঐ পূর্বের সাজদাই যথেষ্ট হবে।

* সাজদায়ে সহো ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ সাজদায়ে সহো করে, তাহলে নামায হয়ে যাবে কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করা ঠিক নয়।

* সাজদায়ে সহো ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও যদি সাজদায়ে সহো না করে উভয় সালাম ফিরিয়ে ফেলে, তারপর কোন কথা বলার পূর্বে বা নামায ভঙ্গ হয়– এমন কোন কিছু করার পূর্বে যদি সাজদায়ে সহোর কথা স্মরণ হয় তাহলে তখনই যদি 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজাদায়ে সহো করে তারপর তাশাহহুদ, দুরূদ শরীফ ও দুআয়ে মাছূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নেয়, তবুও নামায হয়ে যাবে।

* শেষ বৈঠকে দুরূদ শরীফ পড়ার পর বা দুআয়ে মাছূরা পড়ার পর সালাম ফিরানোর পূর্বে যদি সাজদায়ে সহোর কথা স্মরণ হয় তখনই সাজদায়ে সহো করে নিবে।

কাযা নামাযের মাসায়েল

* কারও কোন ফরয নামায ছুটে গেলে স্মরণ আসা মাত্রই কাযা পড়া ওয়াজিব–বিনা ওযরে কাযা করতে বিলম্ব করা পাপ।

* কাযা নামায পড়ার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই– হারাম ও মাকরূহ ওয়াক্ত ছাড়া যে কোন সময় পড়া যায়।

* কারও যদি এক, দুই, তিন, চার বা পাঁচ ওয়াক্ত নামায কাযা হয় এবং এর পূর্বে তার কোন কাযা নেই তাহলে তাকে ছাহেবে তারতীব বলে। তাকে দুই ধরনের তারতীব রক্ষা করতে হবে–

(১) ওয়াক্তিয়া নামাযের পূর্বে এই কাযাগুলো পড়ে নিতে হবে, অন্যথায় ওয়াক্তিয়া নামায শুদ্ধ হবে না।

(২) এই কাযা নামাযগুলোও ধারাবাহিক ভাবে (আগেরটা আগে এবং পরেরটা পরে) পড়তে হবে। ছাহেবে তারতীবের জন্যে এই দুই ধরনের তারতীব রক্ষা করা ফরয। যদি কারও জিম্মায় ছয় বা আরও বেশী ওয়াক্তের কাযা থাকে তাহলে সে কাযা রেখে ওয়াক্তিয়া নামায পড়তে পারে এবং কাযা নামাযগুলিও তারতীব ছাড়া পড়তে পারে, সে ছাহেবে তারতীব থাকে না।

* কারও জিম্মায় ছয় বা ততোধিক নামায কাযা ছিল সে কারণে সে ছাহেবে তারতীব ছিলনা, তারপর সে সব কাযা পড়ে ফেলল, তাহলে সে এখন থেকে

আবার ছাহেবে তারতীব হবে। অতএব আবার যদি পাঁচ ওয়াক্ত পর্যন্ত কাযা হয় তাহলে আবার তারতীব রক্ষা করা ফরয হবে।

* বহু সংখ্যক নামাযের অল্প অল্প করে কাযা পড়তে পড়তে পাঁচ ওয়াক্ত বা তার কমে চলে আসলেও তারতীব ওয়াজিব হবে না।

* তিন কারণে তারতীব মাফ হয়ে যায়।

(১) ওয়াক্ত যদি এত সংকীর্ণ হয় যে, আগে কাযা পড়তে গেলে ওয়াক্তিয়া নামাযের সময় থাকে না, তাহলে আগে ওয়াক্তিয়া নামায পড়ে নিবে।

(২) কাযা নামায যদি পাঁচ ওয়াক্তের অধিক হয়।

(৩) যদি আগে কাযা পড়তে ভুলে যায়।

* শুধু ফরয এবং বেতরের কাযা পড়ার নিয়ম। নফল বা সুন্নাতের কাযা হয় না। তবে কোন নফল বা সুন্নাত শুরু করার পর পূর্ণ না করেই ছেড়ে দিলে তার কাযা করতে হবে। সুন্নাতের মধ্যে ফজরের সুন্নাতের ব্যাপারে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে, সে সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ১৬০ পৃষ্ঠা।

* যদি কোন কারণ বশতঃ দলশুদ্ধ লোকের নামায কাযা হয়ে যায় তাহলে তারা ওয়াক্তিয়া নামায যেমন জামাআতে পড়ত তদ্রূপ কাযা নামাযও জামাআতে পড়বে। ছির্‌রিয়া নামাযের কাযার মধ্যে কেরাত চুপে চুপে পড়বে এবং জেহ্‌রিয়া নামাযের কাযার মধ্যে কেরাত উচ্চস্বরে পড়বে।

উম্‌রী কাযার মাসায়েল

* যদি কোন লোক শয়তানের ধোকায় পড়ে জীবনের প্রথম দিকে বা কোন একটা দীর্ঘ সময় বহু নামায ছেড়ে দিয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে সে নিয়মিত নামায পড়া শুরু করে তাহলে বিগত জীবনের এই ছেড়ে দেয়া নামাযগুলো শুধু তওবা দ্বারা মাফ হয়ে যাবে না বরং সব নামাযগুলোর কাযা পড়া ওয়াজিব। সাধারণভাবে জীবনের এরূপ দীর্ঘ ছুটে যাওয়া নামাযের কাযাকে উম্‌রী কাযা বলা হয়।

* বালেগ হওয়ার পর থেকে কত নামায ছুটে গিয়েছে তার একটা হিসাব করে সবগুলোর কাযা করতে হবে। যথাশীঘ্রই সম্ভব এবং যতবেশী করে সম্ভব এই কাযাগুলো পড়ে নিবে। এক এক ওয়াক্তে কয়েক ওয়াক্তের কাযা পড়ে নিতে পারলেও ভাল। যোহরের কাযা যোহরের ওয়াক্তে, আছরের কাযা আছরের ওয়াক্তে এমনিভাবে যে ওয়াক্তের কাযা সেই ওয়াক্তেই পড়া জরুরী নয়।

* উম্‌রী কাযার নিয়তের মধ্যেও কোন্ নামাযের কাযা করছে তা নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। সাধারণভাবে কোন্ দিন কোন্ তারিখের নামায কাযা পড়া হচ্ছে তা মনে করা এবং নির্দিষ্ট করা মুশকিল, তাই নিয়তের মধ্যে নির্দিষ্ট করার সহজ উপায় হল এরূপ নিয়ত করবে–আমার জিম্মায় যতগুলো ফজরের নামায কাযা রয়েছে তার প্রথমটা কাযা করার নিয়ত করছি। এমনি ভাবে জোহরের নামাযের কাযা করার ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ত করবে যে, আমার জিম্মায় যতগুলি জোহরের নামাযের কাযা রয়েছে তার প্রথমটা কাযা করার নিয়ত করছি। এরূপ প্রত্যেক ওয়াক্তের কাযা করার ক্ষেত্রে এ রকম নিয়ত করে কাযা করতে থাকবে।

নামাযের ফেদিয়ার মাসায়েল

* যদি কারও নামায ছুটে গিয়ে থাকে এবং তার কাযা করার পূর্বে মৃত্যু এসে পড়ে, তাহলে মৃত্যুর পূর্বে ঐ সব নামাযের জন্য ফেদিয়া দেয়ার ওছীয়ত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব। এরূপ অবস্থায় ওয়ারিছগণ তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে এই ফেদিয়া আদায় করবে। পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের মধ্যে ফেদিয়া আদায় হলে তা আদায় করা ওয়ারিছদের উপর ওয়াজিব। এক তৃতীয়াংশের মধ্যে আদায় না হলে যতটুকু অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে তা সকল ওয়ারিছদের সম্মতিতে হতে হবে। তবে না বালেগদের সম্মতি হলেও তার অংশ থেকে নেয়া যাবে না।

* ছদকায়ে ফিতির বা ফিতরার পরিমাণ যা, নামাযের ফেদিয়ার পরিমাণও তাই। প্রতি ওয়াক্ত ফরয নামায এবং বিতর নামাযের বদলে এক একটা ফেদিয়া আদায় করতে হবে। প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং বিতর নামায এই ছয়টা নামাযের অর্থাৎ, প্রতিদিনের ছয়টা ফেদিয়া আদায় করতে হবে।

* ছদকায়ে ফিতির যাদেরকে দেয়া যায় নামাযের ফেদিয়াও তাদেরকে দেয়া যায়।

* মৃত ব্যক্তির জিম্মায় কাযা রয়ে গেছে, কিন্তু তিনি ওছীয়ত করে যাননি, এমতাবস্থায় তার বালেগ উত্তর সূরীগণ যদি নিজেদের সম্পত্তি থেকে স্বেচ্ছায় তার ফেদিয়া আদায় করেন তাহলেও আশা করা যায় আল্লাহ এর ওছীলায় মৃতকে ক্ষমা করবেন।

রমযানের রোযা

* সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে ইচ্ছাকৃতভাবে পান, আহার ও যৌন তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলা হয়। প্রত্যেক আকেল (বোধ সম্পন্ন), বালেগ ও সুস্থ নর-নারীর উপর রমযানের রোযা রাখা ফরয।

* ছেলে মেয়ে দশ বৎসরের হয়ে গেলে তাদের দ্বারা শাস্তি দিয়ে হলেও রোযা রাখানো কর্তব্য। এর পূর্বেও শক্তি হলে রোযা রাখার অভ্যাস করানো উচিত।

রোযার নিয়তের মাসায়েলঃ

* রমযানের রোযার জন্য নিয়ত করা ফরয। নিয়ত ব্যতীত সারাদিন পানাহার ও যৌনতৃপ্তি থেকে বিরত থাকলেও রোযা হবে না।

* মুখে নিয়ত করা জরুরী নয়; অন্তরে নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে, তবে মুখে নিয়ত করা উত্তম।

* মুখে নিয়ত করলেও আরবীতে হওয়া জরুরী নয়– যে কোন ভাষায় নিয়ত করা যায়। নিয়ত এভাবে করা যায়–

আরবীতে ঃ نَوَيْتُ بِصَوْمِ الْيَوْمِ অথবা نَوَيْتُ بِصَوْمِ غَدٍ

বাংলায় ঃ আমি আজ রোযা রাখার নিয়ত করলাম।

* সূর্য ঢলার দেড় ঘন্টা পূর্বে পর্যন্ত রমযানের রোযার নিয়ত করা দুরস্ত আছে, তবে রাতেই নিয়ত করে নেয়া উত্তম। (جواهرالفقه ج/١)

* রমযান মাসে অন্য যে কোন প্রকার রোযা বা কাযা রোযার নিয়ত করলেও এই রমযানের রোযা আদায় হবে– অন্য যে রোযার নিয়ত করবে সেটা আদায় হবে না।

* রাতে নিয়ত করার পরও সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও যৌনকর্ম জায়েয।

সেহ্‌রীর মাসায়েল ঃ

* সেহ্‌রী খাওয়া জরুরী নয় তবে সেহ্‌রী খাওয়া সুন্নাত, অনেক ফজীলতের আমল, তাই ক্ষুধা না লাগলে বা খেতে ইচ্ছে না করলেও সেহ্‌রীর ফজীলত হাছিল করার নিয়তে যা-ই হোক কিছু পানাহার করে নিবে।

* নিদ্রার কারণে সেহ্‌রী খেতে না পারলেও রোযা রাখতে হবে। সেহ্‌রী না খেতে পারায় রোযা না রাখা অত্যন্ত পাপ।

* সেহ্‌রী-র সময় আছে বা নেই এ নিয়ে সন্দেহ হলে সেহ্‌রী না খাওয়া উচিত। এরূপ সময়ে খেলে রোযা কাযা করা ভাল। আর যদি পরে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তখন সেহ্‌রীর সময় ছিল না, তাহলে কাযা করা ওয়াজিব।

* সেহ্‌রীর সময় আছে মনে করে পানাহার করল অথচ পরে জানা গেল যে, তখন সেহ্‌রীর সময় ছিল না, তাহলে রোযা হবে না; তবে সারাদিন তাকে

রোযাদারের ন্যায় থাকতে হবে এবং রমযানের পর ঐ দিনের রোযা কাযা করতে হবে।

* বিলম্বে সেহ্‌রী খাওয়া উত্তম। আগে খাওয়া হয়ে গেলেও শেষ সময় নাগাদ কিছু চা-পানি ইত্যাদি করতে থাকলেও বিলম্বে সেহ্‌রী করার ফজীলত অর্জিত হবে।

ইফ্‌তার-এর মাসায়েল ঃ

* সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি ইফতার করা মোস্তাহাব। বিলম্বে ইফতার করা মাকরূহ।

* মেঘের দিনে কিছু দেরী করে ইফতার করা ভাল। মেঘের দিনে ঈমানদার ব্যক্তির অন্তরে সূর্য অস্ত গিয়েছে বলে সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত ছবর করা ভাল। শুধু ঘড়ি বা আযানের উপর নির্ভর করা ভাল নয়, কারণ তাতে ভুলও হতে পারে।

* সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকা পর্যন্ত ইফতার করা দুরস্ত নেই।

* সবচেয়ে উত্তম হল খোরমার দ্বারা ইফতার করা, তারপর কোন মিষ্টি জিনিস দ্বারা, তারপর পানি দ্বারা।

* লবণ দ্বারা ইফতার শুরু করা উত্তম—এই আকীদা ভুল।

* ইফতার করার পূর্বে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে। দুআ পাঠ করা মোস্তাহাব।

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

* ইফতার করার পর নিম্নের দুআ পাঠ করবে—

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ

* ইফতার এর সময় দুআ কবূল হয়, তাই ইফতারের পূর্বে বা কিছু ইফতার করে বা ইফতার থেকে সম্পূর্ণ ফারেগ হয়ে দু'আ করা মোস্তাহাব।

(جواهر الفتاوى ج /١)

* পশ্চিম দিকে প্লেনে সফর শুরু করার কারণে যদি দিন লম্বা হয়ে যায় তাহলে সুবহে সাদেক থেকে নিয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সূর্যাস্ত ঘটলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইফতার বিলম্ব করতে হবে, আর ২৪ ঘন্টার মধ্যেও সূর্যাস্ত না ঘটলে ২৪ ঘন্টা পূর্ণ হওয়ার সামান্য কিছু পূর্বে ইফতার করে নিবে। (احسن الفتاوى ج /٤)

* পূর্বদিকে প্লেনে সফর করলে যখনই সূর্যাস্ত পাবে তখনই ইফতার করবে।

যে সব কারণে রোযা ভাঙ্গে না এবং মাকরূহও হয় না

১। মেসওয়াক করা। যে কোন সময়ে হোক, কাঁচা হোক বা শুষ্ক।

২। শরীর বা মাথা বা দাড়ি গোঁপে তেল লাগানো।

৩। চোখে সুরমা লাগানো বা কোন ঔষধ দেয়া। (احسن الفتاوی)

৪। খুশবু লাগানো বা তার ঘ্রাণ নেয়া।

৫। ভুলে কিছু পান করা বা আহার করা বা স্ত্রী সম্ভোগ করা।

৬। গরম বা পিপাসার কারণে গোসল করা বা বারবার কুলি করা।

৭। অনিচ্ছা বশতঃ গলার মধ্যে ধোঁয়া, ধুলাবালি বা মাছি ইত্যাদি প্রবেশ করা।

৮। কানে পানি দেয়া বা অনিচ্ছবশতঃ চলে যাওয়ার কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না, তবে ইচ্ছাকৃতভাবে দিলে সতর্কতা হল সে রোযা কাযা করে নেয়া। (جواهر الفتاوی)

৯। অনচ্ছিকৃতভাবে বমি হওয়া। ইচ্ছাকৃতভাবে অল্প বমি করলে মাকরূহ হয় না, তবে এরূপ করা ঠিক নয়।

১০। স্বপ্ন দোষ হওয়া।

১১। মুখে থুথু আসলে গিলে ফেলা।

১২। যে কোন ধরনের ইনজেকশন বা টীকা লাগানো। (جواهر الفقه) তবে রোযার কষ্ট যেন বোধ না হয়- এ উদ্দেশ্যে শক্তির ইনজেকশন বা স্যালাইন লাগানো মাকরূহ। (جواهر الفتاوی)

১৩। রোযা অবস্থায় দাঁত উঠালে এবং রক্ত পেটে না গেলে।

১৪। পাইরিয়া রোগের কারণে যে সামান্য রক্ত সব সময় বের হতে থাকে এবং গলার মধ্যে যায় তার কারণে। (فتاوی رحیمیه ج/ ٣)

১৫। সাপ ইত্যাদি দংশন করলে। (فتاوی محمودیه ج/ ٣)

১৬। পান খাওয়ার পর ভালভাবে কুলি করা সত্ত্বেও যদি থুথুতে লালভাব থেকে যায়।

১৭। শাহওয়াতের সাথে শুধু নজর করার কারণেই যদি বীর্যপাত ঘটে যায় তাহলে রোযা ফাসেদ হয় না।

১৮। রোযা অবস্থায় শরীর থেকে ইনজেকশনের সাহায্যে রক্ত বের করলে রোযা ভাঙ্গে না এবং এতে রোযা রাখার শক্তি চলে যাওয়ার মত দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা না থাকলে মাকরূহও হয় না। (احسن الفتاوی ج/ ٤)

যে সব কারণে রোযা ভাঙ্গে না তবে মাকরূহ হয়ে যায়

১। বিনা প্রয়োজনে কোন জিনিস চিবানো।

২। তরকারী ইত্যাদির লবণ চেখে ফেলে দেয়া। তবে কোন চাকরের মুনিব বা কোন নারীর স্বামী বদ মেজাযী হলে জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে লবণ চেখে তা ফেলে দিলে এতটুকুর অবকাশ আছে।

৩। কোন ধরনের মাজন, কয়লা, গুল বা টুথপেষ্ট ব্যবহার করা মাকরূহ। আর এর কোন কিছু সামান্য পরিমাণও গলার মধ্যে চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (جواهر الفقه ج/ ١)

৪। গোসল ফরয-এ অবস্থায় সারা দিন অতিবাহিত করা।

৫। কোন রোগীর জন্য নিজের রক্ত দেয়া। (جواهر الفقه ج/ ١)

৬। গীবত করা, চোগলখুরী করা, অনর্থক কথাবার্তা বলা, মিথ্যা বলা।

৭। ঝগড়া ফ্যাসাদ করা, গালি-গালাজ করা।

৮। ক্ষুধা বা পিপাসার কারণে অস্থিরতা প্রকাশ করা।

৯। মুখে অধিক পরিমাণ থুথু একত্র করে গিলে ফেলা।

১০। দাঁতে ছোলা বুটের চেয়ে ছোট কোন বস্তু আটকে থাকলে তা বের করে মুখের ভিতর থাকা অবস্থায় গিলে ফেলা।

১১। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকবে না—এরূপ মনে হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীকে চুম্বন করা ও আলিঙ্গন করা। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণের আস্থা থাকলে ক্ষতি নেই, তবে যুবকদের এহেন অবস্থা থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। আর রোযা অবস্থায় স্ত্রীর ঠোঁট মুখে নেয়া সর্বাবস্থায় মাকরূহ।

১২। নিজের মুখ দিয়ে চিবিয়ে কোন বস্তু শিশুর মুখে দেয়া। তবে অনন্যোপায় অবস্থায় এরূপ করলে অসুবিধা নেই।

১৩। পায়খানার রাস্তা পানি দ্বারা এত বেশী ধৌত করা যে, ভিতরে পানি পৌঁছে যাওয়ার সন্দেহ হয়—এরূপ করা মাকরূহ। আর প্রকৃত পক্ষে পানি পৌঁছে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। তাই এ ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। এ জন্য রোযা অবস্থায় পানি দ্বারা ধৌত করার পর কোন কাপড় দ্বারা বা হাত দ্বারা পানি পরিষ্কার করে ফেলা নিয়ম।

১৪। ঠোঁটে লিপিস্টিক লাগালে যদি মুখের ভিতর চলে যাওয়ার আশংকা হয় তাহলে তা মাকরূহ।

যে সব কারণে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হয়

১। কানে বা নাকে ঔষধ দিলে।

২। ইচ্ছকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে বা অল্প বমি আসার পর তা গিলে ফেললে।

৩। কুলি করার সময় অনিচ্ছাবশতঃ কণ্ঠনালীতে পানি চলে গেলে।

৪। স্ত্রী বা কোন নারীকে শুধু স্পর্শ প্রভৃতি করার কারণেই বীর্যপাত হয়ে গেলে।

৫। এমন কোন জিনিস খেলে যা সাধারণতঃ খাওয়া হয় না। যেমন কাঠ, লোহা, কাগজ, পাথর, মাটি, কয়লা ইত্যাদি।

৬। বিড়ি, সিগারেট বা হুক্কা সেবন করলে।

৭। আগরবাতি প্রভৃতির ধোঁয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নাকে বা হলকে পৌঁছালে।

৮। ভুলে পানাহার করার পর রোযা ভেঙ্গে গেছে মনে করে আবার ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু পানাহার করলে।

৯। রাত আছে মনে করে সুবহে সাদেকের পরে সেহরী খেলে।

১০। ইফতারীর সময় হয়নি, দিন রয়ে গেছে অথচ সময় হয়ে গেছে–এই মনে করে ইফতারী করলে।

১১। দুপুরের পরে রোযার নিয়ত করলে।

১২। দাঁত দিয়ে রক্ত বের হলে তা যদি থুথুর চেয়ে পরিমাণে বেশী হয় এবং কণ্ঠনালীর নীচে চলে যায়।

১৩। কেউ জোর পূর্বক রোযাদারের মুখে কোন কিছু দিলে এবং তা কণ্ঠনালীতে পৌঁছে গেলে।

১৪। দাঁতে কোন খাদ্য-টুকরা আটকে ছিল এবং সুবহে সাদেকের পর তা যদি পেটে চলে যায় তবে সে টুকরা ছোলা বুটের চেয়ে ছোট হলে রোযা ভেঙ্গে যায় না, তবে এরূপ করা মাকরূহ। কিন্তু মুখ থেকে বের করার পর গিলে ফেললে তা যতই ছোট হোক না কেন রোযা কাযা করতে হবে।

১৫। হস্ত মৈথুন করলে যদি বীর্যপাত হয়।

১৬। পেশাবের রাস্তায় বা স্ত্রীর যৌনিতে কোন ঔষধ প্রবেশ করালে।

১৭। পানি বা তেল দ্বারা ভিজা আঙ্গুল যৌনিতে বা পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করালে।

১৭। শুকনো আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে পুরোটা বা কিছুটা বের করে আবার প্রবেশ

করালে। আর যদি শুকনো আঙ্গুল একবার প্রবেশ করিয়ে একবারেই পুরোটা বের করে নেয়– আবার প্রবেশ না করায়, তাহলে রোযার অসুবিধা হয় না।

১৮। মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে গেলে এবং এ অবস্থায় সুবহে সাদেক হয়ে গেলে।

১৯। নস্যি গ্রহণ করলে বা কানে তেল ঢাললে।

২০। কেউ রোযার নিয়তই যদি না করে তাহলেও শুধু কাযা ওয়াজিব হয়।

২১। স্ত্রীর বেহুশ থাকা অবস্থায় কিম্বা বে-খবর ঘুমন্ত অবস্থায় তার সাথে সহবাস করা হলে ঐ স্ত্রীর উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।

২২। রমযান ব্যতীত অন্য নফল রোযা ভঙ্গ হলে শুধু কাযা ওয়াজিব হয়।

২৩। এক দেশে রোযা শুরু করার পর অন্য দেশে চলে গেলে সেখানে যদি নিজের দেশের তুলনায় আগে ঈদ হয়ে যায় তাহলে নিজের দেশের হিসেবে যে কয়টা রোযা বাদ গিয়েছে তার কাযা করতে হবে। আর যদি সেখানে গিয়ে রোযা এক দুটো বেড়ে যায় তাহলে তা রাখতে হবে।

যে সব কারণে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং কাযা, কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হয়

১। রোযার নিয়ত (রাতে) করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে।

২। রোযার নিয়ত করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী সম্ভোগ করলে। স্ত্রীর উপরও কাযা কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে। স্ত্রী যৌনির মধ্যে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করালেই কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে, চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক।

৩। রোযার নিয়ত করার পর পাপ হওয়া সত্ত্বেও যদি পুরুষ তার পুরুষাঙ্গ স্ত্রীর পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করায় এবং অগ্রভাগ ভিতরে প্রবেশ করে (চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক) তাহলেও পুরুষ স্ত্রী উভয়ের উপর কাযা এবং কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে।

৪। রোযা অবস্থায় কোন বৈধ কাজ করল যেমন স্ত্রীকে চুম্বন দিল কিম্বা মাথায় তেল দিল তা সত্ত্বেও সে মনে করল যে, রোযা নষ্ট হয়ে গিয়েছে; আর তাই পরে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার ইত্যাদি করল, তাহলেও কাযা কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে।

যে সব কারণে রোযা না রাখার অনুমতি আছে

১। যদি কেউ শরীয়ত সম্মত সফরে থাকে তাহলে তার জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে; পরে কাযা করে নিতে হবে। কিন্তু সফরে যদি কষ্ট না হয়, তাহলে রোযা রাখাই উত্তম। আর যদি কোন ব্যক্তি রোযা রাখার নিয়ত করার পর সফর শুরু করে তাহলে সে দিনের রোযা রাখা জরুরী।

২। কোন রোগী ব্যক্তির রোযা রাখলে যদি তার রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা হয় অথবা অন্য কোন নূতন রোগ দেখা দেয়ার আশংকা হয় অথবা রোগ মুক্তি বিলম্বিত হওয়ার আশংকা হয়, তাহলে রোযা ছেড়ে দেয়ার অনুমতি আছে। সুস্থ হওয়ার পর কাযা করে নিতে হবে। তবে অসুস্থ অবস্থায় রোযা ছাড়তে হলে কোন দ্বীনদার পরহেযগার চিকিৎসকের পরামর্শ থাকা শর্ত, কিম্বা নিজের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে হতে হবে, শুধু নিজের কাল্পনিক খেয়ালের বশীভূত হয়ে আশংকাবোধ করে রোযা ছাড়া দুরস্ত হবে না। তাহলে কাযা কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে। (بہشتی زیور)

৩। রোগ মুক্তির পর যে দুর্বলতা থাকে তখন রোযা রাখলে যদি পুনরায় রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রবল আশংকা হয় তাহলে তখন রোযা না রাখার অনুমতি আছে, পরে কাযা করে নিতে হবে।

৪। গর্ভবতী বা দুগ্ধদায়িনী স্ত্রী লোক রোযা রাখলে যদি নিজের জীবনের ব্যাপারে বা সন্তানের জীবনের ব্যাপারে আশংকা বোধ করে বা রোযা রাখলে দুধ শুকিয়ে যাবে আর সন্তানের সমূহ কষ্ট হবে-এরূপ নিশ্চিত হলে তার জন্য তখন রোযা ছাড়া জায়েয, পরে কাযা করে নিতে হবে।

৫। হায়েয নেফাস অবস্থায় রোযা ছেড়ে দিতে হবে এবং পবিত্র হওয়ার পর কাযা করে নিতে হবে।

যেসব কারণে রোযা শুরু করার পর তা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি রয়েছে

১। যদি এমন পিপাসা বা ক্ষুধা লাগে যাতে প্রাণের আশংকা দেখা দেয়।

২। যদি এমন কোন রোগ বা অবস্থা দেখা দেয় যে, ওষুধ-পত্র গ্রহণ না করলে জীবনের আশা ত্যাগ করতে হয়।

৩। গর্ববতী স্ত্রীলোকের যদি এমন অবস্থা হয় যে, নিজের বা সন্তানের প্রাণ নাশের আশংকা হয়।

৪। বেহুঁশ বা পাগল হয়ে গেলে।

* উল্লেখ্য যে, এসব অবস্থায় যে রোযা ছেড়ে দেয়া হবে পরে তার কাযা করে নিতে হবে।

* কেউ যদি অন্যকে দিয়ে কাজ করাতে পারে বা জীবিকা অর্জনের জন্য অন্য কোন কাজ করতে পারে তা সত্ত্বেও সে টাকার লোভে রৌদ্রে গিয়ে কাজ করল এবং এ কারণে অনুরূপ পিপাসায় আক্রান্ত হল কিম্বা বিনা অপারগতায় আগুনের কাছে যাওয়ার কারণে অনুরূপ পিপাসায় আক্রান্ত হল, তাহলে তার জন্যে রোযা ছাড়ার অনুমতি নেই।

রমযান মাসের সম্মান রক্ষার মাসায়েল

* রমযান মাসে দিনের বেলায় লোকদের পানাহারের উদ্দেশ্যে হোটেল রেস্তোরা প্রভৃতি খাবার দোকান খোলা রাখা রমযানের অবমাননা বিধায় তা পাপ। অন্য ধর্মাবলম্বী বা মাযূর ব্যক্তিদের খাতিরে খোলা রাখার অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। (فتاوى رحيميه ج/٦)

* কোন কারণ বশতঃ রোযা ভেঙ্গে গেলেও বাকী দিনটুকু পানাহার পরিত্যাগ করে রোযাদারের ন্যায় থাকা ওয়াজিব। (বেহেশতি জেওর)

* দুর্ভাগ্য বশতঃ কেউ যদি রোযা না রাখে তবুও অন্যের সামনে পানাহার করা বা প্রকাশ করা যে, আমি রোযা রাখিনি– এতে দ্বিগুণ পাপ হয়, প্রথম হল রোযা না রাখার পাপ, দ্বিতীয় হল গোনাহ প্রকাশ করার পাপ।

রোযার কাযার মাসায়েল

* রমযানের রোযা কাযা হয়ে গেলে রমযানের পর যথা শীঘ্র কাযা করে নিতে হবে। বিনা কারণে কাযা রোযা রাখতে দেরী করা গোনাহ।

* কাযা রোযার জন্যে সোবহে সাদেকের পূর্বেই নিয়ত করতে হবে, অন্যথায় কাযা রোযা সহীহ হবে না। সোবহে সাদেকের পর নিয়ত করলে সে রোযা নফল হয়ে যাবে।

* ঘটনাক্রমে একাধিক রমযানের কাযা রোযা একত্রিত হয়ে গেলে নির্দিষ্ট করে নিয়ত করতে হবে যে, আজ অমুক বৎসরের রমযানের রোযা আদায় করছি।

* যে কয়টি রোযা কাযা হয়েছে তা একাধারে রাখা মোস্তাহাব। বিভিন্ন সময়ে রাখাও দুরস্ত আছে।

* কাযা শেষ করার পূর্বেই নতুন রমযান এসে গেলে তখন ঐ রমযানের রোযাই রাখতে হবে। কাযা পরে আদায় করে নিতে হবে।

রোযার কাফফারা-র মাসায়েল

* একটি রোযার কাফফারা ৬০টি রোযা (একটি কাযা বাদেও)। এই ৬০টি রোযা একাধারে রাখতে হবে। মাঝখানে ছুটে গেলে আবার পুনরায় পূর্ণ ৬০টি একাধারে রাখতে হবে।

* কাফফারার রোযা এমন দিন থেকে শুরু করবে যেন মাঝখানে কোন নিষিদ্ধ দিন এসে না যায়। উল্লেখ্য, যে পাঁচ দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ বা হারাম তা হল দুই ঈদের দিন এবং ঈদুল আযহার পরের তিন দিন। কাফফারার রোযা রাখার মধ্যে হায়েযের দিন (নেফাছের নয়) এসে গেলে যে কয়দিন সে হায়েযের কারণে বিরতি যাবে তাতে অসুবিধে নেই। এই ৬০ দিনের মধ্যে নেফাস বা রমযানের মাস এসে যাওয়ার কারণে বিরতি হলেও কাফফারা আদায় হবে না।

* কাযা রোযার ন্যায় কাফফারার রোযার নিয়তও সুবহে সাদেকের পূর্বে হওয়া জরুরী।

* একই রমযানের একাধিক রোযা ছুটে গেলে কাফফারা একটাই ওয়াজিব হবে। দু রমযানের ছুটে গেলে দুই কাফফারা ওয়াজিব হবে।

* কাফফারা বাবত বিরতিহীন ভাবে ৬০ দিন রোযা রাখার সামর্থ না থাকলে পূর্ণ খোরাক খেতে পারে– এমন ৬০ জন মিসকীনকে (অথবা এক জনকে ৬০ দিন) দু'বেলা পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়াতে হবে অথবা সাদকায়ে ফিতর-য়ে যে পরিমাণ গম বা তার মূল্য দেয়া হয় প্রত্যেককে সে পরিমাণ দিতে হবে। এই গম ইত্যাদি বা মূল্য দেয়ার ক্ষেত্রে একজনকে ৬০ দিনেরটা এক দিনেই দিয়ে দিলে কাফফারা আদায় হবে না। তাতে মাত্র এক দিনের কাফফারা ধরা হবে।

* ৬০ দিন খাওয়ানোর বা মূল্য দেয়ার মাঝে ২/১ দিন বিরতি পড়লে ক্ষতি নেই।

রোযার ফেদিয়ার মাসায়েল

* ফেদিয়া অর্থ ক্ষতি পূরণ। রোযা রাখতে না পারলে বা কাযা আদায় করতে না পারলে যে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় তাকে ফেদিয়া বলে। প্রতিটা রোযার পরিবর্তে সাদকায়ে ফিতর (ফিতরা) পরিমাণ পণ্য বা তার মূল্য দান করাই হল এক রোযার ফেদিয়া। (ফিতরা-এর পরিমাণ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ২৩৩ পৃষ্ঠা)

* যার যিম্মায় কাযা রোযা রয়ে গেছে– জীবদ্দশায় আদায় হয়নি, মৃত্যুর পর তার ওয়ারিছগণ তার রোযার ফেদিয়া আদায় করবে। মৃত ব্যক্তি ওছীয়ত করে গিয়ে থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে নিয়ম অনুযায়ী এই ফেদিয়া আদায় করা হবে। আর ওছীয়ত না করে থাকলেও যদি ওয়ারিছগণ নিজেদের মাল থেকে ফেদিয়া আদায় করে দেন তবুও আশা করা যায় আল্লাহ তা কবূল করবেন এবং মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন।

* অতি বৃদ্ধ রোযা রাখতে না পারলে অথবা কোন ধ্বংসকারী বা দীর্ঘ মেয়াদী রোগ হলে এবং সুস্থ হওয়ার কোন আশা না থাকলে আর রোযা রাখলে ক্ষতি

হওয়ার ভয় থাকলে এমন লোকের জন্য প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে ফেদিয়া আদায় করার অনুমতি আছে। তবে এরূপ বৃদ্ধ বা এরূপ রোগী পুনরায় কখনও রোযা রাখার শক্তি পেলে তাদেরকে কাযা করতে হবে এবং যে ফেদিয়া দান করেছিল তার ছওয়াব পৃথকভাবে সে পাবে।

নফল রোযার মাসায়েল

* সারা বৎসরের পাঁচ দিন ব্যতীত যে কোন দিন নফল রোযা রাখা যায়। উক্ত পাঁচ দিন হল দুই ঈদের দুই দিন এবং ঈদুল আযহার পরের তিন দিন অর্থাৎ, ১১ই, ১২ই ও ১৩ই জিলহজ্ব। এই পাঁচ দিন যে কোন রোযা রাখা হারাম।

* যে প্রত্যেক চান্দ্র মাসের ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই তারিখে নফল রোযা রাখল, সে যেন সারা বৎসর রোযা রাখল। এটাকে 'আইয়্যামে বীযের রোযা' বলে।

* প্রত্যেক সোমবার এবং বৃহস্পতিবারও নবী (সঃ) নফল রোযা রাখতেন। এতেও অনেক সওয়াব আছে।

* বেলা দ্বিপ্রহরের এক ঘন্টা পূর্বে পর্যন্ত নফল রোযার নিয়ত করা দুরস্ত আছে।

* নফল রোযা শুরু করলে সেটা পুরো করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাই নফল রোযার নিয়ত করার পর সেটা ভাঙ্গলে তার কাযা করা ওয়াজিব।

* স্বামী বাড়ীতে থাকা অবস্থায় তার বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর জন্যে নফল রোযা রাখা দুরস্ত নয়। রাখলে স্বামী হুকুম করলে তা ভেঙ্গে পরে কাযা করে নিতে হবে।

* মেহমান যদি একা খেতে মনে কষ্ট পায় তাহলে তার খাতিরে মেযবান (বাড়ীওয়ালা) নফল রোযা ভেঙ্গে ফেলতে পারে। ভাঙ্গলে পরে কাযা করে নিতে হবে। তবে এই ভাঙ্গার অনুমতি সূর্য ঢলার পূর্ব পর্যন্ত। (عمدة الرعاية)

মান্নতের রোযার মাসায়েল

* যদি কেউ আল্লাহর নামে রোযা রাখার মান্নত করে তাহলে সেই রোযা রাখা ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে কোন শর্তের ভিত্তিতে মান্নত মানলে সেই শর্ত পূরণ হওয়ার পূর্বে ওয়াজিব হয় না– শর্ত পূরণ হলেই ওয়াজিব হয়।

* কোন নির্দিষ্ট দিনে রোযা রাখার মান্নত করলে এবং সেই দিন রোযা রাখলে রাত্রেই নিয়ত করা জরুরী নয়, দুপুরের এক ঘন্টা পূর্বে পর্যন্ত নিয়ত করা দুরস্ত আছে।

* কোন নির্দিষ্ট দিনের রোযা রাখার মান্নত করলে এবং সেই দিন সে রোযা রাখলে মান্নতের রোযা বলে নিয়ত করুক বা শুধু রোযা বলে নিয়ত করুক বা নফল বলে নিয়ত করুক মান্নতের রোযাই আদায় হবে। তবে কাযা রোযার নিয়ত করলে কাযাই আদায় হবে–মান্নতের রোযা আদায় হবে না।

* কোন দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে মান্নত না করলে যে কোন দিন সে মান্নতের রোযা রাখা যায়। এরূপ মান্নতের রোযার নিয়ত সুবহে সাদেকের পূর্বেই হওয়া শর্ত।

* কোন নির্দিষ্ট দিনে বা নির্দিষ্ট তারিখে বা নির্দিষ্ট মাসে রোযা রাখার মান্নত করলে সেই নির্দিষ্ট দিনে বা তারিখে বা মাসে রোযা রাখাই জরুরী নয়– অন্য কোন সময় রাখলেও চলবে।

* যদি এক মাস রোযা রাখার মান্নত করে তবে পুরো এক মাস লাগাতর রোযা রাখতে হবে।

* যদি কয়েক দিন রোযা রাখার মান্নত করে তাহলে একত্রে রাখার নিয়ত না থাকলে সে কয় দিন ভেঙ্গে ভেঙ্গে রাখলেও চলবে। আর একত্রে রাখার নিয়ত করলে একত্রেই রাখতে হবে।

সুন্নাত এ'তেকাফ (রমযানের শেষ দশকের এ'তেকাফ)-এর মাসায়েল

* এ'তেকাফ অর্থ স্থির থাকা, অবস্থান করা। পরিভাষায় জাগতিক কার্যকলাপ ও পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছওয়াবের নিয়তে মসজিদে বা ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা ও স্থির থাকাকে এ'তেকাফ বলে।

* রমযানের শেষ দশকে এ'তেকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কেফায়া, অর্থাৎ বড় গ্রাম বা শহরের প্রত্যেকটা মহল্লা এবং ছোট গ্রামের পূর্ণ বসতিতে কেউ কেউ এ'তেকাফ করলে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে– আর কেউই না করলে সকলেই সুন্নাত তরকের জন্য দায়ী হবে।

* রমযানের ২০ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে থেকে ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা পর্যন্ত এ'তেকাফের সময়।

এ'তেকাফের শর্ত সমূহ ঃ

এ'তেফাকের জন্য তিনটি শর্ত; যথা ঃ

(১) এমন মসজিদে এ'তেকাফ হতে হবে যেখানে নামাযের জামাআত হয়। জুমুআ-র জামাআতে হোক বা না হোক। এ শর্ত পুরুষের এ'তেকাফের ক্ষেত্রে। মহিলাগণ ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে এ'তেকাফ করবে।

(২) এ'তেকাফের নিয়ত করতে হবে।

(৩) হায়েয নেফাস শুরু হলে এ'তেকাফ ছেড়ে দিবে।

যে সব কারণে এ'তেকাফ ফাসেদ তথা নষ্ট হয়ে যায় এবং কাযা করতে হয় ঃ

(১) স্ত্রী সহবাস করলে; চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক, ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে হোক। সহবাসের আনুষঙ্গিক কাজ যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন, ইত্যাদির কারণে বীর্যপাত হলে এ'তেকাফ ফাসেদ হয়ে যায়, তবে চুম্বন ইত্যাদির কারণে বীর্যপাত না হলে এ'তেকাফ বাতিল হয় না, তবে এ'তেকাফের অবস্থায় তা করা হারাম।

(২) এ'তেকাফের স্থান থেকে শরীয়ত সম্মত প্রয়োজন বা স্বাভাবিক প্রয়োজন ছাড়া বের হয়ে যাওয়া। শরীয়ত সম্মত প্রয়োজন হলে মসজিদের বাইরে যাওয়া যায়; যেমন সে মসজিদে জুমুআর জামাআত না হলে জুমুআর নামাযের জন্যে জামে মসজিদে যাওয়া, ফরয বা সুন্নাত গোসলের জন্যে বের হওয়া ইত্যাদি। আর স্বাভাবিক প্রয়োজনেও বের হওয়া যায়; যেমন পেশাব-পায়খানার জন্য বের হওয়া, খাদ্য খাবার এনে দেয়ার লোক না থাকলে খাওয়ার আনার জন্য বের হওয়া, মসজিদের ভিতর উযুর পানির ব্যবস্থা না থাকলে এবং পানি দেয়ার জন্য কেউ না থাকলে উযুর পানির জন্য বাইরে যাওয়া । যে কাজের জন্য বাইরে যাওয়া হবে সে কাজ সমাপ্ত করার পর সত্বর ফিরে আসবে, বিনা প্রয়োজনে কারও সাথে কথা বলবে না।

* গোসল ফরয হওয়া ছাড়াও আমরা শরীর ঠাণ্ডা করার নিয়তে বা পরিষ্কার করার নিয়তে সাধারণতঃ যে গোসল করে থাকি, শুধু এরূপ গোসলেরই উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে না। তবে কাউকে বলে যদি পথের মধ্যে পানির ব্যবস্থা করে রাখে বা পুকুর ইত্যাদি থাকে আর পেশাব পায়খানা থেকে ফেরার পথে অতিরিক্ত সময় না লাগিয়ে জলদি ঐ পানি গায়ে মাথায় ঢেলে বা ডুব দিয়ে গোসল সেরে চলে আসে তাহলে এ'তেকাফের ক্ষতি হবে না।

এ'তেকাফের অবস্থায় যে সব জিনিস মাকরূহ ঃ

(১) এ'তেকাফ অবস্থায় চুপ থাকলে ছওয়াব হয় এই মনে করে চুপ থাকা মাকরূহ তাহরীমী।

(২) বিনা জরুরতে দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত হওয়া মাকরূহ তাহরীমী। যেমন কেনা-বেচা করা ইত্যাদি । তবে নেয়াহেত জরুরত হলে যেমন ঘরে খোরাকী নেই এবং সে ব্যতীত কোন বিশ্বস্ত লোকও নেই–এরূপ অবস্থায় মসজিদে মাল-পত্র উপস্থিত না করে কেনা-বেচার চুক্তি করতে পারে।

এ'তেকাফের মোস্তাহাব ও আদব সমূহ ঃ

১. এ'তেকাফের জন্য সর্বোত্তম মসজিদ নির্বাচন করবে। সর্বোত্তম মসজিদ হল মসজিদুল হারাম, তারপর মসজিদে নববী, তারপর বায়তুল মুকাদ্দাস,

তারপর যে জামে মসজিদে জামাআতের এন্তেজাম আছে, তারপর মহল্লার মসজিদ, তারপর যে মসজিদে বড় জামাআত হয়।

২. নেক কথা ব্যতীত অন্য কথা না বলা।

৩. বেকার বসে না থেকে নফল নামায, তিলাওয়াত, তাসবীহ তাহলীলে মশগুল থাকা উত্তম।

* এ'তেকাফে খাস কোন ইবাদত করা শর্ত নয়– যে কোন নফল নামায, যিকির–আযকার, তিলাওয়াত, দ্বীনী কিতাব পড়া, পড়ানো বা যে ইবাদত মনে চায় করতে পারে।

* এ'তেকাফ শুরু করার পর নিজের বা অন্যের জীবন বাঁচানোর তাগিদে অনন্যোপায় অবস্থায় এ'তেকাফের স্থান থেকে বের হলে গোনাহ নেই বরং তা জরুরী, তবে তাতে এ'তেকাফ ভেঙ্গে যাবে।

* কোন শরীয়ত সম্মত প্রয়োজনে বা স্বাভাবিক প্রয়োজনে বের হলে ইত্যবসরে কোন রোগী দেখলে বা জানাযায় শরীক হলে তাতে কোন দোষ নেই।

* পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এ'তেকাফে বসা অথবা বসানো উভয়টা নাজায়েয ও গোনাহ। (جواهر الفتاوى ج/١)

* মহিলাদের জন্যে মসজিদে এ'তেকাফ করা মাকরূহ তাহরীমী। তারা ঘরে এ'তেকাফ করবে। স্বামী মওজুদ থাকলে এ'তেকাফের জন্য স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। স্বামীর খেদমতের প্রয়োজন থাকলে এ'তেকাফে বসবে না। শিশুর তত্ত্বাবধান ও যুবতী কন্যার প্রতি খেয়াল রাখার প্রয়োজনীয়তা থাকলে এ'তেকাফে না বসাই সমীচীন। মহিলাগণ নির্দিষ্ট কোন কামরায় বা ঘরের কোন এক স্থানে পর্দা ঘিরে এ'তেকাফে বসবেন। মহিলাদের জন্য এ'তেকাফের অন্যান্য মাসায়েল পুরুষদেরই ন্যায়।

ওয়াজিব এ'তেকাফ (মান্নতের এ'তেকাফ)-এর মাসায়েল

* এ'তেকাফের মান্নত করলে এ'তেকাফ ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে কোন শর্তের ভিত্তিতে মান্নত করলে (যেমন আমার অমুক কাজ হয়ে গেলে এ'তেকাফ করব) শর্ত পূরণ হওয়ার পূর্বে ওয়াজিব হয় না।

* ওয়াজিব এ'তেকাফের জন্য রোযা শর্ত–যখনই এ'তেকাফ করবে রোযাও রাখতে হবে।

* ওয়াজিব এ'তেকাফ কমপক্ষে একদিন হতে হবে। বেশী দিনের নিয়ত করলে তা-ই করতে হবে।

* যদি শুধু এক দিনের এ'তেকাফের মান্নত করে তবে তার সঙ্গে রাত শামেল হবে না। তবে যদি রাত দিন উভয়ের নিয়ত করে বা একত্রে কয়েক দিনের মান্নত করে তাহলে রাত্রও শামেল হবে। দিন বাদে শুধু রাতে এ'তেকাফের মান্নত হয় না।

* উপরোল্লিখিত মাসায়েল ব্যতীত সুন্নাত এ'তেকাফের ক্ষেত্রে যে সব মাসায়েল বর্ণনা করা হয়েছে, ওয়াজিব এ'তেকাফের ক্ষেত্রেও সেগুলো প্রযোজ্য।

মোস্তাহাব/ নফল এ'তেকাফের মাসায়েল

* সুন্নাত এ'তেকাফ, (রমযানের পূর্ণ শেষ দশক) ও ওয়াজিব এ'তেকাফ ব্যতীত অন্যান্য যে কোন সময়ের এ'তেকাফের জন্য কোন পরিমাণ সময় নির্ধারিত নেই– সামান্য সময়ের জন্যেও তা হতে পারে।

* যে সব জিনিস দ্বারা এ'তেকাফ ফাসেদ হয়ে যায় এবং কাযা করতে হয় সে সব দ্বারা মোস্তাহাব এ'তেকাফও নষ্ট হয়ে যাবে। তবে মোস্তাহাব এ'তেকাফের জন্য যেহেতু সময়ের পরিমাণ নির্ধারিত নেই, তাই তার কাযাও নেই।

যাকাতের মাসায়েল

কোন্ কোন্ অর্থ/সম্পদ কি পরিমাণ থাকলে যাকাত ফরয হয় ঃ

* যদি কারও নিকট শুধু স্বর্ণ থাকে – রৌপ্য, টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়িক পণ্য কিছুই না থাকে, তাহলে সাড়ে সাত তোলা বা তার বেশী (স্বর্ণ) থাকলে বৎসরান্তে তার উপর যাকাত ফরয হয়।

* যদি কারও নিকট শুধু রৌপ্য থাকে– স্বর্ণ, টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়িক পণ্য কিছুই না থাকে, তাহলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা (রৌপ্য) থাকলে বৎসরান্তে তার উপর যাকাত ফরয হয়।

* যদি কারও নিকট কিছু স্বর্ণ থাকে এবং তার সাথে কিছু রৌপ্য বা কিছু টাকা-পয়সা বা কিছু ব্যবসায়িক পণ্য থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে স্বর্ণের সাড়ে তোলা বা রৌপ্যের সাড়ে বায়ান্ন তোলা দেখা হবে না বরং স্বর্ণ, রৌপ্য এবং টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়িক পণ্য যা কিছু আছে সবটা মিলে যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের যে কোন একটার মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে (বৎসরান্তে) তার উপর যাকাত ফরয হবে।

* যদি কারও নিকট শুধু টাকা-পয়সা থাকে–স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্যবসায়িক পণ্য কিছু না থাকে, তাহলে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের

যে কোন একটার মূল্যের সমপরিমাণ (টাকা-পয়সা) থাকলে বৎসরান্তে তার উপর যাকাত ফরয হবে।

* কারও নিকট স্বর্ণ, রৌপ্য ও টাকা-পয়সা কিছুই নেই শুধু ব্যবসায়িক পণ্য রয়েছে, তাহলে উপরোক্ত পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্যের যে কোন একটার মূল্যের সমপরিমাণ থাকলে বৎসরান্তে তার উপর যাকাত ফরয হবে।

* কারও নিকট স্বর্ণ, রৌপ্য নেই শুধু টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়িক পণ্য রয়েছে, তাহলে টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য মিলিয়ে যদি উক্ত পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্যের যে কোন একটার মূল্যের সমপরিমাণ হয় তাহলে বৎসরান্তে তার উপর যাকাত ফরয হবে।

যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত সমূহ ঃ

* আকেল (বুদ্ধিমান) বালেগ, ছাহেবে নেছাব মুসলমানের উপর বৎসরে একবার যাকাত আদায় করা ফরয। যে পরিমাণ অর্থের উপর যাকাত ফরয হয় তাকে বলে 'নেছাব' আর এ পরিমাণ অর্থের মালিককে বলা হয় 'ছাহেবে নেছাব'। গরীব, পাগল ও না-বালেগের সম্পত্তিতে যাকাত ফরজ হয় না।

* নেছাব পরিমাণ অর্থের উপর পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হলে যাকাত ফরয হয়–এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে যাকাত ফরয হয় না।

* অর্থ সম্পদের প্রত্যেকটা অংশের উপর পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয় বরং শুধু নেছাব পরিমাণের উপর বৎসর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। কাজেই বৎসরের শুরুতে যে পরিমাণ ছিল (নেছাবের চেয়ে কম না হওয়া চাই) বৎসরের শেষে যদি তার চেয়ে পরিমাণ বেশী দেখা যায় তাহলে ঐ বেশী পরিমাণের উপরও যাকাত ফরয হবে। এখানে দেখা গেল ঐ বেশী পরিমাণ–যেটা বৎসরের মাঝে যোগ হয়েছে–তার উপর পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত না হওয়া সত্ত্বেও তার উপর যাকাত আসছে।

* কেউ যদি বৎসরের শুরুতে মালেকে নেছাব হয় এবং বৎসরের শেষেও মালেকে নেছাব থাকে, মাঝখানে কিছু কম হয়ে যায় (নেছাবের ন্যূনতম পরিমাণের চেয়ে কমে গেলেও) তবে বৎসরের শেষে তার নিকট যে পরিমাণ থাকবে তার উপর যাকাত ফরয হবে। তবে মাঝখানে যদি এমন হয়ে যায় যে, মোটেই অর্থ সম্পদ না থাকে, তাহলে পূর্বের হিসাব বাদ যাবে। পুনরায় যখন নেছাবের মালিক হবে তখন থেকে নতুন হিসাব ধরা হবে, তখন থেকেই বৎসরের শুরু ধরা হবে।

যে সব অর্থ/ সম্পদের যাকাত আসে না ঃ

* ব্যবসায়িক পণ্য ছাড়া ঘরে যে সব আসবাবপত্র, কাপড়-চোপড় থালা-বাসন, হাড়ি-পাতিল, আলমারি, শোকেজ, পড়ার বই ইত্যাদি থাকে তার উপর যাকাত আসে না।

* থাকা বা ভাড়া দেয়ার উদ্দেশ্যে যে ঘর-বাড়ী নির্মাণ করা হয় বা ক্রয় করা হয় কিম্বা অনুরূপ উদ্দেশ্যে যে জমি ক্রয় করা হয় সে ঘর-বাড়ী ও জমির মূল্যের উপর যাকাত আসে না। তবে ব্যবসা/বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত বাড়ী ও জমির মূলের উপর যাকাত আসে।

* কারও কারখানা থাকলে এবং উক্ত কারখানায় কোন উৎপাদন হলে সে উৎপাদনের কাজে যে মেশিন, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ব্যবহৃত হয়, মিল-ফ্যাক্টরীর যে গাড়ী ও যানবাহন ব্যবহৃত হয় তার মূল্যের উপর যাকাত আসে না বরং যাকাত আসে উৎপাদিত মালামাল ও ক্রয়কৃত কাঁচামালের উপর।

* রিকশা, বেবী, বাস, ট্রাক, লঞ্চ, স্টীমার ইত্যাদি যা ভাড়ায় খাটানো হয় অথবা যা দিয়ে উপার্জন করা হয় তার মূল্যের উপর যাকাত আসে না। অবশ্য এসব যানবাহনই যদি কেউ ব্যবসার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করে থাকে তাহলে তার মূল্যের উপর যাকাত আসবে।

* পেশাজীবীরা তাদের পেশার কাজ চালানোর জন্য যে সব যন্ত্রপাতি ও আসবাব পত্র ব্যবহার করে থাকে তার মূল্যের উপর যাকাত আসে না। যেমন কৃষকের ট্রাক্টর, ইলেকট্রিশিয়ানের ড্রিল মেশিন ইত্যাদি।

* যদি কারও নিকট ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হীরা, মণি, মুক্তা, ডায়মণ্ড ইত্যাদির অলংকার থাকে, তাহলে তার মূল্যের উপর যাকাত আসে না। তবে এরূপ নিয়তে রাখা হলে যে, এটা একটা সঞ্চয়–প্রয়োজনের মুহূর্তে বিক্রি করে নগদ অর্থ অর্জন করা যাবে–এরূপ হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। (جواهر الفتاوى ج ١)

* প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের অর্থ হাতে পাওয়ার পূর্বে তার উপর যাকাত আসে না। তবে যে টাকাটা কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলক নয় বরং চাকুরিজীবী স্বেচ্ছায় কর্তন করায় তার উপর যাকাত আসবে। এটা হল সরকারী চাকুরীর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের মাসআলা। আর প্রাইভেট কোম্পানীর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা হাতে পাওয়ার পূর্বেও তার যাকাত দিতে হবে। এমনিভাবে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রেও চাকুরিজীবী যদি প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকায় কোন ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে অংশ নেয় তাহলেও তার যাকাত দিতে হবে। (احسن الفتاوى ج/٤)

* না-বালেগ ও পাগল-এর অর্থ/সম্পত্তিতে যাকাত আসে না।

যাকাত হিসাব করার তরীকা ও মাসায়েল ঃ

* যে অর্থ/সম্পদে যাকাত আসে সে অর্থ/সম্পদের ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত আদায় করা ফরয। মূল্যের আকারে নগদ টাকা দ্বারা বা তা দ্বারা কোন আসবাব পত্র ক্রয় করে তা দ্বারাও যাকাত দেয়া যায়।

* যাকাতের ক্ষেত্রে চান্দ্র মাসের হিসেবে বৎসর ধরা হবে। যখন থেকেই কেউ নেছাব পরিমাণ অর্থ/সম্পদের মালিক হবে তখন থেকেই তার যাকাতের বৎসর শুরু ধরতে হবে।

* স্বর্ণ রৌপ্যের মধ্যে যদি ব্রোঞ্জ, রাং, দস্তা, তামা ইত্যাদি কোন কিছুর মিশ্রণ থাকে আর সে মিশ্রণ স্বর্ণ রৌপ্যের চেয়ে কম হয় তাহলে পুরোটাকেই স্বর্ণ রৌপ্য ধরে যাকাতের হিসেব করা হবে– মিশ্রিত দ্রব্যের কোন ধর্তব্য হবে না। আর যদি মিশ্রিত দ্রব্য স্বর্ণ রৌপ্যের চেয়ে অধিক হয়, তাহলে সেটাকে আর স্বর্ণ রৌপ্য ধরা হবে না বরং ঐ মিশ্রিত দ্রব্যই ধরা হবে।

* যাকাত হিসেব করার সময় অর্থাৎ ওয়াজিব হওয়ার সময় স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্যবসায়িক পণ্য ইত্যাদির মূল্য ধরতে হবে তখন কার (ওয়াজিব হওয়ার সময়কার) বাজার দর হিসেবে এবং স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি যে স্থানে রয়েছে সে স্থানের দাম ধরতে হবে। (احسن الفتاوى ج/٤)

* শেয়ারের মূল্য ধরার ক্ষেত্রে মাসআলা হলঃ যারা কোম্পানীর লভ্যাংশ (Dividend) অর্জন করার উদ্দেশ্যে নয় বরং শেয়ার ক্রয় করেছেন শেয়ার বেচা-কেনা করে লাভবান হওয়া (Capital Gain) -এর উদ্দেশ্যে, তারা শেয়ারের বাজার দর (Market Value) ধরে যাকাত হিসেব করবেন। আর শেয়ার ক্রয় করার সময় যদি মূল উদ্দেশ্য থাকে কোম্পানী থেকে লভ্যাংশ (Dividend) অর্জন করা এবং সাথে সাথে এ উদ্দেশ্যও থাকে যে, শেয়ারের ভাল দর বাড়লে বিক্রিও করে দিব, তাহলে যাকাত হিসেব করার সময় শেয়ারের বাজার দরের যে অংশ যাকাত যোগ্য অর্থ/সম্পদের বিপরীতে আছে তার উপর যাকাত আসবে, অবশিষ্ট অংশের উপর যাকাত আসবে না। উদাহরণ স্বরূপ–শেয়ারের মার্কেট ভ্যালূ (বাজার দর) ১০০ টাকা, তার মধ্যে ৬০ ভাগ কোম্পানীর বিল্ডিং, মেশিনারিজ ইত্যাদির বিপরীতে আর ৪০ ভাগ কোম্পানীর নগদ অর্থ, কাঁচামাল ও তৈরী মালের বিপরীতে, তাহলে যাকাতের হিসেব করার সময় শেয়ারের বাজার দর অর্থাৎ ১০০ টাকার ৬০ ভাগ বাদ যাবে। কেননা সেটা এমন অর্থ/সম্পদের বিপরীতে যার উপর যাকাত আসে না। অবশিষ্ট ৪০ ভাগের উপর যাকাত আসবে। (فقہی مقالات)

* যাকাত দাতার যে পরিমাণ ঋণ আছে সে পরিমাণ অর্থ বাদ দিয়ে বাকীটার যাকাত হিসেব করবে। ঋণ পরিমাণ অর্থ বাদ দিয়ে যদি যাকাতের নেছাব পূর্ণ না হয় তাহলে যাকাত ফরয হবে না। তবে হযরত মাওলানা মুফতী তাকী উছমানী সাহেব বলেছেনঃ যে লোন নিয়ে বাড়ি করা হয় বা যে লোন নিয়ে মিল ফ্যাক্টরী তৈরি করা হয় বা মিল ফ্যাক্টরীর মেশিনারিজ ক্রয় করা হয়, এমনিভাবে যে সব লোন নিয়ে এমন কাজে নিয়োগ করা হয় যার মূল্যের উপর যাকাত আসে না যেমন বাড়ি ও ফ্যাক্টরী বা ফ্যাক্টরীর মেশিনারিজের মূল্যের উপর যাকাত আসে না, এসব লোন যাকাতের জন্য বাধা হবে না অর্থাৎ, এসব লোনের পরিমাণ অর্থ যাকাতের হিসাব থেকে বাদ দেয়া যাবে না। হ্যাঁ যে লোন নিয়ে এমন কাজে নিয়োগ করা হয় যার মূল্যের উপর যাকাত আসে; যেমন লোন নিয়ে ফ্যাক্টরীর কাঁচামাল ক্রয় করল (এখানে কাঁচামালের মূল্যের উপর যাকাত আসে) এরূপ ক্ষেত্রে এ লোন পরিমাণ অর্থ যাকাতের হিসাব থেকে বাদ যাবে। মুফতী তাকী উছমানী সাহেব এ মাসআলাটিকে শক্তিশালী যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করেছেন, অতএব তার মতটি গ্রহণ করার মধ্যেই সতর্কতা রয়েছে।

* কারও নিকট যাকাত দাতার টাকা পাওনা থাকলে সে পাওনা টাকার যাকাত দিতে হবে। পাওনা তিন প্রকারের **(এক)** কাউকে নগদ টাকা ঋণ দিয়েছে কিম্বা ব্যবসায়ের পণ্য বিক্রি করেছে এবং তার মূল্য বাকী রয়েছে। এরূপ পাওনা কয়েক বৎসর পর উসূল হলে যদি পাওনা টাকা এত পরিমাণ হয় যাতে যাকাত ফরয হয়, তাহলে অতীত বৎসর সমূহের যাকাত দিতে হবে। যদি একত্রে উসূল না হয়– ভেঙ্গে ভেঙ্গে উসূল হয়, তাহলে ১১ তোলা রৌপ্যের মূল্য পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে। এর চেয়ে কম পরিমাণ উসূল হলে তার যাকাত ওয়াজিব হবে না–তবে অল্প অল্প করে সেই পরিমাণে পৌঁছে গেলে তখন ওয়াজিব হবে। আর যখনই ওয়াজিব হবে তখন অতীত সকল বৎসরের যাকাত দিতে হবে। আর যদি এরূপ পাওনা টাকা নেছাবের চেয়ে কম হয় তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। **(দুই)** নগদ টাকা ঋণ দেয়ার কারণে বা ব্যবসায়ের পণ্য বাকীতে বিক্রি করার কারণে পাওনা নয় বরং ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র, কাপড়-চোপড়, চাষাবাদের গরু ইত্যাদি বিক্রয় করেছে এবং তার মূল্য পাওনা রয়েছে– এরূপ পাওনা যদি নেছাব পরিমাণ হয় এবং কয়েক বৎসর পর উসূল হয় তাহলে ঐ কয়েক বৎসরের যাকাত দিতে হবে। আর যদি ভেঙ্গে ভেঙ্গে উসূল হয় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্য পরিমাণ না হবে ততক্ষণ যাকাত ওয়াজিব হবে না। যখন উক্ত পরিমাণ উসূল হবে তখন বিগত বৎসর সমূহের যাকাত দিতে হবে। **(তিন)** মহরের টাকা, পুরস্কারের টাকা, খোলা

তালাকের টাকা, বেতনের টাকা ইত্যাদি পাওনা থাকলে এরূপ পাওনা উসূল হওয়ার পূর্বে যাকাত ওয়াজিব হয় না। উসূল হওয়ার পর ১ বৎসর মজুদ থাকলে তখন থেকে তার যাকাতের হিসাব শুরু হবে। পাওনা টাকার যাকাত সম্পর্কে উপরোল্লিখিত বিবরণ শুধু তখনই প্রযোজ্য হবে যখন এই টাকা ব্যতীত তার নিকট যাকাত যোগ্য অন্য কোন অর্থ/সম্পদ না থাকে। আর অন্য কোন অর্থ/সম্পদ থাকলে তার মাসআলা উলামায়ে কিরাম থেকে জেনে নিবেন।

* যে ঋণ ফেরত পাওয়ার আসা নেই–এরূপ ঋণের উপর যাকাত ফরয হয় না। তবে পেলে বিগত সমস্ত বৎসরের যাকাত দিতে হবে।

* যৌথ কারবারে অর্থ নিয়োজিত থাকলে যৌথভাবে পূর্ণ অর্থের যাকাত হিসাব করা হবে না বরং প্রত্যেকের অংশের আলাদা আলাদা হিসাব হবে। (ইসলামী ফিকাহঃ ১ম)

* যে সব স্বর্ণ রৌপ্যের অলংকার স্ত্রীর মালিকানায় দিয়ে দেয়া হয় সেটাকে স্বামীর সম্পত্তি ধরে হিসাব করা হবে না বরং সেটা স্ত্রীর সম্পত্তি। আর যে সব অলংকার স্ত্রীকে শুধু ব্যবহার করতে দেয়া হয়– মালিক থাকে স্বামী, সেটা স্বামীর সম্পত্তির মধ্যে ধরে হিসাব করা হবে। আর যেগুলোর মালিকানা অস্পষ্ট রয়েছে তা স্পষ্ট করে নেয়া উচিত। যে সব অলংকার স্ত্রীর নিজস্ব সম্পদ থেকে তৈরী বা যেগুলো সে বাপের বাড়ি থেকে অর্জন করে সেগুলো স্ত্রীর সম্পদ বলে গণ্য হবে। মেয়েকে যে অলংকার দেয়া হয় সেটার ক্ষেত্রেও মেয়েকে মালিক বানিয়ে দেয়া হলে সেটার মালিক সে। আর শুধু ব্যবহারের উদ্দেশ্য দেয়া হলে মেয়ে তার মালিক নয়। নাবালেগা মেয়েদের বিবাহ-শাদী উপলক্ষে তাদের নামে যে অলংকার বানিয়ে রাখা হয় বা নাবালেগ ছেলে কিম্বা মেয়ের বিবাহ-শাদীতে ব্যয়ের লক্ষ্যে তাদের নামে ব্যাংকে বা ব্যবসায় যে টাকা লাগানো হয় সেটার মালিক তারা। অতএব এগুলো পিতা/মাতার সম্পত্তি বলে গণ্য হবে না এবং পিতা/মাতার যাকাতের হিসাবে এগুলো ধরা হবে না। আর বালেগ সন্তানের নামে শুধু অলংকার তৈরী বা টাকা লাগালেই তারা মালিক হয়ে যায় না যতক্ষণ না সেটা সে সন্তানদের দখলে দেয়া হয়। তাদের দখলে দেয়া হলে তারা মালিক, অন্যথায় সেটার মালিক পিতা/মাতা। (جواهر الفتاوى ج ۱ وغیرہ)

* হিসাবের চেয়ে কিছু বেশী যাকাত দিয়ে দেয়া উত্তম। যাতে কোন রূপ কম হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। প্রকৃতপক্ষে সেটুকু যাকাত না হলেও তাতে দানের ছওয়াবতো হবেই।

গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি প্রাণীর যাকাত

* গরু, বলদ, মহিষ, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর প্রভৃতি প্রাণী ক্ষেত খামারের কাজে বা গাড়ী টানার জন্য অথবা বোঝা বহনের নিমিত্তে প্রতিপালন করা হলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না।

* গরু, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি চতুষ্পদ প্রাণী ব্যবসার নিয়তে ক্রয় করলে অর্থাৎ, ক্রয় করার সময় স্বয়ং ঐ প্রাণী বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করলে সেগুলো ব্যবসায়িক পণ্য বলে গণ্য হবে এবং সেগুলোর মূল্য যাকাতের হিসাবে আসবে। যাকাত আদায় করার দিন তার যে মূল্য সেই মূল্য ধরা হবে। ক্রয় করার সময় যদি বিক্রয়ের নিয়ত না থাকে পরে বিক্রয়ের নিয়ত হয় কিম্বা মূলটা রেখে তার বাচ্চা বিক্রয়ের নিয়ত থাকে বা পরে এরূপ নিয়ত হয়, সে সব ক্ষেত্রে সেগুলো বাণিজ্যিক পণ্য বলে গণ্য হবে না এবং তার উপর যাকাত আসবে না।

* গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ যদি দুধের জন্য অথবা বংশ বৃদ্ধির জন্য কিম্বা শখ বশতঃ পালন করা হয়, তাহলে তাতে যাকাত আসে; তবে সেগুলোতে যাকাত আসার শর্ত হল সেগুলো 'সায়েমা' হতে হবে অর্থাৎ, সেগুলোর বেশীর ভাগ সময়ের খাদ্য বা বেশীর ভাগ খাদ্য নিজেদের দিতে হয় না বরং ময়দান জংগল ও চারণভূমির ঘাসপাতা ও তৃণলতা খেয়ে জীবন ধারণ করে, তাহলে তার উপর যাকাত আসে। তবে এরূপ ছাগল, ভেড়া অন্ততঃ ৪০টা এবং গরু, মহিষ, ৩০টার কম হলে তার উপর যাকাত আসে না। সাধারণতঃ আমাদের দেশে এরূপ গরু ছাগল ইত্যাদি পাওয়া যায় না তাই তার যাকাতের পরিমাণ ও বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা থেকে বিরত রইলাম। আমাদের দেশের গরু মহিষের ফার্মে গরু মহিষকে নিজেরা খাদ্য দিতে হয় তাই সেগুলো সায়েমা নয়। অতএব দুধের উদ্দেশ্যে বা বংশ বৃদ্ধির জন্য পালন করলেও তার উপর যাকাত আসবে না।

* হাঁস, মুরগি যদি ডিমের উদ্দেশ্যে বা তার বাচ্চা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পালন করা হয়, তাহলে সেই হাঁস মুরগির উপর যাকাত আসে না। তবে হাঁস মুরগি বা তার বাচ্চা ক্রয়ের সময় যদি স্বয়ং সেটাকেই বিক্রি করার নিয়তে ক্রয় করা হয় তাহলে সেটা বাণিজ্যিক পণ্য বলে গণ্য হবে এবং তার মূল্যের উপর যাকাত আসবে।

* বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মাছ চাষ করা হলে সেই মাছ বাণিজ্যিক পণ্য বলে গণ্য হবে এবং তার মূল্যের উপর যাকাত আসবে।

(ماخوذ از احسن الفتاوی ج ٤)

কোন্ কোন্ লোকদেরকে বা কোন্ কোন্ খাতে যাকাত দেয়া যায় না

নিম্নলিখিত লোকদেরকে বা নিম্ন লিখিত খাতে যাকাত দেয়া যায় না, দিলে যাকাত আদায় হয় না।

১। যার নিকট নেছাব পরিমাণ অর্থ, সম্পদ আছে।

২। যারা সাইয়্যেদ অর্থাৎ, হাসানী, হুসাইনী, আলাবী, জা'ফরী ইত্যাদি।

৩। যাকাত দাতার মা, বাপ, দাদা, দাদী, পরদাদা, পরদাদী, পরনানা, পরনানী ইত্যাদি উপরের সিঁড়ি।

৪। যাকাত দাতার ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনি পোতা, পৌত্রী, ইত্যাদি নীচের সিঁড়ি।

৫। যাকাত দাতার স্বামী বা স্ত্রী।

৬। অমুসলিমকে যাকাত দেয়া যায় না।

৭। যার উপর যাকাত ফরয হয়—এরূপ মালদার লোকের নাবালেগ সন্তান।

৮। মসজিদ, মাদ্রাসা বা স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি নির্মাণ কাজের জন্য।

৯। মৃত ব্যক্তির দাফন—কাফনের জন্য বা মৃত ব্যক্তির ঋণ ইত্যাদি আদায়ের জন্য।

১০। রাস্তা—ঘাট, পুল ইত্যাদি নির্মাণ ও স্থাপন কার্যে— যেখানে নির্দিষ্ট কাউকে মালিক বানানো হয় না।

১১। সরকার যদি যাকাতের মাসআলা অনুযায়ী সঠিক খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় না করে, তাহলে সরকারের যাকাত ফাণ্ডে যাকাত দেয়া যাবে না।

১২। যাকাত দ্বারা মসজিদ মাদ্রাসার স্টাফকে (গরীব হলেও) বেতন দেয়া যায় না।

যে লোকদেরকে যাকাত দেয়া যায়

১। ফকীর অর্থাৎ, যাদের নিকট সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন সমাধা করার মত সম্বল নেই অথবা যাদের নিকট যাকাত ফেৎরা ওয়াজিব হওয়ার পরিমাণ অর্থ সম্পদ নেই।

২। মিসকীন অর্থাৎ, যারা সম্পূর্ণ রিক্ত হস্ত অথবা যাদের জীবিকা অর্জনের ক্ষমতা নেই।

৩। ইসলামী রাষ্ট্র হলে তার যাকাত তহবিলের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ।

৪। যাদের উপর ঋণের বোঝা চেপেছে।

৫। যারা আল্লাহর রাস্তায় শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত।

৬। মুসাফির ব্যক্তি (বাড়িতে সম্পদশালী হলেও) সফরে রিক্ত হস্ত হয়ে পড়লে।

৭। যাকাত দাতার ভাই-বোন, ভাতিজা-ভাতিজী, ভগ্নিপতি, ভাগনা-ভাগনী, চাচা-চাচী, খালা-খালু, ফুপা-ফুফী, মামা-মামী, শ্বাশুড়ী, জামাই, সৎবাপ ও সৎমা ইত্যাদি (যদি এরা গরীব হয়)।

৮। নিজের গরীব চাকর-নওকর বা কর্মচারীকে দেয়া যায়। তবে এটা বেতন বাবদ কর্তন করা যাবে না।

যাদেরকে যাকাত দেয়া উত্তম

১। দ্বীনী ইল্‌ম পড়নেওয়ালা এবং পড়ানেওয়ালা যদি যাকাতের হকদার হয়, তাহলে এরূপ লোককে যাকাত দেয়া সবচেয়ে উত্তম। (جواهر الفتاوى ج / ١)

২। তারপর যাকাত পাওয়ার সবচেয়ে যোগ্য নিজের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য তারা।

৩। তারপর বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীর মধ্যে যারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য তারা।

৪। তারপর যাকাতের অন্যান্য প্রকার হকদারগণ।

যাকাত আদায় করার তরীকা ও মাসায়েল

* বৎসর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে যাকাত আদায় করতে হবে। বিনা ওযরে বিলম্ব করলে পাপ হবে।

* যাকাত আদায় করার সময় নিয়ত করতে হবে যে, এ সম্পদ আল্লাহর ওয়াস্তে যাকাত হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে, নতুবা যাকাত আদায় হবে না।

* নেছাবের মলিক হওয়ার পর বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেও অর্থাৎ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পূর্বেও অগ্রিম প্রদান করা যায়।

* যাকাত প্রদানের সময় গ্রহণকারীকে একথা জানানো প্রয়োজন নেই যে,এটা যাকাতের টাকা। আপনজনকে যাকাত দিতে তাকে একথা না বলাই শ্রেয়, কেননা বললে তার খারাপ লাগতে পারে।

* যে পরিমাণ টাকা থাকলে কারও উপর যাকাত ফরয হয়– এত পরিমাণ যাকাতের টাকা একজনকে দেয়া মাকরূহ। তবে ঋণী ব্যক্তির ঋণ মুক্তির জন্য বা অধিক সন্তান-সন্তুতি ওয়ালাকে এত পরিমাণ দিলেও ক্ষতি নেই।

* যাকাত দেয়ার নিয়তে কোন টাকা পৃথক করে রাখলে পরে দেয়ার সময় যাকাতের নিয়তের কথা মনে না আসলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

* যাকে যাকাত দিবে অন্ততঃ এত পরিমাণ দিবে যেন ঐ দিনের খরচের জন্য সে আর অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়। কম পক্ষে এত পরিমাণ দেয়া মোস্তাহাব, এর চেয়ে কম দিলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

* কারও নিকট টাকা পাওনা থাকলে যাকাতের নিয়তে সেই পাওনা মাফ করে দিলে যাকাত আদায় হবে না বরং তার নিকট যাকাতের টাকা দিয়ে পরে তার নিকট থেকে ঋণ পরিশোধ বাবদ সে টাকা নিয়ে নিলে যাকাতও আদায় হবে ঋণও উসূল হবে।

* যাকাতের টাকা নিজের হাতে গরীবদেরকে না দিয়ে অন্য কাউকে উকীল বানিয়ে তার দ্বারা দিলেও যাকাত আদায় হবে।

* যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর কেউ নিজের সমস্ত মাল দান করে দিলে তার যাকাত মাফ হয়ে যায়।

* যাকাত দাতার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ তার পক্ষ থেকে যাকাত দিয়ে দিলে যাকাত আদায় হবে না।

* যাকাত দাতা কাউকে পুরস্কার বা ঋণের নামে কিছু দিল আর অন্তরে নিয়ত রাখলে যে, যাকাত হতে দিলাম, তবুও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

সদকায়ে ফিতর/ ফিতরা-এর মাসায়েল

* ঈদুল ফিতরের দিন সোবহে সাদেকের সময় যার নিকট যাকাত ওয়াজিব হওয়া পরিমাণ অর্থ/সম্পদ থাকে তার উপর সদকায়ে ফিতর বা ফেতরা ওয়াজিব। তবে যাকাতের নেছাবের ক্ষেত্রে ঘরের আসবাবপত্র বা ঘরের মূল্য ইত্যাদি হিসেবে ধরা হয় না কিন্তু ফেতরার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় আসবাব পত্র ব্যতীত অন্যান্য আসবাবপত্র সৌখিন দ্রব্যাদি, খালিঘর বা ভাড়ার ঘর (যার ভাড়ার উপর তার জীবিকা নির্ভরশীল নয়) এসব কিছুর মূল্য হিসেবে ধরা হবে।

* রোযা না রাখলে বা রাখতে না পারলে তার উপরও ফেতরা দেয়া ওয়াজিব।

* সদকায়ে ফিতর/ ফিতরা নিজের পক্ষ থেকে এবং পিতা হলে নিজের না-বালেগ সন্তানের পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিব। বালেগ সন্তান, স্ত্রী, স্বামী, চাকর-চাকরানী, মাতা-পিতা প্রমুখের পক্ষ থেকে দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে বালেগ সন্তান পাগল হলে তার পক্ষ থেকে দেয়া পিতার উপর ওয়াজিব।

* একান্নভুক্ত পরিবার হলে বালেগ সন্তান, মাতা, পিতার পক্ষ থেকে এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে ফেতরা দেয়া মোস্তাহাব–ওয়াজিব নয়। (বেহেশতী জেওর [বাংলা])

* সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব না হলেও সঙ্গতি থাকলে দেয়া মোস্তাহাব এবং অনেক সওয়াবের কাজ। (ঐ)

* ফিতরায় ৮০ তোলার সেরের হিসেবে ১ সের সাড়ে বার ছটাক (১ কেজি ৬৬২ গ্রাম) গম বা আটা কিম্বা তার মূল্য দিতে হবে। পূর্ণ দুই সের (১ কেজি ৮৬৬ গ্রাম) বা তার মূল্য দেয়া উত্তম।

* ফিতরায় যব দিলে ৮০ তোলার সেরের হিসেবে ৩ সের নয় ছটাক (প্রায় ৩ কেজি ৫২৩ গ্রাম) দিতে হবে। পূর্ণ ৪ সের (৩ কেজি ৭৩২ গ্রাম) দেয়া উত্তম।

* গম, আটা ও যব ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য শষ্য যেমন ধান, চাউল, বুট, কলাই, মটর ইত্যাদি দ্বারা ফেতরা আদায় করতে চাইলে বাজার দরে উপরোক্ত পরিমাণ গম বা যবের যে মূল্য হয় সেই মূল্যের ধান চাউল ইত্যাদি দিতে হবে।

* ফিতরায় গম, যব ইত্যাদি শষ্য দেয়ার চেয়ে তার মূল্য– নগদ টাকা পয়সা দেয়া উত্তম।

* ফিতরা ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাযের পূর্বেই দিয়ে দেয়া উত্তম। নামাযের পূর্বে দিতে না পারলে পরে দিলেও চলবে। ঈদের দিনের পূর্বে রমযানের মধ্যে দিয়ে দেয়াও দুরস্ত আছে।

* যাকে যাকাত দেয়া যায় তাকে ফেৎরা দেয়া যায়।

* একজনের ফেতরা একজনকে দেয়া বা একজনের ফেতরা কয়েকজনকে দেয়া উভয়ই দুরস্ত আছে। কয়েক জনের ফেতরাও একজনকে দেয়া দুরস্ত আছে কিন্তু তার দ্বারা যেন সে মালেকে নেছাব না হয়ে যায়। অধিকতর উত্তম হল একজনকে এই পরিমাণ ফিতরা দেয়া, যার দ্বারা সে ছোট-খাট প্রয়োজন পূরণ করতে পারে বা পরিবার পরিজন নিয়ে দু' তিন বেলা খেতে পারে।

কুরবানী

কুরবানীর ফজীলত ঃ

* কুরবানীর জন্তুর শরীরে যত পশম থাকে, প্রত্যেকটা পশমের পরিবর্তে এক একটি নেকী পাওয়া যায়।

* কুরবানী-র দিনে কুরবানী করাই সব চেয়ে বড় ইবাদত।

কাদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিবঃ

* ১০ই জিলহজ্জের ফজর থেকে ১২ই জিলহজ্জের সন্ধা পর্যন্ত অর্থাৎ কুরবানীর দিন গুলোতে যার নিকট সদকায়ে ফিতর/ফেতরা ওয়াজেব হওয়া পরিমাণ অর্থ/সম্পদ থাকে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব।

* মুসাফিরের উপর (মুসাফিরী হালতে) কুরবানী করা ওয়াজেব নয়।

* কুরবানী ওয়াজেব না হলেও নফল কুরবানী করলে কুরবানীর ছওয়াব পাওয়া যাবে।

* কুরবানী শুধু নিজের পক্ষ থেকে ওয়াজিব হয়-সন্তানাদি, মাতা-পিতা ও স্ত্রীর পক্ষ থেকে ওয়াজেব হয় না, তবে তাদের পক্ষ থেকে করলে তা নফল কুরবানী হবে।

* যার উপর কুরবানী ওয়াজেব নয় সে কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয় করলে সেই পশু কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়।

* কোন মকসূদের জন্য কুরবানীর মান্নত করলে সেই মকসূদ পূর্ণ হলে তার উপর (গরীব হোক বা ধনী) কুরবানী করা ওয়াজেব হয়ে যায়।

* যার উপর কুরবানী ওয়াজেব সে কুরবানী না করলে কুরবানীর দিনগুলো চলে যাওয়ার পর একটা বকরীর মূল্য সদকা করা ওয়াজেব।

কোন্ কোন্ জন্তু দ্বারা কুরবানী করা দুরস্ত আছে ঃ

* বকরী, পাঠা, খাশী, ভেড়া, ভেড়ী, দুম্বা, গাভি, ষাড়, বলদ, মহিষ, উট এই কয় প্রকার গৃহপালিত জন্তু দ্বারা কুরবানী করা দুরস্ত।

কুরবানী-র জন্তুর বয়স প্রসঙ্গ ঃ

* বকরী, খাশী, ভেড়া, ভেড়ী, দুম্বা কম পক্ষে পূর্ণ এক বৎসর বয়সের হতে হবে। বয়স যদি কিছু কমও হয় কিন্তু এরূপ মোটা তাজা যে, এক বৎসর বয়সীদের মধ্যে ছেড়ে দিলেও তাদের চেয়ে ছোট মনে হয় না-তাহলে তার কুরবানী দুরস্ত আছে তবে অন্ততঃ ছয় মাস বয়স হতে হবে। বকরীর ক্ষেত্রে এরূপ ব্যতিক্রম নেই। বকরী কোন অবস্থায় এক বৎসরের কম বয়সের হতে পারবে না।

* গরু ও মহিষের বয়স কম পক্ষে দুই বৎসর হতে হবে।

* উট-এর বয়স কম পক্ষে পাঁচ বৎসর হতে হবে।

কুরবানীর জন্তুর স্বাস্থ্যগত অবস্থা প্রসঙ্গ ঃ

* কুরবানীর পশু ভাল এবং হৃষ্ট পুষ্ট হওয়া উত্তম।

* যে প্রাণী লেংড়া অর্থাৎ, যা তিন পায়ে চলতে পারে- এক পা মাটিতে রাখতে পারে না বা রাখতে পারলেও তার উপর ভর করতে পারে না-এরূপ পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয নয়।

* যে পশুর একটিও দাঁত নেই তা দ্বারা কুরবানী দুরস্ত নয়।

* যে পশুর কান জন্ম থেকেই নেই তা দ্বারা কুরবানী দুরস্ত নয়। তবে কান ছোট হলে অসুবিধে নেই।

* যে পশুর শিং মূল থেকে ভেঙ্গে যায় তা দ্বারা কুরবানী দুরস্ত নয়। তবে শিং ওঠেইনি বা কিছু পরিমাণ ভেঙ্গে গিয়েছে এরূপ পশুর কুরবানী দুরস্ত আছে।

* যে পশুর উভয় চোখ অন্ধ বা একটি চোখ পূর্ণ অন্ধ বা একটি চোখের দৃষ্টি শক্তি এক তৃতীয়াংশ বা তার বেশী নষ্ট তা দ্বারা কুরবানী দুরস্ত নয়।

* যে পশুর একটি কান বা লেজের এক তৃতীয়াংশ কিম্বা তার চেয়ে বেশী কেটে গিয়েছে তা দ্বারা কুরবানী দুরস্ত নয়।

* অতিশয় কৃশকায় ও দুর্বল পশু যার এতটুকু শক্তি নেই যে, জবেহের স্থান পর্যন্ত হেটে যেতে পারে তা দ্বারা কুরবানী দুরস্ত নয়।

* ভাল পশু ক্রয় করার পর এমন দোষ ত্রুটি দেখা দিয়েছে যার কারণে কুরবানী দুরস্ত হয় না– এরূপ হলে ঐ জন্তুটি রেখে আর একটি ক্রয় করে কুরবানী করতে হবে। তবে ক্রেতা গরীব হলে সেটিই কুরবানী দিতে পারবে।

* গর্ভবতী পশু কুরবানী করা জায়েয। যদি পেটের বাচ্চা জীবিত পাওয়া যায় তবে সে বাচ্চাও জবেহ করে দিবে। তবে প্রসবের নিকটবর্তী হলে সেরূপ গর্ববতী পশু কুরবানী দেয়া মাকরূহ।

* বন্ধা পশু কুরবানী করা জায়েয।

শরীকের মাসায়েল এবং একটা পশুতে কয়জন শরীক হতে পারে?

* বকরী, খাশী, পাঠা, ভেড়া-ভেড়ী ও দুম্বায় এক জনের বেশী শরীক হয়ে কুরবানী করা যায় না। এগুলো একটা এক জনের নামেই কুরবানী হতে পারে।

* একটা গরু, মহিষ ও উটে সর্বোচ্চ সাতজন শরীক হতে পারে। সাতজন হওয়া জরুরী নয়– দুইজন বা তিনজন বা চারজন বা পাঁচজন বা ছয়জন কুরবানী দিতে পারে, তবে কারও অংশই সাত ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম হতে পারবে না।

* মৃতের নামেও কুরবানী হতে পারে।

* রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বিবিগণ ও বুযুর্গদের নামেও কুরবানী হতে পারে।

* যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করেনা বরং গোশত খাওয়া বা লোক দেখানো ইত্যাদি নিয়তে কুরবানী করে, তাকে অংশীদার বানিয়ে

কোন পশু কুরবানী করলে সকল অংশীদারের কুরবানী-ই নষ্ট হয়ে যায়। তাই শরীক নির্বাচনের সময় খুবই সতর্ক থাকা দরকার।

* কুরবানীর পশু ক্রয় করার সময় শরীক রাখার এরাদা ছিল না, পরে শরীক গ্রহণ করতে চাইলে ক্রেতা গরীব হলে তা পারবে না, অন্যথায় পারবে।

* যার সমস্ত উপার্জন বা অধিকাংশ উপার্জন হারাম, তাকে শরীক করে কুরবানী করলে অন্যান্য সকল শরীকের কুরবানী অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

(احسن الفتاوى ج ٧)

কুরবানীর পশু জবেহ করা প্রসঙ্গ ঃ

* নিজের কুরবানীর পশু নিজেই জবেহ করা উত্তম। নিজে জবেহ না করলে বা করতে না পারলে জবেহের সময় সামনে থাকা ভাল। মেয়েলোকের পর্দার ব্যাঘাত হওয়ার কারণে সামনে না থাকতে পারলে ক্ষতি নেই।

* কুরবানীর পশুকে মাটিয়ে শুইয়ে তার মুখ কেবলা মুখী করে নিম্নের দুআ পাঠ করা উত্তম—

إِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ

অতঃপর بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে জবেহ করবে। কেউ দুআ পড়তে না পারলে শুধু 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে জবেহ করলেও চলবে।

অতঃপর এই দুআ পড়া উত্তম—

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّخَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

জবেহকারী যদি উক্ত পশুর কুরবানী দাতা না হয় তাহলে مِنِّىْ এর স্থলে مِنْهُ পড়বে। আর কুরবানী দাতা একাধিক হলে مِنِّىْ এর স্থলে منا বা منه এর স্থলে مِنْهُمْ পড়বে।

* কুরবানী দাতা বা কুরবানী দাতাগণের নাম মুখে উচ্চারণ করা বা কাগজে লিখে পড়া জরুরী নয়। আল্লাহ পাক জানেন এটা কার কুরবানী করা হচ্ছে।

বিঃদ্রঃ জবেহ করার মাসায়েল সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৫১২ পৃষ্ঠা

* কুরবানীর পশু রাতের বেলায়ও জবেহ করা জায়েয তবে ভাল নয়।

* ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করা জায়েয নয়। তবে যেখানে জুমুআ ও ঈদের নামায দুরস্ত নয় সেখানে সোবহে সাদেকের পর থেকেই কুরবানী করা দুরস্ত আছে।

গোশত বন্টনের তরীকা ঃ

* অংশীদারগণ সকলে একান্নভুক্ত হলে গোশত বন্টনের প্রয়োজন নেই। অন্যথায় বন্টন করতে হবে।

* অংশীদারগণ গোশত অনুমান করে বন্টন করবেন না বরং বাটখারা দিয়ে ওজন করে বন্টন করতে হবে। অন্যথায় ভাগের মধ্যে কমবেশ হয়ে গেলে গোনাহগার হতে হবে। অবশ্য কোন অংশীদার মাথা, পায়া ইত্যাদি বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করলে তার ভাগে গোশত কিছু কম হলেও তা দুরস্ত হবে। কিন্তু যে ভাগে গোশত বেশী সেভাগে মাথা পায়া ইত্যাদি বিশেষ অংশ দেয়া যাবে না।

* অংশীদারগণ সকলে যদি সম্পূর্ণ গোশত দান করে দিতে চায় বা সম্পূর্ণটা রান্না করে বিলাতে বা খাওয়াতে চায় তাহলে বন্টনের প্রয়োজন নেই।

কুবরানীর গোশত খাওয়া ও দান করার মাসায়েল ঃ

* কুরবানীর গোশত নিজে খাওয়া, পরিবারবর্গকে খাওয়ানো, আত্মীয়-স্বজনকে দেয়া এবং গরীব মিসকীনকে দেয়া সবই জায়েয। মোস্তাহাব ও উত্তম তরীকা হল তিন ভাগ করে একভাগ নিজেদের জন্য রাখা, এক ভাগ আত্মীয়-স্বজনকে দেয়া এবং একভাগ গরীব মিসকীনকে দান করা।

* মান্নতের কুরবানীর গোশত হলে নিজে খেতে পারবে না এবং মালদারকেও দিতে পারবে না বরং পুরোটাই গরীব মিসকীনদেরকে দান করে দেয়া ওয়াজিব।

* যদি কোন মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে কুরবানীর জন্য ওছিয়ত করে গিয়ে থাকেন তবে সেই কুরবানীর গোশতও মান্নতের কুরবানীর গোশতের ন্যায় পুরোটাই খয়রাত করা ওয়াজিব।

* কুরবানীর গোশত বা বিশেষ কোন অংশ (যেমন মাথা) পারিশ্রমিক রূপে দেয়া জায়েয নয়।

* কুরবানীর গোশত শুকিয়ে (বা ফ্রীজে রেখে) দীর্ঘ দিন খাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। (فتاوى محمودية ج/ ٤)

কুরবানীর পশুর চামড়া সম্পর্কিত মাসায়েল ঃ

* কুরবানীর পশুর চামড়া শুকিয়ে বা প্রক্রিয়াজাত করে নিজেও ব্যবহার করা জায়েয।

* কুরবানীর চামড়া খয়রাতও করা যায় তবে বিক্রি করলে সে পয়সা নিজে ব্যবহার করা যায় না –খয়রাতই করা জরুরী এবং ঠিক ঐ পয়সাটাই খয়রাত করতে হবে। ঐ পয়সাটা নিজে খরচ করে অন্য পয়সা দান করলে আদায় হবে বটে, তবে অন্যায় হবে।

* কুরবানীর চামড়ার দাম মসজিদ মাদ্রাসার নির্মাণ কাজে বা বেতন বাবদ বা পারিশ্রমিক বাবদ বা অন্য কোন নেক কাজে খরচ করা দুরস্ত নয়। খরয়রাতই করতে হবে।

আকীকার মাসায়েল

* আকীকা করা সুন্নাত।

* ছেলে বা মেয়ের জন্মের পর সপ্তম দিবসে আকীকা করা মোস্তাহাব। সপ্তম দিবসে না করতে পারলে যখনই করুক না কেন যে বারে সন্তান জন্ম নিয়েছে তার আগের দিন করবে। যেমন শনিবার সন্তান হয়ে থাকলে শুক্রবার আকীকা করবে, তাহলেও এক রকম সপ্তম দিবসে আকীকা করা হবে; এটাই উত্তম। এ ছাড়াও যে কোন দিন ইচ্ছা করা যায়।

* সন্তান বালেগ হওয়ার পরও তার আকীকা করা দুরস্ত আছে, তবে মৃত্যুর পর আকীকা নেই।

* আকীকা করা দ্বারা সন্তানের বালা মুছীবত দূর হয় এবং যাবতীয় বিপদ–আপদ থেকে নিরাপদ থাকে।

* ছেলে হলে আকীকায় দুইটি বকরী বা ভেড়া উত্তম, আর মেয়ে হলে একটি বকরী বা ভেড়া। কিম্বা কুরবানীর গরু ইত্যাদি বড় পশুর মধ্যে ছেলের জন্য দুই অংশ নেয়া উত্তম আর মেয়ের জন্য এক অংশ। ছেলের পক্ষ থেকে একটি বকরী বা কুরবানী-র এক অংশ দ্বারা আকীকা করলেও চলবে। আর আকীকা না করলেও কোন দোষ নেই। তবে আকীকা করা সুন্নাত।

* যে জন্তু দ্বারা কুরবানী দুরস্ত তার দ্বারাই আকীকা দুরস্ত।

* সন্তানের মাথা মুণ্ডানোর জন্য মাথায় খুর/ব্লেড রাখার সাথে সাথে আকীকার পশু জবেহ করতে হবে– এরূপ ধারণা ভুল এবং এটা বেহুদা রছম।

* আকীকার প্রাণী যবেহ করার সময় (যবেহ করার পূর্বে) এই দুআ পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَتَقَبَّلْهُ

(অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এই আকীকা অমুকের সন্তান অমুকের, তুমি তা কবূল কর) প্রথম فلان শব্দের স্থলে সন্তানের নাম বলবে আর দ্বিতীয় فلان শব্দের স্থলে তার পিতার নাম বলবে। আর পিতা নিজে জবেহ করলে বলবে এটা আমার অমুক সন্তানের আকীকা।

* আকীকার গোশত মাতা, পিতা, দাদা, দাদী, নানা, নানী সহ সকলেই ভক্ষণ করতে পারে।

* আকীকার গোশত কাঁচা ভাগ করে দেয়া বা রান্না করে ভাগ করে দেয়া বা দাওয়াত করে খাওয়ানো সবই দুরস্ত আছে।

* কোন কোন ফকীহ বলেছেন আকীকার পশুর চামড়া বিক্রি করলে তার মূল্য দান করেই দেয়া উচিত। যদিও এ ব্যাপারে কুরবানীর চামড়ার অর্থের ন্যায় অত কড়াকড়ি নেই। (فتاوی رحیمیہ ج/٦)

মান্নতের মাসায়েল

* কোন ইবাদত জাতীয় মান্নত মানলে যদি যে উদ্দেশ্যে মান্নত করেছে সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় তাহলে ঐ মান্নত পূরা করা ওয়াজিব। উদ্দেশ্য পূর্ণ না হলে মান্নত আদায় করা ওয়াজিব হয় না। আর কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত এমনিতেই আল্লাহর নাম নিয়ে কোন কিছুর মান্নত করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব।

* শরীয়তের খেলাফ মান্নত মানলে তা পূর্ণ করা যাবে না, যেমন মাজারে কোন কিছু দেয়ার মান্নত করলে বা নাচগানের মান্নত করলে ইত্যাদি।

* মীলাদের মান্নত মানলে সে মান্নত বাতিল–তা পুরা করার দরকার নেই। (فتاوی محمودیة ج/٤)

* নির্দিষ্ট গরু, বকরী বা মুরগি মান্নত করলে সেটাই দিতে হবে। আর যদি নির্দিষ্ট করে না বলে, তাহলে কুরবানীর উপযুক্ত যে কোন গরু বা খাশী দিতে হবে।

* নির্দিষ্ট কোন স্থানে দেয়ার মান্নত করলে সেখানেই দেয়া জরুরী নয়, যেমন মক্কা শরীফে বা মদীনায় দেয়ার মান্নত করলে সেখানেই দেয়া জরুরী নয়– অন্য স্থানেও দেয়া যাবে।

* ভাঙ্গা নখ কাটলে কিছু দেয়া ওয়াজেব হয় না।

* শাহওয়াত (উত্তেজনা) সহকারে কোন নারী বা বালককে চুমু দিলে কিম্বা পরস্পরে লজ্জাস্থান মিলিত করলে দম ওয়াজেব হয়, বীর্যপাত হোক বা না হোক। তবে হজ্জ ফাসেদ হয় না।

* শাহওয়াত সহকারে কোন নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার কারণে বা মনে মনে কল্পনা করার কারণে বীর্যপাত হলে বা স্বপ্নদোষ হলে কিছু ওয়াজেব হয় না। তবে গোসল ওয়াজেব হয়।

* হস্তমৈথুন করে বীর্যপাত ঘটালে কিম্বা কোন প্রাণী কিম্বা শাহওয়াতের অযোগ্য ছোট মেয়ের সাথে সঙ্গম করলে এবং বীর্যপাত হলে দম ওয়াজেব হবে। বীর্যপাত না হলে কিছু ওয়াজেব হবে না। তবে গোনাহতো হবেই।

* উকূফে আরাফা-র পূর্বে সঙ্গম করলে বীর্যপাত হোক বা না হোক দম ওয়াজেব হবে। নারী পুরুষ উভয়ে মুহ্‌রিম হলে উভয়ের উপর পৃথক পৃথক দম ওয়াজেব হবে। এমতাবস্থায় হজ্জ ফাসেদ হয়ে যাবে। তবে এ বৎসরও অবশিষ্ট হজ্জের ক্রিয়াদি যথারীতি আদায় করতে হবে। পরবর্তী বৎসর হজ্জের কাযা আদায় করতে হবে।

* উকূফে আরাফা-র পর মাথা হলক (বা কছর) ও তওয়াফে যিয়ারত করার পূর্বে সঙ্গম করলে হজ্জ ফাসেদ হবে না তবে পূর্ণ একটা গরু বা উট দম দিতে হবে। মাথা হলক বা কছর করার পর এবং তওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে সঙ্গম হলেও মুহাক্কিক ওলামায়ে কিরামের মতে অনুরূপ পূর্ণ একটা গরু বা উট দম দিতে হবে।

* জানাবাত বা হায়েয নেফাস অবস্থায় তওয়াফে যিয়ারত করলে পূর্ণ গরু বা উট দম দিতে হবে।

* কারেন (কেরান হজ্জকারী) ব্যক্তি উমরা-র তওয়াফ এবং উকূফে আরাফা-র পূর্বে সঙ্গম করলে হজ্জ উমরা উভয়টা ফাসেদ হয়ে যাবে এবং দুটো দম ওয়াজেব হবে। আর আগামীতে হজ্জ উমরা উভয়টা কাযা করতে হবে।

* উমরা করনেওয়ালা তওয়াফের পর সায়ীর পূর্বে কিম্বা তওয়াফ ও সায়ীর পর মাথা হলক বা কছর করার পূর্বে সঙ্গম করলে উমরা ফাসেদ হয় না তবে দম দিতে হয়।

* এহরাম অবস্থায় একটা উকুন মারলে রুটির এক টুকরা অথবা একটা খেজুর দান করবে এবং দুটো বা তিনটা উকুন মারলে এক মুষ্টি গম (এর পরিমাণ) দান করবে। আর তিনের অধিক উকুন মারলে পূর্ণ একটা সদকা দিতে

হবে। উকুন মারার জন্য কাপড় রৌদ্রে দিলে বা উকুন মারার উদ্দেশ্যে কাপড় ধৌত করলে এবং উকুন মারা গেলেও একই মাসআলা। অন্যের দ্বারা উকুন মারানো বা ধরে মাটিতে জীবিত ছেড়ে দেয়াও অনুরূপ।

* ৯ই জিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফা ময়দানের সীমানা ত্যাগ করলে দম দিতে হবে।

* সুবহে সাদেক হওয়ার পূর্বে মুযদালেফা ময়দান ত্যাগ করলে দম দিতে হবে।

* যদি কেউ সব কয় দিনের রমী (কংকর নিক্ষেপ) পরিত্যাগ করে অথবা এক দিনের রমী পূর্ণ পরিত্যাগ করে কিম্বা এক দিনের রমী-র অধিকাংশ পরিত্যাগ করে (যেমন দশ তারিখে ৪টা কংকর কম নিক্ষেপ করল কিম্বা অন্য যে কোন দিন ১১টা কংকর কম নিক্ষেপ করল) তাহলে এ সকল অবস্থায় দম ওয়াজেব হবে। আর যদি এক দিনের রমী থেকে অল্প সংখ্যক কংকর কম থেকে যায় তাহলে প্রত্যেক ছুটে যাওয়া কংকরের বদলায় একটা পূর্ণ সদকা ওয়াজেব হবে। তবে সব সদকা একত্রে একটা দম-এর সমমূল্যের হয়ে গেলে কিছুটা কম করে দিবে।

* কেরান ও তামাত্তু হজ্জকারীদের জন্য দমে শোকর বা হজ্জের কুরবানী করা ওয়াজেব। না করলে দম দিতে হবে।

* কেরান ও তামাত্তু হজ্জকারীদের জন্য ১০ই জিলহজ্জ প্রথমে বড় জামরায় কংকর নিক্ষেপ, তারপর কুরবানী ও তারপর মাথা মুন্ডানো– এই তারতীব রক্ষা করা ওয়াজেব এবং এফরাদ হজ্জকারী-র জন্য প্রথমে কংকর নিক্ষেপ তারপর মাথা মুন্ডানো-এই তারতীব রক্ষা করা ওয়াজেব। এই তারতীবের মধ্যে ওলট পালট হলে দম ওয়াজেব হবে।

* ১১ ও ১২ই জিলহজ্জ সূর্য ঢলার পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করলে পুনরায় সূর্য ঢলার পর কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। না করলে দম দিতে হবে।

* মীনার সীমানাতেই ১৩ই জিলহজ্জের সুবহে সাদেক হয়ে গেলে ১৩ই তারিখও তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজেব হয়ে যায়। না করলে দম দিতে হবে।

* বিদায়ী তওয়াফ করা ওয়াজেব। না করলে দম দিতে হবে।

* এহরাম অবস্থায় হারামের সীমানার ভিতরে বা বাইরে যে কোন স্থানে স্থলভাগে জন্মগ্রহণকারী প্রাণী শিকার করা হারাম। আর এহরাম অবস্থায় না থাকলে শুধু হারামের সীমানার ভিতরের এরূপ প্রাণী শিকার করা হারাম। এরূপ (হারাম) শিকার করলে উক্ত প্রাণীর স্থানীয় মূল্য (যা শিকারী ব্যতীত অন্য দু'জন

বা একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তখনকার বাজার দর হিসেবে নির্দ্ধারণ করবে।) গরীব মিসকীনদেরকে দান করবে অথবা তা দ্বারা প্রাণী ক্রয় করে হারামের সীমানার ভিতরে জবাই করে দিবে কিম্বা তা দ্বারা গম ক্রয় করে মিসকীনদেরকে দিবে। এই টাকা বা গম দেয়ার ক্ষেত্রে একজনকে এক ফিতরা পরিমাণ দিবে। অবশিষ্ট কিছু এক ফিতরা পরিমাণের চেয়ে কম রয়ে গেলে বা শিকারকৃত প্রাণীর মূল্যই এত কম হলে তা-ই একজনকে দিবে। একজন মিসকীনকে দেয় পরিমাণের বদলে একটা করে রোযা রাখলেও চলবে। এ রোযা যে কোন স্থানে রাখা চলে।

* যে সমস্ত গাছ সাধারণতঃ কেউ রোপন করেনা– এমন কোন গাছ হারাম শরীফের সীমানার মধ্যে আপনা আপনি জন্মালে তা কাটা বা ভাঙ্গা নিষেধ। কাটলে বা ভাঙ্গলে তার মূল্য দান করা ওয়াজিব।

বিঃদ্রঃ যে সব ভুল-ক্রটির কারণে দম ওয়াজেব হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা যদি কোন ওযর বশতঃ হয়, তাহলে দম-এর পরিবর্তে ছয়টা ফিতরা পরিমাণ অর্থ ছয়জন মিসকীনকে দান করলে বা তিনটা রোযা রাখলেও চলবে। তবে বিনা ওযরে হলে দমই দিতে হবে। আর যেসব ভুল-ক্রটির কারণে সদকা ওয়াজেব হওয়ার বর্ণনা করা হয়েছে তা যদি ওযর বশতঃ হয়, তাহলে 'সদকা'-এর পরিবর্তে তিনটা রোযা রাখলেও চলবে, তবে বিনা ওযরে হলে সদকাই দিতে হবে। ওযর বলতে বোঝানো হয়েছে ঃ (১) যে কোন ধরনের জ্বর, (২) প্রচন্ড গরম বা প্রচন্ড শীত, (৩) জখম, (৪) পূর্ণ মাথায় বা অর্ধেকে বেদনা, (৫) মাথায় খুব বেশী উকুন হওয়া, (৬) চুস লাগানো, (৭) রোগ বা শীতের কারণে মৃত্যুর প্রবল ধারনা হয়ে যাওয়া, (৮) যুদ্ধের জন্য অস্ত্রসজ্জিত হওয়া।

মক্কায় যিয়ারতের স্থানসমূহ ঃ

১। **জান্নাতুল মুআল্লা ঃ** মক্কার কবরস্থান। এ কবরস্থান যেয়ারত করা মোস্তাহাব। এখানে সাহাবী, তাবেয়ী ও বুযুর্গদের কবর রয়েছে। হযরত খাদীজা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-এর কবরও এখানে রয়েছে। এ কবরস্থানটি হারাম শরীফ থেকে উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত।

২। **রাসূল (সঃ)-এর জন্ম স্থান ঃ** এটি হারাম শরীফের পূর্ব দিকের চত্বরের পূর্বে অবস্থিত।

৩। **জাবালে ছওর ঃ** মক্কা শরীফ থেকে তিন মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত একটি পাহাড়। হিজরতের সময় নবী (সঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে সহ তিন রাত এ পাহাড়ের চূড়ায় একটি গুহায় অবস্থান করেছিলেন। যাকে 'গারে ছওর' বলা হয়।

৪। **জাবালে নূর ও গারে হেরা ঃ** মক্কা শরীফ থেকে তিন মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম জাবালে নূর। এই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত একটি গুহাকে বলা হয় 'গারে হেরা' বা হেরা গুহা। নবুয়ত লাভের পূর্বে নবী (সঃ) এই গুহায় ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। এখানেই সর্বপ্রথম ওহী নাযেল হয়েছিল।

৫। **মুযদালেফার ময়দানঃ** এখানে মসজিদে মাশআরুল হারাম রয়েছে।

৬। **আরাফাত ময়দান ঃ** এখানে মসজিদে নামিরা রয়েছে।

৭। **মিনা ঃ** এখানে মসজিদে খায়ফ রয়েছে, যাতে বহু নবী ইবাদত বন্দেগী করেছেন। এ ময়দানের পূর্ব দিকে কুরবানীর স্থান।

৮। **মসজিদে জিন ঃ** এখানে জিনগণ হাজির হয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনেছিল। এটি জান্নাতুল মুআল্লা-র গেট থেকে একটু উত্তরে রাস্তার ডান পার্শ্বে অবস্থিত।

৯। **মসজিদে তানঈম/মসজিদে আয়েশা ঃ** হযরত আয়েশা (রাঃ) এখান থেকে উমরার এহরাম বেঁধে উমরা করেছিলেন। হাজীগণ সাধারণতঃ এখানে গিয়ে এহরাম বেঁধে এসে উমরা করে থাকেন।

১০। **মসজিদুর-রায়াহ ঃ** রাসূল (সঃ) মক্কা বিজয়ের সময় এখানে ঝান্ডা স্থাপন করেছিলেন। এটি হারাম শরীফ থেকে জান্নাতুল মুআল্লায় যেতে গাজজা মার্কেটের উত্তর প্রান্তে রাস্তার ডান (পূর্ব) পার্শ্বে অবস্থিত।

১১। **মুআবাদা ঃ** এখানে কুরায়শ ও বনু কিনানা গোত্রের লোকেরা রাসূল (সঃ) সহ বনু মুত্তালিব ও বনূ হাশেমকে মক্কা থেকে বের করে আনার জন্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল। অবশেষে রাসূল (সঃ) ও বনু মুত্তালিব এবং বনু হাশেম শিআবে আবী তালিবে (বর্তমান নাম শিআবে আলী) অন্তরীণ হয়ে পড়েন। মুআবাদা নামক বর্তমান এ স্থানটির প্রাচীন অনেক গুলো নাম ছিল। তা হল– আব্‌তাহ, বাত্‌হা, বাত্‌নে মুহাস্‌সাব ও খায়ফে বনী কিনানা। রাসূল (সঃ) বিদায় হজ্জে মিনা থেকে মক্কায় ফেরার পথে এখানে অবস্থান করেছিলেন।

১২। **জাবালে আবী কুবায়ছ ঃ** এ পাহাড়টি মসজিদে হারামের দক্ষিণ পূর্ব পাশে অবস্থিত, যার কিছু অংশ কেটে পূর্বের চত্বরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আর অবশিষ্ট অংশের উপর রাজপ্রাসাদ রয়েছে। হযরত নূহ (আঃ)-এর তুফানের সময় থেকে হজরে আসওয়াদ এ পাহাড়ের উপর রাখা ছিল। 'মুজাহিদ'-এর বর্ণনা মতে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে পাহাড়ের মধ্যে সর্ব প্রথম এ পাহাড়টি সৃষ্টি করেন।

মদীনা মুনাওয়ারা-র যিয়ারত

* মদীনা যিয়ারত করা হজ্জের অংশ নয় তবে একটা শ্রেষ্ঠতম ছওয়াবের কাজ এবং বরকত, মর্যাদা ও উন্নতি লাভের একটা শ্রেষ্ঠ ও বড় মাধ্যম। বড়ই সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে এই মোবারক যিয়ারতে মদীনার তওফীক লাভ করে। তত্ত্বজ্ঞানী আলেমদের মতে সঙ্গতি সম্পন্ন লোকদের জন্য এই যিয়ারত ওয়াজিব।

* রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আমার মৃত্যুর পর যে আমার কবর যিয়ারত করল, সে যেন জীবদ্দশায়ই আমার যিয়ারত করল। (مشكوة بحواله بيهقى) রাসূল (সঃ) আরও বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল, তার জন্য শাফাআত করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে গেল। (دار قطنى والبزار)

* মদীনা সফরের সময় রাসূল (সঃ)-এর যিয়ারত ও মসজিদে নববীর যিয়ারত উভয়টার নিয়ত করবে।

* মদীনার পানে রওয়ানা হওয়ার পর থেকেই বেশী বেশী দুরূদ শরীফ ও এস্তেগফার পড়তে থাকা আদব এবং খুব বেশী আগ্রহ, ভালবাসা ও ভক্তি সহকারে অগ্রসর হতে থাকবে।

* মদীনার নিকট পৌঁছে গেলে যওক শওক ও দুরূদ শরীফ পাঠ আরও বৃদ্ধি করবে।

* মদীনার শহর দৃষ্টি গোচর হলে দুরূদ সালাম পাঠ এবং দুআ করতে থাকবে। সম্ভব হলে যানবাহন থেকে নেমে খালি পায়ে হেটে মদীনায় প্রবেশ করতে পারলে উত্তম।

* মদীনায় প্রবেশের পূর্বে না পারলে প্রবেশের পর গোসল করে নেয়া উত্তম। অন্ততঃ উযূ করে নিবে। তারপর উত্তম পোশাক পরিধান করে (নতুন কাপড় হলে ভাল) খুশবূ মেখে শহরে প্রবেশ করবে।

* রাসূল (সঃ) এর রওযার উপরে অবস্থিত সবুজ গম্বুজ দৃষ্টি গোচর হলে ভক্তি ভালবাসা মনে জাগরুক করবে।

* মদীনায় প্রবেশের পর থাকার জায়গা ঠিক করে মাল সামান রেখে ও বিশেষ জরুরত থাকলে তা সেরে যথা সম্ভব দ্রুত মসজিদে নববীতে গমন করবে। মহিলাদের জন্য রাত্রে যিয়ারত করা উত্তম।

* মসজিদে নববীর যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যায় তবে 'বাবে জিব্রীল' দিয়ে প্রবেশ করা উত্তম।

* মসজিদে প্রবেশ করার সময় ডান পা প্রথমে প্রবেশ করবে এবং পড়বে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

* প্রবেশ করার পর রিয়াযুল জান্নাত (বেহেশের বাগান) নামক স্থানে পৌঁছে মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে এবং জামাআত ছুটে যাওয়ার আশংকা না হলে দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করবে। সম্ভব হলে মেহরাবে নবীর কাছে এই দুই রাকআত নামায পড়া সবচেয়ে উত্তম। অতঃপর শোকর আদায় করবে এবং যিয়ারত কবূল হওয়ার জন্য পূর্বেই দুআ করে নিবে।

* অতঃপর অত্যন্ত আদব ও তাযীমের সাথে রওযার সামনে পৌঁছে রাসূল (সঃ)-এর চেহারা মোবারকের বরাবর দাঁড়াবে। রওজার সামনের দেয়ালে জালির মাঝে এ সোজা একটি বড় ছিদ্র আছে। একেবারে কাছে গিয়ে নয় বরং একটু দূরে দাঁড়ানো আদব। দৃষ্টি নত রাখবে এবং মধ্যম আওয়াজে সালাম পেশ করবে। সালাম পেশ করার সময় এই খেয়াল রাখবে যে, রাসূল (সঃ) কেবলা মুখী হয়ে শুয়ে আরাম করছেন এবং সালাম কালাম শ্রবণ করছেন। নিম্নোক্ত বাক্যে সালাম পেশ করা যায়–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ وُلْدِ آدَمَ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

* পারলে এ জাতীয় আরও বাক্য যোগ করা যায়। না পারলে বা বেশী সময় না পেলে যতটুকু সম্ভব বলবে, অন্ততঃ প্রথম বাক্যটা বলবে। অন্য কেউ সালাম পাঠিয়ে থাকলে তার পক্ষ থেকেও সালাম পেশ করবে। অন্যের পক্ষ থেকে আরবীতে এভাবে সালাম পেশ করা যায়–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ يَسْتَشْفِعُ بِكَ اِلٰى رَبِّكَ

এখানে প্রথম فلان -এর স্থলে সালাম প্রেরণকারী এবং দ্বিতীয় فلان -এর স্থলে তার পিতার নাম বলবে।

* অনেকে সালাম পেশ করে থাকলে এবং সকলের নাম মনে না থাকলে বা এত বেশী সময় না পেলে সকলের পক্ষ থেকে একযোগে এভাবে সালাম পেশ করবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ جَمِيْعِ مَنْ اَوْصَانِىْ بِالسَّلَامِ عَلَيْكَ

* অতঃপর রাসূল (সঃ)-এর ওছীলা দিয়ে দুআ করবে এবং শাফাআতের দরখাস্ত করবে। আরবীতে নিম্নোক্ত বাক্যে এটা করা যায়–

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَاَتَوَسَّلُ بِكَ اِلَى اللّٰهِ فِىْ اَنْ اَمُوْتَ مُسْلِمًا عَلٰى مِلَّتِكَ وَسُنَّتِكَ

* অতঃপর কিছুটা ডান দিকে সরে আর একটি ছিদ্রের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ান। এবার আপনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক(রাঃ)-এর চেহারা মোবারকের বরাবর দাঁড়িয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য এভাবে সালাম পেশ করুন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَثَانِيَهُ فِى الْغَارِ وَرَفِيْقَهُ فِى الْاَسْفَارِ وَاَمِيْنَهُ عَلَى الْاَسْرَارِ اَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقِ جَزَاكَ اللّٰهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا

* অতঃপর আর কিছুটা ডান দিকে সরে হযরত উমর (রাঃ)-এর চেহারা মোবারকের বরাবর দাঁড়িয়ে এভাবে সালাম পেশ করুন। এ সোজাও জালিতে একটি ছিদ্র আছে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفَارُوْقَ الَّذِىْ اَعَزَّ اللّٰهُ بِهِ الْاِسْلَامَ اِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ مَرْضِيًّا حَيًّا وَّمَيِّتًا جَزَاكَ اللّٰهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا ـ

* তারপর আবার রাসূল (সঃ)-এর রওযা মোকারককে সালাম পেশ করে তাঁর ওছীলা দিয়ে শাফাআতের জন্য দুআ করুন। সবশেষে কেবলামুখী হয়ে হাত তুলে প্রাণ ভরে নিজের জন্য এবং সকলের জন্য দুআ করুন। এ নিয়মে সময় সুযোগ পেলেই যিয়ারত করুন।

* রাসূল (সঃ)-এর হুজ্‌রা (যেখানে রাসূল [সঃ]-এর রওযা মোবারক অবস্থিত) এবং রাসূল (সঃ)-এর মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি রিয়াযুল জান্নাত বা বেহেশের বাগান নামে পরিচিত। এ স্থানটির বিশেষ ফজীলত রয়েছে। এখানে নফল পড়ুন ও তিলাওয়াত করুন। তবে নামাজের জামাআতে প্রথম কাতারের ফজীলত অগ্রগণ্যতা রাখে।

* রিয়াযুল জান্নাত অংশের মধ্যে সাতটি উস্তুওয়ানা বা স্তম্ভ রয়েছে, এগুলোকে রহমতের স্তম্ভ বলা হয়। মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে এবং কাউকে কষ্ট না দিয়ে সম্ভব হলে এগুলোর পার্শ্বে নফল নামায পড়ুন। স্তম্ভ সাতটি এইঃ

১। **উস্তুওয়ানা হান্নানাহ ঃ** মিম্বারে নববীর ডান পার্শ্বে অবস্থিত খেজুর বৃক্ষের গুড়ির স্থানে নির্মিত স্তম্ভটি। যে গুড়িটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বার স্থানান্তরের সময় উচ্চস্বরে ক্রন্দন করেছিল।

২। **উস্তুওয়ানা ছারীর ঃ** এখানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ'তেকাফ করতেন এবং রাতে আরামের জন্য তাঁর বিছানা এখানে স্থাপন করা হতো। এ স্তম্ভটি হুজ্‌রা শরীফের পশ্চিম পার্শ্বে জালি মোবারকের সাথে রয়েছে।

৩। **উস্তুওয়ানা উফূদ ঃ** বাহির থেকে আগত প্রতিনিধি দল এখানে বসে হুযুর (সঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করতেন এবং নবী (সঃ) তাদের সাথে এখানেই বসে কথা বলতেন। এ স্তম্ভটিও জালি মোবারকের সাথে রয়েছে।

৪। **উস্তুওয়ানা হারছ ঃ** হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুজরা শরীফে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন কোন না কোন সাহাবী পাহারার জন্য এখানে বসতেন। এ স্তম্ভটিও জালি মোবারক ঘেঁষে রয়েছে।

৫। **উস্তুওয়ানা আয়েশা ঃ** (রাযিঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার মসজিদে এমন একটি জায়গা রয়েছে, লোকজন যদি সেখানে নামায পড়ার ফযীলত জানতো, তবে সেখানে স্থান পাওয়ার জন্য লটারীর প্রয়োজন দেখা দিতো। স্থানটি চিহ্নিত করার জন্য সাহাবায়ে কিরাম চেষ্টা করতেন। হুযুর (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আয়েশা (রাযিঃ) তাঁর ভাগ্নে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাযিঃ)কে সেই জায়গাটি চিনিয়ে দেন। এটিই সেই স্তম্ভ। এই স্তম্ভটি উস্তুওয়ানা উফূদের পশ্চিম পার্শ্বে রওযায়ে জান্নাতের ভিতর অবস্থিত।

৬। **উস্তুওয়ানা আবূ লুবাবা (রাযিঃ) ঃ** হযরত আবূ লুবাবা (রাযিঃ) থেকে একটি ভুল সংঘটিত হওয়ার পর তিনি নিজেকে এই স্তম্ভের সাথে বেঁধে বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত হুযুর (সঃ) নিজে না খুলে দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এর সাথে বাঁধা থাকবো। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আল্লাহ তা'আলা আদেশ না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত খুলবো না। এভাবে দীর্ঘ ৫০ দিন পর হযরত আবূ লুবাবা (রাযিঃ)-এর তওবা কবূল হলো। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন। এটি উস্তুওয়ানা উফূদের পশ্চিম পার্শ্বে রওযায়ে জান্নাতের ভিতর অবস্থিত।

৭। **উস্তওয়ানা জিব্রীল (আঃ) ঃ** হযরত জিব্রীল (আঃ) যখনই হযরত দেহ্ইয়া কাল্বী (রাযিঃ)-এর আকৃতি ধারণ করে ওহী নিয়ে আসতেন, তখন অধিকাংশ সময় তাঁকে এখানেই উপবিষ্ট দেখা যেতো।

* মসজিদে নববীতে একাধারে কেউ ৪০ ওয়াক্ত নামায আদায় করলে তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি এবং আযাব ও মুনাফেকী থেকে মুক্তির ছাড়পত্র লিখে দেয়া হবে বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাই সম্ভব হলে মসজিদে নববীতে একাধারে ৪০ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে পড়ার বিশেষ চেষ্টা করতে হবে।

মদীনাতে যিয়ারতের বিশেষ কয়েকটি স্থান ঃ

১। **জান্নাতুল বাকী ঃ** মদীনা শরীফের কবরস্থানের নাম 'জান্নাতুল বাকী'। মসজিদে নববীর সন্নিকটে পূর্ব দিকে অবস্থিত। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, আহলে বায়ত, আযওয়াজে মুতাহ্হারাত, শোহাদা, আয়েম্মায়ে কিরাম ও আওলিয়ায়ে কিরাম এই কবরস্থানে সমাধিস্থ রয়েছেন। এখানে হযরত উসমান (রাযিঃ) -এর মাযার থেকে যিয়ারত শুরু করুন। অনেকের মতে আব্বাস (রাঃ)-এর কবর থেকে যিয়ারত শুরু করা।

২। **শোহাদায়ে উহুদ ঃ** বৃহস্পতিবার সকালে উহুদের শহীদগণের যিয়ারতে যান। প্রথমে মসজিদে হামযায় দুই রাকআত নামায আদায় করুন। অতঃপর হযরত হামযার মাযার যিয়ারত করুন। পার্শ্বেই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্শ (রাযিঃ) এবং হযরত মুস্আব ইবনে উমাইর (রাঃ)-এর মাযার রয়েছে, তাঁদেরকেও সালাম পেশ করুন। সত্তরজন শহীদ সাহাবায়ে কিরাম এখানে সমাধিস্থ রয়েছেন। সম্ভব হলে পাহাড়ে আরোহণ করুন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা উহুদ পাহাড়ে আগমন করলে এখানকার বৃক্ষ থেকে কিছু খাও, এমনকি কাঁটাদার বৃক্ষ হলেও।"

৩। **মসজিদে কোবা ঃ** হিজরতের পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হস্তে এই মসজিদ নির্মাণ করেছেন; এটিই মুসলমানদের প্রথম মসজিদ। যে দিন সুযোগ হয় এই মসজিদের যিয়ারত করুন, তবে শনিবার দিন উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, মসজিদে কোবায় দুই রাকআত নামাযের সওয়াব উমরার সমতুল্য।

৪। **মসজিদে জুমুআ ঃ** কোবার পথের সন্নিকটবর্তী। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সর্বপ্রথম এই মসজিদে জুমুআর নামায আদায় করেন।

৫। **মসজিদে কেবলাতাইন ঃ** এই মসজিদে কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছিল।

৬। **মসজিদে ফাতাহ ঃ** সিলা'আ পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। খন্দক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে তিন দিন—সোম, মঙ্গল ও বুধবার দুআ করেছিলেন, আল্লাহ পাক দুআ কবুল করেন এবং মুসলমানগণ বিজয়ী হন।

এই মসজিদের নিকটেই পাশাপাশি মসজিদে সালমান ফার্সী, মসজিদে ওমর, মসজিদে ফাতেমা প্রভৃতি কয়েকটি মসজিদ রয়েছে, বর্তমানে এগুলোকে 'মাসাজিদে সাবআ' বা সাত মসজিদ বলা হয়। জিয়ারতের গাড়ী হাজীদেরকে সাধারণতঃ উল্লেখিত কয়েকটি স্থানে নিয়ে যেয়ে থাকে।

৭। **মসজিদে বনী হারাম ঃ** মসজিদে ফাতাহের নিকটবর্তী এই মসজিদেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েছেন।

৮। **মসজিদে গামামাহ ঃ** মসজিদে নববীর দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদের নামায এখানে আদায় করতেন।

৯। **মসজিদে আবু বকর ঃ** মসজিদে গামামাহ-র নিকট উত্তর দিকে অবস্থিত।

১০। **মসজিদে আলী ঃ** এই মসজিদও মসজিদে গামামাহ-র নিকট অবস্থিত।

১১। **মসজিদে ওমর ঃ** এখানে হযরত ওমর (রাঃ) কখনও কখনও নামায পড়েছেন। রাসূল (সঃ)ও এখানে ঈদের নামায পড়েছেন বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন। মসজিদে ওমর মসজিদে গামামাহ-র সামান্য দক্ষিণে অবস্থিত।

১২। **মসজিদু'স সাজদাহ ঃ** এখানে রাসূল (সঃ) সাজদায়ে শোকর আদায় করেছিলেন। দীর্ঘ সাজদা থেকে মাথা তুলে তিনি উপস্থিত হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-কে বলেছিলেন ঃ জিব্রীল (আঃ) এসে আমাকে বললেন, আল্লাহ তাআলা বলছেন ঃ যে আপনার প্রতি দুরূদ পাঠ করে আমি তার প্রতি

রহমত করি, যে আপনাকে সালাম করে আমি তাকে সালাম করি। তাই আমি শোকর আদায় করণার্থে সাজদা করলাম। মসজিদটি বর্তমানে "মসজিদে আবী জর" নামে পরিচিত। এ মসজিদটি মসজিদে নববীর পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে উত্তর দিকে যে রাস্তাটি গিয়েছে তার কিছুটা সামনে গিয়ে চৌরাস্তা পার হয়ে সামনে ডান দিকে রাস্তা মোড় নেয়ার সময় ডান দিকে অবস্থিত।

১৩। **মসজিদুল-ইজাবাহ** ঃ এখানে রাসূল (সঃ) দুই রাকআত নামায পড়ে তিনটি দুআ করেছিলেন, যার দুটো কবূল হয়। দুআ তিনটি ছিল এই (এক) আল্লাহ তাআলা যেন এই উম্মতকে দুর্ভিক্ষ দিয়ে ধ্বংস না করেন। এটি কবূল হয়। (দুই) আল্লাহ তা'আলা যেন এই উম্মতকে নিমজ্জিত করে ধ্বংস না করেন। এটিও কবূল হয়। (তিন) এই উম্মত পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহে যেন লিপ্ত না হয়। এটি কবূল হয়নি। এ মসজিদটি মসজিদে নববীর পূর্ব পাশ এবং জান্নাতুল বাকী'র উত্তর পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি পূর্ব দিকে গিয়েছে যে রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হয়ে জান্নাতুল বাকী'র উত্তর পূর্ব কোণে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে বাঁ দিকে (উত্তর দিকে) তাকালেই দৃষ্টিগোচর হয়।

১৪। **মসজিদুল মুছ্‌তারাহ্** ঃ এটাকে পূর্বে মসজিদে বানু হারেছা বলা হত। বানু হারেছা নামক আনছারী গোত্র এখানে বসবাস করত। রাসূল (সঃ) উহুদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে এখানে বসে আরাম গ্রহণ করেছিলেন। মসজিদটি গাড়ীতে উহুদ পাহাড়ে যাওয়ার সময় উহুদ পাহাড়ের কিছু পূর্বেই রাস্তার বাম পাশে রাস্তা সংলগ্ন অবস্থিত। এটাকে মসজিদুল এছতেরাহা-ও বলা হয়।

১৫। **মসজিদুশ শায়খাইন** ঃ রাসূল (সঃ) উহুদ যুদ্ধে গমন কালে শুক্রবার আসর, মাগরিব ও ইশার নামায এখানে আদায় করেন এবং রাত্র যাপন করে শনিবার সকালে এখান থেকে উহুদ প্রান্তরে গমন করেন। এখানেই রাসূল (সঃ) সৈনিক নির্বাচন করেন এবং ছোট সাহাবীদেরকে ফেরত করেন। এ মসজিদটি মসজিদুল-মুছতারাহ থেকে ৩০০ মিটার দক্ষিণে চৌরাস্তা থেকে ২০ মিটার পূর্বে অবস্থিত। এ মসজিদকে মসজিদুল উদ্‌ওয়া, মসজিদুল বাদায়ে', মসজিদুদ্দির্‌য়ে প্রভৃতি নামেও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।

১৬। **মসজিদু'র রায়াহ** ঃ এটাকে 'মসজিদে যুবাব'-ও বলা হয়। এ মসজিদটি যুবাব নামক একটি ছোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত, যে পাহাড়ে খন্দক খননের কাজ পরিদর্শনের জন্য রাসূল (সঃ)-এর তাবু স্থাপন করা হয়েছিল এবং তিনি এখানে নামাযও পড়েছেন। তরীকুল উয়ূন-এর শুরুতে বাম পাশে মসজিদটি অবস্থিত।

১৭। **মসজিদুল-ফাযীখ** ঃ এটাকে 'মসজিদে শাম্‌স' বা 'মসজিদে বানু-ন নাযীর'-ও বলা হয়। বানু নাযীরের সাথে যুদ্ধের সময় নবী (সঃ) এখানে নামায পড়েছিলেন। মসজিদটি আওয়ালী নামক এলাকায় অবস্থিত।

১৮। **মাশরাবাহ উম্মে ইবরাহীম** ঃ এখানে রাসূল (সঃ)-এর পুত্র ইবরাহীমের মাতা মারিয়া কিব্‌তিয়া বসবাস করতেন। এখানেই ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রাসূল (সঃ) এখানে যাতায়াত করতেন এবং বিবিদের সঙ্গে ঈলা (দ্রঃ ৮৪ পৃষ্ঠা) করার সময় দীর্ঘ একমাস এখানে তিনি অবস্থান করেছিলেন। পরবর্তীতে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল, যাকে 'মসজিদে মাশরাবাহ উম্মে ইবরাহীম' বলা হত। বর্তমানে এখানে কোন মসজিদ নেই। এটি এখন একটি কবরস্থান। যা আওয়ালীতে মুছতাশ্‌ফা ঝাহ্‌রা ও মুছতাশ্‌ফা ওয়াতানী-র মাঝে অবস্থিত।

১৯। **মসজিদুল ফাছ্‌হ্‌** ঃ বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) উহুদ যুদ্ধের পর এখানে নামায পড়েছিলেন। এ মসজিদটি এখন (২০০০ইং) ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। এর উত্তরে উহুদ পাহাড়ে কিছুটা উঁচুতে গুহার ন্যায় একটি ফাটল রয়েছে; বলা হয় নবী (সঃ) উহুদ যুদ্ধে আহত হয়ে এখানে অবস্থান নিয়েছিলেন। এ স্থানটি মাকবারাতুশ শুহাদা– এর উত্তর দিক দিয়ে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত।

বিঃ দ্রঃ এ সব মসজিদ যিয়ারতে গেলে সেখানে অন্ততঃ দুরাকআত নামাযও পড়ে নিবে–শুধু ঘুরে আসবে না।

(হজ্জ ও যিয়ারত সম্পর্কিত অধিকাংশ মাসায়েল معلم الحجاج এবং কতিপয় বর্ণনা المساجد الاثرية তোহফায়ে হজ্জ থেকে গৃহীত)

পর্দার আহকাম

* শরীয়তে গায়র মাহরাম পুরুষ বা নারীর সাথে পর্দা করা ওয়াজিব।

* কোন বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা পুরুষের জন্য হারাম। এমনিভাবে নারীর জন্যেও কোন বেগানা পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে যায় তা মাফ; তবে সে দৃষ্টিকে দীর্ঘায়িত করা যাবে না। নারীদের চেহারাও পর্দার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

* দাড়ি বিহীন বালকের প্রতিও বদনিয়ত ও কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত করা হারাম।

* কোন পুরুষ কোন পুরুষের গোপন অঙ্গ দেখতে পারবে না। তেমনি কোন নারী অপর কোন নারীর গোপন অঙ্গ দেখতে পারবে না। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হলে ভিন্ন কথা– সে ক্ষেত্রেও অন্তর থেকে যথা সম্ভব

শাহওয়াত দূর করার চেষ্টা করবে এবং এ ক্ষেত্রেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ দেখা জায়েয হবে না। পুরুষের নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত গোপন অঙ্গ (সতর) আর নারীর গোপন অঙ্গ (সতর) বলতে বুঝায় তার মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতীত সমস্ত শরীর।

* চলা ফেরা ও কাজ-কর্মের সময় বা লেন-দেনের সময় প্রয়োজন হলে নারীর জন্য মুখমণ্ডল, হাতের তালু, অঙ্গুলি ও পদযুগল খোলারও অনুমতি রয়েছে। কিন্তু পুরুষের জন্য বিনা প্রয়োজনে নারীর এগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয়। (معارف القرآن وبيان القرآن)

* যাদের সঙ্গে নারীকে পর্দা করতে হয় না অর্থাৎ, যাদের সামনে নারীগণ যেতে পারেন তাদের একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল।

এরা হল নারীর মাহরাম ঃ

১। নিজ স্বামী (যার নিকট স্ত্রীর কোন অঙ্গের পর্দা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুত্তম)

২। পিতা (আপন হোক বা সৎ। দুধ পিতাও এর অন্তর্ভুক্ত)

৩। দাদা (দাদার পিতা বা আরও যত উপরে যাক এর অন্তর্ভুক্ত)

৪। নানা (নানার পিতা বা আরও যত উপরে যাক এর অন্তর্ভুক্ত)

৫। চাচা (আপন হোক বা সৎ)

৬। ভাই (আপন হোক বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়) তবে চাচাত মামাত খালাত ফুফাতো ভাইয়ের সঙ্গে পর্দা করতে হবে। দুধ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা দেয়া যায়।

৭। ভ্রাতুষ্পুত্র (আপন ভাইয়ের পুত্র হোক বা বৈমাত্রেয় ভাইয়ের বা বৈপিত্রেয় ভাইয়ের)

৮। ভাগিনা (আপন বোনের ছেলে হোক বা সৎ বোনের)

৯। ছেলে (আপন হোক বা সৎ)

১০। আপন শ্বশুর (আপন শ্বশুর, আপন দাদা শ্বশুর ও আপন নানা শ্বশুর ব্যতীত অন্য সকল প্রকার শ্বশুরের সঙ্গে পর্দা করতে হবে)

১১। মামা (আপন হোক বা সৎ)

১২। নাতী (আপন ছেলের ঘরের হোক বা মেয়ের ঘরের হোক)

১৩। জামাই (আপন মেয়ের জামাই)

* নির্বোধ, ইন্দ্রিয় বিকল ধরনের লোক বা ঐসব বালক যারা বিশেষ কাজ কারবারের দিক দিয়ে নারী পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য বোঝে না, তাদের সাথে পর্দা করা জরুরী নয়–তারাও পর্দার হুকুম থেকে ব্যতিক্রম।

* পূর্বের পরিচ্ছেদ থেকে বোঝা গিয়েছে– পুরুষ কোন্ কোন্ নারীর সঙ্গে দেখা করতে পারবে অর্থাৎ, কোন কোন নারীর সঙ্গে পর্দার হুকুম নেই; তবে সহজে বোঝার জন্য তারও একটি তালিকা নিম্নে পেশ করা হল।

এরা হল পুরুষের মাহরাম ঃ

১। মা (আপন হোক বা সৎ। দুধ মা-ও এর অন্তর্ভুক্ত)

২। মেয়ে (আপন হোক বা সৎ অর্থাৎ স্ত্রীর পূর্বের ঘরের মেয়ে হোক)

৩। বোন (আপন হোক বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়) দুধবোনও এর অন্তর্ভুক্ত। মামাত, খালাত, ফুফাত বোনদের সাথেও পর্দা করতে হবে।

৪। ফুফু (আপন হোক বা সৎ)

৫। খালা (আপন হোক বা সৎ)

৬। ভাতিজি (আপন হোক বা সৎ)

৭। ভাগ্নি (আপন হোক বা সৎ)

৮। শাশুড়ী (আপন শাশুড়ী বা দাদী শাশুড়ী বা নানী শাশুড়ী)

৯। আপন দাদী।

১০। আপন নানী।

১১। পুত্র-বধূ।

১২। নিজ স্ত্রী।

১৩। নাতিনী (ছেলের ঘরের হোক বা মেয়ের ঘরের)

* উল্লেখ্য, পুরুষ তার মাহরাম মহিলার শুধু মাথা, চেহারা, গর্দান, দুই বাহু ও পায়ের নলা দেখতে পারে, তাও যদি শাহওয়াত না থাকে। পেট পিঠ দেখা জায়েয নয়। একজন নারী অপর নারীর এতটুকু অংশই দেখতে পারে, যতটুকু একজন পুরুষ অপর পুরুষের দেখতে পারে– তার বেশী নয়।

* যেখানে নারীর আওয়াজের কারণে অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে সেখানে পর্দার অন্তরালে থেকেও বেগানা পুরুষকে অওয়াজ শুনানো এবং পর্দার সাথে কথা-বার্তা বলা নিষেধ। যেখানে এরূপ আশংকা নেই সেখানে জায়েয কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পর্দার অন্তরালে থেকেও বেগানা পুরুষদের সঙ্গে কথা-বার্তা না বলার মধ্যেই সাবধানতা নিহিত। প্রয়োজনের মুহূর্তে বলতে হলেও নারীকে মিহি

সূরে না বলার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ফিতনার সম্ভবানা থেকে বাঁচার জন্য এটাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

* নারীদের জন্য বেগানা পুরুষকে অলংকারের আওয়াজ শোনানোও জায়েয নয়।

* সুশোভিত রঙিন কারুকার্য খচিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও নিষিদ্ধ। (معارف القرآن نقلا عن الجصاص)

* যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রী বা পরিবারের (অধীনস্ত) কোন মহিলাকে বেগানা পুরুষের সাথে মেলা মেশা করতে দেয়, শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাতে কোন প্রকার বাঁধা না দেয় অর্থাৎ, শরীয়তের পর্দা বিধান লঙ্ঘন করতে দেয় তাকে দাইয়ূস বলা হয়। আর হাদীসে এসেছে দাইয়ূস ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।

খৎনার আহকাম

* ছেলেদের খৎনা, (মুসলমানী) করানো সুন্নাত। খৎনা ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য, তাই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত।

* খৎনা করানোর কোন বয়স নির্ধারিত নেই। বালেগ হওয়ার পূর্বে যে কোন বয়সে যে কোন সময় করে নিবে। (ماثبت بالسنة)

* যদি বালেগ হওয়ার পূর্বে কারও খৎনা না হয়ে থাকে বা কোন অমুসলিম বালেগ হওয়ার পর মুসলমান হয় এবং পূর্বে তার খৎনা না হয়ে থাকে, তাহলেও (বালেগ হওয়া সত্ত্বেও) খৎনা করার হুকুম বলবৎ থাকবে, যদি তার মধ্যে খৎনার কষ্ট সহন করার ক্ষমতা থাকে। (امداد الفتاوى ج ٤ وغيره)

* খৎনা উপলক্ষে আড়ম্বর করা, দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয় স্বজনকে ডেকে আনা এবং তাদেরও ছেলের জন্য কাপড়-চোপড় ও হাদিয়া তোহফা নিয়ে আসা এটা সুন্নাত পরিপন্থী। (ইসলামী ফিকাহ)

গোঁপ, দাড়ির মাসায়েল

* পুরুষের জন্য দাড়ি রাখা ওয়াজেব এবং অন্তত এক মুষ্ঠি পরিমাণ লম্বা রাখা ওয়াজেব। দাড়ি মুন্ডানো বা এক মুঠের চেয়ে কম রেখে ছাঁটা বা উপড়ানো হারাম। এক মুঠের চেয়ে লম্বা হলে তা ছেঁটে ফেলানো দোরস্ত আছে। এরূপ চতুর্দিক থেকে সমান করার জন্য কিছু কিছু ছেঁটে ফেলা দোরস্ত আছে।

(ڈاڑھی اور انبیاء کی سنتیں اور صفائی معاملات)

* দাড়ি এক মুঠের চেয়ে খুব বেশী লম্বা রাখা সুন্নাতের খেলাফ।

(فتاوی رحیمیه ج ٣)

* গোঁপ দুই দিক থেকে লম্বা করা জায়েয আছে কিন্তু যেন ঠোটের উপর না পড়ে– এভাবে ছোট রাখা সুন্নাত।

* গোঁপ মুণ্ডানো জায়েয কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে–কোন কোন আলেম বিদআত বলেছেন। অতএব না মুণ্ডানো ভাল। গোঁপ ছেঁটে এত ছোট করে রাখবে যেন মুণ্ডানোর ন্যায় হয়ে যায়, এরূপ করা উত্তম।

* মহিলার গোঁপ দাড়ি হলে মুণ্ডানো জায়েয বরং দাড়ি হলে মুণ্ডিয়ে ফেলা মোস্তাহাব। কোন ভাবে মূল থেকে তুলে ফেলতে পারলে আরও উত্তম।
(فتاوی رحیمیه ج ۲)

* ভাল দেখানোর জন্য পাকা দাড়ি উপড়ে ফেলা নাজায়েয।

* গালের উপরের পশম দাড়ি নয়। এরূপ পশম মুণ্ডন করে রেখার ন্যায় বানানো জায়েয, তবে খেলাফে আওলা। (فتاوی رشیدیه)

* হলকূমের পশম কামানো চাইনা, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) জায়েয বলেন।

* নীচের ঠোটের নিম্নের পশম (বাচ্চাদাড়ি) কামানোকে ফকীহগণ বিদআত বলেছেন, অতএব তা কামানো চাইনা। (ছাফাইয়ে মোআমালাত)

* দাড়ির কলপ/ খেযাব সম্পর্কিত মাসায়েল জানার জন্য দেখুন ৪২৬ পৃষ্ঠা।

চুল ও শরীরের অন্যান্য পশমের মাসায়েল

* সমস্ত মাথায় কানের মধ্য পর্যন্ত বা কানের লতি পর্যন্ত বা কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখা (অর্থাৎ, বাবরি রাখা) বা সমস্ত মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলা সুন্নাত। সব স্থানে সমান করে ছেঁটে ফেলা জায়েয। বাবরি রাখলে তার যত্ন নেয়া কর্তব্য।

* মাথার কিছু অংশ কামানো আর কিছু অংশে চুল রাখা না জায়েয। রোগ ব্যাধির কারণে হলেও জায়েয নয়। মুণ্ডাতে হলে সমস্ত মাথার চুল মুণ্ডিয়ে ফেলবে। (فتاوی رشیدیه)

* মাথায় টিকি রাখা বা কোন দরগায় মান্নত মেনে জন্মচুল রাখা এসব না জায়েয। (صفائی معاملات)

* মহিলাদের ন্যায় পুরুষের চুল রেখে খোপা বাঁধা বা বেণী বাঁধা জায়েয নয়।
(ایضا)

* মাথা না মুণ্ডিয়ে শুধু গর্দানের পশম মুণ্ডানো জায়েয তবে উত্তম নয়।
(فتاوی رشیدیه)

* মহিলাদের মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটা হারাম, হাদীস শরীফে এরূপ মহিলাদের প্রতি লা'নত এসেছে।

* ভাল দেখানোর জন্য পাকা চুল উঠিয়ে ফেলা নাজায়েয। অবশ্য জেহাদের ময়দানে কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের জন্য এরূপ করা জায়েয আছে।

* পূর্বের পরিচ্ছেদে দাড়িতে কলপ/খেযাব লাগানোর যে মাসআলা বর্ণিত হয়েছে। চুলের কলপ/খেযাব লাগানোর মাসআলাও অনুরূপ।

* নাকের মধ্যের পশম না উপড়িয়ে কাঁচির দ্বারা কাটা উত্তম।

* বগলের পশম উপড়ে ফেলাই উত্তম কিন্তু কামানোও জায়েয।

* নাভির নীচের পশম পুরুষের জন্য কামিয়ে ফেলা উত্তম। কোন রকম লোম নাশকের দ্বারা উপড়ে ফেলাও জায়েয আছে। মেয়েদের জন্য উপড়ে ফেলাই সুন্নাতের মোয়াফেক।

* নাভির নীচের পশম কামানোর সময় নাভির দিক থেকে শুরু করা নিয়ম। অন্ডকোষ, তার নীচে ও মলদ্বারে পশম থাকলে সবই কামিয়ে ফেলবে।

* কানের মধ্যে পশম থাকলে তাও কেটে ফেলবে।

* বুক পিঠের পশম কামানো জায়েয আছে তবে ভাল নয়।

* উপরে উল্লেখিত স্থান সমূহ ব্যতীত শরীরের অন্যান্য স্থানের পশম যেমন পায়ের নলা, রান, হাত ইত্যাদির পশম রাখা এবং কাটা উভয়ই দোরস্ত আছে।

* বগলের পশম, নাভির নীচের পশম, গোঁপ ইত্যাদি প্রত্যেক সপ্তাহে একবার ছাফ করা মোস্তাহাব। শুক্রবারে জুমুআর নামাযের আগেই এসব থেকে পাক সাফ হয়ে মসজিদে যাওয়া উত্তম। দু সপ্তাহে একবার করলেও জায়েয। একেবারে শেষ সীমা চল্লিশ দিন–এ সব থেকে পাক সাফ না হওয়া অবস্থায় চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে গোনাহ হবে।

* জানাবাতের অবস্থায় অর্থাৎ, যখন গোসল ফরয হয় তখন চুল বা এসব পশম কাটা ছাঁটা মাকরূহ।

* বিনা অপারগতায় অন্যের দ্বারা বগলের পশম সাফ করানো ভাল নয়।

* ভ্রু যদি বিশৃংখল থাকে তাও কিছু কিছু কেটে-ছেঁটে সমান করে দেয়া দুরস্ত আছে।

* কাটা চুল মাটির নীচে দাফন করে দেয়া উত্তম। কোন ভাল জায়গায় ফেলে দেয়াও দোরস্ত আছে, কিন্তু নাপাক ও খারাব স্থানে ফেলা চাই না।

* চুলের কলপ/খেযাব, চুলে তেল লাগানো, চিরনি করা, মহিলাদের জন্য আলগা চুলের খোপা লাগানো ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য দেখুন ৪২৪-৪২৬ পৃষ্ঠা।

নখ কাটার মাসায়েল

* হাত পায়ের নখ কেটে ফেলা সুন্নাত। প্রতি সপ্তাহে একবার কাটা মোস্তাহাব। জুমুআর নামাযের পূর্বেই এ থেকে পাক সাফ হয়ে মসজিদে যাওয়া উত্তম। অন্ততঃ দু সপ্তাহে একবার কাটলেও চলবে। চল্লিশ দিনের বেশী না কাটা অবস্থায় অতিবাহিত হলে গোনাহ হবে।

* দাঁত দিয়ে নখ কাটা মাকরূহ। এতে শ্বেত রোগ হওয়ার আশংকা আছে।

* জানাবাতের অবস্থায় অর্থাৎ, গোসল ফরয হওয়ার অবস্থায় নখ কাটা মাকরূহ।

* কেউ কেউ শামী গ্রন্থের বরাত দিয়ে নিম্নোক্ত তারতীবে নখ কাটাকে সুন্নাত বলেছেন– হাতের নখ কাটতে প্রথমে ডান হাতের শাহাদাৎ (তর্জনী) আঙ্গুল হতে শুরু করে কনিষ্ঠ আঙ্গুল পর্যন্ত কাটবে। তারপর বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল হতে শুরু করে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল পর্যন্ত কাটবে, সব শেষে ডান হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুলের নখ কাটবে। আর পায়ের নখ কাটতে প্রথমে ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুল পর্যন্ত তারপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্ঠ আঙ্গুলে শেষ করবে।

তবে উল্লেখ্য যে, দুর্‌রে মুখতার গ্রন্থকার হাফেজ ইব্‌নে হাজারের বরাত দিয়ে এবং স্বয়ং শামী গ্রন্থকারও আল্লামা সুয়ূতী ও ইব্‌নে দাকীকুল ঈদ-এর বরাত দিয়ে উপরোক্ত তারতীব সুন্নাত হওয়া সম্পর্কিত বর্ণনা ও রিওয়ায়াত গ্রহণ যোগ্য নয় বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব যে কোন ভাবে সম্ভব কেটে নিবে। তবে প্রথমে ডান হাতের তারপর বাম হাতের নখ কাটা সুন্নাত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।
(شامی ج/٦)

* কাটা নখ মাটির নীচে দাফন করে দেয়া উত্তম। অন্ততঃ কোন ভাল জায়গায় ফেলে দেয়াও দুরস্ত আছে। নাপাক ও খারাব জায়গায় ফেলা চাইনা।

* নখে মেহেদী লাগানো সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৪২৬ পৃষ্ঠা।

বিশেষ কয়েকটি দিন, রাত ও বিশেষ কয়েকটি সময়ের আমল সমূহ

জুমুআর দিনের বিশেষ কয়েকটি আমল ঃ

১। অন্য দিনের তুলনায় ফজরের সময় ঘুম থেকে আগে উঠা।

২। গোসল করা। (মেসওয়াকও করবে)

৩। উত্তম ও পরিস্কার কাপড় পরিধান করা।

৪। আতর বা খুশবূ লাগানো।

৫। পায়ে হেটে মসজিদে যাওয়া।

৬। ইমাম সাহেবের কাছাকাছি বসা।

৭। মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনা।

৮। খুতবার সময় কোনরূপ কাজ না করা বা কথা না বলা।

জুমুআর দিন উপরোক্ত আমলগুলো করলে প্রতি কদমে এক বৎসর নফল রোযা ও এক বৎসর নফল নামাযের ছওয়াব পাওয়া যায়। (مشكوة ج ١)

৯। সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করা। (জুমুআর নামাযের আগে হোক বা পরে) এরূপ করলে কিয়ামতের দিন তার জন্য আকাশ তুল্য একটি নূর প্রকাশ পাবে।

১০। বেশী বেশী দুরূদ শরীফ পাঠ করা ও বেশী বেশী যিকির করা মোস্তাহাব।

১১। দুই খুতবার মাঝখানে হাত উঠানো ব্যতীত দিলে দিলে দুআ করা।

১২। সূর্য ডোবার কিছুক্ষণ পূর্ব হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত গুরুত্বের সাথে যিকির, তাসবীহ ও দুআয় লিপ্ত থাকা।

১৩। জুমুআর দিন চুল কাটা, নখ কাটা, বগল ও নাভির নীচের পশম সাফ করা। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

১৪। জুমুআর দিন জুমুআর নামাযের জন্য যত শীঘ্র মসজিদে যাবে তত বেশী ছওয়াব হবে। সর্বপ্রথম যে যাবে একটা উট কুরবানীর ছওয়াব পাবে। তারপরের জন একটা গাভী কুরবানীর, তারপরের জন দুম্বা কুরবানীর, তারপরের জন একটা মুরগি দানের এবং তারপরের জন একটা ডিম দানের ছওয়াব পাবে। (مشكوة ج/١)

১৫। যে, ব্যক্তি জুমুআর দিন ফজর নামাযের পূর্বে তিনবার নিম্নোক্ত এস্তেগফারটি পাঠ করবে তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে–

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ۔ (كتاب الاذكار)

সকাল সন্ধ্যার বিশেষ কয়েকটি আমল ঃ

১। যে ব্যক্তি সকাল বেলা তিনবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ে (বিসমিল্লাহ পড়বেনা) সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যারা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত রহমতের দূআ করতে থাকবে এবং ঐ দিন তার মৃত্যু হলে সে শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করবে। আর সন্ধ্যায় অনুরূপ পাঠ করলে পরবর্তী সকাল পর্যন্ত তার ঐ মর্তবা হাছিল হবে। (ترمذى)

২। যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দুআ তিনবার পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন (পুরস্কার ও ছওয়াব দিয়ে) তাকে অবশ্যই রাজী খুশী করে দিবেন। দুআটি এই–

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا ـ (كتاب الاذكار)

অর্থ ঃ আমি সন্তুষ্ট রব হিসেবে আল্লাহর প্রতি, দ্বীন হিসেবে ইসলামের প্রতি এবং নবী ও রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রতি।

৩। যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা (ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর কথা বলার পূর্বে) সাতবার পাঠ করবে اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ[১] তাহলে ঐ দিন বা রাত্রে তার মৃত্যু হলে তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হবে। (مشكوة نقلا عن ابى داؤد)

৪। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত চেয়ে সকাল সন্ধ্যায় আটবার পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট কামনা করি তোমার সন্তুষ্টি এবং জান্নাত।

৫। যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় তিনবার নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে, ঐ দিন ঐ-রাত তার কোন আকস্মিক বিপদ মুছীবত বা নোকছান ঘটবে না। দুআটি এই–

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ (مشكوة ج/١)

অর্থ ঃ আল্লাহর নাম নিয়ে (আমি সকালে/সন্ধা বেলায় পৌঁছলাম) যার নামের উপর থাকলে আসমান ও জমীনের কেউ ক্ষতি করতে পারে না, তিনি সব কিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন।

৬। নবী (সঃ) সকাল বেলায় পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ

১. অর্থঃ হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তোমার কুদরতেই আমি সকাল বেলায় প্রবেশ করলাম, তোমার কুদরতেই আমি সন্ধাবেলায় প্রবেশ করি। তোমার কুদরতেই আমি বেঁচে থাকি এবং মৃত্যুবরণ করি। আর তোমার দিকেই পুনঃ উত্থান করতে হবে।

সন্ধা বেলায় পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ۔ (مشکوة ج/١)

অর্থ ঃ পূর্বের দু'আর মতই।

৭। যে সকাল সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করবে তার একটা গোলাম আযাদ করার ছওয়াব হবে, দশটা নেকী লেখা হবে, দশটা পাপ মোচন হবে এবং দশটা দরজা বুলন্দ হবে–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ۔ (مشکوة عن ابی داؤد)

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক– তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা আর তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

৮। সকাল সন্ধ্যায় কেউ সাইয়েদুল এস্তেগফার পাঠ করলে ঐ দিন বা রাত্রে যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে সে জান্নাতে যাবে। সাইয়েদুল এস্তেগফারটি এই–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ۔ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ (مشکوة ج/١ نقلا عن البخاری)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা। আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপর (অর্থাৎ, তোমার আদেশ-নিষেধের উপর) অটল রয়েছি। আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আমি তোমার কাছে পানাহ

চাই। আমি তোমার কাছে আমার প্রতি প্রদত্ত তোমার নেয়ামত সমূহের কথা স্বীকার করছি এবং আমার পাপ স্বীকার করছি। অতএব, আমাকে মাফ করে দাও। তুমি ছাড়াতো আর কেউ ক্ষমা দানকারী নেই।

৯। যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াছীন পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে স্বস্তিতে থাকবে আর সন্ধ্যায় পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত সুখে স্বস্তিতে থাকবে। (معارف القرآن نقلا عن المظهرى) সূরা ইয়াছীন পাঠের আরও বহু ফজীলত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল একবার সূরা ইয়াসীন পাঠ করলে দশ খতম কুরআনের ছওয়াব পাওয়া যায়।

১০। যে ব্যক্তি প্রতিদিন রাত্রে সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করবে, সে অনাহারে থাকবে না।

১১। আরবী মাসের ২৯ তারিখ হলে সন্ধ্যায় পরবর্তী মাসের চাঁদ তালাশ করা কর্তব্য। কেননা আরবী মাসের হিসাব রাখা মুসলমানদের দায়িত্ব। নতুন চাঁদ দেখলে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, এই চাঁদকে আমার উপর বরকত, ঈমান, শান্তি, নিরাপত্তা ও ইসলাম তথা ধর্মীয় কার্যাবলীর সুযোগ হিসেবে উদিত করে রাখ। হে চাঁদ, আমার ও তোমার প্রতিপালক হলেন আল্লাহ।

১২। সন্ধ্যার সময় বাচ্চা ও শিশুদেরকে ঘরে নিয়ে যাবে–বাইরে রাখবে না। কেননা এ সময় দুষ্ট জিনেরা চলা ফেরা করে।

১৩। সূর্যোদয়ের সময় পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَقَالَنَا يَوْمَنَا هٰذَا وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوْبِنَا

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আজ আমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং পাপের কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করেননি।

১৪। মাগরিবের আযান হওয়ার সময় পড়বে–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْلِىْ .

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, এটা তোমার রাতের আগমন ও দিনের বিদায় গ্রহণের সময় এবং তোমার পক্ষ থেকে আহবান কারীদের আহবান ধ্বনিত হচ্ছে। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

প্রত্যেক ফরয নামাযের পরের বিশেষ কয়েকটি আমল ঃ

* প্রত্যেক ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর – اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ –اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ (এভাবে তিনবার) পড়া সুন্নাত।

* প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার সোবহানাল্লাহ,৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়লে তার বহু ফজীলত রয়েছে। সুন্নাত শেষ করে এগুলো পড়লেও চলবে। ১০০ বার উপরোক্ত তাসবীহ পড়ার পর নিম্নোক্ত দুআটি পড়ে নিলে আরও উত্তম।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থ ঃ ২৯২ পৃষ্ঠা দ্রঃ।

* নবী (সঃ) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর যে সব দুআ (মুনাজাত) পড়তেন তার কয়েকটি নিম্নে পেশ করা হল।

(১) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি শান্তিময় এবং তোমার পক্ষ থেকে শান্তি প্রদত্ত হয়। তুমি মহান হে মহিমাময়, মহানুভব!

(২) اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সাহায্য কর তোমার যিকির করা, তোমার শোকর আদায় করা ও উত্তম ভাবে তোমার ইবাদত করার জন্য।

(৩) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে পানাহ চাই কাপুরুষতা হতে, তোমার কাছে পানাহ চাই হীন বয়সে উপনীত হওয়া থেকে, তোমার কাছে পানাহ চাই দুনিয়ার ফেতনা থেকে এবং তোমার কাছে পানাহ চাই কবরের আযাব থেকে।

(৪) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে পানাহ চাই কুফ্‌রী থেকে, অভাব-অনটন থেকে এবং কবরের আযাব থেকে।

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّى الْهَمَّ (৫)
وَالْحُزْنَ

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি অত্যন্ত দয়ালু, করুণাময়। হে আল্লাহ, তুমি আমার দুঃশ্চিন্তা ও দুঃখ দূরীভূত করে দাও।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِىْ اٰخِرَهٗ وَخَيْرَ عَمَلِىْ خَوَاتِمَهٗ وَاجْعَلْ خَيْرَ (৬)
اَيَّامِىْ يَوْمَ اَلْقَاكَ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি বানাও আমার জীবনের শেষ অংশকে শ্রেষ্ঠ অংশ, আমার শেষ আমলকে শ্রেষ্ঠ আমল এবং সেই দিনকে আমার শ্রেষ্ঠ দিন, যেদিন তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে।

* নাছায়ী শরীফের হাদীসে আছে, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরছী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোন অন্তরায় থাকে না অর্থাৎ, মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের ফলাফল ও আয়েশ ভোগ করতে শুরু করবে। আয়াতুল কুরছী হল তৃতীয় পারার শুরুতে اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ থেকে শুরু করে وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ পর্যন্ত।

আইয়্যামে বীযের আমল (রোযা) ঃ

'আইয়্যামে বীয' অর্থ উজ্জ্বল রাতের দিনগুলো। চান্দ্র মাসের ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ তারিখকে আইয়্যামে বীয বলা হয়।

* নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনটা নফল রোযা রাখে, সে সারা বৎসর নফল রোযা রাখার ছওয়াব পায়। অন্য এক হাদীসে নবী (সঃ) হযরত আবূ যর (রাঃ) কে বলেছিলেন প্রতি মাসে তিন দিন নফল রোযা রাখতে চাইলে আইয়্যামে বীযের তিন দিন রাখবে। (مشكوة ج/١) অন্য রিওয়ায়াত থেকে বোঝা যায় আইয়্যামে বীয ব্যতীত অন্য যে কোন তিন দিন নফল রোযা রাখলেও ঐ ফজীলত হাছিল হয়ে যাবে।

* নফল রোযার নিয়ত ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ২১৯ পৃষ্ঠা।

আশূরা উপলক্ষে করণীয় আমল সমূহ ঃ

মুহাররম মাসের ১০ম তারিখকে 'আশুরা' বলা হয়। আশুরা উপলক্ষে সর্বমোট ৪টি আমল করার রয়েছে।

১। ১০ই মুহাররম তারিখে নফল রোযা রাখা মোস্তাহাব। এর দ্বারা পিছনের এক বৎসরের গোনাহ মাফ হয়। এই রোযা রাখলে ১০ তারিখের সাথে ৯ তারিখ বা ১১ তারিখ মিলিয়ে মোট ২টি রোযা রাখবে। ৯ বা ১১ তারিখ বাদে শুধু ১০ই মুহররমের রোযা রাখা (অর্থাৎ, শুধু ১টা রোযা রাখা) মাকরূহ তানযীহী।
(فتاوی محمودیة ج/ ۳)

২। আশুরায় পরিবার পরিজনকে উত্তম পানাহারের ব্যবস্থা করলে আল্লাহ তা'আলা সারা বৎসর উত্তম পানাহারের ব্যবস্থা করে দিবেন বলে হাদীসে উল্লেখ এসেছে, হাদীসটি আমল যোগ্য (حسن لغیرہ) পর্যায়ের। তবে বাড়াবাড়ি ও রছমে পরিণত করা ঠিক নয়। (ماثبت بالسنة واحسن الفتاوى ج/ ١)

৩। আশুরার দিনে আল্লাহ তা'আলা ফেরআউনের বাহিনীকে সমুদ্রে ডুবিয়ে এবং বানী ইসরাঈলকে তাঁর কুদরতে সমুদ্র পার হওয়ার তাওফীক দিয়ে একটা বড় নিয়ামত দান করেছিলেন। প্রকারান্তরে এটা আমাদের জন্যেও নিয়ামত। তাই এই নিয়ামতের কথা স্মরণ করে আল্লাহর শুকর আদায় করা যায়। এই দিনে আল্লাহ তা'আলা আরও বহু কিছু ঘটিয়েছেন, বহু কিছু পয়দা করেছেন বলে যে সব বর্ণনা পাওয়া যায় তার অধিকাংশই ভিত্তিহীন বা মাউযূ'। (দেখুন ماثبت بالسنة)

৪। এই দিনে কারবালায় হযরত হুসাইন (রাঃ) মর্মান্তিক ভাবে শাহাদাত বরণ করেছিলেন–এই দুঃখ ও মুছীবতের কথা স্মরণ হলে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন পড়া যায়।

* উল্লেখ্য, এই আশুরার দিনে উপরোক্ত ৪টি আমল ব্যতীত আর যা কিছু করা হয়ে থাকে যেমন খিচুড়ি বন্টন, শরবত পান করানো, তাযিয়া বের করা, বুক চাপড়ানো,হায় হোসেন বলে মাতম করা, শোক মিছিল করা ইত্যাদি– এগুলো ভিত্তিহীন– রছম ও বিদআত, এগুলো গোনাহের কাজ, এগুলো পরিত্যাজ্য।

শবে বরাত– এর আমলসমূহ ঃ

'বরাত' শব্দের অর্থ মুক্তি এবং 'শব' -এর অর্থ রাত। অতএব 'শবে বরাত'-এর অর্থ মুক্তির রাত। এই রাতে আল্লাহ তা'আলা অভাব-অনটন, রোগ-শোক ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি চাওয়ার জন্য মানুষকে আহ্বান জানান এবং তাঁর নিকট চাইলে তিনি এসব থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন, তাই এ রাতকে শবে বরাত বা মুক্তির রাত বলা হয়। শাবান মাসের ১৫ই রাত অর্থাৎ, ১৪ই শাবান দিবাগত রাতই হল এই শবে বরাত। হাদীস শরীফের আলোকে এবং ফেকাহর কিতাবে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী শবে বরাত উপলক্ষে ৬টি আমলের কথা প্রমাণিত হয় ঃ

১। ১৪ই শাবান দিবাগত রাতে জাগরণ করে নফল ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার ও তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকা। এ রাতে যে কোন নফল নামায পড়ুন, যে কোন সূরা দিয়ে পড়তে পারেন– কোন নির্দিষ্ট সূরা দিয়ে পড়া জরুরী নয়। যত রাকআত ইচ্ছা পড়তে পারেন। আরও মনে রাখবেন নফল নামায ঘরে পড়াই উত্তম। একান্ত যদি ঘরে নামায পড়ার পরিবেশ না থাকে তাহলে মসজিদে পড়তে পারেন। বর্তমানে শবে বরাত ও শবে কদর উপলক্ষে ইবাদত করার জন্য মসজিদে ভীড় করার একটা রছম হয়ে গিয়েছে– এর ভিত্তিতে কোন কোন মুফতী শবে বরাত ও শবে কদরে ইবাদত করার জন্য মসজিদে একত্রিত হওয়াকে মাকরূহ ও বিদআত বলে ফতুয়া দিয়েছেন। (দেখুন (فتاوی محمودیہ ج ۱) তাই যথা সম্ভব ঘরেই ইবাদত করা উত্তম হবে।

২। এ রাতে বেশী বেশী দুআ করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা সূর্যাস্তের পর থেকে সোবহে সাদেক পর্যন্ত দুনিয়ার আসমানে এসে মানুষকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য, রিযিক চাওয়ার জন্য, রোগ-শোক, বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি ও বিভিন্ন মাকছূদ চাওয়ার জন্য আহবান করতে থাকেন, তদুপরি আর এক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এই রাতে মানুষের সারা বৎসরের হায়াত মওত ও রিযিক দৌলত ইত্যাদি লেখা হয়ে থাকে। অতএব এ রাতে আল্লাহর কাছে বেশী বেশী করে দুআ করা চাই।

৩। হাদীস শরীফে আছে, এই রাতে নবী (সঃ) কবরস্থানে গিয়েছিলেন এবং মৃত মুসলমানদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করেছিলেন, তাই এই রাতে কবর যিয়ারতে যাওয়া যায়। তবে নবী (সঃ) কবরস্থানে একাকী গিয়েছিলেন– কাউকে সাথে নিয়ে আড়ম্বর সহকারে যাননি। তাই এ রাতে দলবল নিয়ে সমারোহ না করে আড়ম্বরের সাথে না করে নীরবে কবর যিয়ারতেও যাওয়া যায়।

৪। নবী (সঃ) মৃত মুসলমানদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করেছিলেন। এটা ঈছালে ছওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। তাই এ রাতে মৃতদের জন্য দূআ করা ছাড়াও অন্যান্য পদ্ধতিতেও ঈছালে ছওয়াব করার অবকাশ রয়েছে। যেমন কিছু দান খয়রাত করে বা কিছু নফল ইবাদত-বন্দেগী করে তার ছওয়াব মৃতদেরকে বখশে দেয়া। এরূপ করাও উত্তম হবে।

৫। পরের দিন অর্থাৎ, ১৫ই শাবান নফল রোযা রাখা উত্তম।

৬। শবে বরাতে (১৪ই শাবান দিবাগত রাতে) গোসল করাও মোস্তাহাব।

(بہشتی گوہر نقلا عن ردالمحتار ج ۱)

* উপরোল্লিখিত ৬টি বিষয় ব্যতীত শবে বরাত উপলক্ষ্যে আর বিশেষ কোন আমল কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। শবে বরাত উপলক্ষ্যে হালুয়া রুটি

তৈরি করা, মোমবাতি জ্বালানো, আতশবাজী ও পটকা ফোটানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ। এগুলো রছম, বিদআত ও গোনাহের কাজ।
(শবে বরাত-এর উপরোক্ত আমল সমূহ সম্পর্কিত হাদীসগুলো ما ثبت بالسنة গ্রন্থে ابن ماجه ও بيهقى প্রভৃতি এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।)

শবে কদর এর ফজীলত ও করণীয় ঃ

'শবে কদর' কথাটি ফারসী। এর আরবী হল 'লাইলাতুল কদর'। শব ও লাইলাত শব্দের অর্থ রাত। আর কদর শব্দের অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। এ রাতের মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণেই একে শবে কদর বা লাইলাতুল কদর বলা হয়। কিম্বা কদর শব্দের অর্থ তাকদীর ও আদেশ। এ রাতে যেহেতু পরবর্তী এক বৎসরের হায়াত, মওত, রিযিক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের তাকদীর লেখা হয় (অর্থাৎ,লওহে মাহফূজ থেকে তা নকল করে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের কাছে সোর্পদ করা হয়) তাই এ রাতকে শবে কদর বা লাইলাতুল কদর বলা হয়।

* লাইলাতুল কদর -এর ইবাদত হাজার মাস ইবাদত করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। (আল-কুরআন)

* রমজান মাসের শেষ দশকের মধ্যে যে কোন বেজোড় রাতে শবে কদর হতে পারে, যেমন ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের রাত। ২৭শে রাতের কথা বিশেষভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

* শবে কদরে নফল নামায, তিলাওয়াত, যিকির ইত্যাদি যে কোন ইবাদত করা যায়। কত রাকআত নফল বা কি কি সূরা দিয়ে পড়তে হবে তা নির্দিষ্ট নেই- যত রাকআত ইচ্ছা, যে সূরা দিয়ে ইচ্ছা পড়া যায়। শবে কদরের নামাযের বিশেষ কোন নিয়ত নেই- ইশার পর সোবহে সাদেক পর্যন্ত যে নফল পড়া হয় তাকে তাহাজ্জুদ বলে, তাই নফল বা তাহাজ্জুদের নিয়তে নামায পড়লে চলে।

* নফল নামায যেহেতু ঘরে পড়া উত্তম, তাই এ রাতেও ঘরে থেকে নামায পড়লে উত্তম হবে। একান্তই ঘরে নামাযের পরিবেশ না থাকলে তিনি মসজিদে গিয়ে পড়বেন। তবে বর্তমানে শবে বরাত ও শবে কদরে ইবাদত করার জন্য মসজিদে ভীড় করার একটা রছম হয়ে গিয়েছে। এর ভিত্তিতে কোন কোন মুফতী শবে কদর ও শবে বরাতে ইবাদত করার জন্য মসজিদে একত্রিত হওয়াকে মাকরূহ ও বিদআত বলে ফতুয়া দিয়েছেন। (দেখুন فتاوى محمودية ج /١) তাই যথা সম্ভব রছম এড়িয়ে ঘরে ইবাদত করাই উত্তম হবে।

* শবে কদরে বিশেষভাবে দুআ কবূল হয়ে থাকে, তাই এ রাতে বেশী বেশী দুআ করা চাই।

* রাসুল (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে শবে কদরে বিশেষভাবে এই দুআ পড়তে শিক্ষা দেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি তো অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা করতে ভালবাস; অতএব আমাকে ক্ষমা করে দাও।

* যে ব্যক্তি শবে কদর চিনতে পারবে তার জন্য শবে কদরে গোসল করা মোস্তাহাব। (بہشتی گوہر بحوالہ در مختار)

দুই ঈদের রাত ঃ

* হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাত্রে জাগরিত থেকে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকবে, তাহলে যে দিন অন্যান্য দেল মরে যাবে সেদিন তার দেল মরবে না অর্থাৎ, কিয়ামতের দিনের আতংকের কারণে অন্যান্য লোকের অন্তর ঘাবড়ে গিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে যাবে, কিন্তু দুই ঈদের রাত্রে জাগরণকারীর অন্তর তখন ঠিক থাকবে– ঘাবড়াবেনা।

(বেহেশতী জেওর -তাবরাণী)

৯ই জিলহজ্জ থেকে ১৩ই জিলহজ্জ পর্যন্ত তাকবীরে তাশরীকের বিধান ঃ

* ৯ই জিলহজ্জের ফজর থেকে ১৩ই জিলহজ্জের আসর নামায পর্যন্ত সর্বমোট ২৩ ওয়াক্তে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব। জামাআতে নামায হোক বা একাকী সর্বাবস্থায় বলতে হবে। পুরুষ হোক বা নারী সকলকে বলতে হবে।

* তাকবীরে তাশরীক এই–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

* এই তাকবীর জোর আওয়াজে বলা ওয়াজিব। তবে মহিলাগণ আস্তে বলবে।

* নামাযের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে এই তাকবীর বলতে হবে। ইমাম বলতে ভুলে গেলে মুক্তাদীগণ সাথে সাথে বলবে– ইমামের বলার অপেক্ষা করবে না।

* ঈদুল আযহার নামাযের পরও এই তাকবীর বলা কারও কারও নিকট ওয়াজিব।

* তাকবীরে তাশরীক একবার বলা ওয়াজিব। তিনবার বলা সুন্নাত নয়। তিনবার বলা সুন্নাতের মত অনুযায়ী ফতুয়া দেয়া হয় না। (فتاوی رحیمیہ ج ۳/)

ঈদের দিনগুলো ঃ

* ঈদুল ফিতরের দিন ঈদুল আযহার দিন এবং ঈদুল আযহার পরের তিন দিন সর্বমোট এই ৫দিন যে কোন প্রকারের রোযা রাখা হারাম।

* উপরোক্ত ৫দিন পানাহারের মধ্যে কিছু অতিরিক্ত জাঁকজমক করার অবকাশ রয়েছে এবং তা শরীয়তের কাম্য।

* ঈদুল ফিতরের দিন ১৩টা জিনিস সুন্নাত।

(১) ভোরে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা।

(২) মেসওয়াক করা।

(৩) গোসল করা।

(৪) যথা সাধ্য উত্তম পোশাক পরিধান করা।

(৫) শরীয়ত সম্মতভাবে সাজ-সজ্জা করা।

(৬) খুশবু লাগানো।

(৭) ঈদগাহ যাওয়ার পূর্বে কোন মিষ্ট দ্রব্য খেয়ে যাওয়া।

(৮) আগে ঈদগাহ যাওয়া।

(৯) ঈদগাহ যাওয়ার পূর্বে সদকায়ে ফিতির (ফেতরা) না দিয়ে থাকলে দিয়ে যাওয়া।

(১০) ঈদগাহ যেয়ে ঈদের নামায পড়া। বিনা ওযরে মসজিদে না পড়া।

(১১) পায়ে হেটে ঈদগাহ যাওয়া।

(১২) যাওয়ার সময় এই তাকবীর আস্তে আস্তে পড়তে পড়তে যাওয়া–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

(১৩) এক রাস্তায় যাওয়া, অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন।

* ঈদুল আযহার দিনও উপরোক্ত বিষয়গুলো সুন্নাত। পার্থক্য হল (১) ঈদুল আযহায় ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু না খাওয়া সুন্নাত। (২) ঈদুল আযহায় ঈদগাহে যাওয়ার সময় উপরোক্ত তাকবীর আস্তে আস্তে নয় বরং জোরে বলা সুন্নাত। (৩) ঈদুল ফিতরের তুলনায় ঈদুল আযহার নামায সকাল সকাল পড়া সুন্নাত। (৪) ঈদুল আযহায় ফিতরা-র বিধান নেই বরং এখানে নামাযের পর কুরবানী রয়েছে।

* যেখানে ঈদের নামায পড়া হবে সেখানে ঐ দিন অন্য কোন নফল নামায পড়া মাকরূহ, চাই ঈদের নামাযের পূর্বে হোক বা পরে। আর ঈদের নামাযের পূর্বে ঘরেও কোন নফল নামায পড়া মাকরূহ। হাঁ ঈদের নামাযের পরে ঘরে নফল নামায পড়া যায়– মাকরূহ হবে না।

১লা এপ্রিলে এপ্রিল ফুল পালন করা ঃ

* এপ্রিল ফুল পালন করার মধ্যে যেহেতু মিথ্যা ও ধোঁকার আশ্রয় নেয়া হয়, তাই তা হারাম ও গোনাহে কবীরা। কেননা ধোঁকা দেয়া ও মিথ্যা বলা হারাম-গোনাহে কবীরা। (فتاوى رحيميه ج ١)

শাওয়ালের ছয় রোযা ঃ

* শাওয়াল মাসে (১লা শাওয়াল-ঈদুল ফিতরের দিন বাদে) ছয়টা নফল রোযা রাখলে এক বৎসর নফল রোযার ছওয়াব পাওয়া যায়। সাধারণ্যে এটাকে ছয় রোযা বলা হয়।

* ছয় রোযা একাধারে রাখা যায় আবার মধ্যে মধ্যে বিরতি দিয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গেও রাখা যায়। এটাই উত্তম। (الدر المختار)

৯ই জিলহজ্জের রোযা ঃ

* জিলহজ্জ মাসের নবম তারিখ (আরাফার দিন) রোযা রাখার অনেক ফজীলত রয়েছে। এর দ্বারা পিছনের এক বৎসর এবং সামনের এক বৎসর-এর গোনাহ মাফ হয়ে যায়।

* কেউ যদি জিলহজ্জ মাসের শুরু থেকে একাধারে নয়টা রোযা রাখে তাহলে তা অনেক উত্তম। (بہشتی زیور بحوالہ عالمگیری ج/١)

শবে মেরাজ ঃ

সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ আছে যে, রজব মাসের ২৭শে রাত্রে রাসূল (সঃ) মেরাজে গিয়েছিলেন। যদিও কোন্ মাসে এবং কোন্ তারিখে মেরাজ হয়েছিল তা নিয়ে বিজ্ঞ মুহাদ্দিসদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। যাহোক রজব মাসের ২৭ তারিখে মেরাজ মেনে নিলেও এ রাত্রটাকে একটি বিশেষ বরকতময় রাত্র বলা যায় মাত্র, কিন্তু এ রাতে নফল ইবাদত করলে বিশেষ অতিরিক্ত ছওয়াব পাওয়া যাবে বা পরবর্তী দিন নফল রোযা রাখলে বিশেষ ফজীলত পাওয়া যাবে– এরূপ মনে করা ঠিক নয়। এ সম্পর্কে যে সব রেওয়ায়েত ও বর্ণনা পাওয়া যায় তা সহীহ নয়। (দেখুন ماثبت بالسنة) অতএব এ রাতকে উৎসবের রাত বা এ দিনের

রোযা রাখাকে জরুরী মনে করা যাবে না। কেউ যদি বিশেষ ছওয়াবের বিশ্বাস না রেখে এবং জরুরী মনে না করে এ রাতে ইবাদত করে বা পরের দিন রোযা রাখে, তার অবকাশ রয়েছে।

১২ই রবিউল আউয়াল ঃ

১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (সঃ)-এর জন্ম দিবস হিসেবে পরিচিত। তাই এ দিনে কেউ কেউ ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করেন। আবার কেউ কেউ জশ্‌নে জুলূসে ঈদে মিলাদুন্নবী করেন বা বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে এই দিনে রাসূল (সঃ)-এর জন্ম বার্ষিকী পালন করেন। 'ঈদে মিলাদুন্নবী' অর্থ নবীর জন্ম উপলক্ষে খুশি বা নবীর জন্ম দিবসের উৎসব। আর 'জশ্‌নে জুলূসে ঈদে মিলাদুন্নবী' অর্থ নবীর জন্ম উৎসব উপলক্ষে বর্ণাঢ্য মিছিল। ১২ই রবিউল আউয়ালে রাসূল (সঃ)-এর জন্ম বার্ষিকী পালন এবং এসব উৎসব ও অনুষ্ঠান করা হবে কিনা এ ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় সামনে রাখা যেতে পারে।

১। ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (সঃ)-এর জন্ম তারিখ কি না বিষয়টি বিতর্কিত বরং অধিকাংশ মুহাক্কিক আলেমের মতে রাসূল (সঃ)-এর জন্ম তারিখ হল ৮ই রবিউল আউয়াল। অতএব মুহাক্কিক উলামায়ে কিরাম এর মত অনুসারে ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (সঃ)-এর জন্ম দিবসের উৎসব করা হলে তা হবে বাস্তবতা বিরোধী এবং অসঙ্গত।

২। ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (সঃ) এর জন্ম তারিখ কি না তা নিয়ে মত বিরোধ থাকলেও এ তারিখটি যে রাসূল (সঃ)-এর ওফাতের তারিখ তা নিয়ে কোন মতবিরোধ নেই। অতএব যে তারিখটি রাসূল (সঃ)-এর ওফাতের নিশ্চিত তারিখ, সে তারিখ মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বেদনা বহ স্মৃতি বিজড়িত তারিখ হতে পারে– উৎসবের নয়। তাহলে এদিনে উৎসব করাও অসঙ্গত হবে বৈকি ?

৩। যদি মেনেও নেয়া হয় যে, ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল(সঃ)-এর জন্ম তারিখ, তবুও ইসলামে জন্ম দিবস বা মৃত্যু দিবস; জন্ম বার্ষিকী বা মৃত্যু বার্ষিকী পালনের কোন নীতি রাখা হয়নি– এগুলো মানুষের সৃষ্ট রছম। স্বয়ং সাহাবায়ে কিরামও রাসূল (সঃ)-এর জন্ম বার্ষিকী, তাঁর মৃত্যু বার্ষিকী পালন করেননি। যদি তাঁরা পালন করতেন তাহলে রাসূল (সঃ)-এর জন্ম তারিখ নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ হওয়ার কোন অবকাশই ছিল না।

৪। রাসূল (সঃ)-এর সীরাত মোবারক নিয়ে আলোচনা করা এবং এরূপ আলোচনার মজলিস অত্যন্ত বরকতময়। রাসূল (সঃ)-এর প্রতি মহব্বত এবং

যওক শওক নিয়ে এরূপ আলোচনা করা ও তাতে শরীক হওয়া রাসূল প্রেমের এক অপরিহার্য দাবী। অতএব ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে এরূপ মজলিস না করে অন্য যে কোন দিন ও যে কোন মাসে করা হলে একদিকে যেমন রহমত ও বরকত লাভ করা যাবে, অপরদিকে অসঙ্গতি ও রছমের অনুসরণ থেকেও নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

৫। রাসূল (সঃ)-এর সীরাত সারা বৎসর আলোচনার বিষয়, কুরআন সুন্নায় বর্ণিত সমুদয় আদর্শইতো রাসূলের সীরাত। এতএব সারা বৎসরই রাসূল (সঃ)-এর সীরাত নিয়ে আলোচনার মজলিস হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুধু রবিউল আউয়াল মাসেই এরূপ মজলিস মাহফিল করা হয় অন্য মাসে করা হয় না– এটাও এক রছম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ রছমও ভেঙ্গে দিয়ে সারা বৎসরের সব সময় সীরাত নিয়ে আলোচনার মোবারক মাহফিলের ব্যবস্থা করতে হবে।

ফাতেহা ইয়াযদহম ঃ

'ফাতেহা' বলতে বুঝানো হয় কোন মৃতের জন্য দুআ করা, ঈছালে ছওয়াব করা। 'ইয়াযদহম' ফার্সী শব্দটির অর্থ একাদশ। ৫৬১ হিজরী মোতাবেক ১১৮২ খৃষ্টাব্দের ১১ই রবিউস্‌সানী তারিখে বড়পীর শায়খ আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে রবিউস্‌সানীর ১১ই তারিখে যে মৃত্যু বার্ষিকী পালন, উরস ও ফাতেহা খানী করা হয় তাকে বলা হয় ফাতেহা ইয়াযদহম।

পূর্বের পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইসলামে জন্ম বার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী পালনের কোন নিয়ম রাখা হয়নি। রাসূল (সঃ), সাহাবা ও তাবিয়ীনদের যুগে তথা আদর্শ যুগে জন্ম বার্ষিকী, মৃত্যু বার্ষিকী, উরস ইত্যাদি পালন করা হত না। এগুলো পরবর্তীতে সৃষ্টি হয়েছে। অতএব ইসলামের নামে এসব অনুষ্ঠান একটা রছম ও বিদআত। তাই ফাতেহা ইয়াযদহম নামে শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর মৃত্যু বার্ষিকী পালন ও উরস করা শরীয়ত সমর্থিত অনুষ্ঠান নয়। তবে তিনি অনেক উঁচু দরের অলী ও বুযুর্গ ছিলেন, তাই এই নির্দিষ্ট তারিখের অনুসরণ না করে অন্য যে কোন দিন তাঁর জন্য দুআ করলে এবং জায়েয তরীকায় তাঁর জন্য ইছালে ছওয়াব করলে তাঁর রূহানী ফয়েয ও বরকত লাভের ওছীলা হবে এবং তা ছওয়াবের কাজ হবে।

আখেরী চাহার শোমবাহ ঃ

'আখেরী চাহার শোমবাহ' কথাটি ফার্সী। এর অর্থ শেষ বুধবার। সাধারণ পরিভাষায় আখেরী চাহার শোমবাহ বলে সফর মাসের শেষ বুধবারকে বোঝানো

হয়ে থাকে। বলা হয়– রাসূল (সঃ) যে অসুস্থতার মধ্যে রবিউল আউয়াল মাসের শুরু ভাগে ইন্তেকাল করেন সে অসুস্থতা থেকে ছফর মাসের শেষ বুধবারে অর্থাৎ, আখেরী চাহার শোমবায় কিছুটা সুস্থতা বোধ করেছিলেন, তাই এ দিবসটিকে খুশির দিন হিসেবে উদযাপন করা হয়। অথচ এ তথ্য সহীহ নয় বরং সহীহ ও বিশুদ্ধ তথ্য হল এ বুধবারেই তাঁর অসুস্থতা বেড়ে যায়। কাজেই যে দিন রাসূল (সঃ) এর অসুস্থতা বেড়ে যায় সেদিন ইহুদী প্রমুখদের জন্য খুশির দিন হতে পারে– মুসলমানদের জন্য নয়। অতএব ছফর মাসের শেষ বুধবার অর্থাৎ, আখেরী চাহার শোমবাহ-কে খুশির দিন হিসেবে উদযাপন করা এবং এ হিসেবে ঐ দিন ছুটি পালন করা জায়েয হবে না। (فتاوى رحيميه ج/١)

মসজিদের অর্থ কড়ি, মসজিদ নির্মাণের পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের মাসায়েল

* হারাম উপায়ে অর্জিত অর্থ মসজিদের কাজে ব্যয় করা জায়েয নয়। হালাল অর্থ দ্বারাই মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। (فتاوى محمودية ج ١)

* অমুসলিমদের অর্থ মসজিদে গ্রহণ করা যায় দুইটি শর্তে। (১) তাদের ধর্মে যদি এরূপ কাজকে পূণ্যের মনে করা হয়ে থাকে। (২) অমুসলিমদের অর্থ গ্রহণ করলে যদি কোন ফেতনা ফাসাদের আশংকা না থাকে, যেমন পরবর্তীতে আবার তারা ফেরত নেয়ার দাবী করতে পারে বা এর জন্যে মুসলমানদের খোঁটা দিতে পারে-এরূপ আশংকা না থাকলে। (فتاوى محمودية ج/١)

* মসজিদের আকৃতি, ডিজাইন চিরাচরিত যেভাবে হয়ে আসছে সেভাবেই হওয়া জরুরী। এমন আকৃতি ও এমন ডিজাইনে মসজিদ নির্মাণ করা, যেটাকে সাধারণ লোক দূর থেকে দেখলে মসজিদ মনে করবে না, সেরূপ করা মাকরূহ ও গর্হিত। আর অমুসলিমদের উপসনালয়ের আকৃতি ও ডিজাইনে মসজিদ নির্মাণ করা সম্পূর্ণ হারাম। এরূপ আকৃতির মসজিদ ভেঙ্গে দেয়া বা তাতে সংযোজন সাধন করে মসজিদের চিরাচরিত রূপের সাথে সাদৃশ্য করে দেয়া ওয়াজিব।

(جواهر الفقه ج/١)

* নাম শোহরতের উদ্দেশ্যে পাথরে খোদাই করে মসজিদ নির্মাণকারীর নাম লাগানো দুরস্ত নয়। তবে যদি এই উদ্দেশ্যে লাগানো হয় যে, এটা দেখে নির্মাণকারীর কথা মানুষের স্মরণ হবে এবং তার জন্য দুআ করা হবে তাহলে তা জায়েয। (فتاوى محمودية ج/١)

* মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন রুম থাকলে তাতে যাওয়ার জন্য পৃথক রাস্তা রাখতে হবে। মসজিদকে রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা অনুচিত হবে। তবে এরূপ হয়ে গেলে ভিন্ন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে।

(فتاوى رحيمية ج/٦)

* মসজিদের ভিতরে কেবলার দিকের দেয়ালে নকশা ইত্যাদি করা মাকরূহ। ভিতরে অন্য দিকের দেয়ালে বা বাইরে করা যায়, যদি কেউ এই উদ্দেশ্যেই অর্থ দিয়ে থাকেন। সামনের দেয়ালেও নামাযের সময় মুসল্লীর নজরে আসে না– এ রকম উপরে করা যায়। (فتاوی محمودیة ج/٦ و احسن الفتاوی ج/٦)

* মসজিদের ইনকামের জন্যে মসজিদ কম্পাউণ্ডে মেছ বা ভাড়ার বাসা তৈরি করা যায়, যদি তাতে মসজিদের ভাব গাম্ভীর্য ও হৈ চৈ এর কারণে মসজিদের পরিবেশ নষ্ট হওয়ার আশংকা না থাকে।

* মসজিদের আয় উপার্জনের স্বার্থে অতিরিক্ত স্থানে দোকান ঘর তৈরি করে তা ভাড়া দেয়া জায়েয। তবে যে স্থানে একবার মসজিদ হয়েছে তা ভেঙ্গে সেখানে দোকান /ঘর তৈরি করা জায়েয নয়।

* মসজিদ কম্পাউণ্ডে ইমাম, মুয়াজ্জিন প্রমুখ স্টাফদের জন্য কক্ষ বা ফ্যামিলী কোয়ার্টার তৈরি করা জায়েয, যদি তাদের ছেলে মেয়েদের হৈ হুল্লোড়ে নামাযের ব্যাঘাত ঘটার আশংকা না হয়।

* বেতনভুক্ত মুদাররিছের জন্য মসজিদে (কুরআন/কিতাব-এর) তা'লীম দেয়া জায়েয নয়। তবে বাইরে কোন জায়গা না থাকলে নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে পড়ানো জায়েয। (১) মুদাররিছ বেতনের লোভের পরিবর্তে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় বেতন/ভাতা নেয়ার উপর ক্ষান্ত করবে। (২) উক্ত তা'লীম নামায, যিকির, তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদতের ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না। (৩) মসজিদের আদব ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। (৪) অবুঝ বাচ্চাদের মসজিদে আনবে না। (احسن الفتاوی ج/٦)

মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত মাসায়েল

* ওয়াক্‌ফের জন্য রেজিষ্ট্রেশন জরুরী নয়। (فتاوی محمودیة ج/٦)

* মসজিদের ব্যবস্থাপনার জন্য বেতন/ভাতার কথা ওয়াক্‌ফ নামায় উল্লেখ থাকলে এবং বিনা বেতন/ভাতায় শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে করার মত কোন লোক বা ট্রাস্টি বোর্ড না থাকলে ব্যবস্থাপনাকারীদের জন্য বেতন/ভাতা নির্ধারণ করার অনুমতি রয়েছে। (فتاوی رحیمیه ج/٦)

* মুতাওয়াল্লী/মসজিদ কমিটির দায়িত্ব ইমাম মুয়াজ্জিনদেরকে প্রয়োজন ও যোগ্যতা অনুসারে বেতন/ভাতা প্রদান করা। এ দায়িত্বে ত্রুটি করলে খোদার নিকট তাদেরকে জবাবদিহী করতে হবে। (فتاوی رحیمیه ج/٤)

* ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বদল করা জায়েয নয়। (احسن الفتاوی ج/٦)

* ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বিক্রয় করা জায়েয নয়। (فتاوى محموديه ج ٦) তবে সাময়িক প্রয়োজনে কোন আসবাব ক্রয় করে থাকলে প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর তা বিক্রয় করা জায়েয। (ايضا)

* মসজিদের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি প্রয়োজনে ভাড়া দেয়া বা জমি হলে তাতে চাষাবাদ করা জায়েয।

* এক ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি অন্য ওয়াক্‌ফে দান করা জায়েয নয়। তবে ওয়াক্‌ফনামায় উল্লেখ থাকলে জায়েয।

* ওয়াক্‌ফনামায় উল্লেখ থাকলে বা ওয়াক্‌ফ/দানকারীর অনুমতি থাকলে এবং এখানে প্রয়োজন না থাকলে এক ওয়াক্‌ফের অর্থ অন্য ওয়াকফে ঋণ দেয়া যায়।

* ওয়াকফ সম্পত্তির অর্থ স্কুল কলেজ প্রভৃতি দুনিয়াবী শিক্ষায় ব্যয় করা জায়েয নয়। (فتاوى رحيمية ج/ ٢)

* মসজিদের লোটা (বালতি ইত্যাদি) মসজিদের বাইরে ঘরে নিয়ে যাওয়া বা উযূ, ইস্তেঞ্জা, গোসল ব্যতীত ব্যক্তিগত অন্য কাজে ব্যবহার করা জায়েয নয়। (فتاوى محموديه ج/ ١٠)

* মুতাওয়াল্লী বা কমিটি মসজিদের টাকা পয়সা ইত্যাদি হক মাফ করার অধিকার রাখে না।

* ওয়াক্‌ফকারী/দানকারীর স্পষ্ট বর্ণনা বা অনুমতি ব্যতীত ওয়াক্‌ফ/দানকৃত সম্পদ থেকে মেহমানদেরকে আপ্যায়ন করা বৈধ নয়।

* ইতেকাফকারী ও এমন মুসাফির, যার কোন ঠিকানা নেই তারা মসজিদে শয়ন ও পানাহার করতে পারে। জরুরত হলে অন্যদের জন্যও শয়ন এবং পানাহার করা জায়েয। তবে মুসাফির ও অন্যরা (নফল) ইতেকাফের নিয়ত করে নিবে। (فتاوى رحيميه ج/ ٢ ؛ امداد الفتاوى)

* মসজিদে কেরোসিন তেল বা দুর্গন্ধযুক্ত কিছু জ্বালানো নিষেধ। এমনকি ম্যাচ জ্বালানোও নিষেধ।

* স্বাভাবিক নামাযের সময় ব্যতীত অন্য সময় বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মসজিদের পাখা চালানো উচিত নয়।

* মসজিদের কুরআন শরীফ বিক্রি করা জায়েয নয়। আবার তিলাওয়াত বিহীন ফেলে রাখাও ঠিক নয়। এজন্যে অতিরিক্ত কুরআন শরীফ মসজিদে রাখবে না। যদি দানকারীকে বলা হয় যে, এখানে কুরআন শরীফ দান করলে প্রয়োজনের অতিরিক্তগুলো বিক্রি করে দেয়া হবে, এরপরও সে দান করে, তাহলে সেরূপ অতিরিক্তগুলো বিক্রি করে দেয়া জায়েয হবে। (خير الفتاوى ج ١)

* মসজিদ অনাবাদ/বিরান হয়ে গেলেও কেয়ামত পর্যন্ত সে স্থান মসজিদের হুকুমে থাকবে এবং মসজিদের ন্যায় তার সম্মান ও আদব রক্ষা করা ওয়াজিব থাকবে।

বিঃদ্রঃ মসজিদের অন্যান্য সুন্নাত, আদব ও বিধি-নিষেধ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ১৩৬-১৩৯ পৃষ্ঠা।

মাদ্রাসা সম্পর্কিত নীতিমালা ও মাসায়েল

* মাদ্রাসার গঠণতন্ত্র রচিত হয়ে থাকলে সে অনুযায়ী মাদ্রাসা পরিচালনা করা জরুরী। অন্যথায় অন্যান্য মাদ্রাসা সমূহের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মাদ্রাসা চালানো হবে। (امداد الفتاوى ج ٣)

* মাদ্রাসা ওয়াক্ফ সম্পত্তি হলে ওয়াকফ সম্পত্তির মাসায়েল অনুযায়ী মাদ্রাসা পরিচালনা করতে হবে।

* মাদ্রাসার টাকা কর্জ দেয়া জায়েয নয়। মুহতামিম এরূপ করলে তিনি ফাসেক, তাকে পদচ্যুত করা ওয়াজিব এবং ঐ টাকার দায়-দায়িত্ব তার। (احسن الفتاوى ج ٦ فتاوى محمودية ج ١) মাদ্রাসার টাকা/পয়সা নিজের জন্য কর্জ নেয়াও জায়েয নয়। (امداد الفتاوى ج ٢)

* দানকারী/ওয়াক্ফকারীর স্পষ্ট বর্ণনা বা অনুমতি ব্যতীত মাদ্রাসার টাকা পয়সা দ্বারা মেহমানদেরকে আপ্যায়ন করানোর শরীয়তে অনুমতি নেই। মাদ্রাসার জলসা প্রভৃতিতে আপ্যায়নের ক্ষেত্রেও এই মাসআলা। আপ্যায়নের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য এই নামে স্বতন্ত্রভাবে কালেকশন করে নেয়া যেতে পারে।

(فتاوى رحيميه ج ٦ والعلم والعلماء)

* মুসাফিরখানার ন্যায় মাদ্রাসার বস্তু, মাদ্রাসার গোসলখানা প্রভৃতি ব্যবহার করা বৈধ নয়। যারা দুই এক দিনের জন্য মেহমান হিসেবে আসেন তারা ব্যবহার করতে পারেন। (فتاوى رحيميه)

* মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত স্থানে মাদ্রাসা বানানোর অনুমতি শরীয়তে নেই, তবে ওয়াক্ফকারী/দানকারীর নিয়ত থাকলে এবং তার অনুমতি থাকলে বানানো যায়। কিম্বা মসজিদের অর্থে ইমারত নির্মাণ করে মাদ্রাসার নিকট ভাড়া দেয়া যায়। (ايضا)

* মসজিদে অমুসলিমদের চাঁদা গ্রহণের যে শর্ত, মাদ্রাসায় অমুসলিদের চাঁদা গ্রহণের বেলায়ও সে শর্ত। দেখুন ২৮৯ পৃষ্ঠা। (العلم والعلماء)

* সরকার যদি প্রতিশ্রুতি দেন যে, আমরা সাহায্য করে কোনভাবে মাদ্রাসায় হস্তক্ষেপ করব না, তাহলে মাদ্রাসার জন্য সরকারী সাহায্য গ্রহণ করা জায়েয। (العلم والعلماء نقلا عن امداد الفتاوى ج ٤)

* যাকাতের অর্থ দ্বারা ইমারত নির্মাণ করা বা মুদাররিছদের বেতন/ভাতা প্রদান করা জায়েয নয়। নিতান্ত ঠেকাবশতঃ এ অর্থ দ্বারা বেতন/ভাতা দিতে হলে হীলা (حيلہ تمليك) করে নিতে হবে।

* সাধারণতঃ যে পদ্ধতিতে হীলা করা হয়ে থাকে যে, একজন গরীব ছাত্র বা কর্মচারীকে ডেকে বলা হয় যে, আমি তোমাকে কিছু যাকাতের টাকা প্রদান করছি, তুমি সেটা মাদ্রাসায় দান করে দিবে। সে বলে জী আচ্ছা। এরপর তাকে যাকাতের টাকা দেয়া হয় এবং সে তা মাদ্রাসায় দান করে দেয়। হযরত থানবী (রহঃ) বলেছেন এতে হীলা সহীহ হয় না, কেননা এভাবে সে নিজেকে উক্ত টাকার মালিকই মনে করে না, সে উক্ত টাকা রেখে দেয়ার অধিকারই বোধ করে না বরং সে উক্ত টাকা ফেরত দিতে নিজেকে বাধ্য মনে করে-নিজেকে স্বাধীন মনে করতে পারে না। তাহলে তাকে উক্ত টাকার মালিক বলা যায় না। আর মালিক না হলে হীলায়ে তামলীক হবে কি ছাই! হযরত থানবী (রহঃ) বলেছেনঃ হীলার একটা ছহীহ তরীকা এই হতে পারে যে, যাকাত পাওয়ার মত হকদার কাউকে বলা হবে ঃ তুমি কারও থেকে এত টাকা ঋণ নিয়ে মাদ্রাসায় দান কর, আমরা তোমার ঋণ পরিশোধের জন্য তোমাকে (যাকাতের) অর্থ প্রদান করব। তারপর সে ঋণ করে মাদ্রাসায় দান করলে মাদ্রাসার যাকাতের অর্থ থেকে তাকে উক্ত পরিমাণ প্রদান করা হবে এবং তা দ্বারা সে ঋণ পরিশোধ করবে। টাকা হাতে পেয়ে সে ঋণ পরিশোধ করতে না চাইলে তার থেকে জোর পূর্বকও ঋণদাতা নিয়ে নিতে পারবেন। (العلم والعلماء) এরূপ ঋণ দেয়ার জন্যও স্বতন্ত্র কিছু টাকা রাখা যেতে পারে।

* ওয়াক্‌ফকারী/ দানকারী নির্দিষ্টভাবে কোন মাদ্রাসার জন্য কুরআন/কিতাব ওয়াক্‌ফ/দান করে থাকলে তা স্থানান্তরিত করা জায়েয নয়। (احسن الفتاوى ج ٦)

* এক মাদ্রাসার মাল-সামান অন্য মাদ্রাসায় স্থানান্তরিত করা জায়েয নয়। (ايضا)

* মাদ্রাসার মুহতামিম/ কমিটির দায়িত্ব মুদাররিছদের যোগ্যতা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তাদেরকে বেতন/ভাতা প্রদান করা। এ দায়িত্বে ত্রুটি করলে খোদার নিটক তাদেরকে জবাবদিহী করতে হবে। (بضوء فتاوى رحيميه ج ٦/)

* মাদ্রাসার মুদাররিছ রমজান মাসে মাদ্রাসার কাজ না করলেও রমজানে যে বন্ধ থাকে তাতে সে বেতন/ভাতা পাবে, যদি শাবান মাসেই সে চাকুরীচ্যুত না হয়ে থাকে এবং শাওয়াল মাসে মাদ্রাসার কাজ করে। (امداد الفتاوی ج/ ۳)

* অসুস্থতা এবং ছুটি কাটানোর দিনগুলোতে বেতন পাবে কি না এ সম্পর্কে মাসআলা হলঃ যদি চাঁদা দাতাদের স্পষ্ট বিবরণ বা লক্ষণ থেকে এ ব্যাপারে সম্মতি বুঝা যায়, তাহলে চাঁদার অর্থ থেকে উক্ত দিনগুলোর বেতন দেয়া জায়েয। অন্যথায় জায়েয নয়। চাঁদা দাতাগণ যদি মুহতামিমকে কিছু অধিকার দিয়ে থাকেন (স্পষ্টভাবে হোক বা হাবভাবে) এবং সে অধিকার বলে তিনি এরূপ মুহূর্তের বেতন/ভাতার ব্যাপারে কিছু শর্ত আরোপ করেন, তাহলে সেই শর্ত অনুযায়ী এরূপ মুহূর্তের বেতন/ভাতা গ্রহণ করা জায়েয। যদি স্পষ্ট সম্মতি না পাওয়া যায় কিম্বা যদি শর্ত নিরূপিত না হয়ে থাকে কিন্তু মাদ্রাসার নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ ও সুবিদিত থাকে, তাহলে সে নিয়মাবলী অনুযায়ী কাজ হবে। আর যদি স্পষ্ট সম্মতি বা নিয়মাবলী রচিত ও সুবিদিত না থাকে তাহলে অন্যান্য মাদ্রাসার সুবিদিত নিয়মাবলীর অনুসরণ করা হবে। আর যদি এই আমদানী কোন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির থেকে হয়ে থাকে তাহলে তার হুকুম ভিন্ন। (امداد الفتاوی ج/ ۳)

* মাদ্রাসার মুদাররিছ বিশেষ কর্মচারী (اجیر خاص) অতএব চাকুরীজীবিদের প্রসঙ্গে এবং শ্রমনীতি সম্পর্কে যে সব মাসায়েল বর্ণনা করা হয়েছে, মুদাররিছদের বেলায়ও সেগুলো প্রযোজ্য হবে। (দেখুন পৃষ্ঠা ৩২০ ও পৃষ্ঠা ৩৩২)

মসজিদ মাদ্রাসা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ধর্মীয় কাজের জন্য চাঁদা কালেকশনের মাসায়েল

* কমিশনের ভিত্তিতে চাঁদা কালেকশন করা বা করানো জায়েয নয়।

(احسن الفتاوی ج/ ٦-- فتاوی محمودیۃ ج/ ۱ اور العلم والعلماء)

* লোকজনের সামনে নির্দিষ্ট করে সম্বোধনপূর্বক কারও নিকট চাঁদা চাওয়া হলে বাহ্যতঃ সে চাপের মুখে বা লজ্জায় পড়ে দিয়ে থাকে-স্বেচ্ছায় খুশি মনে দেয় না। আর খুশি মনে না হলে কারও নিকট থেকে চাঁদা নেয়া জায়েয নয়।

(احسن الفتاوی ج/ ٦)

* চাঁদা চাওয়ার সহীহ তরীকা হল-নির্দিষ্টভাবে সম্বোধন করা ব্যতীত সাধারণভাবে উৎসাহিত করা হবে; এতে যে দিবে তার থেকেই নেয়া হবে।

(ایضا)

* হারাম মাল বা টাকা/পয়সা চাঁদায় গ্রহণ করা যাবে না।

* চাঁদা উসূল করার একটা শর্ত হল নিজেকে অপমাণিত হতে হয় এমন পন্থায় চাঁদা উসূল করা যাবে না। অপমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেরূপ পন্থায় চাঁদা করা জায়েয নয়। (العلم والعلماء)

* চাঁদা প্রদানের জন্য উৎসাহিত করা জায়েয কিন্তু চাপ সৃষ্টি করা এবং নাছোড় হয়ে চাওয়া জায়েয নয়। (ايضا)

* লজ্জায় ফেলে চাঁদা উসূল করা গোনাহ। (ايضا)

* চাঁদা উসূলকারী যদি বুঝতে পারেন যে, তার চাপাচাপির কারণেই চাঁদা দেয়া হচ্ছে, তাহলে তার জন্য সে চাঁদা গ্রহণও জায়েয নয় এবং দাতার জন্যও দেয়া জায়েয নয়। (ايضا)

* ওয়াজ বয়ান ও কথার জাদুতে মানুষ যখন অনেকটা বেহুঁশের মত হয়ে চাঁদা প্রদান করে, সে মুহূর্তের চাঁদা গ্রহণ করা ঠিক নয়। তার স্বাভাবিক অবস্থা হওয়ার পর যা দিবে তা গ্রহণ করবে। (ايضا)

* চাঁদা উসূলকারী চাঁদা প্রদানকারীর জন্য দুআ করে দিবে, তবে চাঁদা প্রদানকারী দুআর জন্য আবেদন করবে না। (ايضا)

* চাঁদা চাওয়ার ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদা ও এস্তেগনা রক্ষা করে চাওয়া উচিত। (ايضا)

* মুতাওয়াল্লী/ব্যবস্থাপক কোন দ্বীনী মাসলেহাতের ভিত্তিতে কারও চাঁদা গ্রহণ নাও করতে পারেন (احسن الفتاوى ج/٦)

কবরস্থান সম্পর্কিত মাসায়েল

* কবরস্থানের শুষ্ক ঘাস কাটা জায়েয আছে। কাঁচা ও তাজা ঘাস কাটা মাকরূহ; তবে রাস্তা ঘাট পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনে কাটা যায়।

* ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থানের অপ্রয়োজনীয় গাছপালা কেটে তা কাউকে বিনামূল্যে দিয়ে দেয়া জায়েয নয় বরং তা বিক্রি করে কবরস্থানের উন্নয়ন ও পরিচ্ছন্নতার কাজে লাগাতে হবে। এ কবরস্থানে প্রয়োজন না থাকলে পার্শ্ববর্তী অন্য কবরস্থানে লাগানো হবে।

* গাছ ব্যতীত শুধু জমি কবরস্থানের জন্য ওয়াক্‌ফ করলে গাছের মালিক ওয়াক্‌ফদাতা। আর কেউ গাছ লাগালে তার মালিক সে। আপনা আপনি যে গাছ জন্মায় তা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির।

* যে স্থানে কবর নেই সেখানে জুতা/স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে হাটাতে কোন অসুবিধা নেই। কবরের উপর দিয়ে জুতা/স্যাণ্ডেল পরে চলা দ্বারা কবরের বেহুরমতী (অমর্যাদা) হয়ে থাকে।

ঈদগাহ্ সম্পর্কিত মাসায়েল

* ঈদগাহ প্রায় মসজিদের ন্যায় হুকুম রাখে। তাই মসজিদের ন্যায় ঈদগাহের আদব, এহতেরাম রক্ষা করা ওয়াজিব।

* ঈদগাহে খেলা-ধূলা করা জায়েয নয়।

* ঈদগাহে স্কুল বানানো জায়েয নয়।

* ঈদগাহের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে মাদ্রাসা বানানো জায়েয নয়।
(احسن الفتاوی ج/٦)

মুতাওয়াল্লী, মুহতামিম এবং মসজিদ/মাদ্রাসা কমিটির গুণাবলী ও দায়িত্ব কর্তব্য

* মুতাওয়াল্লী/ব্যবস্থাপককে মুসলমান হতে হবে। কোন অমুসলিমকে এ পদে নিয়োগ করা জায়েয নয়। (معارف القرآن)

* মসজিদ মাদ্রাসার মুতাওয়াল্লী ও মুহতামিমকে দ্বীনদার, আমানতদার, বিশ্বস্ত ও শরীয়তের পাবন্দ হতে হবে। অন্যথায় তাকে মুতাওয়াল্লী বা মুহতামিম বানানো ঠিক নয়। (জীবন্ত মসজিদ ও فتاوی رحیمیہ ج/٢)

* বে নামাযী বা ফাসেককে মুতাওয়াল্লী বানানো জায়েয নয়।
(فتاوی محمودیہ ج/٢)

* মুতাওয়াল্লী-র মধ্যে প্রশাসনিক দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা জরুরী। (ایضا)

* মুতাওয়াল্লী-র জন্য আকেল ও বালেগ হওয়া শর্ত। পুরুষ হওয়া বা অন্ধ না হওয়া শর্ত নয়। (জীবন্ত মসজিদ)

* মোতাওয়াল্লীর ক্ষমতা শরীয়তের আইনের সীমার দ্বারা সীমাবদ্ধ-শরীয়তের বাইরে যথেচ্ছা ব্যবহার করার বা যথেচ্ছা খরচ করার অধিকার তার নেই। (ঐ)

* মাদ্রাসার মুহাতামিম আলেম হওয়া চাই। শুধু আলেম নয় আলেমে বাআমল হওয়া চাই। আলেম না হলেও অন্ততঃ আলেমে বাআমলের সুহবত প্রাপ্ত হওয়া চাই। (العلم والعلماء)

* মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতার বংশে কোন যোগ্য আলেম থাকলে সে-ই পরবর্তীতে মুহতামিম হওয়ার অধিক হকদার। (ایضا)

* ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে নাজায়েয হস্তক্ষেপ করনেওয়ালা (মুতাওয়াল্লী, মুহতামিম ও কমিটি)-কে পদ থেকে বরখাস্ত করা ওয়াজিব-না করা গোনাহ।
(احسن الفتاوی ج/٦)

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلٰى بِهٖ - (رواه احمد)

অর্থাৎ, শরীরের যে মাংসটুকু হারামের দ্বারা উৎপন্ন, তা জান্নাতে যাবে না, তা জাহান্নামের উপযুক্ত। (আহমদ)

তৃতীয় অধ্যায়
মুআমালাত

(পারস্পরিক লেন-দেন, কায়-কারবার ও আয়- উপার্জন সম্পর্কিত)

অর্থনীতি

সম্পদ উপার্জনের নীতিমালা ঃ

(১) সম্পদ হালাল ও পবিত্র হতে হবে।

(২) হারাম, মাকরূহ ও সন্দেহপূর্ণ (অর্থাৎ, যেখানে জায়েয বা নাজায়েয হওয়ার কোন দিক স্পষ্ট নয়–এরূপ) পন্থায় সম্পদ উপার্জন করা থেকে বিরত থাকবে।

(৩) সম্পদ উপার্জনের কাজে লিপ্ত হয়ে কোন ফরয বা ওয়াজিব বা সুন্নাত কাজে কোন বিঘ্ন ঘটতে যেন না পারে।

(৪) সম্পদ উপার্জন করতে হবে সম্পদের মোহ বা ভোগ বিলাসিতার উদ্দেশ্যে নয় বরং নিজের দায়িত্ব পালন ও ছওয়াব অর্জনের কাজে ব্যয় করার নিয়তে। তাহলে এটা ইবাদত বলে গণ্য হবে।

সম্পদ ব্যয়ের নীতিমালা ঃ

(১) সম্পদের উপর শরীয়ত যে সব দায়িত্ব অর্পণ করেছে, সম্পূর্ণ ইখলাসের সাথে তা আদায় করা। যেমন যাকাত, ফেতরা, কুরবানী, হজ্জ ইত্যাদি।

(২) নিজের এবং নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য হক আদায়ের কাজে ব্যয় করা।

(৩) আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, মেহমান, মুসাফির, এতীম-মিসকীন, বিধবা প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের প্রয়োজন সাধ্যানুযায়ী পূরণ করা।

(৪) অপব্যয় না করা অর্থাৎ, যে সব স্থানে শরীয়ত ব্যয় করতে নিষেধ করেছে সেখানে ব্যয় না করা। অপব্যয় করা হারাম।

(৫) অমিতব্যয় না করা অর্থাৎ, বৈধ স্থানেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় না করা। এটাও শরীয়তে নিষিদ্ধ।

(৬) কার্পণ্য না করা অর্থাৎ, প্রয়োজনের স্থানে মোটেই ব্যয় না করা বা প্রয়োজন অনুপাতে ব্যয় না করা বরং কমী করা। এটাকে বুখ্ল বলা হয়। এটা নিন্দনীয়।

(৭) ব্যয়ের ক্ষেত্রে কমও নয় বেশীও নয়-মধ্যপন্থা অবলম্বন করা জরুরী।

(৮) দ্বীন ইসলামের হেফাজত এবং দাওয়াত, তাবলীগ ও ধর্ম প্রচারের কাজে আন্তরিকভাবে উদার মনে ব্যয় করা।

(৯) নফল ও ছওয়াবের কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পূর্ণ সম্পদ ব্যয় করে দেয়ার ক্ষেত্রে নীতি হলঃ যিনি এরকম মজবুত ঈমান ও মজবুত অন্তরের অধিকারী যে, সম্পদ একেবারে না থাকলেও তিনি হা হুতাশ করবেন না বা হারাম পথে ধাবিত হবেন না, তার জন্য এভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পূর্ণ সম্পদ ব্যয় করে দেয়ার অনুমতি রয়েছে বরং তা উত্তম। আর যার ঈমান ও অন্তর এরকম মজবুত নয় তার জন্য সম্পূর্ণ সম্পদ এভাবে ব্যয় করার অনুমতি নেই। কেননা, এভাবে পরে তার ঈমান হারা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

(১০) সাধারণ অবস্থায় আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি করা অনুচিত।

(اسلام کا اقتصادی نظام ও الفرقان থেকে গৃহীত)

সম্পদ সঞ্চয় ও সংরক্ষণের মাসায়েল ঃ

(১) জরুরী দায়িত্ব আদায় করার পর সাধারণ অবস্থায় নিজের এবং নিজের সন্তানাদি ও পরিবারের জন্য কিছুটা সঞ্চয় রাখা উত্তম, যাতে পরে নিজেকে ও নিজের সন্তানাদিকে অন্যের কাছে হাত পাততে না হয়।

(اسلام کا اقتصادی نظام و حیوة المسلمین)

(২) সুদ ভিত্তিক ব্যাংকে টাকা জমা রাখা জায়েয নয়। কারণ, এতে সুদ ভিত্তিক কারবারের অন্যায়ে সহযোগিতা করা হয়। তবে আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকলে বা অনন্যোপায় অবস্থায় সম্পদ সংরক্ষণের স্বার্থে রাখার অনুমতি রয়েছে। (فتاوی رحیمیہ)

(৩) ব্যাংকের সুদের টাকা ব্যাংকে ছেড়ে দিয়ে আসা অন্যায়। কেননা তারা এটাকে সঠিক খাতে এবং মাসআলা অনুযায়ী ব্যয় করবে না বরং নিয়ম হল এ টাকা তুলে এনে গরীব মিসকীনদের মধ্যে (ছওয়াবের নিয়ত ছাড়া) বন্টন করে দিবে। (احسن الفتاوی)

(৪) ব্যাংকের সুদের টাকা জনকল্যাণ মূলক কাজে ব্যয় করা যায় না। (যেমন রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, মুসাফিরখানা নির্মাণ ইত্যাদি) বরং গরীব-মিসকীনকে প্রদান করতে হবে।

(৫) বর্তমানে প্রচলিত 'বীমা' সুদ ও জুয়ার সমষ্টি বিধায় তা করানো জায়েয নয়। তবে আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকলে ভিন্ন কথা। জীবন বীমা করানো হলে বীমার মূল অর্থ মালিক বা তার ওয়ারিছগণ ভোগ করবেন। বাকীটা সুদের অর্থের ন্যায় সদকা করে দেয়া ওয়াজিব। (فتاوی رحیمیہ ج ۲ و محمودیہ ج ٤)

(৬) সম্পদ সংরক্ষণের স্বার্থে চোর, ডাকাত প্রভৃতির নিকট সম্পদের কথা অস্বীকার করা জায়েয, এতে মিথ্যার গোনাহ হবে না। তবে এরূপ ক্ষেত্রে সরাসরি মিথ্যা না বলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলাই শ্রেয়।

(৭) সম্পদ রক্ষার স্বার্থে কেউ নিহত হলে সে শাহাদাতের ছওয়াব লাভ করবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য করতে টাকা দেয়ার মাসায়েল

যদি কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য অন্যকে টাকা দেয় এবং যাকে টাকা দেয়া হল তার কোন অর্থ উক্ত ব্যবসায় না লাগে বরং সে শুধু শ্রম দেয়, তাহলে এরূপ কারবারকে ইসলামী ফেকাহ্র পরিভাষায় 'মুযারাবাত' বলা হয়। আর উক্ত ব্যবসায় তার টাকা/ অর্থও যদি লাগে তাহলে তাকে 'শেরকাত' (কোম্পানি ব্যবসা) বলা হয়। নিম্নে মুযারাবাত এর মাসায়েল বর্ণনা করা হল ঃ

* অর্থদাতা/মহাজন ও ব্যাপারীর মুনাফার হার নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। অর্থাৎ লাভের কত অংশ কে পাবে তা নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ মহাজনের অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ, বাকীটা ব্যাপারীর ইত্যাদি। যদি এরূপ কথা হয় যে, মোটের উপর মহাজনকে এত টাকা দিতে হবে বা মাসিক এত টাকা দিতে হবে তাহলে নাজায়েয ও সুদ হয়ে যাবে।

* যদি এরূপ কথা হয় যে, যা লাভ হবে তা আমরা বিবেচনা মত বন্টন করে নিব, তাহলে চুক্তি ফাসেদ হয়ে যাবে।

* কারবার শুরু হওয়ার পর যে পর্যন্ত হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে কারবার ক্ষান্ত না করবে, সে পর্যন্ত যদি কোন বারে লাভ কোন বারে লোকসান হয়, তাহলে লোকসান লাভের উপর থেকে কাটা যাবে–বেপারীর উপরও ফেলানো হবে না বা মহাজনের উপরও ফেলানো হবে না।

* হিসাব চুকিয়ে কারবার বন্ধ করার সময় যদি দেখা যায় মোট হিসেবে লাভও দাঁড়ায়নি লোকসানও হয়নি- সমান সমান রয়েছে, তাহলে মহাজন আসল টাকা নিয়ে যাবে আর বেপারীর শ্রম বৃথা যাবে– সে তার শ্রমের পরিবর্তে মহাজনের নিকট কিছু দাবী করতে পারবে না।

* হিসাব চুকানোর সময় যদি দেখা যায় লাভতো হয়ইনি বরং উল্টো লোকসান হয়েছে, তাহলে সেই লোকসান বেপারীর উপর ফেলানো যাবে না বরং সে লোকসান মহাজনের যাবে। বেপারীর পরিশ্রমই তো বৃথা গেল, সেই লোকসানই তার জন্য যথেষ্ট।

* যদি এরূপ শর্ত করা হয় যে, মূল টাকায় লোকসান গেলে বেপারীকেও হারাহারি মতে সে টাকার অংশ দিতে হবে বা কারবারে লাভ না হলে বা লোকসান গেলে মহাজনকে বেপারীর শ্রমের মজুরী দিতে হবে তাহলে এ উভয় রকম শর্ত করা ফাসেদ ও নাজায়েয।

* যদি এরূপ শর্ত করা হয় যে, মুনাফা থেকে একটা নির্দিষ্ট অংক যে কোন এক জনের, বাকীটা অন্যের বা একটা নির্দিষ্ট অংক প্রথমে এক জনের জন্যে পৃথক করে নিয়ে বাকীটা উভয়ের মধ্যে বন্টন হবে, তাহলে মুযারাবাত ফাসেদ হয়ে যায়।

* অর্থদাতা কারবারের জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ বা নির্দিষ্ট এলাকা বা নির্দিষ্ট বিষয় নির্ধারণ করে দিতে পারে।

* কারবারের মেয়াদ নির্ধারিত না থাকলে কত দিন পর পর হিসাব নিকাশ করে পরস্পরের মাঝে মুনাফা বন্টন হবে তা স্থির করে নিতে হবে।

* বেপারী মহাজনের অনুমতি ব্যতীত অন্যের নিকট ব্যবসার জন্যে মহাজনের টাকা দিতে পারবে না।

* ব্যবসা করতে গিয়ে মাল উঠানামা করানো, যাতায়াত, সফরে হলে খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির খরচ মূলধন থেকে যাবে।

* মুযারাবাতের শর্তাবলী ও চুক্তি লিখিতভাবে নিজেদের কাছে রাখা উত্তম।

* মহাজন যে কোন সময় বেপারীকে বরখাস্ত করার ও টাকা তুলে নেয়ার অধিকার রাখে। তবে বেপারীর নিকট সংবাদ পৌছার পূর্বে সে কোন মাল ক্রয় করে থাকলে তা বিক্রয় না করা পর্যন্ত সে বরখাস্ত হবে না।

* মহাজন বা বেপারীর যে কোন একজনের মৃত্যুতে মুযারাবাতের চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায়। ওয়ারিছদেরকে (চাইলে) আবার মুক্তির নবায়ন (Renew) করে নিতে হবে।

(বেহেশতী জেওর, ইসলামী ফেকাহঃ ৩য়, ছাফাইয়ে মোআমালাত এবং [illegible] থেকে গৃহীত)

কোম্পানি বা যৌথ কারবারের মাসায়েল

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি পারস্পরিক চুক্তি ও সম্মতি সাপেক্ষে নিজেদের পুঁজি বিনিয়োগ করে যৌথভাবে কোন কারবার করতে চাইলে তার নীতিমালা ও মাসায়েল নিম্নরূপ ঃ

(১) যথারীতি যৌথ কারবারের চুক্তি অঙ্গীকার হওয়া চাই। লিখিত হওয়াই উত্তম। মৌখিক হলেও জায়েয হবে।

(২) সকলের পুঁজি ও মুনাফা সমান হওয়া জরুরী নয় বরং কারও পুঁজি কম কারও বেশী এবং সে অনুপাতে মুনাফাও অল্প বা অধিক হতে পারে।

(৩) মুনাফা বন্টনের হার পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে হবে অর্থাৎ, কে কত অংশ হারে পাবে সে বর্ণনা থাকতে হবে।

(৪) মুনাফার সম্পর্ক কেবল পুঁজির সাথে নয় বরং শ্রম, সাধনা, কৌশলগত যোগ্যতা, বুদ্ধির প্রখরতা প্রভৃতির প্রভাব রয়েছে মুনাফার ক্ষেত্রে। তাই কারও মধ্যে এসব গুণাবলী অধিক থাকার কারণে তার পুঁজি কম হওয়া সত্ত্বেও তাকে মুনাফার হার অধিক দেয়া যেতে পারে। তবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই তা নির্ধারিত হতে হবে।

(৫) প্রত্যেকের স্বয়ং অথবা প্রতিনিধির মারফত কার্যে অংশ গ্রহণ আবশ্যকীয়। তবে কোন কারণবশতঃ অংশ গ্রহণে অসমর্থ হলেও মুনাফায় অংশীদার থাকবে, কেননা ক্ষতি হলে তাকেও তা বহন করতে হবে।

(৬) কারবারের প্রারম্ভে যদি কোন অংশীদার বলে যে, আমি কাজে অংশ গ্রহণ করব না, তাহলে এ কারবার তার জন্য ফাসেদ হয়ে যাবে।

(৭) যে বিষয়ের যৌথ কারবার চলে তা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সকলের অধিকার সমান। এমনিভাবে যে কোন অংশীদারের হাতে কারবারের ক্ষতি হলে সকলকেই তার দায়িত্ব বহন করতে হবে। অবশ্য কোন অংশীদার তাকে কোন দ্রব্য ক্রয় করতে বাঁধা দেয়া সত্ত্বেও যদি সে ক্রয় করে এবং ক্ষতি হয় তাহলে তার দায়িত্ব একা তাকেই বহন করতে হবে। এমনিভাবে কেউ কোন দ্রব্য ক্রয় করতে গিয়ে অসম্ভব প্রকারের প্রতারিত হয়ে থাকলে সে দায়িত্ব তারই উপর বর্তাবে।

(৮) কোন শরীক স্বেচ্ছায় ক্ষতি করলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে ক্ষতির দায়িত্ব তারই ঘাড়ে বর্তাবে।

(৯) সকল অংশীদারের অনুমতি ছাড়া কোন অংশীদার কাকেও যৌথ মূলধন থেকে ঋণ প্রদান করতে পারবে না।

(১০) লাভ ক্ষতিতে সকল অংশীদারকে ভাগী ধরতে হবে, কোন অংশীদার ক্ষতির ভাগ থেকে মুক্ত থাকার শর্ত আরোপ করলে বা কোন অংশীদার ক্ষতির দায়িত্ব পুরাটা নিজে নিতে চাইলে এ যৌথ কারবার নাজায়েয হবে।

(১১) নিজের ব্যক্তিগত মালামালের সাথে যৌথ কারবারের মালামালকে একত্রিত করে রাখা অথবা উভয় কারবার মিশ্রিত করে রাখা জায়েয নয়। তবে সকল অংশীদারের অনুমতি থাকলে জায়েয।

(১২) সকল অংশীদারের সম্মতি ব্যতীত নতুন কোন অংশীদারকে শরীক করা যাবে না।

(১৩) যে যৌথ কারবারে কোন যৌথ পুঁজি বিনিয়োগ করা হল, কোন অংশীদার ঐ কাজে ব্যক্তিগত অর্থ বিনিয়োগ করে পৃথক কারবার করলেও তা যৌথ কারবারের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। যেমন কতিপয় লোক যৌথভাবে একটা কাপড়ের দোকান দিল, এমতাবস্থায় এদের কেউ ব্যক্তিগতভাবে দ্বিতীয় পৃথক কোন কাপড়ের দোকান দেয়ার অনুমতি পাবে না।

(১৪) যদি কোন অংশীদার বা অংশীদারগণ অপর কোন অংশীদার বা অংশীদারগণকে বলে যে, এ কারবার এ স্থানে করলে ভাল হবে; এমতাবস্থায় অন্যস্থানে কারবার করলে যদি ক্ষতি হয় তাহলে নিজেদের মতে যারা সেটা করবে ক্ষতির দায় তাদেরকেই বহন করতে হবে। অবশ্য মুনাফা হলে চুক্তি অনুযায়ী সকলেই তার অংশ পাবে।

(১৫) যদি কোন কারণে যৌথ কারবার বাতিল হয়ে যায় অথবা কেউ নিজেই স্বেচ্ছায় চুক্তি বাতিল করে তাহলে মুনাফা পুঁজি অনুপাতেই বন্টিত হবে। যদিও কারবারের প্রারম্ভে মুনাফা বেশ-কম গ্রহণের শর্তও হয়ে থাকে কিন্তু ভঙ্গের সময় তা কার্যকরী হবে না।

(১৬) অংশীদারদের কেউ ইন্তেকাল করলে চুক্তি এমনিতেই বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য উত্তরাধিকারীগণ ইচ্ছা করলে চুক্তি নবায়ন (Renew) করতে পারবে।

(ইসলামী ফেকাহঃ ৩য় থেকে গৃহীত)

যৌথ ফার্মের মাসায়েল

একাধিক সমপেশার লোক কোন পুঁজি ছাড়াই শ্রম বিনিয়োগ ও তার মুনাফা বন্টনের চুক্তিতে যে যৌথ ফার্ম গঠন করে, তাকে ফেকাহ্‌র পরিভাষায় 'শিরকতে আমল' বা 'শিরকতে সানায়ে' বলে। যেমন কয়েকজন ঠিকাদার বা কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার বা কয়েকজন দর্জি বা কয়েকজন স্বর্ণকার একত্রে কাজ করার ও তার মুনাফা চুক্তির ভিত্তিতে বন্টন করে নেয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হল।এরূপ যৌথ কারবারের প্রয়োজনীয় কয়েকটি মাসআলা নিম্নরূপ ঃ

(১) এতে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে অংশীদার বানানো যায়।

(২) এ ধরনের যৌথ কারবারে সকলের কাজ সমান সমান হওয়া এবং মুনাফায় সকলের সমান অংশীদার হওয়া শর্ত নয় বরং পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এতে বেশ কমও হতে পারে।

(৩) অংশীদারদের যে কেউ কোন কাজ বা কাজের অর্ডার নিলে তার দায়-দায়িত্ব সকলের উপর এসে যাবে এবং কাজ দাতা যে কোন অংশীদার থেকে কাজ বুঝে নেয়ার অধিকার রাখবে।

(৪) যে কোন অংশীদার কাজের অর্ডার দাতা থেকে পুরা মজুরী চেয়ে নিতে পারবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য অংশীদার আর কাজ দাতা থেকে কিছু চাইতে পারবে না। অবশ্য নির্দিষ্ট কোন এক জনের হাতে মজুরী পরিশোধ করতে বলা হয়ে থাকলে কাজ দাতার পক্ষে অন্য কাউকে মজুরী দেয়া ঠিক হবে না।

(৫) অংশীদারদের একজন কাজ করল অন্যজন করল না, তাহলে এতে কাজ দাতার কিছু বলার থাকবে না। অবশ্য কাজ দেয়ার সময় কাজ দাতার পক্ষ থেকে যদি নির্দিষ্ট কারও কাজে থাকার শর্ত আরোপিত হয়ে থাকে, তাহলে সে অনুযায়ী কাজ হতে হবে।

(৬) কোন অংশীদার অসুস্থতা বা এরূপ অনিবার্য কোন কারণ বশতঃ যদি কাজে অংশগ্রহণ করতে না পারে, তাহলেও সে লাভ ও মজুরীতে অংশীদার থাকবে।

(৭) কোন কাজে ক্ষতি বা লোকসান হয়ে গেলে প্রত্যেক অংশীদারকে সে ক্ষতি বহন করতে হবে, যে যে হারে লাভের অংশ গ্রহণ করে থাকে, ক্ষতির অংশও সে হারে বহন করবে।

(৮) বৃদহায়তনে এ কাজ পরিচালনার প্রয়োজনে কোন ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠন করতে হলে নিজেদের মধ্যে থেকেও করা যায় বা বাইরে থেকেও করা যায়। ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্যের জন্য হয় নির্ধারিত বেতন থাকবে বা মুনাফার একটা হারাহারি অংশ থাকবে- একদিকে নির্ধারিত বেতন নিবে অপরদিকে মুনাফার একটা হারও পাবে–তা হতে পারবে না।

(৯) কাজ শুরুর পূর্বে চুক্তি অঙ্গীকার হওয়া চাই। লিখিত হোক বা মৌখিক। লিখিত হওয়াই উত্তম।

(১০) মুনাফা বন্টনের হার পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত হওয়া চাই।

মিল/ফ্যাক্টরীর সাথে সম্পর্কিত মাসায়েল ও শ্রমনীতি

* মিল/ফ্যাক্টরীতে দু'টো পক্ষ থাকে (১) মালিক পক্ষ (২) শ্রমিক ও কর্মচারী পক্ষ। মালিকের জন্য শ্রমিকের কি করণীয় এবং শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য মালিকের কি করণীয় সে সম্পর্কে ৩৮৯ ও ৩৯০ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি মাসআলা এবং মিল/ফ্যাক্টরীর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক মাসায়েল বর্ণনা করা হল।

* মালিক শ্রমিক মজুরদেরকে নিজের ভাইয়ের মত মনে করবে।

* তাদের মজুরীর মান হবে নিয়োগ কর্তার জীবন যাত্রার মানের সমকক্ষ– উভয়ের মাঝে যেন আকাশ পাতাল পার্থক্য না হয়। এমন কি কৃপণতা বশতঃ কোন মালিক নিম্নমানের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হলে মজুরদেরকে সে মান গ্রহণের জন্য বাধ্য করার অধিকার তার নেই।

* তাদের দ্বারা এমন কঠোর কাজ করাবে না, যাতে তারা অবসন্ন হয়ে পড়ে বা সত্বর ভগ্ন স্বাস্থ্য হয়ে যায়। কখনো এরূপ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তাদের বাস্তব ও আর্থিক সহায়তা করতে হবে।

* মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে এক বার কর্মচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর কাজ করা বা নেয়া অসম্ভব হওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে (অর্থাৎ, ওযর বা বাধ্যবাধকতা না দেখা দিলে) সেই চুক্তি বাতিল করার অধিকার কোন পক্ষের নেই।

* উপরে বর্ণিত প্রকৃত ওযর ছাড়া যখনই ইচ্ছা একটা অজুহাত দাঁড় করিয়ে মালিক মিল/ফ্যাক্টরী লক আউট করতে পারবে না বা শ্রমিককরা কাজ বন্ধ/ধর্মঘট করতে পারবে না।

* মাসিক বেতনের ভিত্তিতে বা দৈনিক ভিত্তিতে (Daily basis) বা কাজের পরিমাণের ভিত্তিতে সব ভাবে শ্রমিক নিয়োগ করা যায়।

* শ্রমিককে মাসিক বেতনের ভিত্তিতে নিয়োগ করে থাকলে কাজ না নেয়ার দিনের বা ছুটির দিনেরও মজুরী তাকে দিতে হবে।

* মালিক মজুরী পরিশোধ করার যে সময় নির্ধারণ করেছে সে সময়েই মজুরী প্রদান করা আবশ্যক। ঘটনাক্রমে কোন দিন বা কোন মাসে পিছিয়ে গেলে দোষ নেই, তবে এরূপ অভ্যস্ত হওয়া অন্যায়।

* মালিক যদি অনুভব করে যে, কোন শ্রমিক ন্যাস্ত কাজের ক্ষতি করছে অথবা সে মনোযোগের সাথে কাজ করছে না, তাহলে মালিকের তাকে কর্মচ্যুত করার অধিকার আছে। কিন্তু কর্মচ্যুত করার পূর্বে দু'টো কথা জানা দরকার। (১) শ্রমিকদের দৈহিক অসুবিধার কারণে এরূপ হয়ে থাকলে তাদেরকে কোনরূপ চার্জ করা যাবে না। (২) মজুরীর স্বল্পতাই যদি তার অমনোযোগীতার কারণ হয়ে থাকে, তাহলে তার মজুরী প্রচলিত মজুরীর চেয়ে কম হয়ে থাকলে তাকে প্রচলিত মজুরীর সমান মজুরী অবশ্যই দিতে হবে। এ দু'টোর কোনটা কারণ না হলে মালিক তাকে কর্মচ্যুত বা অধিক কাজ করতে আইনতঃ বাধ্য করতে পারবে।

* মালিক শ্রমিককে তাগিদ করতে পারবে কিন্তু গালাগালি বা মার-পিট করতে পারবে না।

* শ্রমিকের দ্বারা ওযরবশতঃ অথবা ঘটনাচক্রে অনিচ্ছায় তার ব্যবহারে বা চার্জে দেয়া মেশিন, যন্ত্রাংশ বা কোন আসবাবপত্রের ক্ষতি সাধন হলে মালিক তার থেকে কোন ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে না। কিন্তু যদি সে স্বেচ্ছায় ক্ষতিসাধন করে, যেমন মেশিন সোজা না চালিয়ে বিপরীত দিকে চালায় অথবা তার ঠাণ্ডা গরম তারতম্য না করে তা চালায় আর ক্ষতি হয় অথবা ম্যাচের কাঠি ধরাতে গিয়ে মেশিনে আগুন লেগে গেল কিম্বা গ্লাস বরতন বা এ জাতীয় আসবাবপত্র এমন স্থানে রাখলো, যেখানে ছেলে মেয়ে বা বিড়াল পৌছতে পারে, ফলে তা

ভেঙ্গে গেল, এরূপ হলে মালিক তার থেকে ক্ষতিপূরণ নিতে পারে। ঘরের চাকর নওকরের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

* মালিকের পরামর্শের বিপরীত কাজ করার ফলে ক্ষতি হলে সে জন্য শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

* মিল/ফ্যাক্টরীর উৎপাদিত পণ্যের যে মান দেখে গ্রাহকরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, পরবর্তীতে সে মান কম করে দেয়া গ্রাহকদের প্রতারিত করার শামিল বিধায় তা পাপ ও অন্যায়।

* মালিক যদি কোন কাজের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করে যে, এ কাজ তুমি নিজেই করবে, তাহলে শ্রমিক সে কাজ অন্যকে দিয়ে করাতে পারবে না। করালে যদি ক্ষতি হয় তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

* যে সংস্থার মালিক ব্যক্তি বিশেষ তিনি বা যে সংস্থার মালিক কোন ব্যক্তি বিশেষ নয় বরং সরকার বা জনগণ তার নিয়োগকর্তা যদি অনুমোদন দান করেন তাহলে সে সংস্থার শ্রমিক কর্মচারীদেরকে ছুটি বা অসুস্থতার বেতন/ভাতা দেয়া হবে।

* নিয়োগকর্তাদের পক্ষ থেকে যে টাকা পুরস্কার, অনুদান, বোনাস, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি স্বরূপ দেয়া হয় তাকে কখনো মজুরীর মাঝে গণ্য করা যায় না।

* বেতন দেয়ার সময় নির্ধারিত থাকলে তার পূর্বে বেতন দাবী করার অধিকার বর্তায় না। তবে মালিক ইচ্ছা করলে অগ্রিম দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাকী সময় বা বাকী দিনগুলোর কাজ করে দেয়া শ্রমিকের জিম্মাদারী হয়ে দাঁড়ায়। (ইসলামী ফিকাহঃ ৩য় খণ্ড থেকে গৃহীত)

পেশাজীবি শ্রমিক/ব্যবসায়ী শ্রমিকদের মাসায়েল

যে সব পেশাধারী লোকেরা কিছু কলা কৌশল জানে এবং বিশেষ কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অধীনস্ত হয়ে চাকুরী করে না বরং তারা অনেকের কাজ করে দিয়ে থাকে, তাকে বলা হয় 'আজীরে মুশতারাক' বা ব্যবসায়ী শ্রমিক। পেশাজীবি শ্রমিক। যেমন ঘড়ির মেকার, কুলি, মুচি, রং মিস্ত্রী, মাঝি, কামার, স্বর্ণকার, দর্জি, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি। এই শ্রেণীর শ্রমিকদের সাথে সম্পর্কিত বিশেষ কয়েকটি মাসায়েল নিম্নরূপ ঃ

* তাদের অবহেলার দরুন কোন জিনিস নষ্ট হয়ে গেলে তাদেরকে সে জিনিসের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অবশ্য কেউ ক্ষতিপূরণ দাবী না করলে সেটা তার অনুগ্রহ।

* মজুরী পূর্বেই নির্ধারিত করতে হবে। নগদ না বাকী তাও পূর্বেই ফয়সালা করে নিতে হবে। কাজের ধরন ও বিবরণও পূর্বেই স্পষ্ট হতে হবে।

* তারা কাজ শেষ করার পূর্বে পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকারী হয় না। তবে স্বেচ্ছায় কেউ পরিশোধ করলে তা ভিন্ন কথা। এজাতীয় পেশাজীবিরা বায়না/এডভান্স স্বরূপ কিছু যদি এই শর্তে গ্রহণ করে যে, কাজ না নিলে সে টাকা ফেরত দেয়া হবে না, তাহলে এরূপ করা জায়েয হবে না। এরূপ শর্ত ছাড়া এডভান্স নিতে পারে।

* তারা যদি কাজ ডেলিভারীর সময় নির্ধারিত করে দেয়, তাহলে অনুরূপ করা আবশ্যকীয় নয়। কেননা তারা আইনের জন্য দায়ী-সময়ের জন্য নয়। অবশ্য নৈতিক দৃষ্টিতে ওয়াদা ভঙ্গ করা অনুচিত। তবে সে যদি কোন কিছু আর্জেন্ট দেয়ার কথা বলে কিছু অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করে, তাহলে সময় মত তা দেয়া আবশ্যকীয়।

* তারা পারিশ্রমিক পাওয়া পর্যন্ত তাদের দায়িত্বে দেয়া দ্রব্য আটক রাখতে পারে। যদি এরূপ আটক রাখা দ্রব্য আটক রাখার মেয়াদে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তারা সে জন্য দায়ী নয়।(ইসলামী ফেকাহঃ ৩য়)

ক্রয়-বিক্রয়ের সাধারণ মাসায়েল

* অবৈধ বস্তু ক্রয় করা বা কোনভাবে অবৈধ বস্তুর মালিক হয়ে গেলে এমন লোকের নিকট তা বিক্রয় করা যার জন্য তা অবৈধ, এটা জায়েয নয়।

* যে সব দ্রব্য বিক্রি করা হবে তা সামনে থাকতে হবে অথবা তার নমূনা (sample) সামনে থাকতে হবে। অদেখা দ্রব্য দেখার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার শর্তে ক্রয় করলেও তার অনুমতি রয়েছে।

* বিক্রিত দ্রব্যের সমস্ত অবস্থা (দোষ-ত্রুটি থাকলে তা সহ) ক্রেতাকে খুলে বলতে হবে, অন্যথায় বিক্রয় শুদ্ধ হবে না এবং ক্রেতার তা ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে। দ্রব্যের দোষ না বলে ধোকা দিয়ে বিক্রি করা হারাম।

* বিক্রেতা দ্রব্যের যে গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে ছিল পরে তার বিপরীত প্রমাণিত হল, যেমন বলেছিল রং পাকা বা অমুক কোম্পানীর, অথচ তা মিথ্যা প্রমাণিত হল, এ ক্ষেত্রে ক্রেতা সেটা ফেরত দেয়ার অধিকার রাখে।

* দাম স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে হবে। কেউ তা অস্পষ্ট বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ রাখলে বিক্রয় শুদ্ধ হবে না।

* ক্রয়ের সময় ক্রেতা যদি বলে দু তিন দিনের মধ্যে (তিন দিনের বেশী নয়) দ্রব্যটি গ্রহণ বা বর্জনের কথা জানাব অথবা ঘরে দেখিয়ে পরে বলব, তাহলে উক্ত

মেয়াদের মধ্যে ক্রেতার তা ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে যদি ক্রেতা দ্রব্যটি ব্যবহার করে না থাকে কিম্বা যে সব দ্রব্য ব্যবহার করা ব্যতীত সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না, সেগুলো ব্যবহারের ফলে দ্রব্যটির মাঝে কোন দোষ-ক্রটি সৃষ্টি না হয়ে থাকে।

* বিক্রেতা কোন দ্রব্যের বিশেষ গুণাগুণ বর্ণনা করল, কিন্তু অন্ধকারের কারণে ক্রেতা ভাল করে তা দেখে নিতে পারল না। কিম্বা কেবল বিক্রেতার বর্ণনার ভিত্তিতে সে ক্রয় করল কিন্তু পরে নেয়ার পরে পরীক্ষা করে বিক্রেতার বর্ণনা মত পেল না তাহলে সেটা ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে। নমূনা (Sample) দেখে অর্ডার দেয়ার পর নমূনা মত না পেলেও তা ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে। অবশ্য দ্রব্যটি ব্যবহার করলে বা অন্যের কাছে বিক্রি করলে পরে আর তা ফেরত দেয়ার অধিকার থাকে না।

* কোন দ্রব্য না দেখে ক্রয় করে থাকলে দেখার পর তা রাখা বা না রাখার অধিকার থাকবে।

* যে সব বস্তুর নমূনা দেখে সে সম্পর্কে অনুমান করা যায় না, সেরূপ দ্রব্যের নমূনা দেখে অর্ডার দিলে দ্রব্যটি পাওয়ার পর তা ক্রয় করা না করার অধিকার থাকবে। আর যে দ্রব্যের নমূনা দেখে সে সম্পর্কে অনুমান করা যায় সে ক্ষেত্রে নমূনার অনুরূপ না পেলে উপরোক্ত অধিকার থাকবে, কিন্তু নমূনার অনুরূপ পেলে সে অধিকার থাকবে না।

* বিক্রেতা যদি কোন দ্রব্যের সে পরিমাণ দাম নিয়ে থাকে, যা কোন স্বচ্ছ নির্দোষ দ্রব্যের বিনিময়ে নেয়া হয়ে থাকে, আর পরে তাতে কোন দোষ প্রকাশ পায় তাহলে ক্রেতার তা ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে। যদি ক্রেতা দোষ-ক্রটি সত্ত্বেও রাখতে চায় তাহলে তার দাম কম দেয়ার অধিকার থাকবে না। অবশ্য বিক্রেতা স্বেচ্ছায় কিছু কম নিলে তা তার ইচ্ছা। তবে দোকানদার পণ্যের দোষ-ক্রটি বলা সত্ত্বেও কেউ সে দ্রব্য ক্রয় করলে উক্ত দোষ-ক্রটির কারণে তার ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে না।

* ক্রেতার হাতে এসে কোন ক্রটি সৃষ্টি হলে সে দ্রব্য ফেরত দেয়ার অধিকার নষ্ট হয়ে যায়।

* ক্রটি প্রকাশ পাওয়ার পর কিছু (ভালটা) রেখে বাকীটা (খারাপগুলো) ফেরত দেয়ার অধিকার নেই। রাখলে পূরাটা রাখতে হবে কিম্বা পূরাটা ফেরত দিতে হবে। অবশ্য বিক্রেতা সম্মত হলে সব রকমই করা যেতে পারে।

* যে সব দ্রব্য ভাঙ্গার পর (যেমন ডিম) বা কাটার পর (যেমন তরমুজ) তার ভাল মন্দ বোঝা যায়, সে সব দ্রব্য ভাঙ্গা বা কাটার পর যদি সম্পূর্ণ ফেলে দেয়ার মত অবস্থা দেখা যায়, তাহলে পূরা দাম ফেরত নেয়ার অধিকার থাকবে। যদি অন্য কোন কাজে ব্যবহার করার উপযোগী থাকে (যেমন তরমুজ বা কোন তরকারী জন্তুকে খাওয়ানোর যোগ্য থাকে) তাহলে সেগুলো ফেরত না দিলে কিছু দাম কমানোর অধিকার থাকে।

* ক্রয় বিক্রয়ের সময় প্রথমে দাম পরিশোধ এবং পরে পণ্য হস্তান্তর হবে। ক্রেতা এরূপ দাবী করতে পারবে না যে, প্রথমে পণ্য দিন পরে দাম নিন। অবশ্য বিক্রেতা চাইলে প্রথমে পণ্য দিতে ও পরে দাম নিতে পারে।

* বিক্রেতা কোন দ্রব্য বিক্রি করলে ক্রেতাকে তা এমনভাবে হস্তান্তর করতে হবে যাতে দ্রব্যটি তার আয়ত্তে নিতে কোন প্রকার বেগ পেতে না হয়।

* বিক্রেতা যদি স্বেচ্ছায় কোন দ্রব্য অধিক পরিমাণে দিয়ে থাকে অথবা ক্রেতা মূল্য কিছু বেশী দিয়ে থাকে তাহলে কারবার চূড়ান্ত হওয়ার পর কাউকে তা ফেরত দেয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না।

* দাম পরিশোধ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার ক্রেতাকে বহন করতে হবে, যেমন মানিঅর্ডার খরচ (এমনিভাবে পে অর্ডার ও পোস্টাল অর্ডার খরচ) ইত্যাদি।

* এভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের লেখা পড়া সংক্রান্ত খরচ যেমন জমির দলিল রেজিষ্ট্রি ব্যয় ইত্যাদি ক্রেতাকে বহন করতে হবে।

* ক্রেতাকে পণ্য বুঝিয়ে দিতে যে সব খরচ হয়ে থাকে সে সব খরচ বিক্রেতাকে বহন করতে হবে। যেমন মাপ বা ওজন করার ব্যয়, সম্পত্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র না থাকলে সেগুলো সংগ্রহের ব্যয় ইত্যাদি।

* ক্রেতার নিকট মালামাল পৌঁছানোর পরিবহন ব্যয়, ভিপি খরচ ইত্যাদি ক্রেতাকে বহন করতে হবে, অবশ্য বিক্রেতা স্বেচ্ছায় বহন করলে তা হবে তার বদান্যতা। কিন্তু বিক্রেতাকেই তা বহন করতে হবে– এরূপ শর্ত আরোপ করলে বাণিজ্য ফাসেদ হয়ে যাবে।

* ভিপি যোগে মাল পাঠালে তা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার দায়-দায়িত্ব বিক্রেতাকেই বহন করতে হবে।

* কাউকে কোন মাল তৈরি করার অর্ডার দিলে তার পূর্ণ বিবরণ, দাম দস্তুর, সরবরাহের স্থান, সরবরাহের দিন তারিখ, দাম পরিশোধের সময় ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট হওয়া জরুরী।

* যে কারবার ফাসেদ হয়ে যায় তা ভেঙ্গে দেয়া উচিত। অথবা অন্ততঃ বিক্রেতা দাম ও ক্রেতা পণ্য ব্যবহার থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখবে আর তা কোন দরিদ্র অভাবীকে দিয়ে দিবে।

* শরীয়তে যে সব ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয় সে রূপ কোন কেনা-বেচা সংঘটিত হলেও তা মালিককে ফেরত দেয়া জরুরী- কোনভাবে তাতে হস্তক্ষেপ করা বা নিজের কাজে ব্যবহার করা জায়েয নয়।

* ফল আসার পূর্বে বা পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে আম কাঁঠাল প্রভৃতির বাগান বিক্রি করার যে প্রচলন রয়েছে তা জায়েয নয়।

* যে ব্যক্তি খালেছ হারাম উপায়ে কোন মাল উপার্জন করেছে তার থেকে সেটা ক্রয় করা জায়েয নয়। (فتاوى محموديه ج / ٤)

(বেহেশতী জেওর ও ইসলামী ফেকাহঃ ৩য় প্রভৃতি থেকে গৃহীত)

বিঃদ্রঃ ক্রেতার অধিকার ও বিক্রেতার অধিকার সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৩৯২ ও ৩৯৩ পৃষ্ঠা।

বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়ের মাসায়েল

* ধারে কারবার করতে বিক্রেতার সম্মতি আবশ্যক, তার সম্মতি ছাড়া দাম বাকী রাখা জায়েয নেই।

* বাকীতে কোন বস্তু ক্রয় করলে মূল্য পরিশোধের দিন বা তারিখ নির্দিষ্ট করে বলতে হবে।

* ক্রেতা কোন একটি দ্রব্য বাকীতে ক্রয় করল অথচ দাম পরিশোধের কোন মেয়াদ নির্দিষ্ট করল না-এমনিই দ্রব্য নিয়ে চলে গেল, তাহলে সে মেয়াদ এক মাস বলে ধরা হবে। এক মাস অতিবাহিত হলেও যদি মূল্য পরিশোধ না করে, তাহলে বিক্রেতা তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবে।

(اسلامى فقه بحواله المجلة)

* হিসাব নিকাশের সময় মূল্য নিয়ে মত বিরোধের আশংকা থাকলে মূল্য নির্ধারণের পরেই পণ্য নেয়া উচিত।

* ধারে বিক্রি করার পর বিক্রেতার পণ্য ফেরত নেয়ার অধিকার থাকবে না।

* বিক্রেতা যদি দাম পরিশোধের কিস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়, তাহলে তার পুরো দাম একত্রে দাবী করার অধিকার থাকবে না।

* বাকীতে বিক্রি করলে নগদের তুলনায় কিছুটা বেশী দামে বিক্রি করতে পারবে।

* ধারের মেয়াদ বৃদ্ধি করার অধিকার বিক্রেতার, সে চাইলে মেয়াদ বৃদ্ধিও করতে পারে আবার মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর দাম দাবী করতে পারে বরং কঠোরতা সহকারেও দাম আদায় করার অধিকার তার রয়েছে।

* বাকীতে ক্রয় করলে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব-বিনা অপারগতায় টালবাহানা করা জায়েয নয়।

(ইসলামী ফেকাহঃ ৩য় ও বেহেশতী জেওর থেকে গৃহীত)

দাম এখন পণ্য পরে—এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের মাসায়েল

যদি ক্রেতা থেকে দাম এখনই নেয়া হয় আর পণ্য পরে দেয়ার অঙ্গীকার হয়-এরূপ বিক্রয়কে বলে 'বাইয়ে সালাম'। এ প্রকার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত রয়েছে। যথা ঃ

(১) যে পণ্যটি নেয়া হবে তার পূর্ণ বিবরণ জানা থাকতে হবে। এর জন্য কিছু নমুনা (Sample) দেখে নেয়া উত্তম। যে সব পণ্য নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয় তাতে বাইয়ে সালাম জায়েয নয়, যেমন জন্তুর বেলায়।

(২) দাম দস্তুর চূড়ান্ত করে নিতে হবে।

(৩) পণ্য হস্তান্তরের দিন বা সময় নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

(৪) পণ্য যদি সহজে স্থানান্তর যোগ্য না হয় (যেমন দশ বিশ মণ খাদ্য শস্য বা দু' চার গাইট কাপড় ইত্যাদি) তাহলে সে পণ্য কোন্ স্থান থেকে ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেয়া হবে তা নির্দিষ্ট থাকতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতাকে বলতে পারে যে, অমুক স্থানে আমাদের এ সব দ্রব্য পৌঁছে দিতে হবে।

(৫) এরূপ কারবারের কথা-বার্তা চলার প্রাক্কালে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করতে হবে। যদি কথা-বার্তা চলে আজ আর টাকা দেয়া হবে পরের দিন, তাহলে বিক্রেতা গতকালের দাম আজ মেনে নিতে বাধ্য নয় বরং আজ নতুন করে কারবার চুক্তি করা বা অস্বীকার করার অধিকার থাকবে তার।

(৬) যে মেয়াদের জন্য কারবার চুক্তি হল সে মেয়াদের মধ্যে কখনও যদি পণ্যটি বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়-মওজুদ না থাকে, তাহলে বিক্রেতা টাকা ফেরত দিতে পারবে।

(ইসলামী ফেকাহ ঃ ৩য় থেকে গৃহীত)

আধুনিক কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে শরীয়তের বিধান

* গ্রন্থস্বত্ব/প্রকাশনা স্বত্ব বিক্রয় করা ও তার বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয। (فتاوی رحیمیه ج ۲ / فقهی مقالات)তবে পূর্বেকার অনেক মুফতী এটাকে জায়েয বলতেন না।

* বিনা অনুমতিতে অন্য প্রকাশকের বই প্রকাশ করা জায়েয নয়।
(فتاوی رحیمیہ ج ۲)

* রক্ত বিক্রয় করা জায়েয নয়। তবে দুই অবস্থায় রক্ত দেয়া জায়েয। (১) যদি রক্ত দেয়া ব্যতীত রোগীর জীবনের আশংকা দেখা দেয় এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারের দৃষ্টিতে রক্ত দেয়া ব্যতীত তার জীবন বাঁচানোর আর কোন পথ না থাকে। (২) কিম্বা অভিজ্ঞ ডাক্তারের দৃষ্টিতে রক্ত দেয়া ব্যতীত সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। তাহলে এরূপ রোগীকে রক্তদান করা জায়েয এবং রোগীর জন্যও এরূপ অবস্থায় রক্ত নেয়া জায়েয এবং প্রথম অবস্থায় তাকে বিনামূল্যে রক্ত দেয়ার মত কেউ না থাকলে তার জন্য রক্ত ক্রয় করাও জায়েয। তবে রক্ত বিক্রয় করা কারও জন্যেই জায়েয নয়। (جواہر الفقہ ج ۲)

* মানুষের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (যেমন চোখের কর্ণিয়া, কিডনি ইত্যাদি) বিক্রয় করা জায়েয নয়। চক্ষু দান করা (জীবদ্দশায় হোক বা মরণোত্তর) জায়েয নয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত যুক্তি প্রমাণ জওয়াহেরুল ফেকাহ, ২য় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। অন্যের চক্ষু ব্যবহার করাও জায়েয নয়। (جواہر الفقہ ج ۲ وفتاوی محمودیہ ج ۵)

* বোনাস ভাউচার বিক্রয় করা জায়েয নয়। (احسن الفتاوی ج ٦)

* পেনশন বিক্রয় করা জায়েয নয়, তবে সরকারের কাছে বিক্রি করা জায়েয। (ایضا)

* গোবর বিক্রি করা জায়েয। (ایضا)

* পায়খানা বিক্রি করা জায়েয নয়, তবে মাটি হয়ে গেলে এবং মাটি প্রবল হয়ে গেলে বিক্রি করা জায়েয। (ایضا)

* কিস্তিতে (অধিক মূল্যে হলেও) ক্রয় বিক্রয় করা জায়েয, তবে পূর্ণ কিস্তি পরিশোধ না করলে বিক্রিত দ্রব্য ফেরত গ্রহণ ও বিগত প্রদত্ত কিস্তির টাকা বাজেয়াপ্ত করার শর্ত আরোপ করা হলে সেরূপ বিক্রয় নিষিদ্ধ। (احسن الفتاوی ج ٦)

* ক্রেতা ক্রয় করতে অস্বীকার করলে জমি ইত্যাদির বায়নার টাকা ফেরত দেয়া জরুরী। তবে বায়না করার পর বিক্রেতার সম্মতি ছাড়া ক্রেতার ক্রয় করতে অস্বীকার করার অধিকার নেই। (ایضا)

* রেডিও, টেপরেকর্ডার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে মাসআলা হল– যদি গান বাজনা ইত্যাদি গোনাহের কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে ক্রয় করা জায়েয নয় এবং এরূপ ক্রেতার নিকট বিক্রয় করাও জায়েয নয়। অন্যথায় জায়েয। (ایضا)

* টেলিভিশন ক্রয়-বিক্রয় মাকরূহ তাহরীমী (যা হারামের কাছাকাছি)।
(احسن الفتاوی ج ٦)

* মদ, গাজা, হেরোইন প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। আফিম যেহেতু ঔষধে ব্যবহৃত হয় তাই বিক্রয় করা জায়েয, তবে যে এটা দ্বারা নেশা করবে বলে প্রবল ধারণা হয় তার নিকট বিক্রয় করা মাকরূহ তাহরীমী ও নাজায়েয।
(احسن الفتاوى ج ٦)

* ব্লাক করা আইনত অপরাধ। (فتاوى محموديه ج/ ٤)

* বিড়ি সিগারেট বিক্রয় করা জায়েয, তবে বিড়ি সিগারেট সেবন যেহেতু মাকরূহ তাই এগুলো বিক্রি করা মাকরূহ কাজে সহযোগিতা করার নামান্তর। অতএব এ থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

* ছেড়া ফাটা টাকা (নোট)-এর বদলায় ভাল টাকা (নোট) কম বেশী করে বদলানো দুরস্ত নয়। (فتاوى محموددية ج ٤)

* বাদ্যযন্ত্র ক্রয়-বিক্রয় না জায়েয। (احسن الفتاوى ج ٦)

* বিধর্মীদের বইপত্র, বাতিলপন্থীদের বইপত্র বিক্রয় করা জায়েয নয়। (ايضا)

* এল, সি খুলে ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশ থেকে যে মাল আমদানী করা হয় সেই মাল পৌছার পূর্বে যে ইনভয়েস ও বিল অফ লেডিং হস্তগত হয় তার ভিত্তিতে মাল পৌছার পূর্বেই মাল বিক্রয় করা জায়েয। (ايضا)

* খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম বিক্রয় করা জায়েয নয়।

* সরকার স্মাগলিং বা চোরাই ভাবে আমদানীকৃত মালামাল আটক পূর্বক সেগুলো নিলামে বিক্রয় করলে সেগুলো ক্রয় করা জায়েয নয়। কারণ সরকার সেগুলোর মালিক নয়। (احسن الفتاوى ج/ ٦)

* ডিপো হোল্ডারের পক্ষে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্য গ্রহণ করা জায়েয নয়। (ايضا)

* বর্তমানে প্রচলিত কৌটা ও প্যাকেটে বিভিন্ন মালের যে ওজন লেখা থাকে সেই ওজন ধরে নিয়ে ঐ মাল উক্ত ওজনের মূল্যে বিক্রয় করা জায়েয। গ্রাহককে মেপে দেয়া জরুরী নয়। (ايضا)

* লটারির টিকিট ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়।

* প্রাইজবণ্ড ক্রয় করা জায়েয নয়।

* সুদ ভিত্তিক ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ফিক্সড ডিপোজিট, ডিপোজিট পেনশন স্কীম, এমনিভাবে প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র প্রভৃতি পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করা বৈধ নয়, কারণ এগুলো সুদের হিসাবে পরিচালিত।

* আইনতঃ নিষিদ্ধ না হলে ব্যাংকের বাইরে ডলার, পাউণ্ড ইত্যাদি বেশী মূল্যে বিক্রি করা জায়েয, যদি তাতে মুসলমানদের ক্ষতি না হয়।
(فتاوى محموديه ج/ ٤)

* বৈদেশিক মুদ্রা যেমন ডলার, পাউণ্ড ইত্যাদি সরকার নির্ধারিত মূল্যের বেশী মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয। (فقهی مقالات)

* যখন কোন কোম্পানির শেয়ার প্রাথমিকভাবে ইস্যু (Subscribe) হয় তখন তা ক্রয় করা জায়েয এই শর্তে যে, সে কোম্পানির মূল কারবার হারাম হতে পারবে না। যেমন ইন্সুরেন্স কোম্পানি বা সুদ ভিত্তিক ব্যাংক বা মদের ফাক্টরী ইত্যাদি হতে পারবে না। (فقهی مقالات)

* স্টক মার্কেট থেকে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ও শেয়ার ব্যবসা চারটি শর্তে জায়েয। যথা ঃ

(১) যে কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হবে সেটা মৌলিকভাবে হারাম কারবার করে না।

(২) কোম্পানির কিছু স্থায়ী সম্পত্তি (Fixd Assets) থাকতে হবে, যেমন বিল্ডিং ভূমি ইত্যাদি। যার সম্পূর্ণ পুঁজি এখনও তরল সম্পদে (Liquid Assets) রয়ে গেছে তার শেয়ার ফেস ভ্যালু (Face Value) থেকে কম বা বেশীতে বিক্রি করা জায়েয নয়।

(৩) কোম্পানি কোন সুদী লেন-দেনের সাথে জড়িত থাকলে বাৎসরিক মিটিংয়ে সুদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে, যদিও তার আওয়াজ Overrule (অগ্রাহ্য) হয়ে যায়।

(৪) মুনাফা বন্টন হওয়ার সময় যতটুকু সুদী ডিপোজিট থেকে অর্জিত হবে ততটুকু সদকা করে দিতে হবে- তা ভোগ করতে পারবে না। মুনাফা (Dividend)-এর কত হার সুদী ডিপোজিট থেকে অর্জিত হয় তা কোম্পানির ইনকাম স্টেটমেন্ট (Income Statment) থেকে জানা যায়।

* স্টক এক্সচেঞ্জে অনেক সময় শেয়ারের লেন-দেনের উদ্দেশ্যে নয় বরং পারস্পরিক ডিফারেন্স (Difference) দূর করার উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে, এরূপ ক্ষেত্রে শেয়ার ডেলিভারীও করা হয় না এবং সেটা উদ্দেশ্যও থাকে না বরং শুধু উদ্দেশ্য থাকে ডিফারেন্স দূর করা। এরূপ উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বনাম জুয়া খেলা সম্পূর্ণ হারাম। (فقهی مقالات)

* কারও নামে শেয়ার বরাদ্দ হওয়ার পর শেয়ার সার্টিফিকেট ডেলিভারী পাওয়ার পূর্বেও তা ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয। (ایضا)

* ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। কারণ তা সুদ ভিত্তিক।

* বাণিজ্যিক নাম ও ট্রেডমার্ক বিক্রি করা জায়েয তিন শর্তেঃ

(১) উক্ত নাম ও ট্রেডমার্ক সরকারী আইনে রেজিষ্টার্ড হতে হবে।

(২) উক্ত নাম ও ট্রেডমার্ক ক্রয়কারীকে ঘোষণা দিতে হবে যে, এখন থেকে এই নাম ও ট্রেডমার্কে পূর্বের অমুক ব্যক্তি ও অমুক প্রতিষ্ঠান দ্রব্য তৈরি ও বাজারজাত করবে না বরং অন্যরা করবে।

(৩) উক্ত নাম ও ট্রেডমার্ক ক্রয়কারী যথাসাধ্য পণ্যের সাবেক মান রক্ষা করার কিম্বা আরও অধিক মানসম্পন্ন দ্রব্য উৎপাদন করার চেষ্টা করবে।

(فقہی مقالات)

* ইমপোর্ট এক্সপোর্ট লাইসেন্স ও যে কোন বাণিজ্যিক লাইসেন্স বিক্রি করা জায়েয, যদি রাষ্ট্রীয় আইনে উক্ত লাইসেন্স হস্তান্তর করাতে কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকে। (ایضا)

* ইনডেন্টিং বিজনেস বা কমিশন এজেন্সির কারবার বৈধ। এটা দু' ধরনের হতে পারে

(১) এজেন্ট মূল কোম্পানি থেকে মাল ক্রয় করে বিক্রি করবে এবং কোম্পানি থেকে শতকরা পারসেনটিজ গ্রহণ করবে। এটা জায়েয এই শর্তে যে, প্রথমে এজেন্টকে মাল হস্তগত করতে হবে তারপর ক্রেতাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। নিজের গাড়ি, লরি, ট্রাক ইত্যাদিতে মাল বুঝে নেয়াও হস্তগত করার শামিল। হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করা বৈধ নয়, যেমন ক্রেতা প্রস্তুত করে ক্রেতাকে কোম্পানির গোডাউনে নিয়ে যাওয়া হল আর ক্রেতা তার নিজস্ব গাড়িতে/বাহনে মাল বুঝে তুলে নিয়ে আসল। এ ক্ষেত্রে যেহেতু এজেন্ট মাল হস্তগত করার পূর্বেই বিক্রি করল, তাই এটা জায়েয নয়। এল, সি খুলে বিদেশ থেকে মাল আনা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের বিদেশস্থ শাখা কর্তৃক মাল বুঝে গ্রহণ করা নিজের হস্তগত করার শামিল।

(২) কখনও এরকম হয় যে, এজেন্ট শুধু ক্রেতাদেরকে উৎসাহিত ও প্রস্তুত করে এবং সেই ক্রেতাগণ সরাসরি মূল কোম্পানির সাথে ক্রয়ের চুক্তি করে। আর ক্রেতাদেরকে এই উৎসাহিত করার বিনিময়ে কোম্পানি এজেন্টকে শতকরা হারে কিছু বেনিফিট দিয়ে থাকে। এ পদ্ধতিও বৈধ।

(جدید فقہی مسائل ج/۱ واحسن الفتاوی ج/٦)

* টিকিট কেটে বড়শি দিয়ে মাছ ধরার যে পদ্ধতি বর্তমানে দেখা যায় তা বৈধ নয়। (ایضا)

চাকুরীজীবিদের বিষয়ে কয়েকটি মাসআলা

* কোন পদে লোক নিয়োগের জন্য ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। এ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৫২৫ পৃষ্ঠা

* অমুসলিম/কাফের সরকারের অধীনে চাকুরী করার বিধান সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন পৃষ্ঠা ৫২৬।

* যে সব প্রতিষ্ঠানে অবৈধ কাজকর্ম হয় সেখানে চাকুরী করা বৈধ নয় এবং সেখান থেকে অর্জিত বেতন/ভাতাও হালাল নয়। যেমন সিনেমা-বাইস্কোপ, পূর্ণ সুদ ভিত্তিক ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। তবে ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন, যার হালাল উপায়ে জীবিকা নির্বাহের কোনই উপায় নেই অনন্যোপায় অবস্থায় বিকল্প হালাল ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য ব্যাংক বীমা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা এবং সেখান থেকে বেতন/ভাতা গ্রহণ করা জায়েয হবে।

(احسن الفتاوى ج/۷ - فتاوى رحيميه ج/۲ - وجديد فقهى مسائل ج/۱ وغيره)

* প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের অর্থ (মূল ও বর্ধিত অংশ সহ) গ্রহণ করা জায়েয়। তবে চাকুরীজীবি স্বেচ্ছায় যে অংশ কর্তিত করাবে, সে ক্ষেত্রে তাকওয়া হল তার উপর অর্জিত বর্ধিত অংশ ভোগ না করা।

* কোন চাকুরী গ্রহণের উদ্দেশ্যে উলঙ্গ হয়ে মেডিকেল করানো বৈধ নয়।

(فتاوى محموديه ج/٦)

* চাকুরী ঠিক রাখার জন্য বা চাকুরীতে কোন সুযোগ, সুবিধা লাভ করার জন্য ভ্যাসেকটমি/লাইগেশন করা নাজায়েয ও হারাম। (ايضا)

* চাকুরী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে যদি এই নিয়ম থাকে যে, চাকুরী ছাড়তে হলে এক মাস বা এরকম কোন নির্দিষ্ট সময় পূর্বে মৌখিক/ লিখিতভাবে প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করতে হবে, তাহলে নিয়ম ভঙ্গ করলে চাকুরীজীবির পাপ হবে, তবে প্রতিষ্ঠান এর জন্য চাকুরীজীবি থেকে কোন ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে না কিম্বা চাকুরীজীবিকে উক্ত এক মাসের বেতন ফেরত দিতে হবে না।

(احسن الفتاوى ج/٧)

* চাকুরী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যদি শর্ত আরোপ করে যে, অন্ততঃ এক বৎসর/বা নির্দিষ্ট এত সময় পূর্বে চাকুরী ছাড়তে পারবে না, তাহলে শরীয়ত সম্মত ওযর ব্যতীত সে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে চাকুরী ছাড়লে শক্ত গোনাহগার হবে, তবে যত দিন চাকুরী করেছে, তার বেতন/ ভাতা সে পাবে। (ايضا)

* নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিছক অযোগ্যতার কারণে কোন চাকুরীজীবিকে বরখাস্ত করা হলে অবশিষ্ট সময়ের বেতন/ ভাতা সে পাবে না।

(ايضا)

* চাকুরীজীবি নির্দ্ধারিত ছুটির বাইরে যে কয়দিন ছুটি কাটাবে তার বেতন/ভাতা সে পাবে না। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ছুটির দিন নির্দিষ্ট করা না থাকলে অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক রেওয়াজ কি তা দেখা হবে।

* এক বৎসর নির্দ্ধারিত ছুটি না কাটালে বা কম কাটালে পরর্বতী বৎসর বিগত বৎসরের বকেয়া ছুটি ভোগ করার দাবী করতে পারবে না।

(احسن الفتاوی ج: ٧)

* নির্দ্ধারিত ছুটি ভোগ না করে সে ছুটির সময় ডিউটি পালন করার জন্য অতিরিক্ত বেতন/ভাতা দাবী করা যায় না। (ايضا)

* অফিস টাইমে ব্যক্তিগত কাজ করা এমন কি একটি ব্যক্তিগত চিঠি-পত্র লেখাও জায়েয নয়। তবে অফিসের কোন কাজ না থাকলে ভিন্ন কথা।

(امداد الفتاوی ج: ٣)

* মাদ্রাসার মুদাররিছ (বা স্কুল কলেজের শিক্ষক) যে ঘন্টায় তার ক্লাশ নেই তখন ব্যক্তিগত কাজ করতে পারে বা অন্যের কোন কাজ করে দিতে পারে।

(العلم والعلماء)

চাকুরী বা বসবাসের জন্য বিদেশ গমনের মাসায়েল

* নিজের দেশে এবং নিজের শহরে অন্যান্য লোকদের ন্যায় জীবন জীবিকা চালানোর মত আয় উপার্জনের ব্যবস্থা থাকলে শুধু মাত্র জীবনের ষ্টান্ডার্ড বৃদ্ধির জন্য এবং বিলাসী জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে কোন অমুসলিম দেশে গমন করা মাকরূহ।

* সমাজে সম্মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বা অন্যান্য মুসলমানের উপর বড়ত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বা বিজাতীয় কৃষ্টি সভ্যতার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে কোন অমুসলমান দেশে বসতি গ্রহণ করা হারাম।

* নিজের দেশে থেকে ন্যুনতম জীবন জীবিকার ব্যবস্থাও করতে না পারলে যদি কোন অমুসলিম দেশে কোন বৈধ চাকুরী পাওয়া যায় তাহলে সেখানে যাওয়া ও থাকা জায়েয দুইটি শর্তেঃ (১) সেখানে গেলে ঈমান আমল রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে এতমীনান থাকতে হবে। (২) সেখানে প্রচলিত অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

* কোন অপরাধ ছাড়া নিজের দেশে জেল জরিমানা বা সম্পদ বাজেয়াপ্ত হওয়ার মত পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেও অমুসলিম দেশে বসবাস করতে যাওয়া জায়েয উপরোক্ত দুইটি শর্তে।

* অমুসলিমদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে হলে অমুসলিমদের দেশে বসবাস করতে যাওয়া জায়েয বরং উত্তম। (فقہی مقالات)

কয়েকটি আধুনিক পেশা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান

* উকালতির পেশা জায়েয, তবে শর্ত এই যে, সত্য কেচ গ্রহণ করবে অর্থাৎ, যে মক্কেল ন্যায়ের উপর রয়েছে তার কেচ পরিচালনা করবে। মিথ্যা মোকদ্দমা পরিচালানা করা জায়েয নয় এবং তার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করাও হারাম।

(امداد الفتاوى ج ٣)

* আইনজীবিদের জন্য আইন বিষয়ক পরামর্শ দিয়ে অর্থ গ্রহণের পেশা বৈধ।

(جديد فقهى مسائل ج ١)

* ফটোগ্রাফারের পেশা বৈধ নয়, কারণ প্রাণীর ছবি তোলা জায়েয নয়।

(جديد فقهى مسائل ج ١)

* ঔষধ দেয়া ছাড়াও শুধু ব্যবস্থা বলে দিয়ে বা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে রোগী থেকে অর্থ গ্রহণের পেশা বৈধ। (ايضا)

* নাচ, গান, বাদ্য-বাজনা, অভিনয় ইত্যাদির পেশা বৈধ নয়।

* টেলিভিশন ও গান বাদ্যের উপকরণ মেরামতের পেশা বৈধ নয়। রেডিও মেরামতের ব্যাপারে মাসআলা হলঃ যদি জানা থাকে রেডিও মালিক রেডিওকে খবর শোনার কাজে ব্যবহার করেন-গানবাদ্য শোনার কাজে ব্যবহার করেন না, তাহলে তার রেডিও মেরামত ও তার বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ।

(امداد الفتاوى ج /٣ . واحسن الفتاوى ج /٧)

* ভিসিআর, ভিসিপি, ক্যামেরা প্রভৃতির মাসআলা টেলিভিশনের ন্যায়, আর মাইকের মাসআলা রেডিওর ন্যায় হওয়া যুক্তিসংগত। (লেখক)

* ঘড়ি ও চশমা মেরামতের পেশা বৈধ।

* সাংবাদিকতার পেশা বৈধ, তবে সাংবাদিক তথা পত্র পত্রিকার কর্মকর্তাদেরকে নিম্নোক্ত নীতিমালা মেনে চলতে হবে, অন্যথায় পাপী হতে হবে।

(১) শরয়ী প্রমাণ ব্যতীত এমন কোন ঘটনা ছাপা যাবে না যাতে কারও দোষ প্রকাশ পায়, কারও বিপদের কারণ ঘটে। কেননা কোন কাফের সম্পর্কেও মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা জায়েয নয়।

(২) কোন ঘটনা প্রমাণিত হওয়ার জন্য শুধু লোক মুখের রটনা বা কোন পত্র পত্রিকা বা প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়াকে যথেষ্ট মনে করবে না। তবে সে ঘটনায় যদি কারও কোন দোষ বদনাম না থাকে তাহলে এতটুকু প্রমাণকে যথেষ্ট মনে করা যায়।

(৩) কারও কোন দোষ বদনাম বিষয়ক সংবাদ ছাপা জায়েয নয়, যদিও তা শরয়ী প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় বরং কারও কোন দোষ সম্পর্কে অবগত হলে

গোপনে সংশোধনের নিয়তে তাকে বলে দিতে হবে– সে সংবাদ প্রচার করে তাকে লাঞ্ছিত করা অন্যায়। তবে হা, কেউ মাজলূম হলে মাজলূমের দুরাবস্থা তুলে ধরা এবং জালেমের বিরুদ্ধে বলা জায়েয এবং তাও এই নিয়তে যেন মাজলূমের সাহায্য হয়।

(৪) মানুষকে উপদেশ প্রদান ও সতর্ক করার নিয়তে কোন দোষ বদনামের কথা বলা যায়।

(৫) পত্র-পত্রিকায় কারও নামে তার লেখা প্রতিবাদযোগ্য কোন বিষয় প্রকাশিত হলে, তার ব্যক্তির উপর আক্রমণ না করে শুধু বিষয়টার প্রতিবাদ বা জওয়াব দিয়ে দিতে হবে। কেননা কারও নামে কোন লেখা শুধু প্রকাশিত হওয়াই প্রকৃতপক্ষে এটা তার লেখা-এর প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট নয়।

(৬) যে সংবাদে কারও কোন দোষ বদনাম নেই বা যেটা কারও জন্য ক্ষতিকর নয় এরূপ বিষয় এই শর্তে ছাপা জায়েয যে, তা কোন মুসলমান ব্যক্তি বিশেষ বা মুসলমান জাতির স্বার্থ ও কল্যাণ বিরোধী হতে পারবে না।

(৭) শরীয়ত বিরোধী বা বাতিলপন্থীদের চিন্তাধারা সম্বলিত কোন লেখা প্রকাশ করা যাবে না। বিশেষ প্রয়োজনে ছাপা হলেও সেই দিন এবং সেই সংখ্যাতেই তার প্রতিবাদ ও জওয়াব ছাপতে হবে। পরের কোন সংখ্যার অপেক্ষা করা যাবে না এ জন্য যে, হতে পারে কেউ শুধু এ সংখ্যাটিই পড়বে-পরের সংখ্যা পড়বে না। তাহলে এ সংখ্যার লেখা তার গোমরাহীর কারণ হতে পারে। আর এর জন্য দায়ী হবে এই পত্রিকার কর্মকর্তাগণ।

(৮) শরয়ী দলিলে যদি মুসলমানদের উপর কাফেরদের জুলুম অত্যাচার প্রমাণিত হয়, তাহলে সে সংবাদ এমনভাবে প্রচার করতে হবে যাতে সেই মুসলমানদের সাহায্য সহযোগিতার (বৈধ পদ্ধতিতে) আহ্বান থাকবে।

(৯) পত্র পত্রিকার সম্পাদক সর্বদা এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে হবে যিনি ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে পারদর্শী অথবা অন্ততঃ উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নেয়ায় অভ্যস্ত এবং ধর্মের প্রতি অনুরক্ত।

(১০) ধর্মের জন্য ক্ষতিকর বই পত্র ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হারাম ঔষুধ বা যে কোন ভাবে শরীয়তে নিষিদ্ধ কোন বিষয়ের বিজ্ঞাপন বা এশতেহার প্রকাশ করা যাবে না। (جواهر الفقه ج ٢ ও গীবত গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

* ইলেকট্রিক কাজের পেশা বৈধ তবে সিনেমা, সুদ ভিত্তিক ব্যাংক, বীমা কোম্পানি প্রভৃতি অবৈধ প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রিকের কাজ করা বা যে কোন স্থানে অবৈধ সংযোগ লাগিয়ে দেয়া বৈধ নয়।

বাড়ি/গৃহ নির্মাণ সম্পর্কিত নীতিমালা ও মাসায়েল

* উত্তম প্রতিবেশী দেখে তার পাশে বাড়ি/গৃহ নির্মাণ করতে হবে। তাহলে সে বাড়িতে বসবাস শান্তিদায়ক হবে।

* হারাম অর্থে বাড়ি/গৃহ বানাবে না। হারাম অর্থে নির্মিত বাড়ি/গৃহে বসবাস করা মাকরূহ তাহরীমী (فتاوى رشيدية)

* সুদ ভিত্তিক লোন নিয়ে বাড়ি/গৃহ নির্মাণ করা নাজায়েয, তাহলে সে বাড়ি/গৃহে বরকত হবে না। (فتاوى رحيميه ج ۲)

* গৃহ নির্মাণের সময় নিয়ত রাখতে হবে যে, এতে আল্লাহর ইবাদত করা যাবে এবং শীত গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা ও ইজ্জত আবরু ইত্যাদি হেফাজত করা যাবে।

* ঘর বা বিল্ডিংয়ের প্রতি তলা যতটুকু উঁচু হলে প্রয়োজন সম্পন্ন হয় তার চেয়ে বেশী উঁচু না করা সুন্নাত। (شرعة الاسلام)

* ঘর/বিল্ডিংয়ে কোন প্রাণীর ছবি/মূর্তি বানানো নিষেধ।

* বাড়ি/গৃহে পেশাব-পায়খানা, গোসলখানা ও উযূখানা বানানো সুন্নাত। (مفاتيح الجنان)

* পেশাব-পায়খানার স্থান এমনভাবে বানাবে যেন বসতে গিয়ে কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ না হয় এবং যেন বসে পেশাব করা যায়।

* বাথরূমে পেশাব পায়খানার স্থান ও উযূ গোসলের স্থানের মধ্যে দেয়াল বা পার্টিশন দিয়ে আলাদা করে নিবে, যাতে উযূ গোসলের সময় দুআগুলি পড়া যায়। আলাদা না থাকলে উযূ গোসলের স্থানকেও পেশাব পায়খানার ঘরের অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে এবং সেখানে দুআ দুরূদ বা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা যাবে না।

* উযূর স্থান এমনভাবে বানাবে যেন উযূর জন্য উচুঁতে কেবলামুখী হয়ে বসে উযূ করা যায়। কোন রূমের পশ্চিম দেয়ালে বেসিন লাগাবে না। কেননা বেসিনে কফ, থুতুও ফেলা হয়ে থাকে; তাই পশ্চিম দেয়ালে বেসিন লাগালে কেবলামুখী হয়ে কফ থুতু ফেলানো হবে, যা বেআদবী। থুকদানী রাখার ব্যাপারেও এদিকে খেয়াল রাখবে। একান্ত যদি পশ্চিম দেয়ালে এগুলো থাকে তাহলে কফ থুতু ফেলার সময় মাথা নীচু করে নিবে, তাহলে বে-আদবী থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

* বাড়ি/গৃহে মেহমানখানা বা গেষ্টরূম রাখাও সুন্নাত।

* মেহমানখানা যথাসম্ভব এমন স্থানে বা এমন পার্শ্বে রাখবে, যেখানে গায়র মাহরাম পুরুষেরা ঘরের মহিলাদের স্বাভাবিক আওয়াজ শুনতে না পায় বা মহিলাদের পর্দার ব্যাঘাত না ঘটে।

* যথাসম্ভব গৃহ বা দেয়াল এমনভাবে বানানো, যাতে অহেতুক প্রতিবেশীর বাতাস বন্ধ হয়ে না যায়।

ঘর/বাড়ি/দোকান ইত্যাদি ভাড়া দেয়ার মাসায়েল

* কোন মুসলমানের পক্ষে অমুসলিম/কাফেরের নিকট বাড়ি/ ঘর/ অফিস/দোকান ভাড়া দেয়া মাকরূহ তানযীহী। (احسن الفتاوى ج/ ٧)

* কোন অবৈধ কারবার চালানোর জন্য বাড়ি/ঘর ইত্যাদি ভাড়া দেয়া মাকরূহ তাহরীমী, যা হারামের নিকটবর্তী। যেমন সুদ ভিত্তিক ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, সিনেমা ইত্যাদির জন্য ভাড়া দেয়া। (احسن الفتاوى ج ٧)

* যাদের উপার্জন অবৈধ, তাদের নিকট বাড়ি ভাড়া দেয়া মাকরূহ। এরূপ অবস্থায় ভাড়াটে তার হারাম অর্থ থেকে যে ভাড়া পরিশোধ করবে, তা ব্যবহার করা বাড়ি মালিকের জন্য জায়েয হবে না। এরূপ অর্থ ছদকা করে দেয়া ওয়াজিব। (احسن الفتاوى ج ٧)

* ভাড়ার মেয়াদ একত্রে নির্ধারণ করতে পারে বা ভেঙ্গে ভেঙ্গে সপ্তাহ বা মাস বা বৎসর এভাবেও নির্ধারণ করতে পারে, উভয় পদ্ধতিই জায়েয।

* ভাড়ার মেয়াদ নির্ধারিত থাকলে সেই নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ভাড়া বৃদ্ধি করা জায়েয নয়; যদিও মালিক ইতিমধ্যে মেরামত ইত্যাদি কাজে অর্থ ব্যয় করে থাকে। আর ভাড়ার মেয়াদ নির্ধারিত না থাকলে প্রতি মাসের শুরুতে মালিক বর্ধিত ভাড়া প্রদান বা ঘর/বাসা/ দোকান ইত্যাদি খালি করে দেয়ার জন্য দাবী জানাতে পারে এবং এই অতিরিক্ত ভাড়ায় গ্রহণ করার মত অন্য ভাড়াটে পাওয়া গেলে তখন মালিকের দাবীকৃত অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করা পুরাতন ভাড়াটের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। সে এই অতিরিক্ত ভাড়া না দিতে পারলে ঘর/বাসা/দোকান ইত্যাদি খালি করে দিবে। (احسن الفتاوى ج ٧)

* ভাড়ার মেয়াদ নির্ধারিত থাকলে সেই মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ভাড়াটেকে বাসা/ঘর/দোকান খালি করে দেয়ার জন্য বাধ্য করতে পারবে না। (ايضا) তবে শরীয়ত সম্মত ওযর থাকলে তা পারবে। (هداية)

* ভাড়া দেয়া ঘর/দোকান ইত্যাদির সংস্কার ও মেরামত, পথের সুবিধা এবং ভাড়াটিয়ার অন্যান্য অসুবিধাসমূহ দূর করা মালিকের কর্তব্য। (ইসলামী ফিকাহঃ৩য়)

* ভাড়ার চুক্তি হওয়ার পর কিছু অগ্রিম বা বায়না গ্রহণ করলে এবং পরে ভাড়াটিয়া ভাড়া নিতে না চাইলে গৃহীত অগ্রিম/বায়নার টাকা ফেরত দিতে হবে।

* পজেশন (Possession) ক্রয় বিক্রয় করা জায়েয। (الفقه الاسلامی وادلته)

* ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দখল বুঝে নেয়া মালিকের দায়িত্ব।

* মাস মাস বা পর্যায়ক্রমে ভাড়া থেকে কেটে দেয়া হবে এই শর্তে এডভান্স (Advance) গ্রহণ করা জায়েয। (عالمگیریة ج ٤)

ঘর/বাড়ি/দোকান ইত্যাদি ভাড়া নেয়ার মাসায়েল

* অবৈধ অর্থে নির্মিত ঘর/বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাতে বসবাস করা মাকরূহ তাহরীমী। (فتاوی رشیدیة)

* মাস ভিত্তিক ভাড়া নেয়ার পর মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি বাড়ি/ঘর ছেড়ে দেয় এমতাবস্থায় দেখতে হবে যদি শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত সে ছেড়ে দেয় তাহলে পূর্ণ মাসের ভাড়া তাকে দিতে হবে। আর যদি শরীয়ত সম্মত কোন নির্ভরযোগ্য ওযর বশতঃ ছাড়ে, তাহলে ছাড়ার পূর্বে মালিকের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে নিবে এবং মালিক উক্ত ভাড়াটিয়া থেকে যে কয়দিন সে দখলে রেখেছে তার ভাড়াই নিতে পারবে- পূরা ভাড়া নিবে না। ভাড়ার মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকলে সেই নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বে ঘর খালি করে দিলেও এই হুকুম।

(امداد الفتاوی ج ٣ واحسن الفتاوی ج ٧)

* ভাড়াটিয়া নিজের পক্ষ থেকে ভাড়ার ঘর/দোকানে কোন সংযোজন/নির্মাণ কাজ করলে মালিকের প্রাপ্য ভাড়া থেকে সেটা কেটে দিতে পারবে না। এরূপ হলে ঘর/দোকান ছেড়ে দেয়ার সময় তার সংযোজনকৃত অংশগুলো সে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যেতে পারবে। আর মালিকের অনুমতিক্রমে এরূপ করলে ভাড়া থেকে কেটে দিতে পারবে।

* ভাড়াটিয়ার জন্য মালিকের অনুমতি ব্যতীত অন্যের কাছে ভাড়া দেয়া বা অন্যকে দখল দেয়া জায়েয নয়। (فتاوی رحیمیه ج ٢)

* বাড়ি/দোকান ইত্যাদির দখল মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কোন বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নয়।

* ভাড়া নেয়া বাড়ী/দোকান নষ্ট করে ফেললে অথবা অত্যাধিক দুর্গন্ধময় ও ময়লাযুক্ত করে ফেললে মালিক উক্ত ভাড়াটিয়াকে তুলে দিতে পারবে। (ইসলামী ফেকাহঃ ৩য়)

* বাড়ী/দোকান ভাড়া নিয়ে ব্যবহার না করলেও যতদিন দখলে রাখবে তত দিনের ভাড়া দিতে হবে। (ঐ)

* ভাড়াটিয়া বা মালিকের কেউ মারা গেলে পূর্বের ভাড়া চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং ওয়ারিছদের নতুনভাবে কারবার চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। (هداية)

* বাসা ভাড়া নেয়ার পর যদি এমন কোন অসুবিধা দেখতে পায় যাতে থাকার অসুবিধা, তাহলে সে চুক্তি বাতিল করতে পারে। (هداية ج ٣)

যানবাহনের ভাড়া দেয়া/নেয়া সম্পর্কিত মাসায়েল

* কোন যানবাহন ভাড়া (রিজার্ভ) নিয়ে তার স্বাভাবিক ক্যাপাসিটির বাইরে লোক/ মাল বোঝাই করা যাবে না। তবে মালিক যদি চায় বা সম্মত হয় তাহলে তার সে অধিকার আছে। (ইসলামী ফিকাহঃ ৩য়)

* কোথাও যাতায়াতের জন্য রিকসা মোটর বা অন্য কোন যানবাহন ভাড়া নেয়ার পর মতের পরিবর্তন হলে রিকসা বা মোটর ফেরত দেয়া যায়। কিন্তু রিকসার প্রচুর সময় ব্যয় করে থাকলে অথবা মোটরে কিছু পথ অতিক্রম করে থাকলে ঐ সময়ের মজুরী/জ্বালানীর দাম দিতে হবে।

* যে পর্যন্ত যাওয়ার ভাড়া করা হয়েছে অথবা টিকেট নেয়া হয়েছে যাত্রী তার চেয়ে বেশী গেলে তাকে আনুপাতিক হারে জরিমানা (অতিরিক্ত ভাড়া) দিতে হবে।

* যানবাহন কোন নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয়ার শর্তে ভাড়া নেয়ার পর পথে তা নষ্ট/অকেজো হয়ে পড়লে ওয়াদাকৃত স্থানে পৌঁছে দেয়া মালিকের দায়িত্ব। যদি যাত্রীদের বিলম্ব/ অপেক্ষা করার অবকাশ না থাকে, তাহলে যে পরিমাণ পথ সে অতিক্রম করেছে তার ভাড়া পরিশোধ করে অন্য যানবাহনে যেতে পারবে। মালিক ভাড়া অগ্রিম নিয়ে থাকলে তার কর্তব্য বাকীটুকু ফেরত দেয়া। (ইসলামী ফেকাহঃ ৩য়)

* কেউ মোটর, রিকসা বা কোন যানবাহন ভাড়া নিলে কি কাজের জন্য, কি মাল বহন করার জন্য এবং তা কত সময় বা কত দূরত্বের জন্য তা পরিষ্কার ভাবে বলে নিতে হবে। যাতে পরে কোন বিরোধ/সংঘর্ষ দেখা না দেয়। (ঐ)

* ভাড়াটিয়া শেষ পর্যন্ত ভাড়া না নিলে অথবা যানবাহন ব্যবহার না করলে গৃহীত অগ্রিম টাকা মালিকের হবে-এই শর্তে ভাড়ার অগ্রিম লেন-দেন জায়েয নেই। (ঐ)

* রেলগাড়ী, ট্রাক, ঠেলাগাড়ী প্রভৃতিতে যে ধরনের ও যে পরিমাণ মালামাল বোঝাই করার অর্ডার নেয়া হয়েছে বা যার চুক্তি হয়েছে, তার চেয়ে বেশী পরিমাণ দ্রব্য বোঝাই করা জায়েয নয়। এমনিভাবে যাত্রীর সাথে যে পরিমাণ মাল নেয়ার সুযোগ কর্তৃপক্ষ দেয়, চুরি করে তার চেয়ে বেশী নেয়া জায়েয নয়। (ঐ)

* কারও মালামাল নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয়ার অর্ডার নিলে সেখানে পৌঁছে দেয়া এবং পৌছানো পর্যন্ত ভাঙ্গা চুরা ও নষ্ট হওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব যানবাহনওয়ালার উপর বর্তায়। আর কোন জীবজন্তু পাঠালে তার খাদ্য, মাছ পাঠালে তাতে বরফ দেয়া অথবা ডিম পাঠালে তা শীতল রাখার ব্যবস্থা করা মালিকের উপর বর্তাবে। মোটকথা–মালামালের নিরাপত্তার দায়িত্ব যানবাহন কর্তৃপক্ষের এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব মালিকের। (ঐ)

* নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার জন্য কোন যানবাহন রিজার্ভ করলে বা ট্রেনের সিট রিজার্ভ করলে উক্ত সময়ের মধ্যে বা সে দূরত্বের মধ্যে অন্য কাউকে চড়তে না দেয়ার অধিকার এসে যায়। (ঐ)

হক্কে শোফআর মাসায়েল

১। তোমার জমিতে হামেদ শরীক বা পাশ-আলিয়া প্রতিবেশী। এমতাবস্থায় তুমি যদি ঐ জমি বিক্রয় করতে চাও তবে হামেদ খরিদ করতে চাইলে অন্যে নিতে পারবে না। এই যে হামেদের দাবী, এই দাবীকে 'হক্কে শোফআ' (Pre-emption) বা অগ্রক্রয়াধিকার বলে এবং হামেদকে তোমার 'শফী' বলা হবে।

২। হামেদ যদি 'হক্কে শোফআর' দাবী চায় তবে হামেদের এতটুকু করতে হবে যে, বিক্রয় সংবাদ শুনা মাত্রই অবিলম্বে মুখ দিয়ে বলতে হবে যে, "আমি ঐ জমি কিনব।" যদি কিছু মাত্র দেরী করে বলে তাহলে তার দাবী অগ্রাহ্য হবে অর্থাৎ 'হক্কে শোফআর' দাবী করা তার জন্য জায়েয হবে না। এমনকি একখানা চিঠিতে শুরুতে যদি জমি বিক্রয়ের কথা থাকে এবং সে চিঠিখানা শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে বলে যে, 'আমি ঐ জমি নিব, তবুও তার দাবী অগ্রাহ্য হবে।

৩। শফী (পাশ আলিয়া প্রতিবেশী) যদি বলে যে, আমাকে এত টাকা দাও আমি আমার 'হক্কে শোফআর' দাবী ছেড়ে দেই, তবে হক্কে শোফআর দাবীতো সে আর করতে পারবেই না, অধিকন্তু টাকাও পাবে না; কেননা তা রেশওয়াত। (ঘুষ)

৪। আদালতে হুকুম হওয়ার পূর্বেই শফী মারা গেলে শফীর ওয়ারেছরা 'হক্কে শোফআর' দাবী করতে পারবে না; কিন্তু খরিদ্দার মারা গেলে শফীর হক্ক বাতিল হয় না।

৫। শফী (পাশ আলিয়া প্রতিবেশী) প্রথমে শুনল যে, জমি এক হাজার টাকায় বিক্রয় হয়েছে এই শুনে সে চুপ করে থাকল, পরে শুনল যে, পাঁচশত টাকায় বিক্রি হয়েছে তাহলে তার 'হক্কে শোফআ' বাতিল হয়নি। এইরূপে প্রথমে যদি শুনে যে, অমুকে ক্রয় করেছে এবং সে সময় দাবী না করে, পরে জানতে পারে যে, অন্য লোক ক্রয় করেছে তারপর দাবী করে, তদ্রূপ যদি প্রথমে শুনে যে, অর্ধেক জমি বিক্রি হয়েছে তখন শোফআর দাবী না করে এবং পরে শুনে যে, সমস্ত জমি বিক্রি হয়েছে তখন সে শোফআর দাবী করে তবুও তার দাবী জায়েয হবে।

(ছাফাইয়ে মোআমালাত থেকে গৃহীত)

জমি বর্গা দেয়ার মাসায়েল

১। জমি বর্গা বা ভাগা দেওয়া জায়েয আছে, কিন্তু যখন কথা-বার্তা অর্থাৎ ইজাব কবূল হয় তখনই নিম্নলিখিত শর্তগুলো পরিষ্কার হওয়া চাই। ১ম, কতদিন যাবৎ বর্গা করবে তা পরিষ্কার বলে দেওয়া চাই। ২য়, বীজ কে দিবে তা পরিষ্কার হওয়া চাই। ৩য়, কোন্ ফসল করবে তা পরিষ্কার বলে দেওয়া চাই। ৪র্থ, অংশ হিসেবে ভাগ করা চাই এবং সে অংশ প্রথমেই পরিষ্কার হয়ে যাওয়া চাই; যেমন অর্ধা-অর্ধি বা তিন ভাগের এক ভাগ এবং দুই ভাগ ইত্যাদি। ৫ম, জমি খালি করে বর্গাতির হাতে দেওয়া চাই। ৬ষ্ঠ, জমি এবং বীজ গৃহস্তের এবং গরু, লাঙ্গল ও মেহনত বর্গাতির বা শুধু জমিন গৃহস্থের অন্য সব বর্গাতির এইরূপ ঠিক হওয়া চাই। ৭ম, জমি কৃষির যোগ্য হওয়া চাই। ৮ম, জমির মালিক এবং বর্গাদার উভয়ের বালেগ ও স্বজ্ঞানী হওয়া চাই।

২। শরীয়ত নির্ধারিত শর্তগুলো পালন না করে যদি কেউ জমি বর্গা দেয় তবে তা নাজায়েয হবে, সুতরাং সমস্ত ফসল বীজওয়ালা পাবে, অপর পক্ষ যদি জমিওয়ালা হয় তা হলে সে দেশাচার অনুসারে জমির কেরায়া পাবে এবং যদি বর্গাতি হয় তবে দেশাচার অনুসারে তার মেহনতের মজুরী পাবে; কিন্তু এই কেরায়া এবং মজুরী প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত অংশের মূল্য অপেক্ষা অধিক হতে পারবে না।

৩। জমি বর্গার কথা-বার্তা (অর্থাৎ ইজাব-কবূল) ঠিক হয়ে যাওয়ার পর উভয় পক্ষের যে কেউ কোন একটি শর্ত অমান্য করতে চাইলে কাযীর নিকট নালিশ

করে তাঁর দ্বারা জোরপূর্বক মানান হবে; কিন্তু কাযী বীজওয়ালাকে বাধ্য করতে পারবে না।

৪। জমি মালিক বা বর্গাতি-এর মধ্যে কেউ মারা গেলে জমি বর্গা ছুটে যায়।

৫। অনেকে আগে বলে না যে, পাট বুনাও, আমন বুনাও কি আউশ বুনাও, শেষে আপোষে ঝগড়া হয়; এ রকম করা চাই না, আগে সব কথা পরিষ্কার করে বলা চাই।

৬। অনেক জায়গায় ধান কে কাটবে, পাট কে উঠাবে বা খড়-পাটখড়ি কে নিবে তা নিয়ে বাদানুবাদ হয়; এ রকম হওয়া চাই না, আগেই কথা পরিষ্কার করে নেয়া চাই, যাতে পরে দুই কথা হতে না পারে বরং সাক্ষী করে লিখলে আরও ভাল হয়, যাতে সহজেই স্মরণ থাকতে পারে।

৭। অনেক জায়গায় ধান ধার্য করে জমি লাগানো হয়। যেমন বলে যে, চাই ধান কর, চাই পাট কর, ফসল হোক বা না হোক, চাই এ জমির উৎপন্ন দ্রব্য হতে দাও, চাই অন্য কোথা থেকে দাও, এই জমি খানায় বা বিঘা প্রতি পাঁচ মণ ধান আমাকে দিতে হবে, এরূপ জায়েয আছে।

৮। আজকাল গভর্ণমেন্টের আইনের বলে অনেকে জমি বর্গা নিয়ে বা জমায় নিয়ে বার বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে গেলে বা রেকর্ড হয়ে গেলে পরে আর মালিককে ফেরত দিতে চায় না। কিন্তু নিশ্চিত জেনে রেখ, মালিকের বিনা খুশিতে ঐ জমি রাখা কিছুতেই জায়েয নয়। যদি কেউ রাখে তবে একেতো তা রাখা হারাম, দ্বিতীয়তঃ ঐ জমি চাষাবাদ করা হারাম। তৃতীয়তঃ ঐ জমিতে যা কিছু ফসল হবে তা তার জন্য হারাম ও পলীদ (নাপাক) হবে।

(ছাফাইয়ে মোআমালাত থেকে গৃহীত)

গরু, ছাগল, হাস, মুরগি রাখালী দেয়ার মাসায়েল

গরু, ছাগল, হাস, মুরগী, ইত্যাদি জীবজন্তু রাখালী দেয়া এই শর্তে যে, এর যে বাচ্চা হবে তা আমরা আধা-আধি (বা চারআনা বা তিনআনা বা এরূপ কোন হারে) ভাগ করে নিব বা মুরগীর ডিম এভাবে ভাগ করে নিব, এরূপ রাখালী বা ভাড়া দেয়া জায়েয নয়। গ্রামাঞ্চলে এরূপ প্রচলিত থাকলেও তা জায়েয নয়। তবে নির্দিষ্ট সময় লালন-পালন করলে তার বিনিময়ে এত টাকা দেয়া হবে, বা এত পারিশ্রমিক দেয়া হবে– এরূপ চুক্তি করা জায়েয।

বন্ধকের মাসায়েল

(যদি কারও নিকট থেকে টাকা-পয়সা কর্জ নিয়ে বিশ্বাসের জন্য তার নিকট কোন জিনিস রাখা হয় এই শর্তে যে, যখন কর্জ পরিশোধ করব তখন আমার জিনিস নিয়ে যাব– একে রেহেন বা বন্ধক বলে। এ সম্পর্কিত মাসআলাসমূহ নিম্নরূপ ঃ)

* কর্জ পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধকী জিনিস ফেরত নেয়ার বা দখল নেয়ার অধিকার থাকে না।

* কোন জিনিস বন্ধক রাখলে বন্ধক গ্রহীতা কোন রূপে তা ব্যবহার করলে না জায়েয হবে। মালিক অনুমতি দিলেও বন্ধকী জিনিস দ্বারা কোন রূপেই লাভবান হওয়া জায়েয নয়। যেমন বাগান বন্ধক রেখে তার ফল খাওয়া, জমি বন্ধক রেখে তার ফসল খাওয়া, ঘর বন্ধক রেখে তাতে বসবাস করা, অলংকার থালা-বাটি বন্ধক রেখে তা ব্যবহার করা ইত্যাদি।

* গরু, ছাগল, বকরী, ঘোড়া ইত্যাদি বন্ধক রাখলে তার খোরাক ইত্যাদির খরচ মালিককে দিতে হবে। গাভী, বকরীর দুধ ও বাছুর সবই মালিক পাবে, দুধ খেয়ে থাকলে ঋণ পরিশোধ হওয়ার সময় দুধের মূল্য ফেরত দিতে হবে; অবশ্য কিছু খরচ হয়ে থাকলে সে খরচের টাকা কেটে রাখতে পারবে।

* বন্ধকী স্বত্ব বিক্রি করা জায়েয নয়। বন্ধকী জিনিস খোয়া গেলে এবং ঋণের চেয়ে তার মূল্য কম হলে বাকীটুকু পাওনাদার (অথবা বন্ধকী জিনিসের মালিক) থেকে নিয়ে নিতে পারবে এবং বন্ধকী জিনিসের মূল্য পরিমাণ ঋণ পরিশোধ ধরা হবে। আর বন্ধকী জিনিসের মূল্য ঋণের চেয়ে বেশী হলে মালিক ঐ বেশী পরিমাণটুকু বন্ধক গ্রহীতার কাছে দাবী করতে পারবে না।

* তুমি কারও নিকট টাকা চাইলে, সে টাকা দিতে না পেরে কোন জিনিস দিল যা অন্য কারও নিকট বন্ধক রেখে তুমি টাকা আনলে, পরে ঐ জিনিসের মূল মালিক টাকা দিয়ে বন্ধক গ্রহীতার নিকট থেকে তার মাল ছাড়িয়ে নিল, এমতাবস্থায় মূল মালিককে তুমি টাকা দিতে বাধ্য।

* বন্ধকের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও মালিক অর্থ পরিশোধ করে বন্ধকী জিনিস ফেরত না নিলে তা বিক্রি করে নিজের অর্থ আদায় করার অধিকার এসে যায়। ইসলামী জজ (কাজী) থাকলে তার নিকট মামলা দায়ের করে বিক্রির অনুমোদন নিয়ে নিবে।

(বেহেশতী জেওর, ইসলামী ফিকাহঃ ৩য় এবং ছাফাইয়ে মোআমালাত থেকে গৃহীত)

আরিয়াত বা কোন বস্তু ধার দেয়া নেয়ার মাসায়েল

(বিনা ভাড়ায় ফেরত দেয়ার শর্তে কোন বস্তু দেয়া বা চেয়ে আনাকে 'আরিয়াত' বলে। যেমন পাকানোর জন্য কারও ডেগ চেয়ে নেয়া হল কিম্বা পড়ার জন্য কারও বইপত্র আনা হল ইত্যাদি।)

* আরিয়াত যিনি আনবেন তিনিই ব্যবহার করতে পারবেন। অবশ্য পরিষ্কার ভাষায় মালিকের অনুমতি থাকলে অন্যকেও ব্যবহার করতে দেয়া যায় বা এমন লোককেও দেয়া যায় যার ব্যাপারে একীন থাকে যে, মালিক নিশ্চয় তার ব্যাপারে অনুমতি দিবেন কিম্বা বস্তুটা যদি এমন হয় যা সকলেই সমানভাবে ব্যবহার করে থাকে-কারও ব্যবহারে কোন তারতম্য ঘটে না, তাহলেও অন্যদেরকে ব্যবহার করতে দেয়া যায়। তবে মালিক যদি পরিষ্কার ভাষায় অন্য কাউকে ব্যবহার করতে দিতে নিষেধ করে তাহলে অন্য কাউকে ব্যবহার করতে দেয়া কোন অবস্থাতেই দুরস্ত হবে না।

* আরিয়াত দাতা (অর্থাৎ, বস্তুর মালিক) যদি উক্ত বস্তু ব্যবহারের জন্য বিশেষ কোন নিয়ম বা নির্দিষ্ট সময় বলে দিয়ে থাকে, তাহলে তার খেলাফ করা জায়েয নয়।

* আরিয়াতের বস্তু আমানতের মত-নিজের বস্তুর চেয়ে অধিক যত্ন ও হেফাজতের সাথে তা রাখা কর্তব্য। আরিয়াতের বস্তু পূর্ণ সতর্কতা ও হেফাজত অবলম্বন সত্ত্বেও যদি কোন প্রকারে নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার ক্ষতিপূরণ নেয়া যায় না। তবে সতর্কতা অবলম্বন না করলে বা হেফাজতে গাফলতী করে থাকলে ক্ষতিপূরণ নেয়া যায়।

* বাড়ী বানিয়ে থাকার জন্য জমি আরিয়াত দিলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বাড়ী ভেঙ্গে জমি খালি করে দিতে বললে গোনাহ হবে এবং বাড়ী ভাঙ্গার জন্য যে ক্ষতি হবে সে ক্ষতিপূরণও দিতে হবে।

* ফসল করে খাওয়ার জন্য কাউকে জমি আরিয়াত দিলে ফসল পাকার পূর্বে জমি ফেরত চাইতে পারবে না। চাইলেও জমি ফেরত পাবে না। অবশ্য ইচ্ছা করলে সে দিন থেকে (যে দিন থেকে সে ফেরত চেয়েছে) ফসল পাকা পর্যন্ত দেশ রেওয়াজ অনুসারে জমির ভাড়া নিতে পারে। কেউ কারও ক্ষতি করতে পারবে না।

* আরিয়াত বস্তু ওয়াদা মত সময়ে ফেরত দেয়া কর্তব্য। অন্যথায় নষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ছাফাইয়ে মোআমালাত ও বেহেশতী জেওর থেকে গৃহীত)

আমানতের মাসায়েল

* টাকা-পয়সা বা মাল-সামান আমানত রাখলে আমানতদারের উপর তার পূর্ণ হেফাজত করা ওয়াজিব।

* কেউ টাকা-পয়সা আমানত রাখলে অবিকল সেই টাকা-পয়সাই পৃথকভাবে হেফাজত করে রাখা ওয়াজিব- নিজের টাকার সঙ্গে মিশানো এবং ঐ টাকা থেকে খরচ করা জায়েয নয়। এরূপ করতে হলে মালিক থেকে অনুমতি নিতে হবে।

* আমানতের মাল পূর্ণ হেফাজত সত্ত্বেও নষ্ট হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। আর হেফাজতে ত্রুটি করার কারণে নষ্ট হলে বা চুরি হলে, খোয়া গেলে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

* কেউ কাপড়-চোপড়, হাড়ি-পাতিল, থালা-বাসন, বই-পত্র অলংকার ইত্যাদি আমানত রাখলে মালিকের বিনা অনুমতিতে আমানতদারের পক্ষে তা ব্যবহার করা জায়েয নয়। গাভী আমানত রাখলে তার দুধ খাওয়া বা বলদ আমানত রাখলে তার দ্বারা জমি চাষ করানো মালিকের অনুমতি ব্যতীত জায়েয নয়।

* কেউ যদি বলে ভাই! এই মালটা দেখুন আমি আসছি, আর আপনি বলেন আচ্ছা বা ঠিক আছে, কিম্বা চুপ থাকেন বা হাত দ্বারা সে বস্তুটা সামলে নেন, তাহলে আমানত রাখার হুকুম এসে যায়। যদি আমানত রাখতে অসুবিধা থাকে তাহলে এরূপ মুহূর্তে পরিষ্কারভাবে তাকে শুনিয়ে বলে দিতে হবে যে, না ভাই আমার ওযর আছে, আমি দেখতে/রাখতে পারব না।

* আমানতকারী যখনই তার মাল ফেরত চাইবে তখনই তার মাল তার নিকট ফেরত দেয়া ওয়াজেব-বিনা ওযরে ফেরত দিতে বিলম্ব করা জায়েয নয়।

* আমানতকারী নিজে না এসে অন্য কোন লোককে মাল ফেরত নেয়ার জন্য পাঠালে তাকে নিজের দায়িত্বে দেয়া যায়। পরে যদি মালিক অস্বীকার করে যে সে তাকে পাঠায়নি, তাহলে মালিক আপনার কাছ থেকে মাল আদায় করে নিতে পারবে। এরূপ মুহূর্তে একথাও বলা যায় যে, মালিক নিজে না আসলে আমি অন্য কারও কাছে দিব না।

* কেউ আমানত রাখলে সেটা লিখে রাখা আদব।

* যে অভাবী, তার জন্য কারও আমানত না রাখা উচিত। কেননা অভাব আমানতে খেয়ানতের বা অনিয়মের কারণ ঘটতে পারে।

* আমানতদার নিজেই মালের হেফাজত করবে, নিজের কাছেই রাখবে কিম্বা পরিবারের মধ্যে স্ত্রীর কাছে, মায়ের কাছে, মেয়ের কাছে বা এরূপ অন্য কারও

কাছে যাদের উপর তার পূর্ণ আস্থা আছে এবং যাদের কাছে সে নিজের টাকা পয়সা সচরাচর রাখে এদের কাছেও আমানতের মাল রাখতে পারবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কারও নিকট মালের মালিকের বিনা অনুমতিতে রাখতে পারবে না। রাখলে খোয়া গেলে ভর্তুকি দিতে হবে। বিশ্বস্ত বন্ধু-বান্ধব যাদের কাছে সে নিজের-মালামাল রেখে থাকে তাদের কাছেও মালিকের বিনা অনুমতিতে রাখতে পারবে।

* মালিকের অনুমতি নিয়ে আমানতের মাল দ্বারা ব্যবসা করা যেতে পারে।

বিঃ দ্রঃ হেফাজতের সঙ্গে আমানত রেখে অন্যের উপকার করা অনেক ছওয়াবের কাজ। কিন্তু আমানতে খেয়ানত করলে কবীরা গোনাহ হবে।

(বেহেশতী জেওর, ইসলামী ফিকাহঃ ৩য়, ছাফাইয়ে মোআমালাত ও [illegible] থেকে গৃহীত)

পড়ে পাওয়া জিনিসের মাসায়েল

* কোথাও পরের কোন পড়ে পাওয়া টাকা/পয়সা বা জিনিস পেলে যদি আশংকা হয় যে, সে না উঠালে কোন দুষ্টলোক পেলে তা আত্মসাৎ করে ফেলবে এবং মালিককে দিবে না, তাহলে তা উঠানোও ওয়াজিব এবং মালিককে খুঁজে পৌঁছে দেয়াও ওয়াজিব।

* কোন পড়ে পাওয়া টাকা/পয়সা বা বস্তু উঠানোর পর ঐ পরিমাণ টাকা/পয়সা বা বস্তুর জন্য মালিকের যতদিন বা যতক্ষণ তালাশ করার সম্ভাবনা থাকে ততদিন বা ততক্ষণ পর্যন্ত সাধ্য অনুসারে লোক সমাগমের স্থলে ঘোষণা দিতে থাকবে। মালিককে পাওয়া গেলে বা তার ওয়ারিশদেরকে পাওয়া গেলে এবং মালের পরিচয় বলতে পারলে তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিবে। আর না পাওয়া গেলে এবং পাওয়ার কোন আশা না থাকলে ঐ টাকা/পয়সা বা বস্তু কোন গরীব দুঃখীকে দান করে দিবে। তবে সে নিজে গরীব হলে নিজেও তা ব্যবহার ও ভোগ করতে পারবে। কিন্তু গরীবকে দেয়ার পর বা নিজের গরীব হওয়ার কারণে নিজেই গ্রহণ করার পর যদি মালিক এসে দাবী করে তবে মালিক সেই টাকা/পয়সা বা বস্তুর মূল্য ফেরত নিতে পারবে। অবশ্য যদি সে দাবী পরিত্যাগ করে তাহলে খয়রাতের ছওয়াব সে-ই পাবে।

* পড়ে পাওয়া জিনিস উঠানোর পর মালিককে তালাশ করা কষ্টকর মনে করে আবার যেখানকার জিনিস সেখানে ফেলে আসা জায়েয হবে না বরং উঠানোর পর মালিককে তালাশ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

* বাগানের মধ্যে নারিকেল, সুপারী, আম, তাল ইত্যাদি পড়ে থাকলে মালিকের বিনা অনুমতিতে তা উঠানো এবং ভক্ষণ করা হারাম। অবশ্য যদি একটা বরই বা বুট বা ছোলা ইত্যাদি এমন কোন সামান্য জিনিস হয়, যা কেউ

নিলে বা খেয়ে ফেললে মালিক মনে কোন কষ্ট পায় না– এরূপ জিনিস উঠিয়ে নেয়া, খাওয়া বা ব্যবহার করা জায়েয আছে।

* হাস মুরগি বা কোন পালিত পাখী যদি কারও বাড়ীর মধ্যে এসে পড়ে এবং তা ধরে রাখে, তাহলে মালিককে তালাশ করে দেয়া ওয়াজিব।

ঋণ সম্পর্কিত আদব ও মাসায়েল

* যথা সম্ভব ঋণ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

* এমন ব্যক্তির নিকট ঋণ চাওয়া ঠিক নয়, যার ব্যাপারে বোঝা যায় যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে ভক্তি বা লজ্জা বা চাপ ইত্যাদির কারণে অস্বীকার করতে পারবে না। যার ব্যাপারে নিশ্চিত জানা আছে যে, অনিচ্ছা হলে স্বাধীনভাবে সে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হবে না-এরূপ লোকের নিকট ঋণ চাওয়াতে দোষ নেই।

* ঋণ গ্রহণ করলে সেটা পরিশোধের সময় নির্দিষ্ট করে নিবে।

* ঋণ নিলে সেটা স্মরণ রাখার জন্য লিখে রাখবে।

* যতদ্রুত সম্ভব ঋণ পরিশোধ করে দেয়া প্রয়োজন, কেননা ঋণ পরিশোধ না করে মৃত্যুবরণ করলে তার রূহ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে–জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না।

* পাওনাদার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেও চাওয়ার অধিকার রাখে।

* পাওনাদার শক্ত কিছু বললেও তা সহ্য করতে হবে।

* সাধ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করা বা আজ-কাল বলে টালবাহানা করা জুলুম।

* ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি অস্বচ্ছল হলে তাকে সময় সুযোগ দেয়া উচিত-পেরেশান করা উচিত নয়। পারলে ঋণ পূরোটা বা তার কিয়দংশ মাফ করে দিবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলাও কিয়ামতের কষ্ট থেকে মুক্তি দিবেন।

* ঋণ গ্রহণকারী যদি ঋণ পরিশোধের ভার এমন কোন লোকের উপর ন্যস্ত করতে চায় যার থেকে উসূল করা যাবে বলে আশা করা যায়, তাহলে সেটা মেনে নিবে। অহেতুক জিদ ধরা ঠিক নয়।

* খারাব মাল দ্বারা ঋণ পরিশোধ করবে না বরং ভালটার দ্বারা পরিশোধ করা উত্তম।

* পাওনাদার ঋণ বুঝে পাওয়ার সময় ঋণ গ্রহণকারীকে দুআ দিবে এবং তার শুকর আদায় করবে।

* ঋণ পরিশোধ করলে তাও লিখে রাখবে।

* বিশ্বাস ও ভক্তির সাথে নিম্নের দুআটি পড়লে ইনশাআল্লাহ ঋণ আদায় হয়ে যাবে–

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

(ترمذی)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, হারাম হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল রুযী দ্বারা আমার অভাব পূরণ কর এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা কর।

* সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করলে মামলা করে বা প্রকাশ্যে কিম্বা গোপনে যে কোনভাবে পাওনা উসূল করে নেয়া পাওনাদারের জন্য জায়েয। এরূপ অবস্থায় দেনাদারকে শক্ত কথা বলাও জায়েয।

(بہشتی زیور، آداب المعاشرت থেকে গৃহীত)

বিবাহ

যাদের সাথে বিবাহ হারাম ঃ

১। নিজের সন্তানের সাথে। যেমন ছেলে, পোতা, পরপোতা, নাতি, নাতির ছেলে ইত্যাদি যতই নীচের দিকে যাক না কেন।

২। বাপ, দাদা, পরদাদা, নানা, পরনানা, ইত্যাদি যতই উর্ধ্বে যাক না কেন।

৩। ভাই। (আপন বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়)। মাতা ও পিতা উভয়ে ভিন্ন হলে সেরূপ ভাইয়ের সাথে বিবাহ জায়েয।

৪। ভাতিজা।

৫। ভাগিনা।

৬। মামা, অর্থাৎ, মায়ের আপন বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভাই।

৭। চাচা, অর্থাৎ, পিতার উপরোক্ত তিন প্রকার ভাই।

৮। জামাই, অর্থাৎ, মেয়ের সাথে যার বিবাহের আক্‌দ হয়েছে। (চাই সহবাস হোক বা না হোক)

৯। মায়ের স্বামী, অর্থাৎ, পিতার মৃত্যুর পর মা যদি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে এবং তার সাথে সহবাস হয়।

১০। সতীনের পুত্র।

১১। শ্বশুর, তার পিতা, দাদা, পরদাদা ইত্যাদি।

১২। ভগ্নির স্বামীর সাথে, যে পর্যন্ত ভগ্নি তার বিবাহে থাকে।

১৩। ফুফা এবং খালু, যে পর্যন্ত ফুফু ফুফার এবং খালা খালুর বিবাহে থাকে।

১৪। নসবের দিক দিয়ে অর্থাৎ, জন্ম ও জাতিগত দিক দিয়ে যে সব আত্মীয় ও আপনজনের সাথে বিবাহ হারাম (যেমন বাপ, দাদা, ছেলে, চাচা, মামা ইত্যাদি)। তদ্রূপ দুধের দিক দিয়েও সেসব আত্মীয়ের সাথে বিবাহ হারাম। যেমন দুধবাপ, দুধ ভাই, দুধ পোতা ইত্যাদি।

১৫। অন্য কোন ধর্মাবলম্বী পুরুষের সাথে।

১৬। কারও স্ত্রী থাকা অবস্থায় বা তালাকের পর ইদ্দতের সময় অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ হারাম।

১৭। শ্বশুর (আপন)

১৮। কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে যেনা করলে ঐ নারীর মা ও মেয়ে (বা মেয়ের মেয়ে অর্থাৎ, নিম্নদিকের যে কোন মেয়ে) এর সাথে ঐ পুরুষের বিবাহ দুরস্ত নয়।

১৯। কোন নারী কাম ভাবের সাথে বদ নিয়তে অপর কোন পুরুষের শরীর স্পর্শ করলেও উপরোক্ত হুকুম। তদ্রূপ কোন পুরুষ কামভাব সহ বদ নিয়তে কোন নারীকে স্পর্শ করলেও ঐ পুরুষের সন্তানগণ ঐ নারীর জন্য হারাম হয়ে যায়।

২০। ভুলবশতঃ কামভাবের সাথে কন্যা বা শাশুড়ীর গায়ে হাত দিলে স্ত্রী (অর্থাৎ ঐ কন্যার মা বা ঐ শাশুড়ীর মেয়ে) চিরতরে হারাম হয়ে যায়। তাকে তালাক দিয়েই দিতে হবে।

২১। কোন ছেলে কুমতলবে বিমাতার শরীরে হাত লাগালে বা বিমাতা কুমতলবে বিপুত্রের শরীরে হাত লাগালে ঐ নারী তার স্বামীর জন্য একেবারে হারাম হয়ে যায়। (বেহেশতী জেওর থেকে গৃহীত)

যাদের সাথে বিবাহ জায়েয ঃ

যাদের সাথে বিবাহ হারাম তারা ব্যতীত অন্য সব পুরুষের সাথে বিবাহ জায়েয, অতএব যে সব পুরুষের সাথে বিবাহ জায়েয তাদের তালিকা বলে শেষ করার নয়। কিন্তু যাদের সাথে বিবাহ জায়েয তা সত্ত্বেও সমাজে অনেকে সেটাকে জায়েয মনে করে না বা খারাব মনে করে– এরূপ কয়েকজনের কথা উল্লেখ করা হল।

১। এরূপ ভাই যার মা ও বাপ উভয়ে ভিন্ন।

২। মার চাচাত, মামাত, ফুফাত, খালাত ভাইয়ের সাথে বিবাহ জায়েয।

৩। বাপের চাচাত, মামাত ভাইয়ের সাথে বিবাহ জায়েয।

৪। চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর, খালু শ্বশুরের সাথে।

৫। ননদের স্বামী, ভগ্নিপতি (যখন ভগ্নি তার বিবাহে না থাকে) বিহাই অর্থাৎ ভাইয়ের শ্যালক, ছেলের শ্বশুর, মেয়ের শ্বশুর প্রভৃতির সাথে।

৬। ফুফার সাথে, (যখন ফুফু তার বিবাহে না থাকে) খালুর সাথে (যখন খালা তার বিবাহে না থাকে)

৭। পালকপুত্র, ধর্মছেলে, ধর্মবাপ, ধর্ম ভাইয়ের সাথে বিবাহ জায়েয়।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের তরীকা ঃ

* সৎ ও খোদাভীরু পাত্র-পাত্রীর সন্ধান করতে হবে।

* পাত্র/পাত্রীর জন্য বংশ, মুসলমান হওয়া, ধর্মপরায়ণতা, সম্পদশালীতা ও পেশায় সম মানের পাত্র/পাত্রী নির্বাচনের বিষয়টি শরীয়তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্পদশালীতায় সমপর্যায়ের হওয়ার দ্বারা বুঝানো হয়েছে ধনবতী মহিলার জন্য একেবারে নিঃস্ব কাঙ্গাল পুরুষ সমমানের নয়; তবে মহরের নগদ অংশ প্রদানে এবং ভরণ-পোষণ প্রদানে সক্ষম হলে তাকে সমমানের ধরা হবে। উভয় পক্ষের সম্পদ একই পরিমাণে বা কাছাকাছি হতে হবে তা বোঝানো হয়নি।

* পাত্র/পাত্রীর ধর্মপরায়ণতার দিকটাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে।

* পাত্র/পাত্রীর বয়সের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা সংগত, পাত্রীর চেয়ে পাত্রের বয়স কিছু বেশী হওয়া উত্তম; তবে বহুত বেশী বেশ কম হওয়া সংগত নয়।

(اصلاح الرسوم)

বিবাহের পয়গাম/প্রস্তাব দেয়ার তরীকা ঃ

* বিবাহের পয়গাম বা প্রস্তাব দেয়ার পূর্বে নিম্নোক্ত বাক্যটি বলে নিবে–

اَشْهَدُ اَنْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (كتاب الاذكار)

অতঃপর বলবে আমি অমুকের ব্যাপারে এই আগ্রহ নিয়ে এসেছি।

* অপর কেউ প্রস্তাব দিয়ে থাকলে এবং উভয় পক্ষের সে প্রস্তাবে রেজামন্দীভাব দেখা গেলে সেটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অন্য প্রস্তাব দেয়া নিষেধ।

পাত্রী দেখা প্রসঙ্গ ঃ

* বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখে নেয়া সুন্নাত। নিজে না দেখলে বা সম্ভব না হলে কোন মহিলাকে পাঠিয়েও দেখার ব্যবস্থা করা যায়।

* পাত্রীর চেহারা এবং হাত দেখার অনুমতি রয়েছে।

* যে উক্ত নারীকে বিবাহ করতে চায় একমাত্র সে ব্যতীত অন্য কোন গায়ের মাহরামের পক্ষে তাকে দেখা বৈধ নয়।

মহর সম্পর্কিত মাসায়েল ঃ

* মহর পরিশোধ করা ওয়াজিব। তাই নাম শোহরতের জন্য সাধ্যের অতিরিক্ত মহর ধার্য করা অপছন্দনীয়।

* রাসূল (সাঃ) তাঁর কন্যা ফাতেমার জন্য যে মহর ধার্য করেছিলেন, তাকে 'মহরে ফাতিমী' বলা হয়। বর্তমানের হিসেবে তার পরিমাণ কি এ ব্যাপারে তিনটি উক্তি পাওয়া যায়- (১) ১৩১ $\frac{১}{৪}$ তোলা রূপার সমপরিমাণ। (২) ১৪৫ $\frac{৩}{৪}$ তোলা ৮ রত্তি রূপার সমপরিমাণ। (৩) ১৫০ তোলা রূপার সমপরিমাণ। সতর্কতা স্বরূপ ১৫০ তোলার মতটি গ্রহণ করা যায়। বর্তমানে প্রচলিত গ্রাম-এর ওজন হিসেবে ১৫০ তোলা = ১৭৪৯.৬০০ গ্রাম। খুচরা বাকীটুকু পূর্ণ করে দিয়ে ১৭৫০ গ্রাম ধরা চলে। (فتاوی رحیمیه ج ٦)

* কমের পক্ষে মহরের পরিমাণ দশ দেরহাম (অর্থাৎ, প্রায় পৌণে তিন তোলা পরিমাণ রূপার সমপরিমাণ) বেশীর কোন সীমা নেই। তবে খুব বেশী মহর ধার্য করা ভাল নয়।

* বিবাহের সময় মহর ধার্য হলে এবং বাসর ঘর অতিবাহিত হলে ধার্যকৃত পূর্ণ মহর দেয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। আর বাসর ঘর হওয়ার পূর্বে তালাক হলে ধার্যকৃত মহরের অর্ধেক দেয়া ওয়াজিব হয়।

* বিবাহের সময় মহরের উল্লেখ না হলে 'মহরে মেছেল' ওয়াজিব হয় আর এরূপ ছুরতে বাসর ঘর হওয়ার পূর্বেই তালাক হয়ে গেলে সে মেয়েলোকটি মহর পাবে না- শুধু একজোড়া কাপড় পাবে। একজোড়া কাপড়ের অর্থ লম্বা হাতা ওয়ালা একটা জামা, একটা উড়না বা ছোট চাদর ও একটা পায়জামা। অথবা একটা শাড়ী ও একটা বড় চাদর যার দ্বারা আপাদ মস্তক ঢাকা যায়।

* 'মহরে মেছেল' বা খান্দানী মহর বিবেচনার ক্ষেত্রে বাপ দাদার বংশের মেয়েদের যেমন বোন, ফুফু, ভাতিজী, চাচাত বোন প্রমুখের মহর দেখতে হবে।

এবং এই খান্দানী মহর নিরূপণের ক্ষেত্রে যুগের পরিবর্তনে, স্থানের পরিবর্তনে, রূপগুণ, বয়স, পাত্র, দ্বিতীয় এবং প্রথম বিবাহের তারতম্যে মহরের যে তারতম্য হয়ে থাকে তাও বিবেচনায় আনতে হবে।

* স্বামী যদি মহরের নিয়তে (খোরাক, পোশাক ও বাসস্থান ব্যতিরেকে) কিছু টাকা বা অন্য কোন মাল জিনিস দেয়, তাহলে তা মহর থেকেই কাটা যাবে।

* স্বামী যদি স্ত্রীকে ধমক দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে বা লজ্জায় ফেলে বা অন্য কৌশলে ও অসুদপায়ে স্ত্রীর আন্তরিক ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তার দ্বারা মহর মাফ করিয়ে নেয় তবে তাতে মহর মাফ হয়ে যায় না।

ওলীর বর্ণনা ঃ

* ছেলে/মেয়েকে যে বিবাহ দেয়ার ক্ষমতা রাখে তাকে 'ওলী' বলে। ওলীর জন্য আকেল বালেগ এবং মুসলমান হওয়া শর্ত।

* ছেলে/মেয়ের সর্বপ্রথম ওলী তাদের পিতা, না থাকলে দাদা, তারপর পরদাদা, তাদের কেউ না থাকলে আপন ভাই, তারপর বৈমাত্রেয় ভাই, তারপর আপন ভাইয়ের ঘরের ভাতিজা, তারপর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ঘরের ভাতিজা, ভাতিজারা কেউ না থাকলে ভাতিজার ছেলে, তারপর তাদের ছেলে (উপরোক্ত তারতীব অনুযায়ী) তারপর আপন চাচা, তারপর সতাল চাচা, তারপর চাচাত ভাই, তারপর চাচাত ভাইয়ের চেলে তারপর চাচাত ভাইয়ের পোতা (উপরোক্ত তারতীব অনুযায়ী) তারা কেউ না থাকলে পিতার চাচা, সে না থাকলে তার আওলাদ। তারা না থাকলে দাদার চাচা, তারপর তার ছেলে, তারপর তার পোতা ও পরপোতাগণ তারতীব অনুযায়ী ওলী হবে। এ সব পুরুষ ওলীগণ না থাকলে মা ওলী হবে। তারপর দাদী, তারপর নানী, তারপর নানা, তারপর আপন বোন, তারপর বৈমাত্রেয় বোন, তারপর বৈপিত্রেয় ভাই-বোন, তারপর ফুফু, তারপর মামা, তারপর চাচাত বোন।

* এক শ্রেণীর কয়েকজন ওলী থাকলে বড় জন অন্যদের সাথে পরামর্শ ক্রমে কাজ করবে। বড় জনের অনুমতি নিয়ে অন্যরাও কাজ করতে পারে।

* মেয়ে বালেগা হলে তার বিনা অনুমতিতে কোন ওলী বা অন্য কেউ তাকে বিবাহ দিয়ে দিতে পারে না। দিলে মেয়ের অনুমতির উপর সে বিবাহ মওকুফ থাকবে। অনুমতি না দিলে সে বিবাহ বাতেল হয়ে যাবে।

* মেয়ে বালেগা হলে ওলীর বিনা অনুমতিতে সে সমান ঘরে বিবাহ বসতে পারে, কিন্তু সমান ঘরে বিবাহ না বসে নীচ ঘরে বিবাহ বসলে এবং ওলী তাতে মত না দিলে সে বিবাহ দুরস্ত হবে না।

এযেন নেয়ার তরীকা ও মাসায়েল ঃ

* মেয়ে যদি ছেলেকে পূর্বে থেকে না চিনে তাহলে এযেন (অনুমতি/সম্মতি) নেয়ার সময় মেয়ের সামনে ছেলের নাম-ধাম, পরিচয় ও মহরের কথা তুলে ধরে বলতে হবে 'আমি তোমাকে বিবাহ দিচ্ছি বা বিবাহ দিলাম বা বিবাহ দিয়েছি। তুমি রাজি আছ কি না ?

* সাবালেগা অবিবাহিতা মেয়ের নিকট এযেন চাওয়ার পর সে (অসম্মতিসূচক কোন ভাব প্রকাশ না করে সম্মতি সূচক ভাব প্রকাশ করে অর্থাৎ, গম্ভীর ভাব ধারন করে) চুপ থাকলে বা মুচকি হেসে দিলে বা (মা বাপের বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার মন বেদনায়) চোখের পানি ছেড়ে দিলে তার এযেন আছে ধরা হবে। জবরদস্তী তার মুখ থেকে 'রাজি আছি' কথা বের করার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন ও অন্যায়।

* মেয়ে পূর্বে থেকে ছেলেকে না চিনলে এবং তার সামনে ছেলের নাম/ধাম, পরিচয় সুস্পষ্টভাবে তুলে না ধরলে তার চুপ থাকাকে এযেন বা সম্মতি ধরা যাবে না।

* শরীয়ত অনুসারে যে ওলীর হক অগ্রগণ্য, তিনি বা তার প্রেরিত লোক ব্যতীত অন্য কেউ এযেন আনতে গেলেও সে ক্ষেত্রে মেয়ের চুপ থাকাটা এযেন বলে গণ্য হবে না বরং সে ক্ষেত্রে স্পষ্ট অনুমতির শব্দ উল্লেখ করলেই এযেন ধরা যাবে।

* যদি মেয়ে বিধবা কিম্বা তালাক প্রাপ্তা হয় তাহলে তার চুপ থাকাটা এযেন বলে গণ্য হবে না বরং মুখ দিয়ে স্পষ্ট কথা (যেমন 'রাজি আছি') বলতে হবে।

* না বালেগা ছেলে/মেয়ের বিবাহ যদি বাপ দাদা করায় তাহলে সে বিবাহ দুরস্ত আছে এবং বালেগ হওয়ার পর তাদের সে বিবাহ ভঙ্গ করার কোন ক্ষমতা থাকবে না। বাপ, দাদা ব্যতীত অন্য কেউ করালে যদি সমান ঘরে করায় এবং মহরও ঠিক মত হয় তাহলে বর্তমানে তাদের বিবাহ দুরস্ত হয়ে যাবে তবে বালেগ হওয়ার সময় মুসলমান হাকিমের আশ্রয় গ্রহণ করে তারা সে বিবাহ ভেঙ্গে দিতে পারবে। আর বাপ, দাদা ব্যতীত অন্যরা নীচ ঘরে বা অনেক কম মহরে বিবাহ দিলে সে বিবাহ দুরস্ত হবে না।

বিবাহের দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে কথা ঃ

* বিবাহ শাউয়াল মাসে এবং জুমুআর দিনে এবং মসজিদে সম্পন্ন করা উত্তম। এ ছাড়াও যে কোন মাসে, যে কোন দিনে, যে কোন সময়ে বিবাহ হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। অমুক অমুক দিন বিবাহ করা ঠিক নয়- এ

জাতীয় কথা কুসংস্কার এবং এগুলো হিন্দুয়ানী ধ্যান-ধারণা থেকে বিস্তার লাভ করেছে।

আক্দ সম্পন্ন করা বা বিবাহ পড়ানোর তরীকা ঃ

* এ'লান বা ঘটা করে (অর্থাৎ, বিবাহের খবর প্রচার করে) বিবাহের আক্দ সম্পন্ন করা সুন্নাত। বিনা ওযরে এ'লান ছাড়া গোপনে বিবাহ পড়ানো সুন্নাতের খেলাফ। (فتاوی رحیمیه ج/ ۲)

* আক্দ করতে চাইলে পূর্বে মহর ধার্য না হয়ে থাকলে প্রথমে মহর ধার্য করবে। (সামর্থ অনুযায়ী) কম মহর ধার্য করার মধ্যেই বরকত নিহিত।

* উকীল পাত্রী থেকে অনুমতি/সম্মতি নিয়ে আসবে। পাত্রী নিজেও মজলিসে এসে সরাসরি প্রস্তাব/কবূল করতে পারে– সে ক্ষেত্রে উকীলের প্রয়োজন হয় না। উকীলের অনুমতি/সম্মতি আনার সময় সাক্ষীদের উপস্থিত থাকা জরুরী নয়।

* গায়র মাহরামকে উকীল বানানো ঠিক নয়।

* অতঃপর বিবাহের নিম্নোক্ত খুতবা পাঠ করবে। এই খুতবা পাঠ করা মোস্তাহাব। এই খুতবা ইজাব কবূলের পূর্বে হওয়া সুন্নাত।

(فتاوی محمودیه ج/ ۸ وفتاوی رحیمیه ج/ ۲)

এ খুতবা মৌলিকভাবে দাঁড়িয়ে পড়াই নিয়ম। বসেও পড়া জায়েয।

(فتاوی رحیمیة)

খুতবাটি এই–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ۔ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ۔ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لَا يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهٗ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا۔ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ

وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ـ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ـ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ـ (كتاب الاذكار)

* এই খুতবার সঙ্গে নিম্নোক্ত বাক্যও যোগ করা উত্তম–

اُزَوِّجُكَ عَلٰى مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ مِنْ اِمْسَاكٍ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ـ (كتاب الاذكار)

* এ খুতবা চুপচাপ শ্রবণ করা ওয়াজিব। (احسن الفتاوى ج/ ٥)

* খুতবা পাঠ করার পর দুজন সাক্ষীর সম্মুখে তাদেরকে শুনিয়ে উকীল (বা পাত্রী) পাত্রকে (বা তার নিযুক্ত প্রতিনিধিকে) পাত্রীর পরিচয় প্রদানপূর্বক বিবাহের প্রস্তাব পেশ করবে এবং পাত্র (বা তার প্রতিনিধি তার পক্ষ হয়ে) আমি কবূল করলাম বা আমি গ্রহণ করলাম বা ইত্যকার কোন বাক্য বলে সে প্রস্তাব গ্রহণ করবে। ব্যস, বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।

* অতঃপর নব দম্পতির উদ্দেশ্যে উপস্থিতরা বা পরবর্তীতে যে জানবে সে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمَا وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ ـ

* বিবাহের পর খেজুর ছিটিয়ে দেয়া বা বন্টন করা সুন্নাতে যায়েদা। হযরত থানবী (রহঃ) বর্তমান যুগে ছিটানো নয় বরং বন্টন করাই সঙ্গত বলে মত প্রকাশ করেছেন। কারণ, খেজুর ছিটানো সম্পর্কিত হাদীস কারও কারও মতে জয়ীফ। তদুপরি বর্তমান যুগে খেজুর ছিটানো ও তা আহরণকে কেন্দ্র করে মনোমালিণ্য হয়ে থাকে, তাই ছিটানোর পদ্ধতি পরিত্যাগ করা সঙ্গত। (اصلاح الرسوم)

* টেলিফোনে বিবাহ জায়েয। এর সূরত এই হতে পারে যে, ছেলে বা মেয়ে টেলিফোনে একজনকে উকীল নিযুক্ত করবে যে, আপনি এত মহরের বিনিময়ে অমুক মেয়ের সাথে/অমুক ছেলের সাথে আমার বিবাহ সম্পন্ন করে দিন। অতঃপর উক্ত উকীল বিবাহের মজলিসে ছেলের পক্ষ থেকে/মেয়ের পক্ষ থেকে কবূল করবে। (فتاوى دار العلوم و رحيمية)

বিবাহ মজলিসের কয়েকটি রছম ও কুপ্রথা ঃ

* বিবাহের গেটে টাকা ধরা না জায়েয। (فتاوی محمودیة ج ۳)

* বিবাহের আক্‌দ সম্পন্ন হওয়ার পর বর দাঁড়িয়ে হাজিরীনে মজলিসকে যে সালাম দিয়ে থাকে, এটা একটা রছম-এটা পরিত্যাজ্য। (فتاوی محمودیة ج ۳)

* বিবাহের পর বর গুরুজনদের সাথে যে মুসাফাহা করে থাকে এটা ভিত্তিহীন ও বেদআত। (ایضا)

* বিবাহের পর বধূর মুখ দেখানো রছম ও (পর পুরুষকে দেখানো) না জায়েয। (ایضا)

বাসর রাতের কতিপয় বিধান ঃ

* নববধূ মেহেদি ব্যবহার করবে, অলংকার এবং উত্তম পোশাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হবে।

* পুরুষ বাসর ঘরে প্রবেশ করতঃ নববধূকে সহ দুই রাকআত (শুকরানা) নামায পড়বে। (شرعة الاسلام)

* অতঃপর স্ত্রীর কপালের উপরিস্থিত চুল ধরে বিসমিল্লাহ বলে এই দুআ পাঠ করা সুন্নাত−

اَللّٰهُمَّ اِنِّی اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَاجَبَلْتَ عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ (امداد الفتاوی ج ۲)

* সহবাস সংক্রান্ত বিধানের জন্য দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৪৭৭।

ওলীমা বিষয়ক সুন্নাত ও নিয়ম সমূহ ঃ

* বাসর ঘর হওয়ার পর (তিন দিনের মধ্যে বা আক্‌দের সময়) আপন বন্ধু-বান্দব, আত্মীয়-স্বজন এবং গরীব মিসকীনদেরকে ওলীমা অর্থাৎ, বৌ-ভাত খাওয়ানো সুন্নাত। কেউ কেউ বাসর হওয়ার পর এবং আক্‌দের সময় উভয় সময়েই এরূপ আপ্যায়ন উত্তম বলেছেন।

* ওলীমায় অতিরিক্ত ব্যয় করা কিংবা খুব উঁচু মানের খানার ব্যবস্থা করা জরুরী নয় বরং প্রত্যেকের সামর্থানুযায়ী খরচ করাই সুন্নাত আদায়ের জন্য যথেষ্ট।

* যে ওলীমায় শুধু ধনী ও দুনিয়াদার লোকদের দাওয়াত করা হয় এবং দ্বীনদার ও গরীব মিসকীনদের দাওয়াত করা হয় না হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তা

হল সর্ব নিকৃষ্ট ওলীমা, অতএব ওলীমায় দ্বীনদার ও গরীব মিসকীনদেরকেও দাওয়াত করা উচিত।

* আমাদের দেশে যে বরযাত্রী যাওয়ার নিয়ম চালু হয়েছে এবং কনের পরিবারের পক্ষ থেকে ভোজের ব্যবস্থা করার নিয়ম চালু হয়েছে, এটা শরীয়ত সম্মত অনুষ্ঠান নয়– এটা রছম, অতএব তা পরিত্যজ্য।

তালাক

তালাক দেয়ার মাসায়েল ঃ

* নিতান্ত অপারগতা ছাড়া তালাক দেয়া জুলুম ও অন্যায়।

* নিতান্ত ঠেকা ব্যতীত স্বামীর নিকট তালাক চাওয়া মহাপাপ।

* কোন কল্যাণ ও প্রয়োজনে তালাক দেয়া মোবাহ বা জায়েয।

* স্ত্রী যদি স্বামীর জন্য কষ্টদায়ক হয় বা স্ত্রী নামায সম্পূর্ণ পরিত্যাগকারিণী হয় বা স্বামীর অবাধ্য হয় তাহলে সে স্ত্রীকে তালাক দেয়া মোস্তাহাব বা উত্তম। বোঝানো সত্ত্বেও যে স্ত্রী অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয় তাকেও তালাক দেয়া মোস্তাহাব।

(احسن الفتاوى ج ٥)

* স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর হক আদায় করতে অক্ষমতা দেখা দিলে তালাক দিয়ে দেয়া ওয়াজিব। তবে স্ত্রী তার হক মাফ করে দিলে ওয়াজিব থাকে না।

* নিজের কানে শোনা যায় এতটুকু শব্দে তালাক দিলেই তালাক হয়ে যায়, স্ত্রীর বা অন্য কারুর শোনা যাওয়া জরুরী নয়।

* হাসি ঠাট্টা করে বা রাগের মুহূর্তে বা নেশা পান করে মাতাল অবস্থায় তালাক দিলেও তালাক হয়ে যায়।

* তালাক দেয়ার ক্ষমতা স্বামী ব্যতীত অন্য কারও নেই। অবশ্য স্বামী কাউকে (স্ত্রীকে বা অন্য কাউকে) তালাক দেওয়ার ক্ষমতা দিলে সে তালাক দিতে পারে।

* হায়েয নেফাসের অবস্থায় তালাক দিলে তালাক হয়ে যায়। তবে হায়েয নেফাসের অবস্থায় তালাক দেয়া গোনাহ।

* এক সঙ্গে তিন তালাক দেয়া হারাম ও গোনাহে কবীরা। তবে এক সঙ্গে তিন তালাক দিলেও তিন তালাক হয়ে যাবে এবং স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় নিয়ম মাফিক অন্য স্বামীর ঘর হয়ে ঘুরে না আসলে আর তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখার বা বিবাহ করার উপায় থাকবে না।

* কারও চাপ, জোর-জবরদস্তী বা হুমকির মুখে তালাক দিলেও তালাক হয়ে যাবে।

বিঃ দ্রঃ তালাকের বিভিন্ন শব্দ এবং তালাকের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। আর তালাকের শব্দ ও প্রকারের পার্থক্যের ভিত্তিতে হুকুমেরও পার্থক্য হয়ে থাকে। তাই তালাক সম্পর্কিত কোন ঘটনা ঘটলে মুফতীদের থেকে সমাধান জেনে নিতে হবে।

তালাক দেয়ার তরীকা ঃ

তালাক দেয়ার তিনটি তরীকা, যথা ঃ (১) অতি উত্তম (২) উত্তম (৩) বিদআত ও হারাম।

১। তালাক দেয়ার অতি উত্তম তরীকা হলঃ স্ত্রী যখন হায়েয থেকে পাক হবে তখন (অর্থাৎ, তহুর বা পাকীর সময়ে) এক তালাক দিবে এবং শর্ত এই যে, এ তহুরের মধ্যে তার সাথে সহবাস হতে পারবে না। এর পরবর্তী হায়েয থেকে তার ইদ্দত শুরু হবে এবং তিন হায়েয অতিবাহিত হলে তার ইদ্দত শেষ হবে। এই ইদ্দতের মধ্যে আর কোন তালাক দিবে না। ইদ্দত শেষ হলে বিবাহ ভেঙ্গে যাবে।

২। তালাক দেয়ার উত্তম তরীকা হলঃ স্ত্রী হায়েয থেকে পাক হলে তহুরের মধ্যে এক তালাক দিবে। তারপর হায়েয গিয়ে দ্বিতীয় তহুর এলে তাতে আর এক তালাক দিবে। তারপর তৃতীয় তহুরে আর এক তালাক দিবে। এ ভাবে তিন তহুরে তিন তালাক দিবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে ঐ স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে না।

৩। তালাকের বিদআত ও হারাম তরীকা হলঃ উপরোক্ত তরীকাদ্বয়ের বিপরীত নিয়মে তালাক দেয়া। যেমন এক সঙ্গে তিন তালাক দেয়া বা হায়েযের সময় তালাক দেয়া বা যে তহুরে সহবাস হয়েছে সেই তহুরে তালাক দেয়া। এ সব অবস্থায় তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে, তবে গোনাহ হবে।

ইদ্দতের মাসায়েল

(স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হলে বা তার স্বামীর মৃত্যু হলে যে সময়ের জন্য উক্ত স্ত্রীকে এক বাড়ীতে থাকতে হয়, অন্যত্র যেতে পারে না বা অন্য কোথাও বিবাহ বসতে পারে না তাকে ইদ্দত বলে। ইদ্দতের মাসায়েল নিম্নরূপ ঃ)

* স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হলে তালাকের তারিখের পর পূর্ণ তিন হায়েয অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত স্ত্রীর পক্ষে অন্যত্র বিবাহ বসা হারাম।

* উক্ত ইদ্দতের সময়ে তাকে স্বামীর বাড়ীতেই নির্জন বাসস্থানে থাকতে হবে।

* উক্ত স্ত্রীর বয়স কম হওয়ার কারণে বা বৃদ্ধ হওয়ার কারণে হায়েয না আসলে তিন হায়েয়ের পরিবর্তে পূর্ণ তিন মাস উপরোক্ত নিয়মে ইদ্দত পালন করতে হবে।

* গর্ভাবস্থায় তালাক হলে সন্তান প্রসব হওয়া মাত্রই ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে, চাই যত তাড়াতাড়ি প্রসব হোক না কেন।

* হায়েযের অবস্থায় তালাক হলে সে হায়েযকে ইদ্দতের মধ্যে ধরা যাবে না। সে হায়েয বাদ দিয়ে পরবর্তী পূর্ণ তিন হায়েয ইদ্দত পালন করতে হবে।

* যদি কোন স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহবাস বা নির্জনবাস হওয়ার পূর্বেই স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাকে ইদ্দত পালন করতে হয় না।

* তালাকে বায়েন হলে ইদ্দত পালন করার সময় (পূর্ব) স্বামী থেকে সতর্কতার সাথে পূর্ণ মাত্রায় পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে। তবে স্বামী কর্তৃক অবৈধভাবে আক্রান্ত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকলে সেখান থেকে সরে অন্যত্র গিয়ে ইদ্দত পালন করাই সমীচীন হবে।

* কোন বিবাহ যদি অবৈধ হয় এবং সহবাসও হয় তাহলে ঐ পুরুষ যখন তাকে পরিত্যাগ করবে তখন থেকে ইদ্দত পালন করতে হবে।

* যে স্ত্রীর স্বামী মারা যায় তার ইদ্দত হল চার মাস দশ দিন আর গর্ভবতী হলে তার ইদ্দত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত।

* স্বামীর মৃত্যু হলে মৃত্যুকালে স্ত্রী যে বাড়ীতে ছিল ইদ্দত পালন করার সময় দিবারাত্রি সে বাড়ীতেই থাকতে হবে, অবশ্য গরীব হলে এবং বাইরে গিয়ে কাজকর্ম ব্যতিরেকে খাওয়া পরার ব্যবস্থা না থাকলে দিনের বেলায় কাজের জন্য বাইরে যেতে পারবে, কিন্তু রাতের বেলায় সে বাড়ীতেই থাকতে হবে। বাড়ীতে নিজেদের একাধিক ঘর বা একাধিক কামরা থাকলে যে কোন ঘর বা যে কোন কামরায় থাকতে পারবে। নির্দিষ্ট একটি স্থানেই আবদ্ধ থাকা জরুরী নয়। বাড়ির বারান্দা বা উঠানেও বের হতে পারবে।

* স্বামীর মৃত্যু চাঁদের প্রথম তারিখে হলে চাঁদের হিসেবে চার মাস দশ দিন ধরা হবে। আর চাঁদের প্রথম তারিখ ছাড়া অন্য যে কোন তারিখে মৃত্যু হলে ৩০ দিনের চার মাস এবং তারপর ১০দিন অর্থাৎ, ১৩০দিন ইদ্দত পালন করবে। স্ত্রী ঋতুমতী বা গর্ভবতী না হলে যদি তাকে তালাক দেয়া হয়, তাহলে চাঁদের ১ম তারিখে তালাক হলে চাঁদের হিসেবে তিন মাস আর অন্য তারিখে তালাক হলে ৩০ দিনের তিন মাস অর্থাৎ, ৯০ দিন ইদ্দত ধরা হবে।

* স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেতে দেরী হলে সংবাদ পাওয়ার পূর্বে যে সময় অতিবাহিত হয়েছে সেটাও ইদ্দতের ভিতর অতিবাহিত হয়েছে ধরা হবে আর ইদ্দতের পূর্ণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সংবাদ পেলে আর তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে না– তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে ধরা হবে।

* স্বামীর মৃত্যু হলে বা তালাকে বায়েন হলে স্ত্রীকে শোক পালন করতে হয়। এ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৪৬০ পৃষ্ঠা।

ওয়াক্‌ফ/ সদকায়ে জারিয়ার মাসায়েল

* জায়গা-জমি, বাড়ি, বাগান ইত্যাদি আল্লাহর নামে এই মর্মে ওয়াক্‌ফ করা যে, এতে মসজিদ/ মাদ্রাসা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হবে কিম্বা এতে গরীব দুঃখীরা, ইসলামের সেবকরা থাকবে কিম্বা এর আয় থেকে তারা ভোগ করবে–এরূপ করাকে 'সদকায়ে জারিয়া' বলে। অন্যান্য সব এবাদত বন্দেগীর ছওয়াব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু সদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব যতদিন ঐ সম্পত্তি থাকবে এবং যতদিন গরীব দুঃখীর উপকার ও ইসলামের খেদমত হতে থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত দাতার আমলনামায় ছওয়াব লেখা হতে থাকবে।

* ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিতে যেন কোনরূপ খেয়ানত না হয় বা বে-জায়গায় খরচ না হয় সে জন্য একজন মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা দরকার, যদিও মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা ছাড়াও ওয়াক্‌ফ করা সহীহ। মুতাওয়াল্লির গুণাবলী ও যোগ্যতা সম্পর্কে ১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে।

* ওয়াক্‌ফকারী যদি নিজের জীবিত কাল পর্যন্ত নিজেই মুতাওয়াল্লী থাকতে চায় তাও জায়েয আছে।

* ওয়াক্‌ফকারী যদি এই শর্ত করে যে, যত দিন আমি জীবিত থাকব, ততদিন এই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ আমি নিজেই করব এবং এর আয়ের এক চতুর্থাংশ বা অর্ধেক বা আমার প্রয়োজন পরিমাণ আমি রাখব (অবশিষ্ট অমুক অমুক দ্বীনী কাজে ব্যয় হবে) তবে এরূপ ওয়াক্‌ফ করা এবং শর্ত অনুযায়ী আয়ের অংশ গ্রহণ করাও দুরস্ত আছে।

* ওয়াক্‌ফকারী যদি শর্ত করে যে, এই ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় থেকে এত অংশ বা এত টাকা আগে আমার আওলাদ পাবে, (বাকী যা কিছু থাকবে তা অমুক অমুক দ্বীনী কাজে ব্যয় হবে) তবে তাও দুরস্ত আছে। আওলাদকে উক্ত পরিমাণই দেয়া হবে।

* মাদ্রাসা মসজিদে টাকা-পয়সা বা মাল-আসবাব দান করা এবং তালিবে ইলমদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করাও সদকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

(ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির অন্যান্য মাসায়েল ৩০৫-৩০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে)

ওয়াসিয়াত

* নজের মাল বা সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের অধিক ওয়াসিয়াত করা যাবে না। এক তৃতীয়াংশের অধিকের জন্য ওয়াসিয়াত করলেও তার ওয়াসিয়াত এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে, ওয়াসিয়াত সম্পূর্ণ হোক বা না হোক।

* নিজের ওয়ারিছ (যে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে অংশ পাবে)-এর জন্য ওয়াসিয়াত করা যায় না। অবশ্য যদি অন্যান্য ওয়ারিছরা এতে সম্মত থাকে তাহলে উক্ত ওয়ারিছ ওয়াসিয়াত দ্বারা অংশ পেতে পারে অথবা যদি উক্ত ওয়ারিছ হকদার হওয়া সত্ত্বেও অন্য কোন কারণে মীরাছ থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলেও সে ওয়াসিয়াত অনুযায়ী অংশ পাবে, যেমন দাদা জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় পিতা ইন্তেকাল করলে নাতি দাদার সম্পত্তি থেকে অংশ পায় না কিন্তু দাদা ওয়াসিয়াত করে গেলে তখন উক্ত নাতি ওয়াসিয়াত অনুযায়ী অংশ পাবে।

* কোন মাকরূহ বা হারাম কাজের জন্য ওয়াসিয়াত করে গেলে তা পূরণ করা হবে না।

* ওয়াসিয়াতকারীর মৃত্যুর পর তার কাফন-দাফনের ব্যয় ও ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট অর্থ থেকে ওয়সিয়াত পূর্ণ করা হবে। দাফন-কাফনের ব্যয় ও ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট না থাকলে ওয়াসিয়াত পূরা করা হবে না।

* কেউ কোন দ্রব্য বা শস্য সদকা করার ওয়াসিয়াত করলে সে দ্রব্যের দামও সদকা করা যায়।

* কাউকে নিজের বাড়িতে বিনা ভাড়ায় থাকতে দেয়ার ওয়াসিয়াত করলে সে ওয়াসিয়াত জায়েয আছে কিন্তু সে যদি একটি মাত্র বাড়ি রেখে যায় তাহলে সে ওয়াসিয়াত এক তৃতীয়াংশের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে অর্থাৎ তাকে উক্ত বাড়ির এক তৃতীয়াংশের মধ্যে থাকতে দেয়া হবে, বাকী অংশ ওয়ারিছদের জন্য।

* যতদিন কোন লোক জীবিত থাকবে, তার নিজের ওয়াসিয়াত ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারও বাকী থাকবে।

* যদি কেউ ওয়াসিয়াত করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার জানাযা পড়াবে বা আমাকে অমুক স্থানে দাফন করবে তাহলে এসব ওয়াসিয়াত পূরণ করা ওয়াজিব নয়, তবে অন্য কোন শরীয়ত সম্মত বাঁধা না থাকলে পূরণ করাতে কোন অসুবিধা নেই।

* কারও অনাদায়ী যাকাত, অনাদায়ী হজ্জ থাকলে তা আদায় করার বা নামায রোযা বাকী থাকলে তার ফেদিয়া আদায় করার ওয়াসিয়াত করে যাওয়া ওয়াজিব। এরূপ ওয়াসিয়াত করে গেলে তার দাফন-কাফন ও ঋণ পরিশোধের

পর যে পরিমাণ সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকবে তার এক তৃতীয়াংশের মধ্য হতে তা আদায় করা হবে। যদি এক তৃতীয়ংশের মধ্যে তা আদায় না হয় তাহলে তা আদায় করা না করা ওয়ারিছদের ইচ্ছাধীন থাকবে। 'নামাযের ফেদিয়া, 'রোযার ফেদিয়া', 'বদলী হজ্জ' ইত্যাদি পরিচ্ছেদে এসব সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

মীরাছ বা উত্তরাধিকার বন্টনের মাসায়েল

(মীরাছে কার কি অংশ সে সম্পর্কে আমি এ গ্রন্থে আলোচনা করব না, উত্তরাধিকারীদের প্রকার ও সংখ্যার কম বেশী হওয়াতে তার মধ্যে পার্থক্যও হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে ফারায়েয সম্পর্কে অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামএর নিকট প্রত্যেকে তাদের অবস্থা জানিয়ে সমাধান জেনে নিতে পারবেন। এখানে মীরাছ বন্টনের পূর্বে কি কি করণীয় আছে সে সম্পর্কিত মাসায়েল বর্ণনা করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করা হবে।)

* মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তিন প্রকারের খরচ সমাধা করার পূর্বে মীরাছ বা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন করা যায় না। উক্ত তিন প্রকার খরচ সমাধা করার পর কিছু উদ্বৃত্ত না থাকলে ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারীগণ কিছুই পাবে না– থাকলে পাবে। সে খরচ তিনটি হল– (১) মৃতের দাফন-কাফন, (২) মৃতের ঋণ, (৩) মৃতের ওয়াসিয়াত। ওয়াসিয়াত সম্পর্কে পূর্বের পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। দাফন-কাফন ও ঋণ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল।

* মৃত ব্যক্তি যা কিছু রেখে যায়, তন্মধ্য থেকে সর্ব প্রথমে তার দাফন-কাফনের খরচ বহন করা হবে। অবশ্য যদি অন্য কেউ ছওয়াবের নিয়তে বা মহব্বতে দাফন– কাফনের খরচ বহন করতে চায় তাহলে তা নির্ভর করবে ওয়ারিছদের মর্জির উপর; তারা ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। স্ত্রীর দাফন-কাফনের খরচ সর্ব প্রথম স্বামীর উপর বর্তায়, স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বহন করতে হবে। যে মৃত ব্যক্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি রেখে যায়নি তার দাফন-কাফনের খরচ সেসব লোকেরা বহন করবে যারা পরিত্যক্ত সম্পত্তি থাকলে তার ওয়ারিছ হতো– যে যে অনুপাতে মীরাছ পেতো সে অনুপাতেই সে এ খরচ বহন করবে। আর যে লাওয়ারিছ অর্থাৎ, যার কোন ওয়ারিছ বা আত্মীয়-স্বজন না থাকে, তার কাফন–দাফনের দায়িত্ব ইসলামী সরকারের। ইসলামী সরকার না থাকলে সেই লাওয়ারিছ মৃত ব্যক্তির মহল্লা বা লোকালয়ের লোকদের উপর তার দাফন-কাফনের খরচ বহন করা ওয়াজিব।

* দাফন-কাফনের পর এবং মীরাছ বন্টনের পূর্বে দ্বিতীয় জরুরী খরচ হল মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা (যদি ঋণ থাকে)। ঋণ দুই ধরনের (এক) সুস্থ অবস্থার ঋণ ঃ অর্থাৎ সুস্থাবস্থায় যদি কারও থেকে নগদ টাকা ঋণ নিয়ে থাকে বা সুস্থ্য অবস্থায় কারও থেকে কিছু ক্রয় করে থাকে এবং তার দাম বাকী থাকে আর সুস্থ অবস্থায়ই সে তার এসব ঋণের কথা প্রকাশ করে থাকে বা অন্যরা এমনিতেই সে বিষয়ে অবগত ছিল। স্ত্রীর অনাদায়ী মোহরও এই প্রকার ঋণের অন্তর্ভুক্ত। (দুই) এমন ঋণ যা সে অন্তিম রোগ (মারাদুল মাওত)-এর সময় স্বীকার করে ছিল যা অন্য কারও জানা ছিল না বা কোন সাক্ষীও ছিল না। অন্তিম রোগ বা মারাদুল মওত বলতে বোঝায় যে রোগে তার ইন্তিকাল হয়।

উক্ত উভয় প্রকার ঋণের হুকুম আহকাম নিম্নরূপ ঃ

(১) যদি মৃতের দায়িত্বে এক প্রকার বা উভয় প্রকারের ঋণ থাকে তাহলে দাফন-কাফন সম্পন্ন করার পর উভয় প্রকার ঋণ পরিশোধ করা হবে। তার পরে মীরাছ বন্টন করা হবে।

(২) পরিত্যক্ত সম্পত্তির চেয়ে ঋণের পরিমাণ অধিক হলে দেখতে হবে- যদি সে ঋণ এক প্রকার এবং প্রাপক এক ব্যক্তি হয় তাহলে কাফন-দাফনের পর যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকবে তা তাকে দিয়ে দেয়া হবে। বাকীটুকু প্রাপক মাফ করে দিবে। সে মাফ করতে না চাইলেও তার সে অধিকার রয়েছে তবে আইনতঃ ওয়ারিছদের উপর তা পরিশোধের জিম্মাদারী নেই। অবশ্য তারা অবস্থা সম্পন্ন হয়ে থাকলে বাকী ঋণটুকুও পরিশোধ করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব। আর যদি প্রাপক একাধিক ব্যক্তি হয় তাহলে তারা সবাই কাফন-দাফনের পর উদ্বৃত্তটুকু নিজেদের মধ্যে ঋণের অনুপাতে বন্টন করে নিবে।

(৩) যদি মৃত ব্যক্তির উভয় প্রকারের ঋণ থাকে এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি (দাফন-কাফনের ব্যয় বহন করার পর) সেসব ঋণ পরিশোধে যথেষ্ট না হয় তাহলে প্রথমে পরিশোধ করতে হবে প্রথম প্রকারের ঋণ। তারপর অবশিষ্ট থাকলে দ্বিতীয় প্রকারের পাওনাদাররা তাদের ঋণের অনুপাতে যা থাকে সেটা বন্টন করে নিবে। অর্থাৎ, তারা সে অনুপাতেই অংশ পাবে। আর প্রথম প্রকারের ঋণ পরিশোধ করার পর কিছু অবশিষ্ট না থাকলে তারা ওয়ারিছদেরকে আইনত বাধ্য করতে পারবে না। অবশ্য নৈতিক দায়িত্ব ভেবে ওয়ারিছগণ নিজেদের অর্থ থেকে দিয়ে দিলে ভিন্ন কথা, এর জন্য ওয়ারিছগণ ছওয়াবও লাভ করবে।

* মীরাছের আইন অনুযায়ী যেসব আপনজন অংশ পায় না, তারা যদি মীরাছ বণ্ঠনের সময় মজলিসে উপস্থিত থাকে বিশেষতঃ তাদের মধ্যে যারা এতীম,

মিসকীন ও অভাবগ্রস্ত হয় তাদেরকে অংশীদারগণ স্বেচ্ছায় কিছু দিয়ে তাদেরকে খুশি করা উত্তম। এটা অংশীদারদের আইনগত দায়িত্ব নয়- নৈতিক দায়িত্ব। এটাও এক প্রকার সদকা ও নেক কাজ।

মামলা-মোকদ্দমা, সাক্ষ্য ও বিচার সংক্রান্ত মাসায়েল

* মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা করে অর্জিত সম্পদ নিজের হয়ে যায় না- তা ভোগ করা নাজায়েয ও হারাম।

* যখন কোন ব্যাপারে কাউকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা হয়, তখন সে বিষয় সম্পর্কে তার বিশুদ্ধভাবে জানা থাকলে সে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করবে না- শরীয়ত সম্মত ওযর ব্যতীত সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা গোনাহ। পক্ষান্তরে সাক্ষীকে বার বার ডেকে বা সে যাতায়াত খরচ চাইলে তা না দিয়ে বা অন্য কোন ভাবে তাকে বিব্রত করাও গোনাহ।

* কোন নারীকে বিচারক নিয়োগ করা জয়েয নয়। তবে ইমাম আবূ হানীফার মতে যে ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য জায়েয শুধু সেরূপ ক্ষেত্রের জন্য নারীকে বিচারক নিয়োগ করা যায়।

* বিচারকের জন্য বাদী/বিবাদী থেকে বা অধীনস্ত আমলাদের থেকে কোন হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ নয়। বিচারকের জন্য বাদী/বিবাদী কোন পক্ষের দাওয়াত গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ। বিচারকের জন্য মাতা- পিতা বা সন্তানের পক্ষে কোন রায় দেয়ার অনুমতি নেই, কেননা এতে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠতে পারে। তবে তাদের বিপক্ষে ন্যায়সঙ্গত ভাবে রায় দিতে পারবে।

* বিচারকের জন্য বিনা ওযরে কোন মামলার রায় প্রদানে বিলম্ব করা জায়েয নয়।

* বিবাদী উপস্থিত থাকলে তার বক্তব্য না শুনে রায় প্রদান করা বৈধ নয়।

* বাদী বিবাদী কোন পক্ষের বক্তব্য শ্রবণে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা বৈধ নয়- উভয় পক্ষের বক্তব্যই সমান আন্তরিকতার সাথে শ্রবণ করা দায়িত্ব।

* রাগের অবস্থায় বিচার করা ও রায় প্রদান করা নিষিদ্ধ।

(الاحكام السلطانية ও معارف القرآن প্রভৃতি থেকে গৃহীত)

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

সত্যিকার মুসলমান সেই, যার জবান ও হাত দ্বারা কোন মুসলমান কষ্ট পায় না।

(মুসলিম)

চতুর্থ অধ্যায়

মুআশারাত

নামায রোযা ইত্যাদি ইবাদত যেমন ফরয, তেমনিভাবে মুআশারাত তথা পারস্পরিক আচার-আচরণ ও সমাজ সামাজিকতা দুরুস্ত করা এবং আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার রক্ষা করাও ফরয। (اسلامی تہذیب)

মানবাধিকার

মাতা-পিতার জন্য সন্তানের করণীয়
তথা
মাতা-পিতার অধিকার

(১) যদি মাতা-পিতার প্রয়োজন হয় এবং সন্তান তাদের ভরণ-পোষণ দিতে সক্ষম হয়, তাহলে মাতা-পিতার ভরণ-পোষণ দেয়া সন্তানের উপর ওয়াজেব। এমন কি পিতা-মাতা কাফের হলেও তাদের ভরণ-পোষণ দেয়া ওয়াজিব।

(২) প্রয়োজন হলে মাতা-পিতার খেদমত করা। খেদমত নিজে করতে পারলে করবে নতুবা খেদমতের জন্য লোকের ব্যবস্থা করা দায়িত্ব। উল্লেখ্য যে, খেদমতের ক্ষেত্রে পিতার তুলনায় মাতাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

(৩) পিতা-মাতা ডাকলে তাদের ডাকে সাড়া দেয়া এবং হাজির হওয়া। এমনকি পিতা-মাতা যদি কোন অসুবিধায় পড়ে বা অসুবিধার ভয়ে সহযোগিতার জন্য ডাকেন আর অন্য কেউ তাদের সহযোগিতা করার মত না থাকে, তাহলে ফরয নামাযে থাকলেও তা ছেড়ে দিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া ওয়াজিব। তবে জরুরত ছাড়া যদি ডাকেন তাহলে ফরয নামায ছাড়া জায়েয হবে না। আর নফল বা সুন্নাত নামাযে থাকা অবস্থায় বিনা জরুরতে পিতা-মাতা ডাকলে তখনকার মাসআলা হল—যদি সে নামাযে আছে একথা না জেনে ডেকে থাকেন তাহলে নামাজ ছেড়ে তাদের ডাকে সাড়া দেয়া ওয়াজেব। আর যদি নামাযে আছে একথা জেনেও বিনা জরুরতে ডাকেন, তাহলে সেরূপ ক্ষেত্রে নামাজ ছাড়বে না। দাদা-দাদী, নানা-নানীর ক্ষেত্রেও মাসআলা অনুরূপ।

(৪) মাতা-পিতার হুকুম মান্য করা ওয়াজিব, যদি কোন পাপের বিষয়ে হুকুম না হয়। কেননা, পাপের বিষয়ে হুকুম হলে তা মান্য করা নিষেধ। মোস্তাহাব পর্যায়ের ইল্‌ম হাছিল করার জন্য সফর করতে হলে তাদের অনুমতি প্রয়োজন। তবে ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া পরিমাণ ইল্‌ম হাছিল করার জন্য সফর করাটা তাদের অনুমতির উপর নির্ভরশীল নয়। এ সম্পর্কে অত্র গ্রন্থের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(৫) পিতা-মাতার সঙ্গে সম্প্রীতি ও ভক্তির সাথে নম্রভাবে কথা বলা আদব। রূঢ়ভাবে ও ধমকের স্বরে কথা বলা নিষেধ।

(৬) কথায়, কাজে ও আচার-আচরণে পিতা-মাতার আদব-সম্মান রক্ষা করা। এ জন্যেই তাঁদের নাম ধরে ডাকা নিষেধ, চলার সময় তাঁদের পশ্চাতে চলা উচিত, তাঁদের সামনে নিম্ন স্বরে কথা বলা উচিত, তাঁদের দিকে তেজ দৃষ্টিতে তাকানো অনুচিত। উল্লেখ্য যে, সম্মানের ক্ষেত্রে মাতার তুলনায় পিতাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

(৭) কোনভাবে তাঁদেরকে কষ্ট দেয়া হারাম। মাতা-পিতা অন্যায়ভাবে কষ্ট দিলেও তাঁদেরকে কষ্ট দেয়া যাবে না। এমনকি মৃত্যুর পরও তাঁদেরকে কষ্ট দেয়া নিষেধ, এ জন্যেই তাঁদের মৃত্যুর পর চিৎকার করে কাঁদা নিষেধ। কারণ তাতে তাঁদের রূহের কষ্ট হয়।

(৮) নিজের জন্য যখনই দুআ করা হবে, তখনই পিতা-মাতার মাগফেরাতের জন্য, তাঁদের প্রতি আল্লাহর রহমতের জন্য এবং তাঁদের মুশকিল আছান ও কষ্ট দূর হওয়ার জন্য দুআ করা কর্তব্য। তাঁদের মৃত্যুর পরও আজীবন তাঁদের জন্য এরূপ দুআ করতে হবে। জনৈক তাবিঈ বলেছেন, যে প্রতিদিন অন্ততঃ পাঁচবার পিতা-মাতার জন্য দুআ করল, সে পিতা-মাতার হক (অর্থাৎ, দুআ বিষয়ক হক) আদায় করল। পিতা-মাতার জন্য দুআ করার বিশেষ বাক্যও আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন। তা হল– رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا এ দুআর মধ্যে পিতা-মাতার প্রতি আল্লাহর রহমত কামনা করা হয়। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, পিতা-মাতা অমুসলমান হলে তাঁদের জীবদ্দশায় এ রহমতের দুআ এই নিয়তে জায়েয হবে যে, তারা পার্থিব কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুন এবং ঈমানের তওফীক লাভ করুন। মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য রহমতের দুআ করা জায়েয নয়।

(৯) পিতা-মাতার খাতিরে পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনের সাথে এবং পিতা-মাতার ঘনিষ্ঠজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করা, সম্মানের ব্যবহার করা এবং সাধ্য অনুযায়ী তাদের উপকার ও সাহায্য করা কর্তব্য।

(১০) পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করা এবং তাদের জায়েয ওছীয়ত পালন করাও তাঁদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

বিঃ দ্রঃ দুধমাতার সাথেও সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাঁর আদব তাযীম রক্ষা এবং যথাসাধ্য তাঁর ভরণ-পোষণ করতে হবে। আর বিমাতা নিজের আপন মাতা না হলেও যেহেতু সে পিতার প্রিয়জনের মধ্যে একজন, তাই তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার এবং যথাসাধ্য তাঁর জানে মালে খেদমত করতে হবে।

(مفاتيح الجنان ـ ج/١ احسن الفتاوى ـ تنبيه الغافلين ـ حقوق العباد ـ معارف القرآن ও [illegible] প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

সন্তানের জন্য পিতা-মাতার করণীয় তথা সন্তানের অধিকার

(১) সুসন্তানের জন্য একজন সুন্দর মাতার ব্যবস্থা করা ঃ অর্থাৎ, শরীফ ও নেককার নারীকে বিবাহ করা, তাহলে তার গর্ভে সু-সন্তানের আশা করা যায়। কেননা সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থাতেই মাতার চিন্তা-ভাবনা, মন-মানসিকতা ও স্বভাব-চরিত্রের প্রভাব সন্তানের উপর পড়া শুরু হয় এবং মাতৃকোলে লালন-পালন অবস্থাতেও এই প্রভাব পড়তে থাকে।

(২) সন্তানের জীবন রক্ষা করা ঃ ইসলাম জাহেলী যুগের সন্তান হত্যা করার রছমকে তাই হারাম করেছে। সন্তানের জীবন রক্ষার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা মাতা-পিতার দায়িত্ব। সন্তানের উপর থেকে বালা-মুসীবত যেন দূর হয়ে যায়—এ উদ্দেশ্যে সন্তানের আকীকা করাকে সুন্নাত করা হয়েছে।

(৩) সন্তানকে লালন-পালন করাও মাতা-পিতার দায়িত্ব। এ জন্য মাতার উপর দুধপান করানোকে ওয়াজিব করা হয়েছে। মাতার অবর্তমানে বা তাঁর অপারগতার অবস্থায় দুধমাতার মাধ্যমে সন্তানকে দুধ পান করানো হলে তার ব্যয়ভার বহন করা সন্তানের পিতার উপর ওয়াজিব। উল্লেখ্য যে, দুধমাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সচ্চরিত্রবান ও দ্বীনদার মহিলাকে নির্বাচন করা কর্তব্য। কারণ, বাচ্চার চরিত্রে দুধের একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে। এমনিভাবে সন্তানের লালন-পালন হালাল সম্পদ দ্বারা হওয়া চাই, নতুবা সন্তান বড় হওয়ার পর তার মধ্যে হালাল হারাম-এর পার্থক্য করার প্রবৃত্তি থাকবে না।

(৪) সন্তানকে আদর সোহাগের সাথে লালন- পালন করা কর্তব্য। কেননা আদর সোহাগ থেকে বঞ্চিত হলে সন্তানের স্বভাব-চরিত্রে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

(৫) সন্তানের ভাল নাম রাখা মাতা-পিতার দায়িত্ব এবং এটা সন্তানের অধিকার। এর দ্বারা বরকত হাছিল হবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪৯৪ পৃষ্ঠা।

(৬) সন্তানকে সুশিক্ষা প্রদান করা ঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই এ শিক্ষা প্রদান শুরু হবে। তাই সন্তান-ছেলে হোক বা মেয়ে– ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে

সাথেই তার ডান কানে আযানের শব্দগুলো এবং বাম কানে ইকামতের শব্দগুলো শোনানো সুন্নাত করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এ শব্দগুলোর একটা সুপ্রভাব তার মধ্যে পড়বে। সন্তানকে সর্বপ্রথম কথা যেটা শিখানো উত্তম তা হল "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু"। সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেয়া এবং ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা দেয়া কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে। সন্তানদের দুনিয়াবী হকের মধ্যে রয়েছে তাদেরকে সাঁতার কাটা, জীবিকা উপার্জনের জন্য কোন বৈধ পেশা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেয়া।

(৭) সন্তানকে আদব, আমল ও সচ্চরিত্র শিক্ষা দেয়া ঃ দুধের শিশু অবস্থা থেকেই তার আদব ও চরিত্র শিক্ষা শুরু হয়ে যায়। তাই ইসলামী নীতিতে বলা হয়েছে দুগ্ধপোষ্য শিশুর জাগ্রত থাকা অবস্থায়ও তার সামনে মাতা-পিতা যৌন আচরণ থেকে বিরত থাকবে, নতুবা ঐ সন্তানের মধ্যে নির্লজ্জতার স্বভাব জন্ম নিতে পারে। সন্তানের সাত বৎসর বয়স হলে তাকে নামাযের নির্দেশ প্রদান এবং দশ বৎসর হলে মারপিট ও শাসনপূর্বক তার দ্বারা নামায পড়ানো- এগুলো সন্তানকে আমল শিক্ষা দেয়ার অংশ বিশেষ। সন্তানকে লালন-পালন, সুশিক্ষা প্রদান এবং আদব, আমল ও সচ্চরিত্র শিক্ষা দেয়া প্রসঙ্গে ৪৯৬-৫০২ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবরণ দেখুন।

(৮) সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ রক্ষা করা ঃ সন্তানদেরকে ধন-সম্পদ দান প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ভাল। তবে কোন সন্তান তালিবে ইল্‌ম হলে সে যেহেতু দ্বীনের কাজে নিয়োজিত থাকার দরুন জীবিকা উপার্জনে স্বাভাবিকভাবে পিছিয়ে থাকবে, তাই তাকে কিছু বেশী দান করে গেলে কোন অন্যায় হবে না। এমনিভাবে কোন সন্তান রোগের কারণে বা স্বাস্থ্যগত কারণে উপার্জন করতে অপারগ হলেও তাকে কিছু বেশী দেয়া যায়।

(৯) বিবাহের উপযুক্ত হলে বিবাহ দেয়া। তবে বিবাহের খরচ বহন করা পিতা/মাতার দায়িত্ব নয়। (احسن الفتاوی ج / ٥)

(১০) কন্যা বিধবা কিম্বা স্বামী পরিত্যাক্তা হলে পুনঃবিবাহ পর্যন্ত তাকে নিজেদের কাছে রাখা এবং তার প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা পিতা-মাতার দায়িত্ব।

(مفاتيح الجنان ٥ / احسن الفتاوی ج – حقوق العباد ـ تربيت اولاد ـ تنبيه الغافلين এবং 'মাতা পিতা ও সন্তানের হক' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

উস্তাদের জন্য ছাত্রের করণীয়
তথা
উস্তাদের হক

(১) উস্তাদের আদব রক্ষা করা ঃ কথা-বার্তা, শব্দ প্রয়োগ, আচর-আচরণ, উঠা-বসা, চলা-ফেরা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই আদব রক্ষা করতে হবে। যেমন উস্তাদের আগে বেড়ে কথা না বলা, উস্তাদের সামনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরে কথা না বলা, তাঁদের দিকে পিছন দিয়ে না বসা, এক সাথে চলার সময় তাঁদের সামনে না চলা, তাদের সামনে বেশী না হাসা, বৃথা কথা না বলা ইত্যাদি।

(২) উস্তাদের প্রতি ভক্তি রাখা ঃ উস্তাদের সাথে ভক্তি সহকারে কথা বলা, ভক্তি সহকারে তাঁদের দিকে দৃষ্টি দেয়া এবং হাবভাবে ভক্তি প্রকাশ করা কর্তব্য।

(৩) উস্তাদকে আজমত ও শ্রদ্ধা করা ঃ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে শ্রদ্ধা ও আজমতের সাথে তাঁদের সামনে হাজির হওয়া কর্তব্য।

(৪) উস্তাদের সামনে তাওয়াজু' ও বিনয়ের সাথে থাকা ঃ কথা-বার্তা ও আচার-আচরণ সব কিছুতেই বিনয় থাকতে হবে। দুনিয়ায় সব ক্ষেত্রেই খোশামোদ তোষামোদ নিন্দনীয়; একমাত্র উস্তাদের সাথে তা প্রশংসনীয়।

(৫) উস্তাদের খেদমত করা ঃ এই খেদমতের মধ্যে উস্তাদ অভাবী এবং ছাত্র স্বচ্ছল হলে উস্তাদের বৈষয়িক সহযোগিতা করা এবং তাঁদেরকে হাদিয়া-তোহফা প্রদান করাও অন্তর্ভুক্ত।

(৬) উস্তাদের হক অনেকটা পিতার মত। বস্তুতঃ উস্তাদ হল রূহানী পিতা, তাই পিতার ন্যায় উস্তাদের হকও তাঁর মৃত্যুর পরেও বহাল থাকে। এজন্যেই উস্তাদের মৃত্যুর পরও সর্বদা তাঁর জন্যে দুআ করা কর্তব্য। উস্তাদের নিকট আত্মীয়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, তাঁদের খেদমত করা, এমনিভাবে উস্তাদের বন্ধু-বান্ধব ও সমসাময়িক অন্যান্য শিক্ষকদের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং প্রয়োজনে তাঁদের খেদমত করা কর্তব্য।

(৭) উস্তাদের খেদমতে লিপ্ত হলে আদব হল তাঁর অনুমতি ব্যতীত চলে না যাওয়া। (অনুমতি প্রকাশ্য হোক বা লক্ষণ থেকে বোঝা যাক)

(৮) কোন কারণে উস্তাদ অসন্তুষ্ট হলে বা উস্তাদের মেজাযের পরিপন্থী কোন কথা বলে ফেললে সাথে সাথে নিজের ত্রুটির জন্য ওযরখাহী করা এবং উস্তাদকে সন্তুষ্ট করা জরুরী।

(৯) ছাত্রের কোন অসংগত প্রশ্ন বা অসংগত আচরণের কারণে উস্তাদ রাগ করলে, বকুনি দিলে বা মারধর করলে ছাত্রের কর্তব্য সেটা সহ্য করা। এমনকি অন্যায়ভাবে কিছু বললেও তার নিন্দা-শেকায়েত না করা এবং মন খারাপ না করা উচিত।

(১০) ছাত্রের কর্তব্য মনোযোগের সাথে উস্তাদের বক্তব্য ও ভাষণ শ্রবণ করা, অন্যমনস্ক না হওয়া এবং উস্তাদের কথা ভাল করে ইয়াদ মুখস্থ করা।

(১১) উস্তাদ কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে নিষেধ করলে তা মান্য করা উচিত এবং কখনো তাকে অসুবিধায় ফেলতে চেষ্টা না করা উচিত। কোন বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্ন করাও নিষেধ। নিজেদের মেধার গৌরব প্রদর্শনের জন্য প্রশ্ন করা বা অস্পষ্ট কিম্বা অর্থহীন প্রশ্ন করাও উচিত নয়।

(১২) উস্তাদের কোন বক্তব্য বোধগম্য না হলে সে জন্য উস্তাদের প্রতি কুধারণা পোষণ করবে না বরং বুঝতে না পারাকে নিজের বোধশক্তির ত্রুটি মনে করবে।

(১৩) উস্তাদের মতের বিপরীত অন্য কারও মত তাঁর সামনে বয়ান করবে না।

(১৪) পাঠ দানের সময় সম্পূর্ণ নিরব থাকা উচিত। এদিক সেদিক তাকানো, কথা-বার্তা বলা বা হাসি তামাশায় লিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ বর্জনীয়।

(১৫) নিজের কোন ত্রুটি হলে উস্তাদের সামনে অকপটে তা স্বীকার করে নেয়া কর্তব্য। অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত না হওয়া উচিত।

(১৬) উস্তাদের কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সে জন্য উস্তাদের প্রতি ভক্তি হারিয়ে না বসা বরং তার এমন কোন সুব্যাখ্যা বের করা, যাতে উস্তাদ রক্ষা পান। অবশ্য স্পষ্টতঃই উস্তাদ থেকে কোন অন্যায় সংঘটিত হলে তা সমর্থন না করা চাই।

(১৭) মাঝে মধ্যে চিঠিপত্র যোগাযোগ ও হাদিয়া-তোহফা দ্বারা তাঁদের মন খুশি করতে থাকা কর্তব্য। সারা জীবন এটা করতে থাকবে। ছাত্রজীবন শেষ হয়ে গেলেই উস্তাদের হক বন্ধ হয়ে যায় না।

(১৮) নিজের দ্বারা উস্তাদের কোন আসবাবপত্রের ক্ষতি সাধন হলে আদবের সাথে সেটা জানিয়ে দেয়া জরুরী। গোপন রেখে উস্তাদকে কস্ট দেয়া অনুচিত।

(১৯) উস্তাদ রোগাক্রান্ত হলে অথবা দুর্বল হয়ে পড়লে কিম্বা অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকলে সবক পাঠ বন্ধ রাখা।

(২০) শাগরিদকে উস্তাদের খেদমতে হাজির হয়ে ইলম শিক্ষা করতে হবে। শাগরিদের নিকট পড়াবার জন্য আসার কষ্ট উস্তাদকে না দেয়াই আদব।

(২১) উস্তাদ যা পড়াবেন পূর্বাহ্ণে তা মুতালা করা (পড়ে আসা)ও উস্তাদের হকের অন্তর্ভুক্ত। এতে করে তাকে বোঝানোর জন্য উস্তাদকে অতিরিক্ত বেগ পেতে হবে না বা বাড়তি কোন প্রশ্নের জওয়াব দেয়ার পেরেশানী উস্তাদকে সইতে হবে না।

(২২) উস্তাদ কোন ছাত্রের জন্য কোন বিশেষ বিষয় বা বিশেষ কিতাব/বই পড়া ক্ষতিকর মনে করে নিষেধ করলে ছাত্রের পক্ষে তা থেকে বিরত থাকা উচিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ যাদের থেকে দ্বীনী মাসআলা মাসায়েল শিক্ষা করা হয় তারাও শিক্ষক বলে গণ্য। এমনকি যাদের প্রণীত দ্বীনী কিতাব পত্র দ্বারা কেউ উপকৃত হয় এ নিয়ম অনুযায়ী তাঁরাও তার উস্তাদ এবং সে তাদের ছাত্র বা শাগরিদ বলে গণ্য। উস্তাদের ন্যায় তাঁদেরও হক রয়েছে, তবে কিছুটা হকের মধ্যে কমী বেশিতো থাকবেই, যা সহজে বোধগম্য।

(فروع الايمان . آداب المعاشرت . اصلاح انقلاب امت এবং ادب الدنيا و الدين প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

ছাত্রের জন্য উস্তাদের করণীয় তথা ছাত্রের হক

(১) ছাত্রদের সাথে কল্যাণকর, কোমল, সহজ, স্নেহপূর্ণ ও ভাল আচার-আচরণ করা কর্তব্য।

(২) ভুল না পড়ানো ঃ ভুল পড়ানো, ভুল ব্যাখ্যা দেয়া অথবা ভুল মাসআলা বলা সম্পূর্ণ হারাম। নিজের মূর্খতা গোপন করার জন্য এরূপ না করা উচিত।

(৩) কোন বিষয় না জানা থাকলে বলবে জানি না। নিজের পক্ষ থেকে আন্দাজে কিছু না বলা উচিত।

(৪) ছাত্রদের রুচি, যোগ্যতা এবং মেজাযের প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলা।

(৫) ছাত্রদের মেধা ও ধারণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের জন্য বিষয় বস্তু নির্বাচন ও উপস্থাপন করা কর্তব্য। বক্তব্যের ভাষা, অলংকার প্রয়োগ ও সবকের পরিমাণ নির্ধারণ এ নীতি অনুসারেই হতে হবে; নতুবা বিষয় তাদের বোধগম্য হবে না কিম্বা মেধা স্থবির হয়ে পড়বে, আর এভাবে তারা লেখা পড়ায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে।

(৬) ছাত্রদের দেহমনে সজীবতা ও অনুপ্রেরণা বহাল রাখার জন্য বৈধ পন্থায় তাদেরকে কিছু সময় আনন্দ ফুর্তির সুযোগ দিতে হবে এবং তাদের পানাহার ও আরাম বিশ্রামের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৭) ছাত্রদেরকে শুধু কিতাবী ইল্‌ম শিক্ষা দেয়াই যথেষ্ট নয় বরং তাদের আমল আখলাকের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৮) উস্তাদের বক্তব্য যেন ছাত্ররা শুনতে পায়– এতটুকু উচ্চস্বরে ভাষণ দেয়া (বা আওয়াজ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা) উস্তাদের কর্তব্য এবং এটা ছাত্রদের হক।

(৯) এক বারে ছাত্ররা বুঝতে বা উপলব্ধি করতে না পারলে দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার ভাষণ দিয়ে, ব্যাখ্যা করে পড়ানো উস্তাদের কর্তব্য এবং ছাত্রদের হক।

(১০) মাঝে মধ্যে ছাত্রদের পরীক্ষা নেয়া এবং তাদের জ্ঞানের উন্নতি ও বিশুদ্ধতা যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন।

(১১) কোন বিষয় বা কোন বিশেষ কিতাব কোন ছাত্রের পক্ষে ক্ষতিকর হলে তা থেকে তাকে বিরত রাখা।

(১২) ছাত্রদের ফলপ্রসু ইলম দানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা।

(১৩) রাগান্বিত অবস্থায় কোন কথা বলায় ছাত্রের উপকার হবে বুঝতে পারলে সেভাবেই বলা।

(১৪) কোন এক ব্যাপারে রাগ করলে অন্য ব্যাপারে সে রাগের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা উচিত নয়। এমনি ভাবে এক জনের উপর রাগ হলে সকলের উপর সে রাগ ঝাড়াও ঠিক নয়।

(১৫) ছাত্রের কোন প্রশ্নের জওয়াবে প্রয়োজনীয় ও উপকারী বিষয় থাকলে তার যথা সম্ভব জওয়াব দেয়া এবং জওয়াবের সাথে আনুষঙ্গিক কোন জরুরী বিষয় থাকলে সেগুলোও বলে দেয়া।

(১৬) অযোগ্য, বদমেজাযী বা স্নেহশীল নয়–এমন ব্যক্তির উস্তাদ হওয়া বা এমন ব্যক্তিকে উস্তাদ বানানো উচিত নয়। এরূপ করলে ছাত্রদের হক নষ্ট হবে।

(১৭) উস্তাদের নিজের মধ্যে আদব ও আমল আখলাক থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা, তার আদব ও আমল আখলাকের প্রভাব ছাত্রের উপর পড়বে।

(১৮) ছাত্রকে পড়ানোর পূর্বে উস্তাদের ভালভাবে পড়ে যাওয়া উচিত।

(১৯) ছাত্রদের মেধা ও স্মৃতিশক্তি বর্ধনের কোন কৌশল ও পন্থা জানা থাকলে তাদেরকে তা অবহিত করা উচিত।

(২০) উস্তাদ বড় এবং ছাত্র তার ছোট; অতএব ছোটদের প্রতি বড়দের যা যা করণীয় উস্তাদকে ছাত্রের জন্য সেগুলো করতে হবে (দ্রষ্টব্য-৩৮৩ পৃষ্ঠা)

(اصلاح انقلاب امت . آداب المعاشرت প্রভৃতি থেকে গৃহীত)

স্বামীর জন্য স্ত্রীর করণীয়
তথা
স্বামীর অধিকারসমূহ

(১) স্বামীর আনুগত্য ও খেদমত করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের পরে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকারই সবচেয়ে বেশী। তবে স্ত্রী কোন পাপ কাজে স্বামীর আনুগত্য করবে না; যেমন নামায না পড়া, যাকাত না দেয়া, পর্দায় না থাকা বা পেছনের রাস্তায় যৌন সংগম করতে দেয়া ইত্যাদি ব্যাপারে স্বামী হুকুম দিলে তা মান্য করা হারাম হবে। এসব ব্যাপারে (নম্রভাবে এবং কৌশল ও হেকমতের সাথে) স্বামীর বিরোধিতা করা ফরয। এমনিভাবে স্বামী যে কোন ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুআক্কাদা লংঘনের ব্যাপারে তথা হারাম বা মাকরূহ তাহরীমী করার ব্যাপারে হুকুম দিলে বা বললে তার বিরোধিতা করতে হবে আর কোন মোস্তাহাব ও নফল কাজের ব্যাপারে না করার হুকুম দিলে সে ব্যাপারে স্বামীর কথা মেনে চলা ওয়াজিব। স্ত্রী এমন কোন মোবাহ কাজে লিপ্ত হতে পারবে না যাতে স্বামীর খেদমতের ব্যাপারে ত্রুটি হয়। স্বামীর যে হুকুম না মানলে স্বামীর কষ্ট হবে-এরূপ হুকুম মানতে হবে (যদি সেটা পাপের হুকুম না হয়)। স্বামী কাছে থাকা অবস্থায় নফল নামায ও নফল রোযা স্বামীর অনুমতি ব্যতীত করবে না, তবে স্বামী সফরে বা বাইরে থাকলে তার অনুমতি ব্যতীত করাতেও ক্ষতি নেই।

(২) স্বামীর নিকট তাঁর সাধ্যের বাইরে কোন খাদ্য-খাবার বা পোশাক-পরিচ্ছদের আবদার করবে না বরং স্বামীর সাধ্য থাকলেও নিজের থেকে কোন কিছুর ফরমাশ না করাই উত্তম। স্বামীই নিজের থেকে তার খাহেশ জিজ্ঞেস করে সে মোতাবেক ব্যবস্থা করবে-এটাই সুন্দর পন্থা।

(৩) স্বামী অপছন্দ করে- এরূপ কোন পুরুষ বা নারীকে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘরে আসতে দিবে না, নিজের নিকট আনবে না এবং নিজের কাছে রাখবে না।

(৪) স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাড়ি বা ঘর থেকে বের হবে না।

(৫) স্বামীর টাকা-পয়সা ও মাল-সামান হেফাজত এবং সংরক্ষণ করা স্ত্রীর দায়িত্ব। স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীর টাকা-পয়সা ও মাল-সামান থেকে কাউকে (মা-বাপ, ভাই বোন হলেও) কোন কিছু দিবে না। এমনকি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার টাকা-পয়সা থেকে ঘরের আসবাব পত্রও ক্রয়

করতে পারবে না। স্বামীর টাকা-পয়সা থেকে গোপনে কিছু কিছু নিজে সঞ্চয় করা এবং নিজেকেই সেটার মালিক মনে করা এবং সেভাবে সে অর্থ অন্যত্র পাচার করা বা ব্যবহার করাও জায়েয নয়। সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্যও এরূপ করতে পারবে না, করতে চাইলে তার জন্য স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। এমনিভাবে স্বামীর স্পষ্ট অনুমতি বা অনুমতি দেয়ার প্রবল ধারণা না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর মাল-দৌলত থেকে কাউকে চাঁদা প্রদান বা দান-খয়রাতও করতে পারবে না। অবশ্য দুই চার পয়সা যা ফকীরকে দেয়া হয় বা এরূপ যৎসামান্য বিষয়-যে ব্যাপারে স্বামীর অনুমতি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা- সেরূপ বিষয় ভিন্ন কথা, সেটা অনুমতি ছাড়াও জায়েয। স্ত্রীর নিজস্ব সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রেও স্বামীর সাথে পরামর্শ করে নেয়া প্রয়োজন এবং সেটাই উত্তম।

(৬) স্বামী যৌন চাহিদা পূরণ করার জন্য আহবান করলে স্ত্রীর পক্ষে তাতে সাড়া দেয়া কর্তব্য, ফরয। অবশ্য শরীয়ত সম্মত ওযর থাকলে ভিন্ন কথা, যেমন হায়েয নেফাসের অবস্থা থাকলে।

(৭) স্বামী অস্বচ্ছল, দরিদ্র বা কুৎসিত হলে তাঁকে তুচ্ছ না জানা।

(৮) স্বামীর মধ্যে শরীয়তের খেলাফ কোন কিছু দেখলে আদবের সাথে তাঁকে সংশোধনের চেষ্টা করা এবং স্বামীকে দ্বীনদার বানানোর চেষ্টা চালানো স্ত্রীর কর্তব্য। এর জন্য প্রথমে স্ত্রীকে শরীয়তের অনুগত ও দ্বীনদার হতে হবে, তাহলে তার প্রচেষ্টা বেশী সফল হবে।

(৯) স্বামীর নাম ধরে না ডাকা। এটা বে-আদবী। তবে প্রয়োজনের সময় স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করা যায়।

(১০) কারও সম্মুখে স্বামীর সমালোচনা না করা।

(১১) স্বামীর আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঝগড়া-বিবাদ ও কথা কাটা কাটি না করা। সকলের সাথে মিলে মিশে থাকার চেষ্টা করা।

(১২) স্বামীর উদ্দেশ্যে সেজে-গুজে পরিপাটি হয়ে এবং হাসি মুখে থাকা কর্তব্য। এটা স্বামীর অধিকার।

(১৩) স্বামীর মেজায ও মানসিক অবস্থা বুঝে চলা জরুরী।

(১৪) স্বামী সফর থেকে এলে বা বাইরে থেকে কর্মক্লান্ত হয়ে এলে তার তাৎক্ষণিক যত্ন নেয়া, সুবিধা অসুবিধা দেখা ও খোঁজ খবর নেয়া জরুরী। শুধু সফর থেকে ফিরলেই নয় সর্বদাই স্বামীর স্বাস্থ্য শরীরের প্রতি খেয়াল রাখা ও যত্ন নেয়া স্ত্রীর দায়িত্ব।

(১৫) স্বামীর ঘরের রান্না বান্না করা, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি আইনগত ভাবে স্ত্রীর দায়িত্ব নয়, তবে এটা তার নৈতিক কর্তব্য। অবশ্য স্বামীর স্বচ্ছলতা থাকলে এর জন্য স্ত্রী চাকর নওকর চেয়ে নেয়ার অধিকার রাখে। স্ত্রী চাকর নওকরের কাজ তত্ত্বাবধান করবে এবং নিজেও তাদের সাথে কাজ করবে। এমনিভাবে স্বামীর কোন আত্মীয়-স্বজন বা শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করাও স্ত্রীর আইনগত দায়িত্ব নয়, তবে নৈতিক কর্তব্য। প্রয়োজনে এর জন্য স্বামী নিজে না পারলে চারক নওকর নিয়োগ করবে। অবশ্য স্বামী যদি অস্বচ্ছল হয় এবং নিজেও ঘরের বা মা-বাপ আপনজনের এসব খেদমত আঞ্জাম দিতে না পারে আর অনন্যোপায় অবস্থায় স্ত্রীকে এসব কাজের জন্য হুকুম দেয়, এমতাবস্থায় স্বামীর সে হুকুম না মানলে স্বামীর কষ্ট হবে বিধায় তখন স্ত্রীর পক্ষে সে হুকুম মান্য করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। ঘরের কাজ করার মধ্যে স্ত্রীর সম্মান নিহিত রয়েছে, অসম্মান নয় এবং এর জন্য স্ত্রী ছওয়াবও লাভ করবে– স্ত্রী এসব কথা মনে রাখলেই এভাবে চলা তার জন্য সহজ লাগবে।

(১৬) স্বামীর না শুকরি করবে না। যেমন কোন এক সময় তাঁর আনীত কোন দ্রব্য অপছন্দ হলে এরূপ বলবে না যে, কোন দিন তুমি একটা পছন্দ সই জিনিস দিলে না .... ইত্যাদি।

(১৭) স্বামীর আদব এহতেরাম ও সম্মান রক্ষা করে চলা। চড়া গলায় ঝাঁজালো স্বরে স্বামীর সাথে কথা না বলা, তাকে শক্ত কথা না বলা। স্বামী কখনও স্ত্রীর হাত পা দাবিয়ে দিতে গেলে স্ত্রী সেটা করতে দিবে না। ভেবে দেখুন তো মাতা-পিতা বা যাদের সাথে আদব রক্ষা করে চলতে হয় তারা এরূপ করতে চাইলে তখন কিরূপ করা হয়। অবশ্য অনন্যোপায় অবস্থার কথা ভিন্ন। মোটকথা কথা-বার্তায়, উঠা-বসায়, আচার-আচরণে সর্বদা স্বামীর আদব রক্ষা করে চলা কর্তব্য। ভালবাসা ও আদব উভয়টার সমন্বয় করে চলা কর্তব্য।

(১৮) সন্তানাদি লালন-পালন করা ঃ এটা স্ত্রীর দায়িত্ব। সন্তানকে দুধ পান করানো স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। (معارف القرآن)

(১৯) সতীত্ব রক্ষা করা ঃ এটা স্বামীর সম্পদ, অতএব সতীত্ব রক্ষা না করলে সতীত্বহীনতার অপরাধতো রয়েছেই, সেই সাথে রয়েছে স্বামীর অধিকার লংঘনের অপরাধ।

(بہشتی زیور ও تحفہ زوجین، مفاتیح الجنان থেকে গৃহীত)

স্ত্রীর জন্য স্বামীর করণীয় তথা স্ত্রীর অধিকারসমূহ

(১) হালাল মাল দ্বারা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেয়া স্বামীর উপর ওয়াজিব। পোষণ বা পোশাকের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রদান করা বা প্রতি ঈদে কিম্বা বিবাহশাদী ইত্যাদি উপলক্ষে থাকা সত্ত্বেও নতুন পোশাক দেয়া স্বামীর কর্তব্য নয়। দিলে তার অনুগ্রহ। স্বামীর স্বচ্ছলতা যেরূপ সেই মানের ভরণ-পোষণ দেয়া কর্তব্য। স্ত্রীর হাত খরচার জন্যেও পৃথকভাবে কিছু দেয়া উচিত, যাতে সে তার ছোটখাট এমন সব প্রয়োজন পূরণ করতে পারে যেগুলো সব সময় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তবে অবাধ্য হয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তার ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকার থাকে না।

(২) স্বামীর স্বচ্ছলতা থাকলে স্ত্রীর জন্য চাকর নওকরের ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। অবশ্য স্বচ্ছলতা না থাকলে তখন স্ত্রীকেই রান্না-বান্না (নিজের জন্য এবং স্বামীর সন্তানাদির জন্যেও) ইত্যাদি কাজ করতে হবে, এটা তখন তার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি স্ত্রী অসুস্থতার কারণে বা আমীর-উমরা প্রভৃতি বড় ঘরের কন্যা হওয়ার কারণে নিজে করতে সক্ষম না হয়, তাহলে স্বামীর দায়িত্ব প্রস্তুত খাবার ক্রয় করে আনা বা অন্য কোন স্থান থেকে বা অন্য কারও মাধ্যমে পাকানোর ব্যবস্থা করা।

(৩) স্ত্রীর বসবাসের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথক ঘর বা অন্ততঃ পৃথক রুম পাওয়া স্ত্রীর অধিকার। স্ত্রী যদি পৃথক থাকার কথা বলে এবং স্বামীর মাতা-পিতা বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে একই ঘরে থাকতে খুশি খুশি রাজী না থাকে, তাহলে তার ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। অন্ততঃ একটা পৃথক কামরা তাকে দিতে হবে, যেখানে সে তার মাল-আসবাব তালাবদ্ধ রেখে হেফাজত করতে পারে এবং স্বাধীন ভাবে একান্তে স্বামীর সাথে মনোরঞ্জন করতে পারে। উল্লেখ্য যে, শ্বশুর শাশুড়ীর খেদমত করা স্ত্রীর উপর আইনতঃ ওয়াজিব নয়, করলে তার ছওয়াব আছে। বরং এ খেদমতের দায়িত্ব তার স্বামীর; সে নিজে করতে না পারলে লোক দ্বারা করাবে। তাও না পারলে এবং একান্ত অনন্যোপায় অবস্থায় স্ত্রীর মাধ্যমে করাতে চাইলে তখন স্ত্রীর সেটা করার দায়িত্ব এসে যায়। নতুবা স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রী আন্তরিকভাবে না চাইলেও জবরদস্তী তাকে স্বামীর মাতা-পিতার অধীন করে রাখা, জোর জবরদস্তী মাতা-পিতার সাথে একান্নভুক্ত রাখা এবং জোর জবরদস্তী তার দ্বারা

মাতা-পিতার খেদমত করানো উচিত নয়। এটা স্ত্রীর প্রতি জুলুম। (اصلاح انقلاب امت) তবে স্ত্রীরও মনে রাখা উচিত যে, একান্ত ঠেকা অবস্থা না হলে স্বামীকে তার মাতা-পিতা ও ভাই বোন থেকে পৃথক করে নিয়ে তাদের মনে কষ্ট দেয়াও উচিত নয়। (تحفہ زوجین)

(৪) স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যহার করা।

(৫) স্ত্রীর চরিত্রের ব্যাপারে অহেতুক সন্দেহ বা কুধারণা না রাখা। (আবার একেবারে অসতর্কও না থাকা উচিত)

(৬) হায়েয নেফাস প্রভৃতির বিধান ও দ্বীনী মাসায়েল শিক্ষা করে স্ত্রীকে তা শিক্ষা দেয়া, নামায রোযা প্রভৃতি ইবাদত করা ও দ্বীনের উপর চলার জন্য স্ত্রীকে তাগিদ দেয়া এবং বেদআত, রছম প্রভৃতি শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ থেকে তাকে বাঁধা দেয়া স্বামীর কর্তব্য।

(৭) প্রয়োজন অনুপাতে স্ত্রীর সাথে সংগম করা। প্রতি চার মাসে অন্ততঃ একবার স্ত্রীর সাথে যৌন সংগম করা স্বামীর উপর ওয়াজিব।

(৮) স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত তার সাথে আযল না করা। (অর্থাৎ, যৌন সংগম কালে যোনির বাইরে বীর্যপাত না করা)

(৯) স্ত্রীর মাতা-পিতা, ভাই, বোন প্রভৃতি রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনের সাথে তাকে দেখা সাক্ষাত করতে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা। তবে যাতায়াতের ভাড়া দেয়া স্বামীর আইনত কর্তব্য নয়, দিলে সেটা তার অনুগ্রহ বলে বিবেচিত হবে। মাতা-পিতার সঙ্গে সপ্তাহে একবার সাক্ষাৎ করতে চাইলেও দিবে এবং অন্যান্য মাহরাম আত্মীয়দের সঙ্গে বৎসরে একবার। তবে মাতা-পিতা যদি কন্যার কাছে আসতে পারার মত হয় কিম্বা মাতা-পিতা বা কোন আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার মধ্যে বেপর্দা হওয়ার বা অন্য কোন রকম ফেতনার আশংকা থাকে তাহলে এরূপ অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে যেতে বাঁধা দিতে পারে (امداد الفتاوی ج/۲) এরূপ ক্ষেত্রে মাতা পিতা ও আপনজন এসে তাকে দেখে যাবে। তাতেও কোন অকল্যাণের সম্ভাবনা থাকলে তাদেরকে স্ত্রীর কাছে আসতে না দেয়ার অধিকার রয়েছে স্বামীর। সেরূপ ক্ষেত্রে তারা দূর থেকে দেখে ও কথা বলে যেতে পারে। (প্রাগুক্ত)

(১০) স্ত্রীর সাথে কৃত যৌন সংগম প্রভৃতি গুপ্ত বিষয় অন্যত্র প্রকাশ না করা। এটাও স্ত্রীর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

(১১) পারিবারিক শান্তি শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে যে ক্ষেত্রে স্ত্রীকে সংশোধনমূলক কিছুটা প্রহার করার অনুমতি স্বামীকে দেয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রেও স্বামী

সীমালংঘন করতে পারবে না। অর্থাৎ, প্রকাশ্য স্থানে দাগ পড়ে যাবে এমনভাবে স্ত্রীকে মারতে পারবে না বা প্রচণ্ডভাবেও মারপিট করতে পারবে না। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪৮১ পৃষ্ঠা।

(১২) বিনা কারণে স্ত্রীকে তালাক না দেয়া। স্ত্রীর জেনা, মিথ্যা, বাতিল মতবাদে বিশ্বাস, ফাসেকী প্রভৃতি কারণে তালাক দেয়া হলে স্বামীর অন্যায় হয় না। পক্ষান্তরে অনন্যোপায় অবস্থা ব্যতীত স্ত্রীরও স্বামীর কাছ থেকে তালাক চেয়ে নেয়া অন্যায়।

(১৩) স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য অন্ততঃ কিছুক্ষণ নির্জনে তাকে সময় দেয়া, তার সঙ্গে হাসিফুর্তি করা স্বামীর কর্তব্য। যাতে সেও মনোরঞ্জন করতে পারে, মনের কথা বলতে পারে, সুবিধা–অসুবিধার কথা জানাতে পারে এবং একাকিত্বের কষ্ট লাঘব করতে পারে। এরূপ সময় দিতে না পারলে তার সমমনা কোন নারীকে তার নিকট আসা-যাওয়া বা রাখার ব্যবস্থা করবে। মোটকথা, ঘরের পর্দার মধ্যে থেকেও যেন স্ত্রী তার মনের খোরাক পায় তার জন্য শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৪) রাত্রে স্ত্রীর নিকট শয়ন করাও স্ত্রীর অধিকার।

(১৫) স্ত্রীদের নায-নখ্‌রা এবং মান-অভিমান করারও অধিকার রয়েছে।

(১৬) স্ত্রীর ভুল-ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, যতক্ষণ সীমালংঘনের পর্যায়ে না যায় এবং তার পক্ষ থেকে কষ্ট পেলে ছবর করা এবং নিরব থাকা। তবে এক্ষেত্রেও ভারসাম্যতা রক্ষা করতে হবে অর্থাৎ, প্রয়োজন বোধে স্ত্রীকে মোনাছেব মত তম্বীহ করতে হবে।

(১৭) স্ত্রীর সঙ্গে কথা-বার্তা বলা এবং তাকে খুশি রাখাও স্বামীর কর্তব্য এবং এটাও স্ত্রীর অধিকার।

(১৮) মহর স্ত্রীর অধিকার। স্বামীর উপর মহর প্রদান করা ফরয। স্বামী মহর প্রদান করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে স্ত্রীর মহর আদায় করা হবে।

(১৯) স্ত্রীর প্রতি অবিচার না করা। পুরুষ তার কর্তৃত্ব সুলভ ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোন ভাবেই স্ত্রীর প্রতি জুলুম অবিচার করতে পারবে না।

(২০) একাধিক স্ত্রী থাকলে ভরণ, পোষণ, রাত্রি যাপন প্রভৃতি বিষয়ে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। তবে মনের টান কারও প্রতি কম বেশী থাকলে সেটার জন্য স্বামী দায়ী নয়, কেননা সেটা তার এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়।

(تحفه زوجين . احسن الفتاوى وامداد الفتاوى থেকে গৃহীত)

পীর মুরশিদ বা শায়খে তরীকতের সাথে মুরীদদের করণীয় (পীরের হক)

(১) পীর বা শায়খে তরীকত এক প্রকার উস্তাদ, কাজেই উস্তাদের যে সব হক পীরেরও সে সব হক। তদুপরি পীরের অন্য যেসব হক রয়েছে তা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

(২) অন্তরে এই একীন রাখা যে, এই মুরশিদ থেকেই আমার মকছুদ হাছিল হবে, অন্যদিকে মন দিলে ফয়েয বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব এবং যা কিছু ফয়েয বরকত হাছিল হয় সবই পীরের ফয়েয বরকতে হয়েছে মনে করবে।

(৩) পীরের সব কথা (যদি শরীয়তের খেলাফ না হয়) ভক্তি সহকারে পালন করা।

(৪) পীরের অনুমতি না নিয়ে তাঁর কাজের অনুসরণ না করা। কারণ তাঁর মর্তবা বড়, তিনি যা করেন তোমার হয় তো তা সাজে না।

(৫) পীর যা কিছু দুরূদ ওযীফা বা যিকির বাতান তাই পড়া, অন্য কোন ওযীফা নিজে শুরু করে থাকলে বা অন্য কেউ বলে থাকলে তা ছেড়ে দেয়া। ছেড়ে দিতেও পীরের নিকট বলে নিবে।

(৬) পীরের সামনে থাকাকালে সম্পূর্ণ মনোযোগ তাঁর দিকে রাখবে। এমনকি ফরয সুন্নাত ব্যতীত নফল নামায বা কোন ওযীফাও তাঁর এজাযত না নিয়ে তাঁর সামনে থেকে পড়বে না। পড়লে আড়ালে গিয়ে পড়বে।

(৭) এমন স্থানে দাঁড়াবে না, যাতে তোমার ছায়া তাঁর ছায়ার উপর বা তাঁর শরীরের উপর পড়তে পারে।

(৮) তাঁর মুছল্লার উপর পা রাখবে না।

(৯) তাঁর লোটা, বদনা, রেকাবী ইত্যাদি ব্যবহার করবে না।

(১০) পীরের সামনে পানাহার বা উযূ গোসল করবে না। অবশ্য যদি তিনি হুকুম করেন তাহলে হুকুম পালন করবে।

(১১) পীরের সাক্ষাতে কারও সাথে কথা বলবে না। এমন কি কারও দিকে মুখও ফিরাবে না।

(১২) পীর সাহেব উপস্থিত না থাকলেও তাঁর বসার জায়গায় দিকে পা লম্বা করবে না এবং

(১৩) থুথু ফেলবে না।

(১৪) পীর সাহেবের কোন কথা বা কাজের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলবে না, কেননা হতে পারে তিনি সেটা এল্‌হাম দ্বারা বলছেন বা করছেন। অবশ্য শরীয়তের স্পষ্ট বিধানের বরখেলাফ হলে তা মান্য করা যাবে না এবং হক্কানী পীর সে রকম কিছু বলতে বা করতেও পারেন না।

(১৫) পীরের কারামত দেখার ইচ্ছা করবে না।

(১৬) (বিশেষ কিছু) স্বপ্নে দেখলে পীরের নিকট জানাবে।

(১৭) বিনা জরুরতে এবং বিনা অনুমতিতে তাঁর ছোহবত ছেড়ে অন্যত্র যাবে না।

(১৮) নিজের পীরের কথা অন্যের কাছে তখনই বলবে যখন বুঝবে যে, সে কথার মর্ম উপলব্ধি করবে এবং কদর করবে।

(১৯) নিজের কথা বাহ্যতঃ সহীহ হলেও পীরের কথা রদ করবে না এই ভেবে যে, আমার বুঝ ভুলও হতে পারে।

(২০) নিজের অন্তরের ভাল মন্দ সব অবস্থা পীরকে অবগত করে যথাযথ ব্যবস্থা জেনে নিবে। তিনি কাশ্‌ফের দ্বারা জেনে নিবেন– এই ভরসায় বসে থাকবে না। পীর ব্যতীত অন্য কাউকে যিকির আযকারের অবস্থা এবং হালত সম্পর্কে বলবে না, তাহলে বরকত নষ্ট হয়ে যাবে।

(بصائر حكيم الامت ও فروع الايمان থেকে গৃহীত)

(বিঃ দ্রঃ কামেল পীরের আলামত সম্পর্কে দেখুন ৫৬৬ পৃষ্ঠা)

উলামায়ে কেরাম, মাশায়েখ ও বুযুর্গদের সাথে করণীয়

(১) উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের আগে বেড়ে কোন কথা না বলা আদব। অবশ্য যদি তাঁরা কাউকে কোন কথার উত্তর দিতে বলেন তাহলে ভিন্ন কথা।

(২) তাঁদের আগে বেড়ে কোন কাজ না করা। যেমন খাওয়ার মজলিস হলে তাঁদের আগে খাওয়া শুরু না করা, চলার সময় তাঁদের সম্মুখে না চলা, অবশ্য যদি তাঁরা কাউকে আগে করতে বা চলতে নির্দেশ দেন তাহলে ভিন্ন কথা। উল্লেখ্য, একজনের বয়স বেশী আর একজনের ইল্‌ম বেশী– এ দুজনের মধ্যে যার ইল্‌ম বেশী তিনি আদব সম্মানে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য।

(৩) তাঁদের সামনে তাঁদের চেয়ে জোর আওয়াজে কথা না বলাই আদব।

(৪) তাঁদের নাম ধরে গোঁয়ার-এর ন্যায় তাঁদেরকে না ডাকাই আদব।

(৫) তাঁদের দরজায় কড়া নেড়ে, নক করে বা চিৎকার করে তাঁদেরকে ডেকে ঘরের বাইরে না আনা বরং প্রয়োজনে তাঁদের নিকট গেলে আদব হল দরজার বাইরে নীরবে অপেক্ষা করতে থাকা, যতক্ষণ না তাঁরা নিজেরাই বাইরে আসেন। তবে অনন্যোপায় অবস্থা হলে ভিন্ন কথা।

(৬) অন্তরে তাঁদের প্রতি আজমত ও সম্মানবোধ সৃষ্টি করা কর্তব্য। এতে ক্বলবে নূর পয়দা হয়, ঈমানে দৃঢ়তা পয়দা হয় এবং দ্বীনের উপর মজবূতী সৃষ্টি হয়।

(৭) কোন বুযুর্গ ও হক্কানী আলেমকে নিজের মুরব্বী ও মুসলেহ (এছলাহ ও সংশোধনকারী) বানিয়ে নেয়া এবং তাঁর দিক নির্দেশনা মোতাবেক নিজের জীবন পরিচালনা করা জরুরী।

(৮) বুযুর্গদের সামনে কোন ভাবেই কোন বিষয়ে নিজের বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ না করা উচিত। এটা বে-আদবী।

(৯) উলামা ও বুযুর্গদের সমালোচনা, তাঁদের অবমাননা ও তাঁদের নিন্দা বদনাম পরিহার করা কর্তব্য।

(১০) কাউকে উলামা ও বুযুর্গদের নিন্দা বদনাম বা অবমাননা করতে শুনলে সঙ্গে সঙ্গেই নম্রভাবে তাকে বাঁধা দেয়া জরুরী। বাঁধা দেয়ার একটা ভাষা এরূপ হতে পারে যে, ভাই এটা বর্জন করুন, এতে আমরা অন্তরে কষ্ট পাই।

(১১) মসলা-মাসায়েল বা কোন ফতুয়া জিজ্ঞাসা করার সময় আদব তাজীম সহকারে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য। সাধারণ মানুষের পক্ষে মাসআলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার সময় মাসআলার দলীল চাওয়া অনুচিত। তবে বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা।

(معارف القرآن ও اصلاح انقلاب امت . آداب المعاشرت থেকে গৃহীত)

সাধারণ মানুষের জন্য উলামা ও মাশায়েখদের করণীয়

(১) মাদ্রাসায় পাঠদানের ক্ষেত্রে ইল্‌মে দ্বীনের জরুরী বিষয় গুলোকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেয়া।

(২) সমসাময়িক যুগে মানুষ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় অথবা তারা যে সব প্রয়োজন পূরণের কঠোর তাগিদ অনুভব করে, ওয়াজ নছীহতের মাধ্যমে সে সব ব্যাপারে তাদেরকে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক ধারণা দিতে হবে। (ওয়াজ নছীহত সম্পর্কিত নীতিমালার জন্য দেখুন ৪০৬ পৃষ্ঠা)

(৩) মৌখিকভাবে অথবা লিখিত আকারে ফতুয়া জিজ্ঞাসাকারীদেরকে জওয়াব প্রদান করা।

(৪) আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সার্বিক বিষয়ে হেদায়েত ও দিক নির্দেশনা দান করা।

ছোটদের প্রতি বড়দের করণীয়

(১) ছোটদেরকে স্নেহ করা।

(২) খুব বেশী নাজুক মেজায না হওয়া উচিৎ এবং কথায় কথায় ছোটদেরকে ধমক-ধামক ও তিরস্কার না করা উচিৎ। ছোটদের ভুল-ত্রুটি কিছুটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতেও দেখা উচিৎ। প্রাথমিক পর্যায়ে দু একবার নম্রভাবে বুঝিয়ে দেয়ার পর তাতে কাজ না হলে তখন কঠোরতা গ্রহণ করলে তাতে ক্ষতি নেই।

(৩) যার সর্ম্পকে লক্ষণ দেখে বোঝা যায় যে, সে নির্দেশ মান্য করবে না, তাকে নির্দেশ দিয়ে সরাসরি বে-আদব প্রমাণিত না করাই ভাল। অবশ্য শরীয়তের কোন ওয়াজিব বিষয় হলে ভিন্ন কথা।

(৪) বিনা নির্দেশে কোন খেদমত করতে উদ্বুদ্ধ হলেও তার সাধ্য এবং আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই। তার সাধ্যের বাইরে তার থেকে হাদিয়া নেয়া ঠিক নয়। তার আরাম, নিদ্রা প্রভৃতির রেয়ায়েত করা চাই। দাওয়াত করলে সাধ্যাতীত আপ্যায়ন করতে বাঁধা দেয়া উচিৎ।

(৫) কখনও ছোটদের প্রতি অতিরিক্ত রাগ বা ক্ষোভ প্রকাশ করলে বা শাসন করলে পরবর্তীতে তাদের মন খুশি করে দেয়া দরকার। কেয়ামতের দিন সকলেইতো সমান হবে; কি জানা আছে তখন কে ছোট আর কে বড় হয়! কাজেই নিজের পক্ষ থেকে অন্যায় হয়ে থাকলে খোলাখুলি ওযরখাহী করে নেয়া ভাল।

(৬) কোন ছোটকে এতটা নৈকট্য প্রদান করবেনা বা এতটা প্রশ্রয় দিবেনা কিম্বা তার সুপারিশ ও তার কথায় এতটা আমল দিবেনা, যাতে সে মাথায় চড়ে যায় কিম্বা অন্যরা তাকেই বড়দের থেকে স্বার্থ বা কাজ হাছিলের মাধ্যম মনে করে বসে এবং তার সঙ্গে সর্ম্পক গড়ে তোলার জন্য নানাভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়।

(৭) ছোটদেরও বড়দেরকে হক কথা বলার অধিকার রয়েছে, কাজেই ছোটদের কেউ কোন ন্যায় কথা বললে তাকে খারাপ মনে করার অবকাশ নেই। অবশ্য আদব রক্ষা করে না বললে তার জন্য স্বতন্ত্র তম্বীহ্ করা যেতে পারে।

(৮) ছোটদের তুচ্ছ না জানা। কেননা ছোট হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে এমন কোন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, যা তার (বড়র) মধ্যে নেই।

(৯) অনিয়ম বা নীতিহীন কোন কিছু ছোটদের সাথেও করবে না।

(১০) ছোটদের বে-আদবীর কারণে সরাসরি তাদের সাথে কথা বলতে খুব বেশী ক্রোধ এসে যেতে থাকলে অন্য কারও মাধ্যমে তাদেরকে যা বলার বলে দিবে।

(১১) ছোট যদি অধীনস্ত হয় তাহলে তাকে শরীয়ত মোতাবেক গড়ে তোলা এবং চালানো বড়দের দায়িত্ব।

(آداب المعاشرت প্রভৃতি থেকে গৃহীত)

ইমামের জন্য মুসল্লী/মুক্তাদীগণের করণীয়

(১) মুসল্লী ও মুক্তাদীগণ ইমামের আদব ও সম্মান রক্ষা করবেন। তাই আদব হল ইমাম নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে মুসল্লীগণও সাথে সাথে দাঁড়িয়ে যাবেন। ইমাম যে কাতার বরাবর পৌঁছবেন সে কাতারের লোকজন দাঁড়িয়ে যাবেন।

(২) ইমামের মধ্যে শরীয়তসম্মত প্রকৃত দোষ না দেখা দিলে তার পেছনে নামায পড়তে নারাযী দেখাবে না।

(৩) কখনও নির্দ্ধারিত সময়ে ইমাম উপস্থিত হতে না পারলে তাঁর জন্য চার পাঁচ মিনিট পযর্ন্ত অপেক্ষা করবে, এর কারণে কোন উচ্চবাচ্য বা ইমামের নিন্দা সমালোচনা করবে না, এটাকে তাঁর মানবিক ওযর বলে গণ্য করবে।

(৪) ইমাম উপস্থিত থাকা অবস্থায় তাঁর সম্মতি ব্যতীত অন্য কাউকে ইমাম বানাবে না।

(৫) নামায বা কেরাতে ইমামের কোন ভুল হয়ে গেলে তার কারণে ইমামের প্রতি ভক্তি নষ্ট করা অনুচিত। কেননা, মানুষের পক্ষে নামাযে ভুল-চুক হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

(৬) ইমাম উলামা ও মাশায়েখদের অন্তর্ভুক্ত, এ হিসেবেও তার জন্য অন্যদের কিছু করণীয় রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উলামা মাশায়েখ ও বুযুর্গদের জন্য যা করণীয়, ইমামের জন্যও তা করণীয়। দেখুন ৩৮১ পৃষ্ঠা।

(فتاوی دار العلوم ج ۲ - احسن الفتاوی ج ۳ প্রভৃতি থেকে গৃহীত)

মুসল্লী/ মুক্তাদীদের জন্য ইমামের করণীয়

(১) ইমাম সমস্ত গোনাহ থেকে তওবা না করে নামায শুরু করবেন না, যেহেতু তিনি মুক্তাদীদের জন্য সুপারিশকারী। এতএব সর্বাগ্রে তাকে পরিস্কার হতে হবে।

(২) সালাম ফিরানোর পর ইমাম যখন দুআ করবেন, তখন শুধু একার জন্য নয় বরং সকলের জন্য দুআ করবেন; অন্যথায় তাদের প্রতি খেয়ানত হয়ে যাবে।

(৩) নির্দ্ধারিত সময়ে নামায পড়ানো ইমামের দায়িত্ব। তবে মানবিক জরুরত বশতঃ মাঝে মধ্যে দুই চার মিনিট বিলম্ব হলে তা অন্যায় নয়।

(৪) জামাআতের নির্দ্ধারিত সময় হয়ে যাওয়ার পর কারও আগমনের অপেক্ষায় এতখানি বিলম্ব করা যাবে না, যাতে উপস্থিত মুসল্লীদের কষ্ট হয়। তবে এমন কোন লোক যদি হয় যার জন্য অপেক্ষা না করলে উৎপাত ও ফ্যাসাদ ঘটবে, তাহলে ভিন্ন কথা।

(৫) ইমাম মুসল্লীদের সন্তুষ্টি ব্যতীত নামায এতখানি লম্বা করবেন না, যাতে তাদের কষ্ট হয়। এ জন্যই মুসল্লীদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবে তিনি সুন্নাত পরিমাণ কেরাতের চেয়ে কেরাত লম্বা করবেন না, আবার সুন্নাত পরিমাণের চেয়ে কম পড়াও মাকরূহ এবং রুকু সাজদার তাসবীহ এভাবে পড়বেন যেন মুক্তাদীগণ এতমীনানের সাথে তিনবার পড়তে পারেন। এজন্যেই কারও কারও মতে ইমামের জন্য উত্তম হল রুকূ সাজদার তাসবীহ পাঁচবার পড়া।

(৬) মুসল্লীদের সন্তুষ্টি ব্যতীত অস্বাভাবিকভাবে নামায পড়ানো থেকে অনুপস্থিত থাকবেন না।

(৭) ইমামের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে শরীয়ত সম্মত কোন দোষ থাকার কারণে তার পেছনে নামায পড়তে মুসল্লীগণ অসম্মত হলে তার পক্ষে তাদের ইমামতি করা মাকরূহ। এরূপ অবস্থায় তিনি তাদের ইমামতি করবেন না।

(تنبیہ الغافلین ও فتاوی دار العلوم ج / ۳ ـ احسن الفتاوی ج / ۳ থেকে গৃহীত)

বিঃ দ্রঃ- ইমাম একজন আলেম ও মাশায়েখদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে তার উপর আরও কিছু দায়িত্ব বর্তায়। (দেখুন ৩৮২ পৃষ্ঠা)

আত্মীয় স্বজনের সাথে করণীয়
তথা
আত্মীয়-স্বজনের অধিকার

* আনুগত্য, খেদমত, সদ্ব্যবহার এবং আদব তা'জীমের ক্ষেত্রে দাদা-দাদী এবং নানা-নানীর হক পিতা-মাতার তুল্য। চাচা এবং ফুফুর হক পিতার তুল্য। ছোট ভাইয়ের কাছে বড় ভাই পিতৃতুল্য। হাদীছের বর্ণনা ও ইংঙ্গিত অনুসারে এরূপই প্রমাণিত হয়। এছাড়া ভাতিজা, ভাতিজী, ভাগিনা, ভাগ্নী প্রমুখ আত্মীয় স্বজন, যাদের সাথে জন্মগতভাবেই আত্মীয়তা হয় সাধারণভাবে তাদের সকলের হক বা অধিকার নিম্নরূপঃ

(১) তাদেরকে ভালবাসা।

(২) তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।

(৩) তাদের মধ্যে কারও ভরণ-পোষণের কষ্ট থাকলে সঙ্গতি অনুসারে তাদের আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করা।

(৪) মাঝে-মধ্যে তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা।

(৫) তাদের দ্বারা কোন কষ্ট পেলে তা সহ্য করা।

(৬) তাদের সাথে আত্মীয়তা ও সর্ম্পক ছেদন না করা।

(৭) সালাম, কালাম ও হাদিয়া আদান-প্রদান অব্যাহত রাখা। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিষয়গুলো আমল করাকে বলা হয় 'ছেলায়ে-রেহ্‌মী' অর্থাৎ, আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখা। এই ছেলায়ে-রেহ্‌মী ওয়াজিব।

* শ্বশুর-শাশুড়ী, শালা, ভগ্নীপতি, জামাই, পুত্রবধূ, স্ত্রীর আগের ঘরের সন্তান, স্বামীর অন্য পক্ষের সন্তান ইত্যাদি যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে আত্মীয়তা হয়, তাদের হকও সাধারণ মুসলমানের চেয়ে বেশী- সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমান ও এতীম-মিসকীনের চেয়ে তাদেরকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। অনেক আলেমের মতে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের ন্যায় বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথেও ছেলায়ে-রেহমী রক্ষা করা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণীরই হুকুম এক পর্যায়ের।

(تعليم الدين ، حقوق العباد ، مفاتيح الجنان এবং মা-বাপ ও সন্তানের হক গ্রন্থাদি থেকে গৃহীত।)

প্রতিবেশীর সাথে করণীয় (প্রতিবেশীর অধিকার)

হাদীছে প্রতিবেশীর বহু অধিকার বর্ণিত হয়েছে। এক রেওয়ায়েতের বর্ণনা অনুযায়ী বাড়ীর চতুর্দিক চল্লিশ বাড়ী পর্যন্ত সকলেই প্রতিবেশীর আওতাভুক্ত। তাছাড়া শহরে বা গ্রামে বাড়ীর পার্শ্ববর্তীগণ যেমন প্রতিবেশী, তদ্রূপ বাড়ী থেকে যার সাথে একত্রে সফরে যাওয়া হয় বা বিদেশে গিয়ে এক সঙ্গে সফর করা হয় এইসব সফরসঙ্গী এবং মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত বা যে কোন কর্মস্থলে এক সঙ্গে যারা কিছুক্ষণের জন্য হলেও থাকে তারাও প্রতিবেশী, হোক সাময়িক প্রতিবেশী তবুও ততক্ষণের জন্য প্রতিবেশীর নির্দ্ধারিত অধিকার তাদের প্রাপ্য। বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত প্রতিবেশীর অধিকার সমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) সাহায্য সহযোগিতা চাইলে তা করা।

(২) ঋণ চাইলে তা প্রদান করা।

(৩) অসুস্থ হলে শুশ্রুষা করা।

(৪) অভাবী হলে আর্থিকভাবে তার উপকার করা।

(৫) কোনরূপ কষ্ট পেলে (যেমন গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগি বা ছেলে-মেয়ে দ্বারা কোন কিছু নষ্ট বা ক্ষতি হলে) ছবর করা।

(৬) প্রতিবেশীর বিবি, সন্তানাদি ও জীব-জন্তুর হেফাজত করা।

(৭) প্রতিবেশীর খুশির বিষয়ে খুশি প্রকাশ করা।

(৮) প্রতিবেশীর কোন দুঃখের বিষয় হলে সমবেদনা প্রকাশ করা।

(৯) বিশেষ কোন রান্না-বান্না বা ফল- ফ্রুটের ব্যবস্থা হলে প্রতিবেশীকেও তা থেকে কিছু হাদিয়া দেয়া। সম্ভব না হলে গোপনে সেগুলো বাড়ির মধ্যে ঢুকানো এবং নিজের সন্তানেরা যেন তা নিয়ে বাইরে না আসে, যাতে প্রতিবেশীর সন্তানাদি তা দেখে মনক্ষুন্ন না হয়।

(১০) মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় অংশ নেয়া।

(১১) প্রতিবেশীর সাথে সমঝোতা ব্যতীত উচুঁ দেয়াল বা ইমারত বানিয়ে তার বাতাস বন্ধ করে না দেয়া।

(১২) প্রতিবেশীর অনুমতি ব্যতীত তার বাড়ির আশ-পাশে ময়লা আর্বজনা ফেলে তাকে দুর্গন্ধের কষ্ট না দেয়া ।

(حقوق العباد ও فتح الملهم ج ١ থেকে গৃহীত)

সাধারণ মুসলমানের অধিকার

(১) কোন মুসলমান পীড়িত হলে তার শুশ্রূষা করা। এ প্রসংঙ্গে ৪৫৪ পৃষ্ঠায় দেখুন।

(২) কোন মুসলমানের মৃত্যু হলে তার দাফন-কাফনে শরীক হওয়া।

(৩) মহব্বত করে দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করা (যদি দাওয়াত গ্রহণে অন্য কোন বাঁধা না থাকে) কোন মুসলমান ডাকলে তার ডাকে সাড়া দেয়া কর্তব্য।

(৪) কোন হাদিয়া-তোহফা দিলে তা গ্রহণ করে তার মনস্তুষ্টি করা। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪১৯ পৃষ্ঠা)

(৫) হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে তার জওয়াব দেয়া। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪১০ পৃষ্ঠা)

(৬) কোন মুসলমানকে দেখলে সালাম দেয়া। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৩৯৫ পৃষ্ঠা)

(৭) কোন মুসলমান কোন কাজে আটকে গেলে সকলে মিলে তার কাজ উদ্ধার করে দেয়া।

(৮) মুসলমানদের বিবি এবং সন্তানাদির জীবন ও সম্মান রক্ষা করা।

(৯) কোন মুসলমান যদি কোন বিষয়ে ন্যায্য কছম খেয়ে বসে, তাহলে তা পূর্ণ করা ও রক্ষা করার জন্য সকলে চেষ্টা করা।

(১০) মজলূম মুসলমানের সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং জালেমকে বাঁধা দেয়া।

(১১) মুসলমানকে ভালবাসা।

(১২) নিজের জন্য যা ভালবাসা হয় প্রত্যেক মুসলমানের ব্যাপারে তা কামনা করা এবং তদ্রুপ ব্যবহার করা।

(১৩) কোন কারণে কোন মুসলমানের সাথে দ্বন্দ্ব-কলহ হয়ে গেলে তিন দিনের বেশী তা টিকিয়ে না রাখা বরং আপোষ মীমাংসা করে ফেলা।

(১৪) দুইজন মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ হয়ে গেলে তা মিটিয়ে দেয়া সকলের উপর ওয়াজিব।

(১৫) কোন মুসলমান কোন সুপারিশ করলে যথাসম্ভব তা গ্রহণ করা এবং কোন আশা করে এলে যথাসম্ভব তাকে নিরাশ বা বঞ্চিত না করা।

অমুসলমানের হক বা অধিকার

হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি অমুসলমানগণ ইসলাম ধর্মের অনুসারী না হলেও তারাও মানুষ, মানুষ হিসেবে তাদের কিছু হক রয়েছে; যেমন ঃ

(১) অন্যায়ভাবে কারও জানে কষ্ট না দেয়া।

(২) কারও সম্পদের ক্ষতি না করা।

(৩) অন্যায়ভাবে কারও মন্দ না বলা, গালি-গালাজ না করা।

(৪) সমালোচনার ক্ষেত্রে ভারসাম্যতা রক্ষা করা।

(৫) তাদের জীবন বিপন্ন হতে দেখলে তা থেকে রক্ষা করা।

(৬) অভাব-অনটন, রোগ-শোক ও বিপদ-আপদে সহযোগিতা করা।

(৭) শরীয়তের আইন অনুসারে কেউ শাস্তির উপযুক্ত হলে ন্যায় বিচার করা।

দুঃস্থ মানুষের জন্য করণীয়
তথা
দুঃস্থদের অধিকার

এতীম, মিসকীন, বিধবা, অন্ধ, পঙ্গু, আতুর, চিররোগা, ভিক্ষুক, মুসাফির প্রভৃতি দুঃস্থ ও নিরাশ্রয়ী মানুষেরও অনেক অধিকার রয়েছে এবং তাদের জন্যেও অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। যেমন ঃ

(১) তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা।

(২) টাকা-পয়সা বা খাদ্য পোশাক দিয়ে তাদের সাহায্য করা। তবে এমনভাবে সাহায্য করা ঠিক নয়, যাতে ভিক্ষাবৃত্তি প্রশ্রয় পায়। কেননা, ভিক্ষাবৃত্তিকে

ইসলাম ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। এ জন্যেই যার নিকট এক দিনের খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে, তারপক্ষে খোরাকীর জন্য হাত পাতা জায়েয নেই এবং জেনে শুনে এরূপ ব্যক্তিকে দান করাও নিষেধ। এমনিভাবে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োজন পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও সওয়াল করা হারাম। (احسن الفتاوی ج ٤) এ ছাড়া যে ব্যক্তি উপার্জন করে খাওয়ার ক্ষমতা রাখে তার জন্যও হাত পাতা নিষেধ এবং এরূপ হাতপাতা ব্যক্তিকে দান করাও নিষেধ।

(৩) তারা কাজ করতে অক্ষম হলে তাদের কাজ করে দেয়া।

(৪) কথা দ্বারা তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া এবং তাদের সাথে ভাল কথা বলা।

(৫) যথাসাধ্য তাদের আকাংখা ও আবদার রক্ষা করা।

(৬) তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, নম্র ব্যবহার করা এবং রূঢ় ব্যবহার না করা।

বিঃ দ্রঃ সরকারেরও দায়িত্ব দুঃস্থ মানুষের ভরণ-পোষণ এবং যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করা।

শ্রমিকের প্রতি মালিকের করণীয়
তথা
শ্রমিকের অধিকার

(১) শ্রমিকের যুক্তি সংগত মজুরী নির্ধারণ করা ঃ এই মজুরী নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদীদের যে নীতি-চাহিদা বেশী হলে মজুরী বেশী হবে কিন্তু চাহিদার তুলনায় শ্রমিক বেশী পাওয়া গেলে মজুরী কমে যাবে, কিম্বা সমাজতন্ত্রের যে নীতি-প্রত্যেকেরই দক্ষতা অনুযায়ী তার থেকে কাজ নেয়া হবে কিন্তু মজুরী দেয়ার সময় শুধু তার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাকে মজুরী দেয়া হবে, তার দক্ষতার মূল্যায়ন করা হবে না– এর কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয় বরং ইসলামী নীতিতে এমন মজুরী দিতে হবে, যা দ্বারা পরিবেশ, চাহিদা ও জীবন যাত্রার স্বাভাবিক মান অনুযায়ী শ্রমিকের প্রয়োজন পূর্ণ হয়, সেই সাথে সাথে তার দক্ষতার মূল্যায়নও করতে হবে।

(২) দ্রুত মজুরী পরিশোধ করা ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক কাজ করা মাত্রই পারিশ্রমিক দাবী করতে পারে। তবে অগ্রিম বা অন্য কোন রকম শর্ত থাকলে সে শর্তানুসারেই কাজ হবে।

(৩) কাজের সময় নির্ধারিত থাকতে হবে ঃ মালিক যতক্ষণ ইচ্ছা শ্রমিকদের দ্বারা খেয়াল খুশি মত কাজ করিয়ে নিতে পারবে না।

(৪) কাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে হবে ঃ যে কাজের জন্য কোন শ্রমিককে নিয়োগ করা হবে, তার সম্মতি ছাড়া তাকে অন্য কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

(৫) অধিকতর সুবিধার জন্য অন্য স্থানে চলে যাওয়ার অধিকার থাকবে শ্রমিকের এবং শ্রম সম্পর্কীয় চুক্তি বিশেষ অসুবিধার জন্য সে বাতিল করতে পারবে।

(৬) শ্রমিককে এমন স্থানে রাখা যাবে না, যাতে তার স্বাস্থ্যহানী ঘটবে। মালিককে শ্রমিকের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৭) শ্রমিকের শিক্ষা দীক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। তবে এর দায়িত্ব মালিকের নয় বরং ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষা সাধারণতঃ অবৈতনিক এবং রাষ্ট্রই তার সকল ব্যয় ভার বহন করবে।

(৮) ক্ষতির বোঝা শ্রমিকের ঘাড়ে চাপানো যাবে না। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যে শ্রমিক নিয়োগ করা হয় উৎপাদনের ঘাটতির কারণে সে শ্রমিকের সম্মতি ব্যতীত তার মজুরীতে কোন প্রকার কমতি করা যাবে না।

(৯) শ্রমিকের চাকুরীর নিরাপত্তা থাকতে হবে। কোন কারণে তার চাকুরী চলে গেলে তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে কিনা তা দেখে ন্যায় ভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ইসলাম প্রশাসকদেরকে নির্দেশ দিয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রমিক আইনের আশ্রয় গ্রহণ করার অধিকার রাখে।

(১০) ইসলামী সরকার বৃদ্ধ, পঙ্গু, অসুস্থ নিঃসহায় প্রভৃতি দুঃস্থ শ্রেণীর লোকদের ভরণ-পোষণ ও তাদের যাবতীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করে থাকে। এভাবে ইসলামে শ্রমিকদের বৃদ্ধ বা অসুস্থকালীন ভাতা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে।

(حقوق العباد ইসলামী ফিকাহ ও ইসলামে শ্রমিকের অধিকার গ্রন্থসমূহ থেকে গৃহীত)

মালিকের জন্য শ্রমিকের করণীয়
তথা
মালিকের অধিকার

(১) শ্রমিক নির্ধারিত পূর্ণ সময় আমানতদারীর সাথে শ্রমে নিয়োগ করবে। অন্যথায় যতটুকু সময় সে ফাঁকি দিবে সেই পরিমাণ মজুরী গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ হবে না।

(২) দক্ষতার সাথে কাজ আঞ্জাম দিবে।

(৩) কাজের এবং উৎপাদনের পরিবেশ বজায় রাখবে।

(৪) ধর্মঘট করবে না।

(৫) মালিক বা নিয়োগকারী মারাত্মক অসুবিধায় পড়লে সে শ্রমিকের সঙ্গে কৃত চুক্তি বা অঙ্গীকার বাতিল করতে পারে; এটা শ্রমিককে মেনে নিতে হবে। অবশ্য সেটা ন্যায় ভিত্তিক হচ্ছে কি না তা বিচারের জন্য প্রয়োজন বোধে শ্রমিক আইন ও প্রশাসনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

(حقوق العباد ইসলামী ফেকাহ ও ইসলামে শ্রমিকের অধিকার গ্রন্থসমূহ থেকে গৃহীত)

পশুপক্ষী ও জীবজন্তুর হক বা অধিকার

(১) অযথা কোন পশুপক্ষীকে কষ্ট দেয়া অন্যায়; যেমনঃ বাসা থেকে শাবকদের নিয়ে এসে তাদের মা বাপকে কষ্ট দেয়া। এটা নিষ্ঠুরতার শামিল।

(২) যে সব পশুপক্ষী দ্বারা মানুষের কোন কাজ হয় না, তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখে তাদের জন্মগত স্বাধীনতাকে নষ্ট করা বৈধ নয়।

(৩) যে সব পশুপক্ষী খাওয়ার উপযুক্ত নয়, তাদেরকে শুধু মনের আনন্দের জন্য বা হাতের নিশানা ঠিক করার জন্য বধ করা নিষেধ।

(৪) গৃহপালিত পশু পাখিদের থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করে রাখা কর্তব্য- পানাহার ও থাকায় কষ্ট দেয়া উচিৎ নয়।

(৫) যে সব পশুর দ্বারা কাজ নেয়া হয়, তাদের শক্তির চেয়ে অতিরিক্ত কাজ তাদের দ্বারা না নেয়া।

(৬) নিষ্ঠুরভাবে জীব জন্তুকে প্রহার না করা। জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নয় বরং আল্লাহর মাখলূক হিসেবে তাদের প্রতিও ভালবাসা থাকা চাই।

(৭) যে সব জীবজন্তু খাওয়ার জন্য জবেহ করা হয় বা মানুষের কষ্টদায়ক হওয়ার কারণে বধ করে ফেলা হয়, তাদেরকে ধারালো অস্ত্র দ্বারা কাজ সম্পন্ন করা। ভোঁতা অস্ত্র দ্বারা কষ্ট দেয়া নিষেধ।

(৮) জীব-জন্তুকেও গালি -গালাজ করা নিষেধ।

(৯) নাপাক খাদ্য খাবার জীব জন্তুকে খাওয়ানো নিষেধ। (نفع المفتي والسائل)

চাকর-নওকরদের সাথে করণীয়

(১) নিজেরা যা খাবে চাকর-নওকরকে তা খাওয়াবে।

(২) নিজেরা যা পরিধান করবে চাকর-নওকরকে সেরূপ পোশাক দিবে।

(৩) তাদের দ্বারা সাধ্যতীত কাজ না নেয়া।

(৪) কোন কাজ তাদের কষ্ট সাধ্য হলে ঐ কাজে তাদের সহায়তা করা।

(৫) তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা অর্থাৎ, কঠোর ব্যবহার ও কঠোর বাক্য প্রয়োগ না করা।

(৬) তারা রোগাক্রান্ত হলে কিম্বা কোন কষ্টে পড়লে তাদেরকে সমবেদনা জানানো।

(৭) তাদেরকে দ্বীন ও শরীয়ত মোতাবেক চালানো। কেননা অধীনস্তকে দ্বীনের উপর চালানো কর্তব্য।

বিঃ দ্রঃ শ্রমিকদের অধিকার অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়গুলোর অনেকটা চাকর নওকরদের বেলায়ও প্রযোজ্য।

ব্যবসায়ী/বিক্রেতার করণীয় তথা ক্রেতার অধিকার

(১) মাপ, ওজন, পরিমাণ ও সংখ্যায় ইনসাফ রক্ষা করা অর্থাৎ, যতটুকু ক্রেতার প্রাপ্য অন্ততঃ ততটুকু অবশ্যই দিয়ে দেয়া– তার চেয়ে কম না করা বরং তার চেয়ে একটু বেশী দিয়ে দেয়া উত্তম।

(২) প্রতারণা না করা; যেমন ভেজাল ও নকল মালকে আসল বলে, নিম্নমানের মালকে উন্নতমানের বলে কিম্বা ভাল মালের সাথে খারাপটাকে মিশ্রিত করে দিয়ে বা যে কোনভাবে যে কোন রকমে ক্রেতাকে প্রতারিত না করা।

(৩) দ্রব্যের দোষ-ত্রুটি থাকলে ক্রেতাকে সে সম্পর্কে অবহিত করা। ক্রেতাকে বুঝতে না দিয়ে মাল চালিয়ে না দেয়া। যেমন অন্ধকারে মাল বিক্রি করা হল বা ছেড়া ফাঁটা ও ত্রুটিপূর্ণ অংশ ভাজের মধ্যে বা তলে রেখে চালিয়ে দেয়া হল ইত্যাদি। এগুলো প্রতারণার শামিল এবং অন্যায়।

(৪) দ্রব্যের অতিরঞ্জিত বা অবাস্তব প্রশংসা না করা।

(৫) প্রয়োজনীয় দ্রব্য গুদামজাত না করা। অবশ্য কারও গুদামজাত করণের ফলে যদি শহরে/দেশে দ্রব্যমূল্যের উপর কোন প্রভাব না পড়ে, তার গুদামজাতকরণ দেশে/ শহরে দুর্ভিক্ষের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তার গুদামজাত করণে কোন পাপ হবে না।

(৬) অঙ্গীকার রক্ষা করা।

(৭) বাজার দরের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য না নেয়া, যদিও ক্রেতা সম্মত হলে যে কোন মূল্যে তার নিকট দ্রব্য বিক্রি করা যায়। কিন্তু ক্রেতা অজ্ঞ বা সে ঠেকায় পড়েছে, যে কোন মূল্যে সে নিতে বাধ্য– এরূপ অবস্থায় বিক্রেতার নৈতিক কর্তব্য হলো স্বাভাবিক বাজার দরের চেয়ে অতিরিক্ত না নেয়া।

ক্রেতার করণীয় তথা ব্যবসায়ী/বিক্রেতার অধিকার

(১) ত্রুটিপূর্ণ বা অচল মুদ্রা না দেয়া। ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন একটা অচল টাকা চালানো চল্লিশ টাকা চুরি করার চেয়ে জঘন্য অপরাধ।

(২) দ্রব্য পাওয়ার পর নগদে ক্রয় হয়ে থাকলে সাথে সাথে বা বাকীতে ক্রয় করে থাকলে নির্ধারিত সময়ে মূল্য পরিশোধ করা। কোনরূপ টাল-বাহানা বা গড়িমসি না করা।

(৩) বাকীতে ক্রয় করলে মূল্য পরিশোধের সময় নির্ধারিত করা জরুরী।

(৪) দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা নিয়ে বা দ্রব্যের অন্য কোন বিষয় নিয়ে বিক্রেতার সঙ্গে অহেতুক কথা বাড়াবাড়ি না করা।

(৫) ঠেকা ও অনন্যোপায় অবস্থায় পেয়ে কোন ব্যবসায়ী/বিক্রেতাকে তার দ্রব্যের মূল্য বাজার দরের চেয়ে কম না দেয়া। নৈতিক ভাবে এটা অন্যায়।

(৬) মূল্য নির্ধারণ হওয়ার পর তার চেয়ে কম না দেয়া।

আদব, শিষ্ঠাচার ও সংস্কৃতি

সাক্ষাত ও মুলাকাতের সুন্নাত এবং আদব সমূহ

সাক্ষাৎ প্রার্থীর করণীয় ঃ

* কারও নিকট সাক্ষাতের জন্য এমন সময় যাবে না, যখন গেলে তার ঘুম, ওজীফা কিম্বা বিশেষ কোন কাজ বা আমলের ব্যাঘাত ঘটবে।

* কারও কাছে পূর্বে ইত্তেলা (Information) দেয়া ব্যতীত নাস্তা বা খাওয়ার ওয়াক্তে যাবে না। গেলে খেয়ে যাবে এবং গিয়েই সে খেয়ে এসেছে- একথা জানিয়ে দিবে। এ সম্পর্কে "মেহমানের করণীয় আমলসমূহ"- শীর্ষক পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা নং ৪১৬ দেখুন।

* অনুমতি প্রার্থনা করবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪৩৭ পৃষ্ঠা।

* অনুমতি না হলে বা বিশেষ কোন কাজে তিনি লিপ্ত রয়েছেন, ফলে এ মুহূর্তে সাক্ষাৎ প্রদান করতে গেলে তার কষ্ট বা ক্ষতি হবে- এরূপ অবস্থা হলে চলে আসা বাঞ্ছনীয় কিম্বা এমন স্থানে বসে তার অপেক্ষা করতে থাকবে যেন তিনি জানতে না পারেন। অতঃপর স্বাধীনভাবে যখন তিনি কাজ থেকে ফারেগ হবেন, তখন সাক্ষাৎ প্রার্থনা করবে। এমন স্থানে অপেক্ষায় থাকবে না যেন তিনি

বুঝতে পারেন এবং ব্যস্ততার কারণে সাক্ষাৎ প্রদান করতে না পেরে বা সময় দিতে না পেরে লজ্জিত হন।

* দেখা হওয়ার পর সালাম দিবে। (সালাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৩৯৫ পৃষ্ঠা) আর মুসাফাহা ও মুআনাকার জন্য অগ্রসর হওয়া অপর পক্ষের কাজ, সে স্বেচ্ছায় অগ্রসর না হলে বা কোন বিশেষ কাজে লিপ্ত থাকলে মুসাফাহা মুআনাকা করতে গিয়ে তাকে বিব্রত করবে না বা তার ব্যাঘাত ঘটাবে না।

(مسائل وآداب ملاقات)

* যদি তার সাথে পরিচয় অনেক পুরাতন হয় কিম্বা এত হালকা পরিচয় হয় যে, তার ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে নিজের পরিচয় বলে দিয়ে তার দ্বিধা দূর করবে। এ কথা বলে তাকে লজ্জা দিবে না যে, আমাকে চিনতে পারেননি? ..... ইত্যাদি।

* দীর্ঘ কথা বলতে হলে তার এত কথা শোনার সময় হবে কি না তা জেনে নিতে হবে। তার ইচ্ছার বাইরে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে বা দীর্ঘ কথা বলে তাকে বিব্রত করবে না।

* মুরব্বী ও গুরুজনদের নিকট সাক্ষাতের জন্য যেতে হলে যদি তাদের সাক্ষাতের জন্য সময় নির্ধারিত থাকে তাহলে সেই নির্ধারিত সময়ে যাবে।

* সাক্ষাৎ হওয়ার পর মজলিসের সুন্নাত, আদব ও কথা বলার সুন্নাত, আদব-এর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এর জন্য দেখুন ৪০২-৪০৮ পৃষ্ঠা।

যার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করা হয় তার কর্তব্য ঃ

* কোন বিশেষ ওযর বা একান্ত অসুবিধা না থাকলে সাক্ষাৎ প্রদান করতে গড়িমসি না করা।

* বিশেষ সাক্ষাৎ প্রার্থী হলে পরিপাটি হয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ প্রদান করা উত্তম। (شرعة الاسلام)

* সাক্ষাৎ প্রার্থীর জন্য বসা বা স্থান গ্রহণের জায়গা করে দিবে বা মজলিসে স্থান না থাকলে অন্ততঃ একটু নড়ে চড়ে বসে তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবে, এতে সাক্ষাৎ প্রার্থী প্রীত হবে।

* সাক্ষাৎ প্রার্থী অপরিচিত হলে তার পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চেয়ে তার দ্বিধা সংকোচকে দূর করবে।

টেলিফোনে কথা বলার সুন্নাত ও আদব সমূহ

সাক্ষাৎ ও মুলাকাতের সুন্নাত ও আদব সমূহে যা যা উল্লেখ করা হয়েছে, কারও সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ ও কথা-বার্তার ক্ষেত্রেও সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ ঃ

(১) এমন সময় কারও কাছে টেলিফোন করবে না যখন তার ঘুম, ওজীফা কিম্বা বিশেষ কোন কাজ বা আমলের ব্যাঘাত ঘটবে।

(২) টেলিফোন করার সময় নির্ধারিত থাকলে তখনই করবে।

(৩) টেলিফোন রিসিভ করার পর প্রথমেই সালাম দিতে হবে। সালাম যে কোন কথা বলার পূর্বেই হওয়া নিয়ম।

(৪) তার সাথে পরিচয় না থাকলে কিম্বা আওয়াজে সে টের না পেলে বা অনেক পুরাতন বা এত হালকা পরিচয় যে, তার ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা-এরূপ ক্ষেত্রে নিজের পরিচয় বলে দিয়ে তার দ্বিধা দূর করবে। এ কথা বলে তাকে লজ্জা দিবে না যে, আমাকে চিনতে পারেননি? ..... ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৫) দীর্ঘ কথা বলতে হলে তার এত কথা শোনার সময় আছে কি না জেনে নিতে হবে, তার সম্মতির বাইরে দীর্ঘ কথা বলে তাকে বিব্রত করবে না।

(৬) কথা বলার সময় কথা বলার সুন্নাত ও আদব সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪০৩ পৃষ্ঠা)

সালামের সুন্নাত ও আদব সমূহ

সালাম প্রদান সংক্রান্ত ঃ

* আগে সালাম দিবে। এটাই উত্তম, কেননা যে প্রথমে সালাম প্রদান করবে সে অধিক ছওয়াবের অধিকারী হবে।

* পরিচিত-অপরিচিত, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলকে সালাম দিবে। মাতা-পিতা, স্ত্রী, পুত্র পরিজন সকলকেই সালাম করবে।

* সওয়ারী ব্যক্তি পায়ে চলা ব্যক্তিকে, চলনেওয়ালা বসা বা দাঁড়ানো ব্যক্তিকে, আগন্তুক অবস্থানকারীকে, কম সমংখ্যক লোক অধিক সংখ্যকদেরকে এবং কম বয়সী অধিক বয়সীকে অগ্রে সালাম করা উত্তম। জামাআতের মধ্য থেকে একজন সালাম করলে সকলের পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট হবে।

* সালামের সময় হাত দিয়ে ইশারা করবে না বা হাত কপালে ঠেকাবে না কিম্বা মাথা ঝুঁকাবে না। তবে দূরবর্তী লোককে সালাম করলে-যার পর্যন্ত

আওয়াজ না পৌঁছার সম্ভাবনা রয়েছে- সেরূপ ক্ষেত্রে শুধু বোঝানোর জন্য হাত দিয়ে ইশারা করা যেতে পারে। (اسلامی تهذیب)

* মাতা-পিতা বা গুরুজন ও বড়কে সালাম করার সময় আওয়াজ এবং ভাব-ভঙ্গির মধ্যে আদব ও সম্মান ফুটে ওঠা উচিৎ। এমনিভাবে ছোট ও স্নেহভাজনকে সালামের ক্ষেত্রে স্নেহ ব্যক্ত হওয়া সংগত। (اسلامی تهذیب)

* অমুসলিমকে সালাম করবে না। তবে বিশেষ স্বার্থে বা তার অনিষ্টতা থেকে রক্ষার প্রয়োজনে একান্ত কিছু বলে যদি তাকে অভিভাদন জানাতেই হয়, তাহলে 'গুড মর্নিং', 'গুড ইভিনিং' বা 'শুভ-সকাল' 'শুভ সন্ধা' ইত্যাদি কিছু বলে অভিভাদন করা যায়। (كتاب الاذكار)

* কোন মজলিসে মুসলিম অমুসলিম উভয় প্রকারের লোক থাকলে মুসলমানদের নিয়তে সালাম দিবে কিম্বা নিম্নরূপ বাক্যেও সালাম দেয়া যায়-

اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

অর্থ ঃ যারা হেদায়াত তথা ইসলামের অনুসরণ করেছে, তাদের প্রতি সালাম।

* নিম্নোক্ত ব্যক্তিদেরকে সালাম দেয়া নিষিদ্ধ (মাকরূহ) এরূপ ব্যক্তিদেরকে সালাম প্রদানকারী সালামের উত্তর পাওয়ার হকদার হয় না।

(ক) কোন পাপ কাজে রত ব্যক্তি /ব্যক্তিগণকে; যেমন জুয়া বা দাবা খেলায় রত ব্যক্তিকে।

(খ) পেশাব-পায়খানায় রত লোককে।

(গ) পানাহাররত ব্যক্তিকে (অর্থাৎ, তার মুখে খাদ্য/পানীয় থাকা অবস্থায়)

(ঘ) ইবাদত যেমন নামায, তিলাওয়াত, আযান ও ইকামত প্রদানে এবং দ্বীনী কিতাব আলোচনায় রত ব্যক্তি বা যিকির ওজীফায় রতদেরকে।

(ঙ) কোন মজলিসে বিশেষ কথা-বার্তা বলার মুহূর্তে কথা-বার্তায় ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা থাকলেও সালাম করা উচিত নয়।

(চ) গায়র মাহরাম নারী-পুরুষের মধ্যে যেসব ক্ষেত্রে ফেতনার আশংকা থাকে সেখানে সালাম আদান প্রদান নিষিদ্ধ। (كتاب الاذكار)

* কোন খালি ঘরে প্রবেশ করলে সেখানেও সালাম দিবে। তবে নিম্নোক্ত বাক্যে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ [1] অথবা اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ [2]

১. অর্থঃ হে গৃহবাসী, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

২. সালাম আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর।

* ছাত্রদেরকে কুরআন বা দ্বীনী কিতাব তা'লীম দানে রত ওস্তাদকে কেউ সালাম করলে তিনি জওয়াব দেয়া না দেয়া উভয়টার অবকাশ রাখেন। (شامي)

সালামের জওয়াব প্রদান সংক্রান্ত ঃ

* সালামের জওয়াব দেয়া ওয়াজেব। জামাআতের মধ্য থেকে একজন জওয়াব দিলে সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।

* সালামের জওয়াব শুনিয়ে দেয়া জরুরী। (যদি সালাম দাতা নিকটে থাকেন) আর যদি সালাম দাতা দূরে থাকেন, তাহলে মুখে জওয়াব দেয়ার সাথে সাথে ইশারা দ্বারাও তাকে অবহিত করবে, বিনা প্রয়োজনে ইশারা করবে না, মাথা ঝুঁকাবে না।

* সালাম দাতা اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (আসসালামু আলাইকুম) বললে তার জওয়াবে "ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ" বলা উত্তম। বরং 'ওয়া বারাকাতুহু'– বৃদ্ধি করে দিলে আরও উত্তম। আর সালাম দাতা ওয়ারহমাতুল্লাহ সহ সালাম দিলে তার জওয়াবে ওয়া বারাকাতুহু বৃদ্ধি করে দেয়া উত্তম।

* আওয়াজ ও ভাব-ভঙ্গির ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

* কেউ অন্য কারও সালাম পৌঁছালে তার জওয়াবে বলবে–

وَ عَلَيْكَ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ অথবা وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ

* চিঠি-পত্রের সালাম ও তার জওয়াব প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪০১ পৃষ্ঠা

* কোন অমুসলিম আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম দিলে তার জওয়াবে শুধু বলবে "ওয়া আলাইকুম" অথবা শুধু ইশারা করে দিলেও যথেষ্ট।

* একই সঙ্গে দুই জন একে অপরকে সালাম দিলে প্রত্যেককেই আবার জওয়াব দিতে হবে। তবে আগে পরে হলে পরেরটা জওয়াব এবং আগেরটা সালাম বলে গণ্য হবে এবং কাউকেই আর জওয়াব দিতে হবে না।

(رد المحتار ـ كتاب الاذكار ـ معارف القرآن ـ اسلامی تهذيب ـ شرعة الاسلام গ্রন্থাবলী থেকে গৃহীত)

মুসাফাহার সুন্নাত ও আদব সমূহ

* মুসাফাহা করা সুন্নাত। সাক্ষাতের প্রাক্কালে মুসাফাহা করতে হয়। বিদায়ের সময়ও মুসাফাহা হতে পারে।

* উভয় হাত যোগে মুসাফাহা করা সুন্নাত। অনন্যোপায় অবস্থা ব্যতীত এক হাতে মুসাফাহা করা সুন্নাতের খেলাফ এবং তাকাব্বুরের আলামত।

* মুক্ত হাতে মুসাফাহা করা সুন্নাত অর্থাৎ, মুসাফাহার সময় হাতের মাঝে কাপড় প্রভৃতির অন্তরায় থাকতে পারবে না।

* মুসাফাহার মধ্যে হাদিয়ার টাকা হাতে গুঁজে দেয়া পছন্দনীয় নয়।

* মুসাফাহার পর নিজের হাতে চুমু দেয়া বা নিজের হাত বুকের উপর ফিরানো সুন্নাতের খেলাফ ও বিদআত।

* কারও সঙ্গে এমন সময় মুসাফাহার জন্য হাত বাড়াবে না, যখন তার কোন ব্যস্ততা বা লিপ্ততার কারণে মুসাফাহার জন্য হাত অবসর করতে সে বিব্রত বোধ করতে পারে।

* কোন মজলিসে যেয়ে সকলের সঙ্গে একাধারে মুসাফাহা করতে গিয়ে মজলিসের ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন ঘটানো অনুচিত। এরূপ ক্ষেত্রে একজনের সাথে বা যার উদ্দেশ্যে সে গিয়েছে তার সাথে মুসাফাহার উপরই ক্ষান্ত করবে।

* মুসাফাহা করতে গিয়ে কাউকে কষ্ট দেয়া অনুচিত; কেননা মুসাফাহা করা সুন্নাত আর কাউকে কষ্ট দেয়া হারাম।

* মুসাফাহা হল সালামের পরিপূরক, অতএব যেসব লিপ্ততার সময় সালাম থেকে বিরত থাকার নিয়ম, মুসাফাহার ক্ষেত্রেও সে নিয়ম প্রযোজ্য।

(ماخوذ از اسلامی تہذیب ۔ تعلیم الدین ۔ جواہر الفقہ واز آداب المعاشرت نقلا عن البحر و الفتاوی الهندية والشامی)

মুআনাকার মাসায়েল

* বড়দের প্রতি আজমত এবং ছোটদের প্রতি শফকত ও মহব্বতের সাথে মুআনাকা অর্থাৎ, গলাগলি বা কোলাকুলি করা যেতে পারে, এটা জায়েয বরং সুন্নাত।

* সাধারণভাবে তিন ক্ষেত্রে মুআনাকা করা জায়েয নয় (১) যেখানে নিজের মধ্যে শাহওয়াত থাকে কিম্বা নিজের মধ্যে বা অপর পক্ষের মধ্যে শাহওয়াত এসে যাওয়ার আশংকা থাকে (তবে বিবির ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা) (২) মুআনাকা করতে গেলে যদি কাউকে কষ্ট দেয়া হয় (৩) ঈদের দিন মুআনাকা করা। এটা বেদআত।

* মুআনাকাকারী উভয়ে প্রথমে ডান গলা মিলাবে।

* মুআনাকা শুধু এক দিকেই যথেষ্ট, তিনবার করা জরুরী নয়।

(فتاوی محمودية ج/٥)

* মুআনাকা করার দুআ এই- اَللّٰهُمَّ زِدْ مَحَبَّتِىْ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমার মহব্বত বৃদ্ধি কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খাতিরে।

(ماخوذ از جواہر الفقہ ج/١ ۔ تعلیم الدین ۔ وعالمگیریة وغیرها)

কারও আগমনে দাঁড়িয়ে যাওয়া (কেয়াম করা)

কারও আগমনে দাঁড়িয়ে যাওয়া তিন ধরনের ঃ

(১) সম্মানার্থে দাঁড়ানো ঃ কোন বুযুর্গ বা সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি আন্তরিক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাঁর আগমনে দাঁড়িয়ে যাওয়া জায়েয। তবে তাঁর বসে পড়ার পর সকলে বসে পড়বে। তিনি বসে পড়বেন আর সকলে দাঁড়িয়ে থাকবে– হাদীছে এটাকে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব সেরূপ করা নিষিদ্ধ ও হারাম।

(২) স্নেহার্থে দাঁড়ানো ঃ কোন স্নেহ ভাজন ও অন্তরঙ্গ কেউ আগমন করলে তার ভালবাসায় বা স্নেহে দাঁড়িয়ে যাওয়াও জায়েয।

(৩) আত্মরক্ষার্থে দাঁড়ানো ঃ আগমনকারী ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু তার আগমনে না দাঁড়ালে সে রুষ্ঠ হবে বা মনঃক্ষুণ্ন হবে কিম্বা আগমনকারী তার উপরস্থ, ফলে এভাবে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন না করলে উক্ত অধীনস্তের ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে অথবা তার সম্মানার্থে দাঁড়ালে সে প্রীত হয়ে হেদায়াত গ্রহণ করতে পারে– এরূপ আশা থাকলে এসব ক্ষেত্রেও দাঁড়ানো জায়েয তবে এরূপ ক্ষেত্রেও তার বসে পড়ার পর অন্যরাও বসে পড়বে।

বিঃ দ্রঃ হযরত রাসূল (সঃ) তাওয়াজু, বিনয় ও লৌকিকতা মুক্ত থাকার জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে সাহাবীদের দাঁড়িয়ে যাওয়াকে তিনি অপছন্দ করতেন। অতএব নফ্স-প্রীতির এই যুগে অনুসরণীয় ব্যক্তি বর্গের পক্ষে হযরত রাসূল (সঃ) এর এই আদর্শ অনুসরণে তার উদ্দেশ্যে অন্যদের দাঁড়িয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করাই নিরাপদ ও পছন্দনীয় পন্থা।

(اسلامی تہذیب ও تعلیم الدین، امداد الفتاوی ج ٤، احسن الفتاوی ج ١ এর আলোকে)

মুরব্বী ও গুরুজনের কদমবুছী এবং হাত কপালে চুমু দেয়া প্রসঙ্গ

কদম বূছী ঃ

* কারও পা ছুয়ে সেই হাতে চুমু দেয়া মাকরূহ। আর যদি পা ছুয়ে সেই হাতে চুমু দেয়া না হয় বরং শুধু চেহারার উপর মর্দন করা হয় তাহলে কোন মুত্তাকী পরহেযগার ও বরকতময় ব্যক্তির পা ছুয়ে এরূপ করার অনুমতি রয়েছে, যদি এরূপ করনেওয়ালা ব্যক্তি সুন্নাতের পাবন্দ এবং সহীহ আকীদা সম্পন্ন হয়ে থাকে। অন্যথায় এরূপ করা জায়েয হবে না। (امداد الفتاوی ج ٤)

* কদম বূছী মাঝে মধ্যে ঘটনাক্রমে জায়েয স্থানে করা যেতে পারে, তবে এটাকে নিয়ম বানানো ঠিক নয়। (جواهر الفقه ج ١)

* শ্বশুর-শাশুড়ী বা গুরুজনের পায়ে হাত দিয়ে সালাম না করলে বে-আদবী হয়– এটা মনগড়া ধারণা। সালাম করলে শুধু মুখে করবে।

* আজমত সম্মানের ভিত্তিতে সরাসরি মুখ দিয়ে বুযুর্গ ও আলেম ব্যক্তির পায়ে চুমু দেয়ার অবকাশও রয়েছে, তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাথা ঝুঁকানো জায়েয নয় এবং এটা নিয়ম বানানোর মত বিষয়ও নয়। (তাই রছম প্রীতির এই যুগে এ থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।) তাছাড়া তাকাব্বুর (অহংকার) প্রকাশ পায় বিধায় ফোকাহায়ে কেরাম আলেম ও বুযুর্গদেরকে এরূপ চুমু (কদম-বূছী) অর্জন করার জন্য পা বাড়িয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। (جواهر الفقه ج ١)

হাতে চুমু দেয়া ঃ

* কোন আলেমের হাতে তাঁর ইল্‌মের খাতিরে কিম্বা কোন ন্যায়পরায়ণ বাদশার হাতে তার ন্যায়পরায়ণতার খাতিরে যদি চুমু দেয়া হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। এ ছাড়া অন্য কারও হাতে বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে সাক্ষাতের সময় যে চুমু খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে, শরীয়তে তার অনুমতি নেই। (عين الهداية نقلا عن العنايه والعالمغيرية) তবে কারও পক্ষেই এরূপ খাহেশ রাখা পছন্দনীয় নয় যে, অন্য কেউ তার হাতে চুমু দিয়ে তাকে সম্মান প্রদর্শন করুক। (احسن الفتاوى ج/١)

* কদম বূছীর ন্যায় হাতে চুমু দেয়াকেও নিয়ম বানানো ঠিক নয়। মাঝে মধ্যে ঘটনাক্রমে করা যেতে পারে। (جواهر الفقه ج/١)

চেহারা, কপাল ও মাথায় চুমু দেয়া ঃ

* কোন আলেম, বুযুর্গ ও পরহেযগার ব্যক্তিকে সম্মান ও আজমত স্বরূপ তাঁর চেহারা, কপাল ও মাথায় চুমু দেয়া জায়েয আর খাহেশাত বা প্রবৃত্তির তাড়নায় এরূপ করা হলে তা জায়েয নয়। (عين الهداية نقلا عن القاضيخان والعالمغيرية)

* সাক্ষাৎ বা বিদায়ের সময় কারও গালে বা মুখে চুমু দেয়াও মাকরূহ। (شامى)

বিঃ দ্রঃ পিতা-মাতা সন্তানকে স্নেহবশতঃ যে চুমু খায় বা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একে অপরকে যে চুমু খায় তা সর্বাবস্থায় জায়েয।

চিঠি-পত্রের সুন্নাত ও আদব সমূহ

* চিঠি-পত্রে প্রেরক ও প্রাপক উভয়ের নাম/পরিচয় উল্লেখ থাকা সুন্নাত। (مرقاة ج/٨)

* বিসমিল্লাহ দিয়ে পত্র শুরু করা সুন্নাত।

* চিঠি-পত্রে আসসালামু আলাইকুম .... না লিখে শুধু যদি লেখা হয় "সালামে মাসনূন বাদ" কিম্বা "সালাম বাদ" তাহলে তা শরীয়তসম্মত সালাম বলে গণ্য হবে না এবং তার জওয়াব দেয়াও ওয়াজিব হবে না। (اسلامی تہذیب)

* পত্রের সালামেরও জওয়াব দেয়া ওয়াজিব। এই জওয়াব পত্রের মাধ্যমে লিখিত ভাবেও হতে পারে কিম্বা মুখেও হতে পারে। জবাবী পত্রে "ওয়াআলাইকুমুস সালাম .... লিখলেও জওয়াব হবে আবার আসসালামু আলাইকুম .... লিখলেও জওয়াব হয়ে যাবে। (الشامی واسلامی تہذیب)

* বিসমিল্লাহ, সালাম ও ভূমিকার পর اما بعد লেখা অর্থাৎ, পর সংবাদ বা অতঃপর কথা হল– এ জাতীয় কোন শব্দ লেখা মোস্তাহাব। (مرقات ج /٨)

* প্রেরক তার পূর্ণ ঠিকানা লিখবে, কেননা প্রাপক তার ঠিকানা ভুলে যেতে পারে বা ঠিকানা লেখা কাগজ খুঁজতে পেরেশানী হতে পারে।

* নিজের প্রয়োজনে পত্রের উত্তর পাওয়ার দরকার থাকলে ফেরত খাম পাঠিয়ে দেয়া আদব। অনেক সময় খামের মূল্যের জন্য নয় বরং খাম যোগাড়েই পেরেশানী হয়।

* পত্রের ভাষা প্রাপকের জানা ভাষায় হওয়া চাই।

* পত্রের লেখা পরিষ্কার হওয়া চাই। অন্যথায় প্রাপকের পাঠ উদ্ধার করতে গিয়ে কষ্ট হবে এবং এ কষ্ট দেয়ার জন্য পত্র লেখকই দায়ী হবে।

* পত্রের সম্বোধন গুলোর মধ্যে ভারসাম্যতা থাকা চাই।

* বিয়ারিং পত্র লেখা অনুচিত।

* মুরব্বীদের নিকট একনলেজমেন্ট পত্র প্রেরণ করা বে-আদবী, এতে তার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করা হয় এই মর্মে যে, তিনি হয়ত এই প্রমাণ না থাকলে ভবিষ্যতে পত্র-প্রাপ্তির বিষয় অস্বীকার করতে পারেন।

* কারও আটকানো পত্র প্রাপক ব্যতীত বা তার অনুমতি ব্যতীত অন্যের জন্য দেখা জায়েয নয়, যদি তাতে প্রেরক/প্রাপকের গোপনীয়তা ফাঁস হওয়ার বা প্রেরক কিম্বা প্রাপকের ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে কিম্বা অহেতুকই পত্র খুলে দেখা হয়। এরূপ কারণ না থাকলে সেখানে দেখার অনুমতি আছে; যেমন মাতা-পিতা, উস্তাদ, মুরব্বীগণ অনেক সময় ছেলে/মেয়ে, ছাত্র-বা অধীনস্তের নেগরানীর জন্য করতে পারেন।

মজলিসের সুন্নাত ও আদব সমূহ

* কোন পাপের মজলিস হলে সেখানে যাবে না। অনন্যোপায় অবস্থায় গেলে কিম্বা যাওয়ার পর জানলে বা যাওয়ার পর পাপ কাজ শুরু হলে চলে আসবে। সম্ভব না হলে মনে মনে যিকির আযকারে লিপ্ত হবে– উক্ত পাপ কাজে বা কথায় মনোযোগ দিবে না। এ নিয়ম ঐ সময় প্রযোজ্য, যখন পাপ কথা বা কাজ খাস ঐ মজলিসে হয়। আর যদি পাপ কাজ খাস ঐ মজলিসে না হয়- দূরে হয়, তবুও অনুসরণীয় ব্যাক্তির পক্ষে সেখান থেকে চলে আসা উত্তম।

* উত্তম পোশাক পরিধান করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে মজলিসে গমন করা উত্তম।

* মজলিসে পৌঁছে সালাম করবে, যদি মজলিসের লোকেরা দ্বীনী তা'লীম ও যিকির তিলাওয়াতে লিপ্ত না থাকেন কিম্বা এমন কথা ও কাজে লিপ্ত না থাকেন যে সময় সালাম দিলে ব্যাঘাত ঘটবে।

* বয়স, ইল্‌ম ও বুযুর্গীতে অগ্রসরদেরকে মজলিসে সামনে বসতে দেয়া সুন্নাত।[১]

* বয়স ও ইল্‌মে কম– এরূপ লোকেরা আগে বেড়ে মজলিসে কথা বলবে না।

* মজলিসে পৌঁছে যেখানেই স্থান হয় সেখানেই বসে যাওয়া। লোকদেরকে ঠেলে মধ্যে বা সামনে গিয়ে বসা কিম্বা অপরকে তার স্থান থেকে সরিয়ে সেখানে বসা মাকরূহ। অবশ্য মজলিসের লোকেরা যদি তাকে এরূপ আগে বাড়িয়ে দেন তাহলে তা মাকরূহ হবে না।

* অনুমতি ব্যতীত দু'জন ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তাদের মাঝখানে না বসা। কেননা তাদের মধ্যে বিশেষ আন্তরিকতা বা কোন গোপন কথা থাকতে পারে।

* যখন মজলিসে কোন ব্যক্তি আগমন করেন এবং তার বসার স্থান সংকুলান না হয়, তখন সেখানে বসা লোকদের উচিত একটু চেপে বসে জায়গা প্রশস্ত করে আগন্তুক ব্যক্তির জন্য স্থান করে দেয়া।

* আগন্তুক ব্যক্তি প্রকৃত সম্মানার্হ ব্যক্তি হলে তার সম্মানার্থে কিম্বা আগন্তুকের উদ্দেশ্যে না দাঁড়ালে কোন ক্ষতি হওয়ার বা হাজত পূর্ণ না হওয়ার আশংকা থাকে এরূপ প্রয়োজনে দাঁড়ানোর অনুমতি আছে। আগন্তুক স্নেহভাজন ব্যক্তি হলেও স্নেহ প্রদর্শনার্থে দাঁড়ানো যায়।

---

১. বয়স এবং ইল্‌ম– এ দুয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি অধিক মর্যাদার হকদার। অতএব আলেম নন- এরূপ বয়সী লোকের চেয়ে কম বয়সী অথচ আলেম- তাকেই মজলিসে বসা, পথ চলা, কথা বলা সব ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে।

* কেউ মজলিস থেকে উঠে গেলে এবং পুনরায় তার উক্ত স্থানে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকলে তার স্থানে অন্য কেউ বসবে না।

* ওয়াজ, নছীহত ও বয়ানের মজলিস হলে সকলে খুব মিলে মিলে বসবে।

* মজলিস কেবলামুখী হওয়া উত্তম।

* কোন মজলিসে তিনজন লোক থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে অপর দুজনে একান্তে কোন কথা বলবে না, কেননা এতে তৃতীয়জন মনে ব্যথা পেতে পারেন।

* মজলিসে কারও দিকে পা বাড়িয়ে বসা বে-আদবী।

* কোন মোবারক মাহফিলে যাওয়ার জন্য গোসল করে নেয়া উত্তম।

* মশওয়ারার মজলিস হলে প্রথমে এই দুআ পড়ে নিবে–

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنَا مَرَاشِدَ اُمُوْرِنَا وَاَعِذْنَا مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমাদের জন্য সঠিক বিষয়টি আমাদের অন্তরে উদিত করে দাও এবং নফ্সের ধোঁকা হতে ও কুকর্ম হতে আমাদেরকে রক্ষা কর।

* মজলিস শেষে নিম্নোক্ত দুআ পড়ে নিলে উক্ত মজলিসে সংঘটিত পাপ-ত্রুটির কাফ্ফারা হয়ে যায়।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ۔ (ماخوذ از آداب المعاشرت ۔ اسلامی تهذیب ۔ تعليم الدين وغيره)

কথা বলার সুন্নাত, আদব ও নিয়ম কানূন

* কথা কম বলা উত্তম।

* যা বলবে সত্য বলা ওয়াজিব, মিথ্যা বলা হারাম।[১]

১. সর্বমোট চার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়েজ এবং এক ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা ওয়াজেব। যেসব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা জায়েয তা হল (১) যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে। (২) দুজন বিবদমান লোকের মধ্যে ঝগড়া, শত্রুতা ও বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য (৩) স্বামী তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য। (৪) নিজের প্রকৃত হক উদ্ধারের জন্য কিম্বা নিজের অথবা অপরের বড় ধরনের ক্ষতি ঠেকানোর জন্যেও মিথ্যা বলার অনুমতি রয়েছে। এ নীতির অধীনেই চোর ডাকাতের কাছে নিজের টাকা-পয়সা ও মালের কথা অস্বীকার করা যায়, অন্য ভায়ের গুপ্ত ভেদ কেউ জানতে চাইলে তা অস্বীকার করা যায়। আর যে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা ওয়াজিব তা হল– সত্য বললে খুব মারাত্মক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে এবং মিথ্যা বলা দ্বারা সে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা বোধ হলে সে রূপ ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা ওয়াজেব হয়ে যায়। তাই কোন ক্ষেত্রে সত্য বলা দ্বারা অন্যায় ভাবে নিজের বা অন্যের জীবন হানির সম্ভাবনা দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলে জীবন রক্ষা করা সম্ভব হলে তা করা ওয়াজিব। (مجمع الفتاوى)

* সাধারণভাবে আস্তে কথা বলাই উত্তম। তবে বড় মজলিসের প্রয়োজনে প্রয়োজন অনুপাতে জোরে কথা বলতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরে বলা ভাল নয়।

* নিজের চেয়ে অধিক বয়স এবং অধিক ইল্‌ম সম্পন্ন লোকদেরকে কথা বলতে অগ্রাধিকার দেয়া আদব।

* আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে মূর্খদের ভঙ্গিতে কথা না বলা উচিত।

* বানাওটি করে কথা না বলা।

* কথার মধ্যে ছন্দ সৃষ্টির কসরৎ করা অন্যায়।

* তাহকীক-তদন্ত ব্যতীত কথা বলা অন্যায়। যে কোন কথা শুনেই তাহকীক-তদন্ত ব্যতীত তা বর্ণনা করা মিথ্যার শামিল। তবে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে কিছু জানলে তা তাহকীক ছাড়াই বলা যায়।

* ঝগড়া এবং তর্ক সৃষ্টিকারী কথা বলা অন্যায়।

* মিথ্যা কছম না খাওয়া উচিত। মিথ্যা কছম করা কবীরা গোনাহ।

* সত্য হলেও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর কছম করা নিষেধ। যেমন পিতা-মাতার কছম, কারও জীবনের কছম, কা'বার কছম ইত্যাদি।

* গীবত করা নিষেধ। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৫৫৩ পৃষ্ঠা।

* চোগলখুরী করা নিষেধ। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৫৫৪ পৃষ্ঠা।

* নিজের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতের ব্যাপারে কোন খবর বা প্রতিশ্রুতিমূলক কথা বললে "ইনশাআল্লাহ" বলবে।

* বড়দেরকে সম্মানজনক সম্বোধন পূর্বক কথা বলা আদব।

* বড়দের আদব রক্ষা করে কথা বলা আদব।

* কথার ভাষা হিসেবে আরবী ভাষাকে পছন্দ করবে।

* গালি গালাজ করা হারাম।

* অশ্লীল কথা বলা নিষেধ। এটা গোনাহে কবীরা।

* আল্লাহর কোন সৃষ্টিকে লা'নত করা পাপ।

* কাউকে লা'নত করে ফেললে তার জন্য কল্যাণের দোয়া সম্বলিত নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَهٗ قُرْبَةً وَّرَحْمَةً ۔ (شرعة الاسلام)

অর্থঃ হে আল্লাহ, এটাকে তুমি তার জন্য নৈকট্য ও রহমতের ওছীলা বানাও।

* কারও উপর অপবাদ না লাগানো। এটা মহাপাপ।

* কাউকে কাফের, ফাছেক, মালউন, আল্লাহর দুশমন, বেঈমান ইত্যাদি বলে সম্বোধন করা নিষেধ।

* নিজের ভাঙ্গা ভাঙ্গা অভিজ্ঞতার কথা বলবে না, এতে শ্রোতাদের মনে বিরক্তির উদ্রেক হয়।

* আত্মপ্রশংসা না করা। এটা গোনাহ।

* কোন ফাসেক বা পাপীর প্রশংসা না করা। এটা গোনাহ।

* যার মধ্যে অহংকার দেখা দেয়ার সম্ভাবনা আছে এরূপ ব্যক্তির সম্মুখে তার প্রশংসা না করা।

* অতিরিক্ত ঠাট্টা মজাক না করা। এতে প্রভাব, লজ্জা-শরম ও পরহেযগারী হ্রাস পায়।

* যে শব্দ বা যে ভাষা বাতিলপন্থীরা খারাপ উদ্দেশ্যে এবং খারাপ অর্থে ব্যবহার করে থাকে সেটা পরিহার করা কর্তব্য।

* যে শব্দটা ভাল-মন্দ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এরূপ শব্দকে ভাল-অর্থেও ব্যবহার না করা উচিত

* চিন্তা করে কথা বলবে।

* কথা এত সংক্ষেপ করবে না যাতে বক্তব্য অস্পষ্ট থাকে, আবার এত দীর্ঘ করবে না যাতে বিরক্তি সৃষ্টি হয়।

* চাটুকারিতামূলক কথা বলবে না।

* কোন প্রয়োজনের কথা কারও নিকট পূর্বে বলে থাকলে আবার সেটা পুনরাবৃত্তি করার ক্ষেত্রে পূর্ণ কথা বলবে, শুধু ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট নয়। কারণ হতে পারে তিনি পূর্বের কথা ভুলে গিয়ে থাকবেন এবং এক্ষণে পূর্ণ কথা না হওয়ায় বিভ্রান্তির শিকার হবেন।

* কারও বক্তব্য শেষ হওয়ার পূর্বেই তার কথা কেটে মাঝখানে কথা না বলা আদব। দু'জনে কথা বলতে থাকলে তাদের সম্মতি ব্যতীত তাদের কথায় ফোড়ন কাটবে না।

* শ্রোতাদের ধারণ ক্ষমতা লক্ষ্য রেখে কথা বলা– যে কথা তাদের বুঝে আসার মত নয়– এরূপ কথা না বলা।

* নিজের কথায় ভুল হলে সেটা স্বীকার করে নেয়া, অপব্যাখ্যায় না যাওয়া।

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার তথা দাওয়াত, তাবলীগ এবং ওয়াজ-নছীহত ও বয়ান করার সুন্নাত, আদব ও শর্ত সমূহ

* আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার তথা দাওয়াত প্রদান এবং ওয়াজ-নছীহত ও বয়ান করার পূর্বে নিয়ত সহীহ করে নিবে অর্থাৎ, এ'লায়ে কালিমাতুল্লাহ বা আল্লাহর হুকুম আহকাম চালু করার, আল্লাহর দ্বীন জেন্দা করার এবং ছওয়াব হাছিল করার নিয়ত করবে।

* আল্লাহর কথা এবং হক কথা বলার কারণে যে অসুবিধা দেখা দিতে পারে তার উপর ধৈর্য ধারণের জন্য মনকে প্রস্তুত করে নিবে।

* শ্রোতাদেরকে তাদের কাজ থেকে এবং কথা-বার্তা থেকে ফারেগ করে নিবে।

* আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ে নিবে।

* ওয়াজ-নছীহত ও বয়ানের পূর্বে আল্লাহর হাম্‌দ ও দুরুদ শরীফ পড়ে নিবে। তবে ওয়াজের মজলিসে সকলের সম্মিলিত ভাবে সমস্বরে দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা রছমে পরিণত হয়েছে। তাই এটা পরিত্যাজ্য।

* যে বিষয় বিশুদ্ধভাবে জানা আছে একমাত্র সেটাই বলবে। নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে যেটা জানা হয়নি, তাহকীক ছাড়া সেটা বর্ণনা করা মিথ্যা বয়ান করার শামিল।

* হেকমত, যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কথা বলা জরুরী।

* নরমীর সাথে কথা বলা, কঠোরতা পরিহার করা। মোস্তাহাব পর্যায়ের বিষয় হলে সর্বদাই নরমীর সাথে বলা আর ওয়াজিব ও ফরয পর্যায়ের বিষয় হলে প্রথমে নরমীর সাথে তারপর কঠোরতার সাথে বলবে।

* অন্যকে যে বিষয়ের দাওয়াত ও নছীহত প্রদান করবে, প্রথমে নিজে সেটার উপর আমল শুরু করতে পারলে উত্তম। অন্যথায় মানুষের মনে তার দাওয়াত ও নছীহতের আছর কম হবে।

* এত ঘন ঘন বা এত দীর্ঘ সময় ওয়াজ নছীহত না করা, যাতে শ্রোতাদের মনে বিরক্তির উদ্রেক হয়।

* শ্রোতাদের ধারণ ক্ষমতা লক্ষ্য রেখে কথা বলা জরুরী।

* তারগীব (উৎসাহমূলক কথা) তারহীব (ভয় ও সতর্কতামূলক কথা) ফাযায়েল ও আহকাম সব বিষয়ের সমন্বয়ে বয়ান করা। এমনিভাবে ঈমান ও ইবাদতের বিষয়ের সাথে ইসলামের মুআমালাত, মুআ'শারাত ও আখলাক-চরিত্র সম্পর্কেও বয়ান রাখা জরুরী।

* শ্রোতাদের মন-মেজায লক্ষ্য রেখে কথা বলা জরুরী।

* যে বিষয় শ্রোতাদের জন্য বেশী প্রয়োজনীয় সে বিষয়ের বয়ানকে অগ্রাধিকার দেয়া জরুরী।

* দাওয়াত ও নছীহতের বিনিময়ে পার্থিব বিনিময় গ্রহণ না করা নবীগণের সুন্নাত।

* শ্রোতাদের খায়ের খাহীর জয্‌বা নিয়ে দাওয়াত দিবে ও বয়ান করবে।

* পরকালমুখী করে বয়ান করা অর্থাৎ মুখ্যতঃ আল্লাহর হুকুম ও দ্বীন মানা না মানার পরকালীন লাভ ক্ষতিকে তুলে ধরেই বয়ান করা। কখনও কখনও পার্থিব লাভ-লোকসানকেও গৌণভাবে উল্লেখ করা যায়।

* দ্বীনকে সহজভাবে পেশ করা নিয়ম, যেন শ্রোতারা দ্বীনকে কঠিন মনে করে না বসে।

* পর্যায়ক্রমে জরুরী হুকুম-আহকামের চাপ দেয়া, যাতে এক সঙ্গে অনেকগুলো বিষয়ের চাপ মনে করে শ্রোতাগণ বিগড়ে না যায়।

* দোষ-ত্রুটির নেছবত নিজের দিকে করা, যেমন বলা যে, আমরা কেন ইবাদত করব না? আমরা এই পাপ পরিত্যাগ করি ইত্যাদি। এরূপ না বলা যে, আপনারা কেন ইবাদত করেন না? আপনারা এই পাপ পরিহার করুন ইত্যাদি।

* দায়ী (দাওয়াত দানকারী) নিজের অবস্থানকে পরিষ্কার রাখবে। এমন কোন কাজ করবে না যা প্রকৃতপক্ষে তার জন্য বৈধ হলেও বাহ্যিকভাবে সেটা দেখে তার ব্যাপারে কেউ সন্দিহান হয়ে পড়তে পারে। অন্যায়ভাবে তার উপর কোন অপবাদ আরোপিত হলে সমাজের সামনে সে তার সঠিক অবস্থান ব্যাখ্যা করে দিবে।

* বয়ান এবং ওয়াজের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে নছীহত না করা। এতে উক্ত ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে বক্তার প্রতি মনে মনে ক্ষীপ্ত হয়ে উঠতে পারে এবং হীতে বিপরীত হতে পারে।

(اصلاح انقلاب امت ـ معارف القرآن ـ شرعة الاسلام ـ مفاتيح الجنان ودينى دعوت كے قرآنى اصول
প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

কথা শ্রবণ করার আদব তরীকা

* কথা পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। কোন কথা বোধগম্য না হলে জিজ্ঞেস করার পরিবেশ থাকলে বক্তার নিকট জিজ্ঞেস করে ভালভাবে বুঝে নিতে হবে।

* দ্বীনী কথা-বার্তা আমলের এবং হেদায়েতের নিয়তে শুনতে হবে।

* কেউ আড়াল থেকে ডাকলে তার ডাকে সাড়া দিতে হবে। শুধু নীরবে তার আহ্বানে চলে আসা যথেষ্ট নয়।

* কেউ কোন কাজের কথা বললে হা বা না স্পষ্ট উত্তর দিতে হবে, যেন বক্তা নিশ্চিন্ত হতে পারে। ডাকে সাড়া না দিয়ে শুধু নীরবে কাজ সম্পন্ন করে দেয়াই যথেষ্ট নয়।

* উস্তাদের কথা বুঝে না আসলে (উস্তাদের ত্রুটি নয় বরং) নিজের বোধ ক্ষমতা বা মনোযোগের ত্রুটি আছে মনে করতে হবে।

* উস্তাদের কথা, এমনিভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্যে কেউ কোন কথা বললে কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে সরে যাওয়া বে-আদবী।

* উস্তাদের দোষ-ত্রুটি কাউকে বলতে শুনলে যথাসম্ভব সেটা প্রতিহত করবে। আর সম্ভব না হলে সেখান থেকে সরে যাবে।

* গান-বাদ্য, পর নারীর আওয়াজ বা পর পুরুষের আওয়াজ ইত্যাদি অবৈধ শব্দ কানে এলে সে দিকে মনোযোগ না দেয়া।

* কোন মজলিসে কথা চলতে থাকলে সেদিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে– অন্য কারও সাথে কথা বলা বে-তমীজী।

* মুরব্বী বা উস্তাদ কোন কথা বলার পর বুঝে এসেছে কি না জিজ্ঞেস করলে স্পষ্টভাবে হাঁ বা না বলা উচিৎ, নীরব থাকা ঠিক নয়; এতে উস্তাদ বা মুরুব্বীর পেরেশানী হয়। কথার জওয়াব না দেয়া বেআদবী।

* ওয়াজ-নছীহতের কথা হলে কথা শোনার পূর্বেই ওয়াজকারী ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য এবং সহীহ মাযহাবের লোক কি না তা কোন হাক্কানী আলেম থেকে জেনে নিয়ে তারপর তার ওয়াজ শোনা উচিৎ। এই সতর্কতা অবলম্বনের পরও কোন ওয়ায়েজের কোন কথা অস্পষ্ট বা সন্দেহমূলক মনে হলে কোন বিজ্ঞ হক্কানী আলেম থেকে সে সম্পর্কে ভালভাবে জেনে না নিয়ে তাতে আস্থা স্থাপন করা বা তার উপর আমল করা ঠিক হবে না।

(آداب المعاشرت . اصلاح انقلاب امت . مفاتيح الجنان প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে করণীয়

তর্ক-বিতর্ক দুই ধরনের হয়ে থাকে (এক) পারস্পরিক কথা-বার্তার সময় ঘটনাক্রমে লেগে যাওয়া তর্ক-বিতর্ক। (দুই) দ্বীনী দাওয়াতের কাজে যে বাহাছ মোবাহাছা বা তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে। উভয় প্রকার তর্ক-বিতর্কের সময় যে নিয়ম নীতিগুলো মেনে চলা আবশ্যক তা হল ঃ

১। কথা-বার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করা।

২। রাগ হয়ে কোন কটু কথা না বলা।

৩। এমন যুক্তি প্রমাণ পেশ করা, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়।

৪। বহুল প্রচলিত, প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ব্যাখ্যাবলীর মাধ্যমে প্রমাণ দেয়া, যাতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং সে হটকারিতার পথ পরিহার করে।

৫। প্রতিপক্ষ হক কথা মানে না, বা বুঝে না, কিম্বা বুঝতে চায় না– এরূপ হলে নিজেই চুপ হয়ে যাওয়া নিয়ম।

৬। ভুল সমর্থনের জন্য দলীল প্রমাণ পেশ না করা।

৭। নিজের কথার মধ্যে কোন ভুল বুঝে আসলে তৎক্ষণাৎ তা স্বীকার করে নেয়া উচিত। ভুল স্বীকার না করা গুরুতর অপরাধ।

(ماخوذ از معارف القرآن وتعليم الدين)

হাসি-ফুর্তি ও রসিকতা সম্পর্কে বিধি-বিধান

* শরীয়তের সীমানা লংঘন করে হাসি-ঠাট্টা করলে অন্তর শক্ত হয়ে যায়, গাম্ভীর্য হ্রাস পায়, আল্লাহর যিকির ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে গাফলত পয়দা হয়, লজ্জা-শরম ও পরহেযগারী কমে যায়।

* কোন শোকাতুর বা বিপদ গ্রস্থের দিল খোশ করার জন্য হাসি-ফুর্তির কথা বলা জায়েয বরং উত্তম। এমনিভাবে দ্বীনের কাজ ও ইবাদতের জন্য মনকে সতেজ করার উদ্দেশ্যে এবং মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য হাসি-ফুর্তি ও রসিকতা করা হলে তাও উত্তম।

* হাসি-ঠাট্টা ও রসিকতা করার সময় নিম্নোক্ত বিষয়াবলী লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

(ক) মিথ্যা না হয়।

(খ) কারও মনে বা ইজ্জতে আঘাত না লাগে।

(গ) অতিরিক্ত না হয়।

(ঘ) সারাক্ষণ যেন এতে লেগে থাকা না হয়। এ শর্তগুলো না পাওয়া গেলে তখনই সে হাসি-ঠাট্টা শরীয়তের সীমানা লংঘন করেছে বলে আখ্যায়িত হবে।

প্রশংসা বিষয়ক বিধি-বিধান

* কারও সম্মুখে তার প্রশংসা করা নিষেধ। এতে তার মধ্যে অহংকার বা আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হতে পারে। তবে কেউ যদি অহংকার বা আত্মম্ভরিতার শিকার হবে না বলে বোঝা যায়, তাহলে তার উৎসাহ বৃদ্ধি এবং গুণাগুণের স্বীকৃতি স্বরূপ তার কিছুটা প্রশংসা তার সম্মুখেও করে দেয়া যেতে পারে।

* কারও প্রশংসা করতে হলে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

(১) গুণ যতটুকু তার থেকে বাড়িয়ে বলা যাবে না। অর্থাৎ, প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা যাবে না।

(২) যে বিষয় নিশ্চিত করে জানা নেই তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। যেমন এরূপ বলা যাবে না যে, অমুক নিশ্চিত আল্লাহর অলী। কারণ, কে আল্লাহর অলী তা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না। তবে হাঁ, এভাবে বলা যায় যে, আমার জানা মতে তিনি আল্লাহর অলী, বা আমি তাকে আল্লাহর অলী মনে করি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৩) প্রকৃত প্রস্তাবে সে যেমন, মুখে তার অন্যরকম বলা যাবে না।

* কোন ফাসেক বে-দ্বীনের প্রশংসা করা নিষেধ। তবে প্রকৃত যোগ্যতার স্বীকৃতি দেয়া ভিন্ন কথা।

* আত্মপ্রশংসা করা অর্থাৎ, নিজের প্রশংসা নিজে করা নিষেধ। এটা গোনাহে কবীরা।

হাঁচি সম্পর্কিত বিধি-বিধান

* হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ[১] (আলহামদু লিল্লাহ) পড়ে আল্লাহর শোকর আদায় করবে।

* যে উক্ত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ শুনবে তার জন্য يَرْحَمُكَ اللّٰهُ[২] (ইয়ার হামু কাল্লাহ) বলে জওয়াব দেয়া সুন্নাত। এবং হাঁচি দাতা এর জওয়াবে বলবে–

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়েত করেন এবং তোমাদের অবস্থাকে সংশোধন করে দেন।

* যখন শ্রোতা ব্যস্ততার মধ্যে বা কোন লিপ্ততার মধ্যে থাকবে, তখন হাঁচি দাতার জন্য اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আস্তে বলা উত্তম, যাতে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলে জওয়াব দিতে গিয়ে শ্রোতার ব্যাঘাত না ঘটে।

* হাঁচি দেয়ার সময় আদব হল হাত বা কাপড় দ্বারা মুখ বন্ধ করে রাখবে, যাতে শব্দ কম হয় এবং মুখ ও নাকের ময়লা কারও গায়ে ছুটে গিয়ে না লাগে।

* বার বার হাঁচি দিলে বার বার يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলার দরকার নেই, বুঝতে হবে যে তার সর্দি হয়েছে বা হবে।

১. অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।
২. অর্থঃ আল্লাহ তোমাদেরকে রহমত দান করুন।

হাই সম্পর্কিত বিধি-বিধান

* হাই আসলে যথাসাধ্য তা ঠেকাতে চেষ্টা করবে। যদি একান্ত না পারা যায় তবে মুখ ঢেকে নিবে।

* হাই আসলে হাত দিয়ে মুখ ঢাকার নিয়ম হল– বাম হাতের পিঠ মুখের সাথে আর পেট অপর দিকে থাকবে। নামাযে এবং নামাযের বাইরে সব স্থানেই একই হুকুম, তবে নামাযে হাত বাঁধা অবস্থায় থাকলে ডান হাতের পিঠ মুখের দিকে আর পেট বাইরের দিকে রেখে মুখ ঢাকবে।

* হাই আসলে হা হা করে জোরে শব্দ করবে না।

* হাই আসলে পড়বে– لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

পান করার সুন্নাত ও আদব সমূহ

১. বসে পান করা সুন্নাত।

২. ডান হাতে পান করা সুন্নাত।

৩. পাত্রের ভাঙ্গা স্থানে মুখ লাগিয়ে পান না করা আদব।

৪. তিন শ্বাসে পান করা সুন্নাত।

৫. পানির পাত্রের মধ্যে শ্বাস না ছাড়া এবং ফুঁক না দেয়া। (তিরমিযী)

৬. শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং শেষে আলহামদু লিল্লাহ বলা সুন্নাত।

৭. অন্য মুসলমান ভাইয়ের বিশেষভাবে পরহেযগার ও বুযুর্গদের পান করার পর রয়ে যাওয়া অবশিষ্ট পানি বরকত মনে করে পান করা।

৮. পানি পান শেষে এই দুআ পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَهُ عَذْبًا فُرَاتًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا ۔

(شرعة الاسلام)

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি এটাকে বানিয়েছেন সুমিষ্ট ও সুপেয় এবং এটাকে বানাননি লবণাক্ত ও বিস্বাদ।

৯. দুধ, চা, কফি, মাঠা পান করার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমাদের জন্য এতে বরকত দাও এবং আমাদেরকে এটা আরও বেশী করে দাও।

১০. যমযমের পানি কেবলামুখী হয়ে পান করা মোস্তাহাব। এ পানি দাঁড়িয়ে বসে উভয় ভাবে পান করা যায়। (شامي ج ١)

১১. যমযমের পানি পান করার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট চাই উপকারী ইল্ম, প্রচুর রিযিক এবং সব রোগব্যাধি থেকে শেফা।

১২. পান করার পর অন্যকে দিতে হলে আদব হল ডান পাশের জনকে অগ্রাধিকার দেয়া। তার অনুমতি সাপেক্ষে বাম পার্শ্বের জনকেও দেয়া যায়।

১৩. যে পাত্রের ভিতর দেখা যায় না বা যে পাত্র থেকে এক সঙ্গে অনেক পানি পড়ার সম্ভাবনা- এরূপ পাত্রে মুখ লাগিয়ে পানি পান না করা আদব।

১৪. যিনি পান করাবেন তিনি সর্বশেষে পান করবেন।

খাওয়ার সুন্নাত ও আদব সমূহ

১. খাওয়ার পূর্বে জুতা খুলে নেয়া আদব।

২. উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নাত।

৩. কুলি করা সুন্নাত, যদি প্রয়োজন হয়। (اسلامی تهذيب)

৪. খানা সামনে আসলে এই দুআ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে যে রিযিক দান করেছ তাতে আমাদেরকে বরকত দাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

৫. বিনয়ের সাথে, বিনয়ের ভঙ্গিতে বসা[১] আদব।

---

১. এক হাদীছ থেকে জানা যায় যে, রাসূল (সঃ) ডান পায়ের হাঁটু গেড়ে অন্য পায়ের পেট মাটিতে রেখে (খাড়া করে) বসতেন। (مرقات ج ٨) অন্য এক হাদীছে উভয় হাঁটু খাড়া রেখে নিতম্ব মাটিতে লাগিয়ে বসার কথা বর্ণিত হয়েছে। (تكمله فتح الملهم ج ٤) উপরোল্লিখিত দু'টি পদ্ধতি ছাড়াও উলামায়ে কেরাম খাওয়ার সময় বসার আদবের মধ্যে আরও দুই প্রকার বসার কথা উল্লেখ করেছেন।

(ক) উভয় হাঁটু গেড়ে এবং উভয় কদমের পিঠ মাটিতে রেখে বসা।

(খ) ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসা। (تكمله ج ٤) এই সবগুলো বর্ণনার সার কথা হল বিনয়ের ভঙ্গিতে বসা। আসন গেড়ে বসা বেশী খাওয়ার নিয়াতে বা তাকাব্বুরের জন্যে হলে মাকরূহ, অন্যথায় জায়েয।

৬. সামনের দিকে ঝুঁকে নত হয়ে বসা।

৭. দস্তর খানা বিছানো সুন্নাত।

৮. জমীনের উপর বসা[১] এবং বসার বরাবর খাদ্যের বরতন রাখা।

৯. হেলান দিয়ে না খাওয়া (এমন কি হাতে ভর করেও না)।

১০. খাওয়ার শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ[২] (বিসমিল্লাহে ওআলা বারাকাতিল্লাহ) পড়া সুন্নাত এবং এটি জোরে পড়া মোস্তাহাব, যাতে অন্যরাও শুনতে পারে। (تكملة ج/٤) শুরুতে পড়তে ভুলে গেলে এবং খাওয়ার মাঝে স্মরণ হলে পড়বে بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ[৩] (বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু) (ترمذي)

১১. ডান হাতে খাওয়া সুন্নাত। প্রয়োজনে বাম হাতের সহযোগিতা নেয়া যায়।

১২. নিজের শরীরের ইছলাহ এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনের নিয়তে খেতে হবে।

১৩. তিন আঙ্গুলের (বৃদ্ধ, তর্জনী ও মধ্যমা) দ্বারা খাওয়া সুন্নাত। প্রয়োজনে তিনের অধিকও ব্যবহার করা যেতে পারে।

১৪. এক পদের খানা হলে নিজের সম্মুখ থেকে খাওয়া– অন্যের সম্মুখ থেকে না নেয়া।

১৫. প্রথমেই খানা দিয়েই আরম্ভ করবে। কেউ কেউ নেমক (লবণ) দ্বারা খানা শুরু এবং শেষ করাকে সুন্নাত বলেছেন, কিন্তু যে হাদীছের ভিত্তিতে তা বলা হয়েছে সে হাদীছটি মাওযূ' বা ভিত্তিহীন। (امداد الفتاوى ج/٤)

১৬. প্রথমে পাত্রের মাঝখান থেকে খানা নিবে না বরং পাশ থেকে নিতে থাকবে, কেননা মাঝখানে বরকত নাযেল হয়।

১৭. খেজুর বা এ জাতীয় খাদ্য যেমন বিস্কুট মিষ্টান্ন একটা একটা করে খাওয়া, এক সঙ্গে একাধিক সংখ্যক করে না খাওয়া।

---

১. বর্তমান যুগে চেয়ার টেবিলে খাওয়ার ব্যাপক প্রচলন ঘটায় এতে (تشبه بالكفار বা) বিধর্মীদের বৈশিষ্ট্যের অনুকরণের বিষয়টি আর অবশিষ্ট থাকেনি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে চেয়ার-টেবিলে খাওয়া নিষিদ্ধ না হলেও যেহেতু চেয়ার টেবিলে খাওয়াতে অনেকগুলো সুন্নাত ও আদব বর্জিত হয়, অতএব তা পরিত্যাজ্য।

২. অর্থাৎ, আল্লাহর নামে আল্লাহর বরকতের উপর খাওয়া শুরু করছি।

৩. অর্থাৎ, আমি এর প্রথমে ও শেষে আল্লাহর নাম নিলাম।

১৮. এক লোকমা গলাধকরণ করার পূর্বে আরেক লোকমা না উঠানো। এতে লোভ প্রকাশ পায়।

১৯. খুব গরম খাবার না খাওয়া।

২০.গরম খাদ্য/পানীয় ফুঁক দিয়ে ঠান্ডা না করা। (مفاتيح الجنان نقلا عن العوارف)

২১. খাদ্য দ্রব্য পড়ে গেলে তা উঠিয়ে (প্রয়োজনে পরিষ্কার করে) খাওয়া সুন্নাত।

২২. খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে কোন দোষক্রটি না লাগানো উচিত।[১]

২৩. খাওয়ার সময় এমন সব কথা বা আচরণ থেকে বিরত থাকা উচিৎ, যাতে অন্যের মনে ভয় বা ঘৃণার উদ্রেক হতে পারে। (شرح شرعة الاسلام)

২৪. খাওয়ার মাঝে অন্য কোন কাজ না করাই খাওয়ার আদব।

২৫. পেটে কিছু ক্ষুধা থাকা অবস্থায়ই খানা শেষ করা উত্তম।

২৬. খাবারের বর্তন, পেয়ালা ইত্যাদি ছাফ করে খাওয়া এবং আঙ্গুল সমূহ ভাল করে চেটে খাওয়া[২] সুন্নাত।

২৭. খানা শেষ হলে এই দুআ পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - (سنن اربعة)

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

২৮. দস্তরখানা উঠানোর পূর্বে সকলে উঠে যাবে যাবে না। এটাই আদব।

২৯. দস্তরখানা উঠানোর দু'আ –

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا -

অর্থ ঃ আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা; এমন প্রশংসা যা অশেষ, পবিত্র ও বরকতময়। হে আমার প্রভূ! এই খাবারকে অপ্রচুর মনে করে বা চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়ে বা এর প্রতি বিমুখ হয়ে উঠলাম না।

৩০. খাওয়ার শেষে উভয় হাত কব্জিসহ ধৌত করা সুন্নাত। সাবান, বেশন ইত্যাদি ব্যবহার করে হাত পরিষ্কার করাতেও ক্ষতি নেই। (الذخيرة)

৩১. খাওয়ার শেষে কুলি করা সুন্নাত।

৩২. দাঁতে খেলাল করা সুন্নাত।

---

১. রান্নার দোষ বলা খাদ্য দ্রব্যের দোষ বলার অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আঙ্গুল চাটার সুন্নাত তারতীব হল– প্রথমে মধ্যমা, তারপর তর্জনী, তারপর বৃদ্ধ। আর খাওয়ার মধ্যে পাঁচ আঙ্গুল ব্যবহৃত হলে তারপর অনামিকা, তারপর কনিষ্ঠ।

(تكملة ج/٤ نقلا عن مجمع الزوائد ج/٣)

৩৩. নবী (সঃ) খাওয়ার শেষে হাত এবং মাথায় ভিজা হাত বুলিয়ে নিতেন। রূমাল ইত্যাদি দ্বারা হাত মুছে নেয়াতেও দোষ নেই। (خزانة المفتيين)

৩৪. খাওয়া শেষে সামান্য কিছু তিলাওয়াত ও যিকির করবে। (كتاب الاذكار)

৩৫. খাওয়া শেষে সাথে সাথে ঘুমাবে না, অন্যথায় অন্তর শক্ত হয়ে যাবে। (كتاب الاذكار)

পাত্র ও বরতনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান

* স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র/বরতন ব্যবহার করা হারাম।

* তামা ও পিতলের পাত্র / বরতন ব্যবহার করা মাকরূহ। তবে নিকেল করা থাকলে মাকরূহ নয়। (امداد الفتاوى ج / ٤)

* স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা ও পিতল ব্যতীত অন্যান্য ধাতুর পাত্র / বরতন ব্যবহার করা জায়েয।

* স্বর্ণ-রৌপ্যের পানি লাগানো পাত্র/বরতন ব্যবহার করা বৈধ। (هداية ج / ٤)

* রৌপ্য দ্বারা জড়োয়া করা বা স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা জোড়ানো ও বাঁধানো পাত্র/বরতন ইত্যাদি ব্যবহার করা ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে বৈধ, যদি ব্যবহারের সময় স্বর্ণ-রৌপ্যে স্পর্শ না লাগে। (هداية رابع)

* পাত্রের ভাঙ্গা স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করবে না।

* পাত্র/বরতন ঢেকে রাখা সুন্নাত, বিশেষভাবে ঘুমানোর পূর্বে।

* বড় পাত্র– যা থেকে এক সাথে অনেক পানি পড়ার সম্ভাবনা বা যার ভেতর দেখা যায় না–এমন পাত্র হলে তাতে মুখ লাগিয়ে পান করবে না বরং তার থেকে অন্য পাত্রে ঢেলে পান করবে।

মজলিসে খানার সুন্নাতও আদব সমূহ

* পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত খানার আমল সমূহ ছাড়াও মজলিসে খাওয়া হলে অতিরিক্ত আরও কয়েকটি আমল রয়েছে, যথা ঃ

* প্রথমে ছোটদেরকে হাত ধোয়ানো তার পর গুরুজনদেরকে হাত ধোয়ানো আদব, যাতে গুরুজনদেরকে ছোটদের অপেক্ষা করতে না হয়।

(مفاتيح الجنان نقلا عن الظهيرية)

* খানা পরিবেশনকারী তার ডান দিক থেকে বাম দিকে পর্যায়ক্রমে খানা পরিবেশন করবে।

* ইল্‌ম, আমল, পরহেযগারী ও বয়সে যারা বড়, তাদের দ্বারা প্রথমে খাওয়া আরম্ভ হওয়া আদব।

* কারও লোকমার দিকে নজর না করা আদব।

* যেখান থেকে খানা বন্টন করা হয় সেখানে নজর না করা আদব। এতে লোভ প্রকাশ পায়।

* নিজের খাওয়া শেষ হলেও উঠে না যাওয়া বরং হাত নাড়া-চাড়া করতে থাকা, যেন অন্য সাথীরা লজ্জায় তৃপ্ত হওয়ার পূর্বেই খানা শেষ করে না বসে।

* অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে এক সাথে খেলে এই দুআ পড়া সুন্নাত –

بِسْمِ اللّٰهِ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ - (ترمذی وابو داؤد)

অর্থঃ আল্লাহর নামে, আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে আরম্ভ করলাম।

মেহমানের করণীয় বিশেষ আমল সমূহ

* কেউ নিঃস্বার্থভাবে দাওয়াত দিলে তা কবূল করবে (এটা সুন্নাত) তবে দাওয়াত দাতার সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ সম্পদ হারাম উপায়ে অর্জিত হলে তার দাওয়াত কবূল করা উচিত নয়।

* সুন্নাতের অনুসরণ ও মুসলমানদের মন খুশি করার নিয়তে দাওয়াত কবুল করতে হবে।

* একই সময়ে একাধিক ব্যক্তি দাওয়াত দিলে যার ঘর অধিক নিকটে তার দাওয়াত কবূল করা সুন্নাত। (گلزار سنت)

* দাওয়াত বা পূর্ব এত্তেলা (Information) ছাড়াই খাওয়ার সময় কারও নিকট মেহমান হিসেবে উপস্থিত হওয়া উচিৎ নয়। একান্তই এরূপ সময় যেতে হলে বাইরে থেকে খেয়ে যাবে, যাতে অসময়ে মেজবানকে খানা পাকানোর/খানার ব্যবস্থা করার বিড়ম্বনা পোহাতে না হয় কিম্বা তাদের খাবার মেহমানকে দিয়ে তাদেরকে অভুক্ত থাকতে না হয়। আর বাইরে থেকে খেয়ে গেলে যেয়েই মেজবানকে তা অবহিত করা আদব, অন্যথায় মেহমানের খানা প্রয়োজন ভেবে মেজবান খাবারের ব্যবস্থা করবে তারপরে দেখা যাবে মেহমানের প্রয়োজন নেই। এতে করে খাবার নষ্ট হবে কিম্বা অন্ততঃ মেজবান বিব্রত বোধ করবেই। (آداب المعاشرت) তবে বিশেষ কারও ব্যাপারে যদি জানা থাকে যে, পূর্ব এত্তেলা ছাড়া মেহমান হলেও তিনি কোনরূপ বিব্রতবোধ করবেন না, তাহলে তার ব্যাপারটা ভিন্ন।

* দাওয়াত দেয়া হয়নি– এমন কাউকে মেহমান সাথে আনবে না। আনলে মেজবানের অনুমতি গ্রহণ করবে। তবে মেজবানের কোনই আপত্তি থাকবে না– এমন বুঝতে পারলে অনুমতির প্রয়োজন নেই।

* মেহমান মেজবান কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে বসবে এবং থাকবে।

* মেহমান মেজবানের অনুমতি বা সম্মতি ব্যতীত কাউকে ডেকে খানায় শরীক করবে না বা কাউকে খানা থেকে কিছু প্রদান করবে না।

* মেহমান খাওয়ার মজলিসে এমন কিছুর আবদার করবে না, যা যোগাড় করা মেজবানের জন্য মুশকিল হতে পারে।

* খাওয়ার ব্যাপারে মেহমানের কোন বাছ-বিচার থাকলে কিম্বা বিশেষ কোন অভ্যাস বা রুটিন থাকলে পূর্বেই তা মেজবানকে অবহিত করা উচিত। দস্তরখানে এসে এরূপ কিছু উত্থাপন করে মেজবানকে বিব্রত করা উচিৎ নয়।

(اسلامی تہذیب)

* কোন বিশেষ অসুবিধা না থাকলে মেজবান কর্তৃক উপস্থিত সব রকম খাবার থেকে কিছু কিছু গ্রহণ করে তাকে খুশি করা উচিত।

* মেহমান মেজবানের নিকট এত বেশী সময় বা এত বেশী দিন অবস্থান করবে না, যাতে মেজবানের কষ্ট, ক্ষতি বা বিরক্তি হতে পারে। এরূপ করা নিষিদ্ধ।

* কারও নিকট দাওয়াত খেলে খানা শেষে এই দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ -

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, যে আমাকে আহার করাল তুমি তাকে আহার করাও এবং যে আমাকে পান করাল তুমি তাকে পান করাও।

* বিদায় গ্রহণের সময় মেজবান থেকে অনুমতি নিয়ে বিদায় নেয়া আদব।

* মেজবানের ঘর থেকে বিদায় নেয়ার সময় মেহমান পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ - (مسلم)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছ তাতে বরকত দাও, তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের উপর রহম কর।

মেজবানের করণীয় বিশেষ আমল সমূহ

* মেহমানকে সাদর অভ্যর্থনার সাথে, সম্মানের সাথে ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবে।

* প্রত্যেক মেহমানকে তার মর্যাদা অনুসারে গ্রহণ করবে এবং সে হিসেবে তার খাতের যত্ন করবে। সকলকে এক পাল্লায় মাপা ঠিক নয়। (اسلامی تہذیب)

* খাওয়ার সময় হয়ে গেলে যথাশীঘ্র মেহমানের সামনে খাবার উপস্থিত করা আদব। (شرح شرعة الاسلام)

* মেজবান মেহমানের সাথে এমন কাউকে খানায় একত্রে বসাবে না, যার মন মানসিকতা, রুচি, মেজায ভিন্ন হওয়ার কারণে মেহমানের খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। (اسلامی تہذیب এর আলোকে)

* মেজবান অতিরিক্ত খাওয়ানোর জন্য মেহমানকে পীড়াপীড়ি করবে না।

* সম্ভব হলে মেহমানের রুচির প্রতি লক্ষ্য রেখে সে অনুযায়ী খাদ্য প্রস্তুত করবে। (اسلامی تہذیب)

* সাধ্য এবং প্রচলন অনুযায়ী মেহমানের জন্য অন্ততঃ একদিন আড়ম্বরের সাথে খাবারের আয়োজন করা সুন্নাত।

* সম্ভব হলে বিদায়ের সময় মেহমানকে কিছু হাদিয়া উপঢৌকন প্রদান করবে।

* বিদায়ের সময় মেহমানকে ঘর থেকে দরজা পর্যন্ত পৌছানো সুন্নাত। (তা'লীমুদ্দীন)

হাদিয়া প্রদান করার আদব-তরীকা

* হাদিয়া শুধু মাত্র কোন মুসলমানের মন জয় করার উদ্দেশ্যে এবং মহব্বত থেকে হতে হবে– অন্য কোন প্রকার দুনিয়াবী বা উখরাবী উদ্দেশ্য থাকবে না।

* হাদিয়া পেশ করার পূর্বে বা পরক্ষণে নিজের কোন মতলবের কথা না বলা আদব, এতে হাদিয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হবে।

* হাদিয়া গোপনে প্রদান করা আদব।

* নগদ অর্থ হাদিয়া দিলে মুসাফাহার সময় দেয়া ঠিক নয়।

* নগদ অর্থ ব্যতীত অন্য কিছু হাদিয়া দিলে এমন বস্তু বা এত পরিমাণ দেয়া ঠিক নয়, যা তার পক্ষে গন্তব্যস্থানে বহন করে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর হবে। এরূপ করতে হলে তার গন্তব্য স্থানে সেটা পৌছে দিয়ে আসবে।

* নগদ অর্থ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু হাদিয়া দিলে যাকে দেয়া হবে তার আগ্রহ কিসের প্রতি তা জেনে সেটা দেয়া উত্তম।

* মোনাছাবাত ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার পর হাদিয়া দিবে, অন্যথায় গ্রহণকারীর পক্ষে সংকোচ শরমের কারণ হতে পারে।

* বুযুর্গদের কাছে যেতে হলে হাদিয়া নিয়েই যেতে হবে– এরূপ বাধ্যবাধকতার পেছনে না পড়া চাই। (آداب المعاشرت)

হাদিয়া গ্রহণ করার নিয়ম-পদ্ধতি

* হাদিয়া গ্রহণ করা সুন্নাত। এই সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়তে হাদিয়া গ্রহণ করবে।

* যার সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ উপার্জন হারাম, তার হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয নয়। আর নির্দিষ্টভাবে যদি জানা থাকে যে, হারাম মাল থেকেই হাদিয়া দেয়া হচ্ছে তাহলেও গ্রহণ করা জায়েয নয়।

* হাদিয়া গ্রহণ করার সাথে সাথে প্রদানকারীর সামনেই সেটা অন্যকে প্রদান করবে না। অন্যথায় হাদিয়া প্রদানকারীর অন্তরে আঘাত লাগবে।

* যে বস্তু হাদিয়া প্রদান করা হল তার মূল্য জিজ্ঞাসা করবে না। এতে বস্তুর মূল্য কম হলে হাদিয়া প্রদানকারী তার হাদিয়াকে তুচ্ছ মনে করা হতে পারে ভেবে সংকোচ বোধ করতে পারেন।

* হাদিয়ার বদলা প্রদান করবে। অন্ততঃ তার জন্য তৎক্ষণাৎ মুখে দুআ করে দিবে। নিম্নোক্ত বাক্যে দুআ করা যায়– بَارَكَ اللّٰهُ فِيكُمْ [১] অথবা جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا [২]

* যার মধ্যে হাদিয়ার বদলা পাওয়ার আগ্রহ আছে বোঝা যায়– এরূপ ব্যক্তির হাদিয়া গ্রহণ করবে না। যেমন প্রচলিত বিবাহ–শাদীতে উপঢৌকনের বেলায় এরূপ বোঝা যায়।

(ماخوذ از آداب المعاشرت وفتاوی رشیدیة)

পোশাক-পরিচ্ছদের সুন্নাত, আদব ও বিধি-নিষেধ সমূহ

পোশাকের কাট-ছাঁট বিষয়ক ঃ

* জামা পায়জামা নেছ্ফে ছাক্ব অর্থাৎ, পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত হওয়া সুন্নাত। টাখনু গিরার উপর পর্যন্ত জায়েয। (مرقاۃ ج/۸ و جمع الفوائد)

* গোল জামা অধিক সতর রক্ষার সহায়ক বিধায় তা উত্তম।

* নবী করীম (সঃ)-এর জামার হাতা হাতের কবজি পর্যন্ত ছিল। (ترمذی) অতএব জামা, শেরওয়ানী ইত্যাদির হাতা কবজি পর্যন্ত হওয়া সুন্নাত।

* পুরুষের জন্য মহিলাদের কাট-ছাঁটের পোশাক পরিধান করা এবং তাদের বেশ ধারণ করা, তদ্রূপ মহিলাদের জন্য পুরুষের কাট-ছাঁটের পোশাক পরিধান করা এবং তাদের বেশ ধারণ করা হারাম ও নিষিদ্ধ। (امداد الفتاوی ج ٤)

* মহিলাদের জন্য শাড়ি পরিধান করা জায়েয। (فتاوی دار العلوم)

---

১. আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বরকত দান করুন।

২. আল্লাহ তোমাকে উত্তম বদলা দান করুন।

* প্রাণীর ছবি যুক্ত কাপড় ব্যবহার করা না জায়েয, ছবি যে কোন ভাবেই তৈরী হোক না কেন। (فتاوی محمودیة ج ۵)

* এত টাইট-ফিট পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ, যাতে শরীরের গোপন অঙ্গ ফুটে ওঠে। (احسن الفتاوی)

* পাগড়ীর পরিমাণের ব্যাপারে হযরত রাসূল (সঃ) কোন বিশেষ নির্দেশ দিয়ে যাননি। প্রত্যেকেই তার অভ্যাস অনুসারে পরিমাণ বেছে নিতে পারেন। রাসূল (সঃ)-এর বার হাত ও সাত হাত দুই রকমের পাগড়ী ছিল বলে জানা যায়। (فتاوی دار العلوم ج: ٤)

* কোট, প্যান্ট, শার্ট বর্তমান যুগে মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সর্বস্তরের কর্মজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের পোশাকে পরিণত হওয়ায় এগুলো ব্যবহার করা না জায়েজ হবে না। যেমন থানবী (রঃ) তার যুগে বলেছেনঃ লন্ডনে কোট, প্যান্ট ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হবেনা, কেননা সেখানে এগুলোর ব্যাপক প্রচলন ঘটায় এখন আর এরকম মনে হয় না যে, এগুলো বিশেষ কোন ভিন্ন ধর্মের লোকদের পোশাক। আর تشبه বা ভিন্ন জাতির অনুকরণইতো এগুলো নিষিদ্ধ হওয়ার ভিত্তি। অতএব ভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে অবশিষ্ট না থাকলে তা নিষিদ্ধও থাকবে না। (فقه حنفی کے اصول وضوابط) তবে এগুলো নেককার পরহেযগার লোকদের পোশাক নয় বিধায় এগুলো ব্যবহার করা অনুত্তম হবে নিঃসন্দেহে।

* বিজাতীয় লেবাস-পোশাক বর্জনীয়।

পোশাকের রং বিষয়ক ঃ

* সাদা রংয়ের কাপড় হযরত রাসূল (সঃ) বেশী পছন্দ করতেন। তাই সাদা রংয়ের পোশাকই সর্বোত্তম পোশাক।

* হযরত রাসূল (সঃ) কাল এবং সবুজ রংয়ের কাপড়ও ব্যবহার করেছেন, তাই সর্বদা শুধু সাদাই নয় বরং নিষিদ্ধ রংগুলো ব্যতীত অন্যান্য রংয়ের কাপড়ও মাঝে মধ্যে ব্যবহার করা মোস্তাহাব। (مفاتیح الجنان نقلا عن شرح النقایة)

* পুরুষের জন্য কুসুম-লাল, হলুদ, জাফরান এবং গোলাব রং নিষিদ্ধ আর নিরেট লাল অনুত্তম। (فتاوی رشیدیة وتعلیم الدین) মহিলাদের জন্য সব রং - এর পোশাক জায়েয।

* পাগড়ী কাল রংয়ের হওয়া মোস্তাহাব।

(حاشیه فتاوی دار العلوم ج / ٤ نقلا عن الدر المختار)

পোশাকের সুতা ও বুনন বিষয়ক ঃ

* পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক ব্যবহার করা বৈধ নয়। তবে যে কাপড়ের দৈর্ঘের সুতা রেশম কিন্তু প্রস্থের সুতা রেশম নয়– সেটা ব্যবহার করা বৈধ। আর মহিলাদের জন্য সব ধরনের রেশমের কাপড় বৈধ। (هداية ج/٤)

* যে কাপড়ে শরীর দেখা যায় এমন পাতলা কাপড় পরিধান করা না করারই হুকুম রাখে।

* হারাম উপায়ে অর্জিত পোশাক বা হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ দ্বারা ক্রয় করা পোশাক পরিধান করা হারাম। (الفقه على المذاهب الاربعة)

উচ্চমান ও নিম্নমানের পোশাক বিষয়ক ঃ

* অহংকার প্রদর্শন বা বিলাসিতার নিয়তে উচ্চমানের পোশাক পরিধান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়।

* তাওয়াযু' বা বিনয়ের উদ্দেশ্যে নিম্নমানের পোশাক, পুরাতন পোশাক কিম্বা ছেড়া ফাটা ও তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করা উত্তম। তবে এরূপ পোশাক দেখে লোকে দরবেশ বা আত্মভোলা বলবে কিম্বা বিনয়ী ও দুনিয়াত্যাগী মনে করবে– এরূপ রিয়া বা লোক দেখানোর নিয়ত থাকলে সেটাও এক প্রকার অহংকার বিধায় তা নিন্দনীয়।

* আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন সেই সম্পদের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো এবং শোকর আদায়ের নিয়তে উত্তম পোশাক পরিধান করা প্রশংসনীয়।

* কাপড় যেমন মানেরই হোক সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা শরীয়তের কাম্য।

পোশাক পরিধানের তরীকা বিষয়ক ঃ

* সতর ঢাকা, শারীরিক দোষ-ত্রুটি ঢাকা ও সৌন্দর্য লাভের নিয়তে পোশাক পরিধান করবে। অহংকারের উদ্দেশ্যে পোশাক পরা হারাম। কামিজ, জামা, কোর্তা, ছদরিয়া ইত্যাদি পরিধান করতে প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাত ঢুকানো সুন্নাত। এমনিভাবে পায়জামা পরিধান করতে প্রথমে ডান পা পরে বাম পা ঢুকানো সুন্নাত এবং খোলার সময় এর বিপরীত বাম দিক থেকে খোলা সুন্নাত। মোজা, জুতা, স্যান্ডেল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এরূপ তরীকা সুন্নাত।

* একই সময়ে জামা ও পায়জামা উভয়টি পরিধান করতে হলে আগে জামা পরে পায়জামা পরিধান করা উত্তম। (فقه الحديث)

* পাগড়ীর নীচে টুপি পরা সুন্নাত। টুপি ব্যতীত শুধু পাগড়ী পরিধান করা সুন্নাতের পরিপন্থী। নামাযের সময় মাথার মাঝখান খোলা রাখা মাকরূহ। (ایضا)

* পাগড়ী গোল করে বাঁধা অথবা শামলা (বর্ধিত অংশ) ছেড়ে বাঁধা উভয় রকমই সুন্নাত। শামলা ডানে বা পেছনের দিকে অথবা একই সাথে উভয় দিকে ছেড়ে দেয়া যায়। বাম দিকে শামলা ছাড়ার প্রমাণ নেই বিধায় উলামায়ে কেরাম সেটাকে বেদআত বলেছেন। শামলা এক বিঘত, এক হাত বা তার চেয়ে বেশী পরিমাণ রাখা যায়। (فتاوی دار العلوم ج ٤ وگلزار سنت)

* পায়জামা বসে পরিধান করা ভাল, অন্যথায় স্বাস্থ্যগত অসুবিধা হতে পারে। (تفسیر عثمانی) লুঙ্গি মাথার উপর দিক থেকে এবং পাগড়ী দাঁড়িয়ে পরিধান করবে।

* পুরুষের জন্য লুঙ্গি, পায়জামা, জামা, জুব্বা, আবা ইত্যাদি অহংকার বশতঃ টাখনু গিরার নীচে ঝুলিয়ে পরা কবীরা গোনাহ। অহংকার বশতঃ না হলেও এরূপ পরা ঠিক নয়। কারণ এতে অহংকার বশতঃ যারা করে তাদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। মহিলাদের জন্য পূরো পা ঢেকে মাটি পর্যন্ত কাপড় ঝুলিয়ে পরা উত্তম।

* নতুন কাপড় পরিধান করার দুআ–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে কাপড় পরিধান করিয়েছেন, যার দ্বারা আমি লজ্জাস্থান আবৃত করি এবং তার দ্বারা জীবনকে সৌন্দর্যমন্ডিত করি।

* পুরাতন কাপড় পরিধান করার দুআ–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ ـ

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এই পোশাক পরিধান করালেন এবং এটা আমার চেষ্টা ও শক্তি ছাড়া নছীবে রাখলেন।

* কাপড় খোলার সময় পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ

উল্লেখ্য যে, কাপড় খোলার সময় বিস্‌মিল্লাহ বলার দরুন শয়তান লজ্জাস্থানের দিকে নজর দিতে পারেনা। (حصن حصین)

* কাপড় খোলার পর আদব হল সেটাকে গুছিয়ে রাখা, এলোমেলো না রাখা।

* নতুন কাপড় পরিবর্তন করলে পুরাতন কাপড় গরীব-মিসকীনকে দিয়ে দেয়া উত্তম।

জুতা/স্যান্ডেল সম্পর্কিত বিধি-বিধান

* পুরুষের জন্য মহিলাদের স্টাইলের জুতা/স্যান্ডেল বা মহিলাদের জন্য পুরুষের স্টাইলের জুতা/স্যান্ডেল পরিধান করা হারাম ও নিষিদ্ধ।

(امداد الفتاوى ج ٤)

* জুতা/স্যান্ডেল পরিধান করার সময় প্রথমে ডান পায়ে পরে বাম পায়ে পরিধান করা এবং খোলার সময় প্রথমে বাম পায়েরটা পরে ডান পায়েরটা খোলা সুন্নাত।

* নতুন জুতা/স্যান্ডেল পরিধান করে এই দুআ পড়তে হয়–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِمَا هُوَ لَهٗ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا هُوَ لَهٗ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে কামনা করি এটার কল্যাণ এবং এর সদুদ্দেশ্য। আর তোমার নিকট পানাহ চাই এটার অনিষ্ঠ ও অসদুদ্দেশ্য থেকে।

* জুতা/স্যান্ডেল খোলার সময় পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ

* জুতা/স্যান্ডেল সম্ভব হলে একাধিক রাখা ভাল। (تعليم الدين)

* জুতা পায়ে দেয়ার সময় হাত লাগানোর দরকার হলে বসে পায়ে দিবে।

(فروع الايمان نقلا عن ابى داؤد)

* কোন মজলিসে বা মসজিদে যে স্থানে কেউ জুতা/স্যান্ডেল রেখেছে সেখান থেকে তার জুতা/স্যান্ডেল সরিয়ে সেখানে নিজের জুতা/স্যান্ডেল রাখবে না, এটা অন্যায়, কেননা সেখানে তার জুতা/স্যান্ডেল না পেয়ে সে পেরেশান হবে। অতএব নিজের জুতা/স্যান্ডেল যেখানে খালি আছে সেখানে বা ভিন্ন স্থানে রাখুন।

* জুতা/স্যান্ডেল এমন ভাবে রাখুন যেন তা উক্ত স্থানকে নাপাক বা গান্ধা ময়লাযুক্ত করে না ফেলে। প্রয়োজনে জুতার অতিরিক্ত আলগা ময়লা বাইরে ঝেড়ে আসুন।

* জুতা/স্যান্ডেল একখানা পায়ে দিয়ে হাটা নিষেধ।

* মাঝে মধ্যে খালি পায়ে চলাতে অসুবিধা নেই, তবে হযরত রাসূল (সঃ) অধিকাংশ সময় জুতা/স্যান্ডেল বা মোজা পরিধান করে চলতেন। (فتاوی رشیدیہ)

আয়না-চিরনির বিধি-বিধান

* আয়না দেখা জায়েয।

* আয়না দিনে রাতে যে কোন সময় দেখা যায়। রাতে আয়না দেখা ঠিক নয়– এরূপ একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে, যার কোন ভিত্তি নেই। (امداد الفتاوی ج ٤)

* চুল পরিপাটি করার জন্য চিরনি করা সুন্নাত, তবে খুব বেশী এর ধান্ধায় না পড়া উচিত।

* চুল আঁচড়ানোর সময় প্রথমে ডান দিক তারপর বাম দিক আঁচড়ানো সুন্নাত।

* চিরনি করার জন্য অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে আয়না দেখার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়তে হয়–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ -

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি যেমন আমার চেহারাকে সুন্দর করেছ, তেমন আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও।

* একই চিরনি দিয়ে একাধিক ব্যক্তির চুল আঁচড়ানোতে কোন অসুবিধা নেই।

তেল, প্রসাধনী ও সাজ গোছের বিধি-বিধান

* হযরত নবী করীম (সঃ) মাথায় তেল ব্যবহার করতেন, তাই তেল ব্যবহার করা সুন্নাত।

* তেল ব্যবহার করার ইচ্ছা করলে বাম হাতের তালুতে তেল নিয়ে প্রথমে ভ্রুর উপর, তারপর চোখে, তারপর মাথায় লাগানো সুন্নাত।

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں)

* মাথায় তেল লাগাতে মুখমণ্ডলের দিক থেকে শুরু করা সুন্নাত। (ایضا)

* ক্রিম, স্নো, পাউডার ব্যবহার করাতে কোন দোষ নেই, যদি এগুলোতে কোন নাপাক বস্তু মিশ্রিত না থাকে। (آپ کے مسائل اور انکا حل ج / ۲)

* নেল পালিশ (নখ পালিশ) প্রভৃতি যা ব্যবহার করলে একটা শক্ত আবরণ সৃষ্টি হয়ে যায়, যার নীচে পানি পৌঁছে না-এরূপ বস্তু সহকারে উযূ গোসল সহীহ হয় না। আর উযূ গোসল সহীহ না হলে নামাযও সহীহ হয় না এবং প্রত্যেক উযূর সময় নেল পালিশ দূর করাও মুশকিল, তাই নেল পালিশ থেকে বিরত থাকাই জরুরী। (ايضا)

* নেল পালিশ ব্যতীত অন্যান্য যেসব মেকআপ ব্যবহার করলে আল্লাহর সৃষ্টি করা গঠনে কোন বিকৃতি ঘটে না, তা ব্যবহার করা জায়েয। (ايضا)

* মহিলাগণ চুলের আলগা খোপা বা আলগা চুল ব্যবহার করতে পারেন, যদি সেটা কৃত্রিম চুলের হয়। আর যদি সেটা মানুষের চুল হয় তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয নয়।

* শরীরে গুদানী দিয়ে কিছু অংকন করা হারাম। (تعليم الدين)

সুরমা, আতর ও সেন্ট ব্যবহারের বিধি-বিধান

* পুরুষ মহিলা সবার জন্য সুরমা ব্যবহার করা সুন্নাত।

* সুরমা বিশেষভাবে রাতের বেলায় শোয়ার পূর্বে লাগানো উত্তম।

* প্রত্যেক চোখে তিনবার করে সুরমা লাগানো সুন্নাত।

* আতর ব্যবহার করা সুন্নাত। তবে যে আতরের খুশবু বাইরে ছড়ায়-এরূপ আতর ব্যবহার করে মহিলাগণ বাইরে যাবেন না।

* সেন্ট এর মধ্যে স্পিরিট ব্যবহার করা হয়, এই স্পিরিট খেজুর, কিশমিশ বা আঙ্গুর থেকে তৈরি করা হলে সেরূপ স্পিরিট নাপাক, অতএব সেরূপ স্পিরিটযুক্ত সেন্টও নাপাক হবে এবং তা ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। তবে আহছানুল ফতোয়া ২য় খন্ডে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তদন্ত করে জানা গেছে বর্তমান যুগের স্পিরিটে এবং এ্যালকোহলে (শরাবে) খেজুর, আঙ্গুর ব্যবহার করা হয়না। অতএব বর্তমানের স্পিরিট নাপাক নয়, ফলে সেন্ট ব্যবহারেও কোন দোষ থাকছে না। (احسن الفتاوى) তবে সন্দেহের ক্ষেত্রে বিরত থাকাই শ্রেয়।

* মাঝে মাঝে আতর লাগানো ভাল। বিশেষভাবে জুমুআর দিন, ঈদের দিন প্রভৃতি সময়।

অলংকারের বিধি-বিধান

* মহিলাদের জন্য কাঁচ বা যে কোন ধাতুর চুড়ি পরিধান করা জায়েয।

(فتاوى رشيدية)

* মহিলাদের কান ফুটানো জায়েয। নাক ফুটানো অধিকাংশের মতে জায়েয, কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। (ايضا)

* মহিলাদের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য পিতল, তামা ইত্যাদি সব রকম ধাতুর সব রকম অলংকার ব্যবহার করা জায়েয। তবে বিধর্মীদের অনুকরণ যেন না হয়। (ايضا)

* যেসব অলংকারে বাজনা হয়, সেগুলো গায়র মাহরাম পুরুষের সামনে পরা জায়েয নয়। (ايضا)

* পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি বা স্বর্ণের অন্য যে কোন অলংকার ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম। তবে সাড়ে চার মাশা অর্থাৎ এক সিকি পরিমাণ (৩.৩৮০ গ্রাম) রূপার আংটি ব্যবহার করা জায়েয। এর অধিক ওজনের রূপার আংটিও ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। অন্যান্য ধাতুর আংটি যেমন তামার আংটি, অষ্ট ধাতুর আংটি ইত্যাদি পুরুষের জন্য নাজায়েয। স্বর্ণ রূপা ব্যতীত অন্যান্য ধাতুর আংটি মহিলাদের জন্য জায়েয তবে মাকরূহ। (فتاوی رحیمیہ ج ٦)

* লোহা, পিতল, তামা, কাঁশা, পাথর ইত্যাদি ধাতুর আংটি ব্যবহার করা পুরুষের জন্য জায়েয নয় অর্থাৎ যখন আংটির হলকা বা বৃত্তটা এসব ধাতু দ্বারা তৈরী হবে। আর বৃত্তটা যদি সিকি পরিমাণ রূপার মধ্যে হয় আর নাগীনা বা মণিটা এসব ধাতুর হয় তাহলে তা জায়েয। (الهداية ج ٤)

মেহেদি ও খেযাব (কলপ) সম্পর্কিত বিধি-বিধান

* নারীদের জন্য হাতে এবং পায়ে মেহেদি লাগানো মোস্তাহাব। কেউ কেউ পায়ে মেহেদি লাগানোকে খারাপ মনে করেন এই যুক্তিতে যে, নবী করীম (সঃ) দাড়িতে মেহেদি লাগাতেন, অতএব তা পায়ে লাগানো বেআদবী– এ যুক্তি ঠিক নয়। নবী কারীম (সঃ) দাড়িতে তেল লাগাতেন তাই বলে কি পায়ে তেল লাগানো বে-আদবী হবে?

* অন্ততঃ হাত পায়ের নখে মেহেদী লাগালেও চলবে।

* পুরুষদের হাতে পায়ে মেহেদি লাগানো নিষেধ। তবে চিকিৎসা হিসেবে লাগানো জায়েয আছে।

* পুরুষের জন্য দাড়ি ও চুলে খেযাব লাগানো মোস্তাহাব। কাল ব্যতীত যে কোন রংয়ের খেযাব (কলপ) লাগানো যায়, তবে মেহেদি দিয়ে লাল রংয়ের খেযাব করা সুন্নাত। চুলের কাল রংয়ের সাথে মিলে যায় এমন কাল রংয়ের কলপ লাগানো মাকরূহ, কারণ এতে মানুষকে নিজের বয়স সম্পর্কে ধোঁকা দেয়া হয়। তবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর মনে ভীতি সৃষ্টির জন্য এরূপ করা প্রশংসনীয়। ইমাম আবূ ইউসুফের মতে স্ত্রীর কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্দেশ্যেও কাল রংয়ের কলপ লাগানো যায়।

(رد المحتار ج ٦، فقه الحديث، جواهر الفقه ج ٢ و تعليم الدين)

ভালবাসা ও বন্ধুত্বের নীতিমালা

* কোন অমুসলিমের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব গড়ে তোলা জায়েয নয়।

* সব মুসলমানের সাথে দ্বীনী বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখতে হবে।

* কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে খালেস আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি হলে তাকে জানিয়ে দিবে যে, আমি আপনাকে মহব্বত করি, ভালবাসি, তাহলে তারও তোমার সাথে মহব্বত সৃষ্টি হবে।

* ভালবাসা ও বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে ভারসাম্যতা বজায় রাখা জরুরী। কাউকে ভালবেসে তার কাছে নিজেকে এতখানি উন্মুক্ত করে দেয়া ঠিক নয়, তার কাছে নিজের গোপনীয়তা এতখানি ফাঁস করে দেয়া ঠিক নয়, যাতে কোন দিন সে শত্রু হয়ে গেলে ক্ষতি করতে সক্ষম হয়।

* মহব্বত (ভালবাসা) ও শাহওয়াত (কাম রিপুর তাড়না) এক কথা নয়। বেগানা নারী ও শ্মশ্রুহীন বালকের প্রতি যে আকর্ষণকে মহব্বত বলে মনে হয়, তা প্রায়শঃ প্রকৃতপক্ষে মহব্বত নয় বরং শাহওয়াত থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এরূপ আকর্ষণ পাপ পথে ধাবিত করে থাকে বিধায় তা পাপ ও গর্হিত।

* ভালবাসার বুনিয়াদ হতে হবে দ্বীনদারী ও পরহেযগারী। অতএব যে যত বেশী দ্বীনদার ও পরহেযগার, তার সাথেই ততবেশী ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। দোস্তী মহব্বত করার আগে তার আমল আখলাক দেখে নিতে হবে।

* স্বার্থের জন্য মহব্বত করা ভাল নয়, মহব্বত করতে হবে নিঃস্বার্থ ভাবে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে।

অমুসলিমদের সাথে কোন্ ধরনের সম্পর্ক রাখতে হবে

* মানুষে মানুষে পারষ্পরিক সম্পর্ক চার ধরনের হতে পারে; এর মধ্যে অমুসলিম তথা কাফেরদের সাথে শর্ত সাপেক্ষে তিন ধরনের সম্পর্ক রাখা যায়। এক ধরনের সম্পর্ক কোন অবস্থাতেই রাখা যায় না। যথাঃ

(১) **বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতার সম্পর্ক ঃ** এ পর্যায়ের সম্পর্ক একমাত্র মুসলমানদের সাথেই হবে। কোন কাফেরের সাথে কোন মুসলমানের বন্ধুত্ব বা আন্তরিকতার সম্পর্ক হতে পারে না।

(২) **সহানুভূতি ও সমবেদনার সম্পর্ক ঃ** এ পর্যায়ের সম্পর্ক অমুসলিমদের সাথেও থাকবে। অমুসলিমদের প্রতিও সহানুভূতি প্রদর্শন করা, সমবেদনা জ্ঞাপন করা এবং তাদের উপকার করার শিক্ষা ইসলাম দিয়েছে। তবে যুদ্ধরত অমুসলিমদের সাথে এ পর্যায়ের সম্পর্ক রাখা জায়েয নয়।

(৩) **সৌজন্য ও আতিথেয়তার সম্পর্ক ঃ** ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে অথবা আত্মরক্ষার স্বার্থে অমুসলিমদের সাথেও এ পর্যায়ের সম্পর্ক রাখা যাবে। অর্থাৎ, যদি অমুসলমানদেরকে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা, ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা, তাদেরকে হেদায়াত করা বা এ ধরনের কোন ধর্মীয় উপকারিতা লাভের উদ্দেশ্যে কিম্বা তাদের অনিষ্ঠ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে বাহ্যিক বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার ও সৌহার্দ মূলক আচরণ করা হয় এবং তাদেরকে আতিথেয়তা করা হয় তবে তা জায়েয। অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাদের সাথে এরূপ সম্পর্ক রাখা জায়েয নয়।

(৪) **লেন-দেনের সম্পর্ক ঃ** অর্থাৎ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকুরী, শিল্প ও কারিগরী ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করা। এ ধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা অমুসলমানদের সাথে জায়েয, তবে এতে যদি মুসলমানদের ক্ষতি হয় তবে জায়েয নয়। এ কারণে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত কাফেরদের হাতে সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। এরূপ মুহূর্তে তাদের সাথে শুধু মাত্র স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি রয়েছে।

(ماخوذ از معارف القرآن وبیان القرآن)

অমুসলিমদের সাথে একত্রে পানাহার এবং তাদের হাতের তৈরী ও তাদের রান্না করা খাদ্য-খাবারের মাসায়েল

* অমুসলিমদের জবেহ করা প্রাণীর গোশত খাওয়া জায়েয নয়। অমুসলিমদের তৈরী ও রান্না করা খাদ্য খাবার, মিষ্টি ইত্যাদি ক্রয় করা এবং খাওয়া জায়েয, যদি বাহ্যিকভাবে তাতে কোন নাপাক বস্তুর মিশ্রণ বোঝা না যায়। তবে মুসলমান ভাইয়ের উপকারের উদ্দেশ্যে মুসলমানের দোকান থেকে ক্রয় করলে উত্তম হবে। (امداد الفتاوی ج/ ۳)

* অমুসলিমদের সাথে একত্রে বসে বা তাদের বরতনে খাওয়া মাকরূহ, তবে ঠেকা বশতঃ হলে জায়েয। আর যদি জানা থাকে যে, তাদের বরতন নাপাক তাহলে জায়েয নয়। (فتاوی محمودیة ج/ ۵)

সুপারিশ সম্পর্কে নীতিমালা

কারও কার্যোদ্ধার করে দেয়ার জন্য যে সুপারিশ করা হয় তার মধ্যে এক প্রকার সুপারিশ হল বৈধ ও ভাল সুপারিশ। এরূপ সুপারিশ করলে ছওয়াব লাভ হয়। যে কার্য উদ্ধারের জন্য সুপারিশ করা হবে উক্ত কার্য যে করবে সে যে পরিমাণ ছওয়াব লাভ করবে, সুপারিশকারী ব্যক্তিও সে পরিমাণ ছওয়াব লাভ করবে; চাই তার সুপারিশ কার্যকরী ও সফল হোক বা না হোক। আর এক

প্রকার হল অবৈধ ও মন্দ সুপারিশ। এরূপ সুপারিশ করলে পাপ হয়। যে অবৈধ কার্যের জন্য সুপারিশ করা হবে সে কাজ করলে যে পাপ হবে অবৈধ সুপারিশেও সে পরিমাণ পাপ হবে।

বৈধ ও ভাল সুপারিশের জন্য শর্ত হলঃ

(১) যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে তার দাবী সত্য ও বৈধ হতে হবে।

(২) যার নিকট সুপারিশ করা হবে, সুপারিশকারী তার উপর নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি খাটিয়ে চাপ ও জবরদস্তী প্রয়োগ করতে পারবে না। সারকথা– বৈধ বিষয়ের জন্য বৈধ পন্থায় সুপারিশ করা হল ভাল সুপারিশ।

সুপারিশ মন্দ এবং অবৈধ হয়ে যায় নিম্নোক্ত কারণেঃ

(১) কোন অবৈধ এবং অসত্য দাবী আদায়ের জন্য সুপারিশ করলে।

(২) সুপারিশের পন্থা অবৈধ হলে। সুপারিশকারী ব্যক্তি যদি নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি ও পদবলের ভিত্তিতে যার নিকট সুপারিশ করা হবে তার উপর চাপ সৃষ্টি করে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে, যার ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে কাজ করতে বাধ্য হতে হয়, তাহলে এরূপ পন্থায় সুপারিশ করা হল অবৈধ পন্থায় সুপারিশ। এভাবে কার্যোদ্ধার করা হারাম।

(ما خوذ از آداب المعاشرت ومعارف القرآن)

শোয়া এবং ঘুমের সুন্নাত, আদব ও বিধি-নিষেধ সমূহ

১. ইশার নামাযের পর গল্প-গুজব বা দুনিয়াবী কাজ-কর্ম কিম্বা দুনিয়াবী কথা-বার্তায় লিপ্ত না হয়ে যথাশ্রীঘ্র সম্ভব ঘুমানোর প্রস্তুতি নেয়া সুন্নাত। এ সুন্নাত পালন করলে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য ওঠা সহজ হয় কিম্বা অন্ততঃ ফজরের নামাযের জন্য সহজেই ঘুম ভাঙ্গে। ইশার পর ঘুমানোর পূর্বে অপ্রয়োজনীয় দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলা মাকরূহ।

২. ঘুম পড়ার পূর্বে পেশাব-পায়খানার জরুরত থেকে ফারেগ হয়ে নেয়া উত্তম।

৩. ঘুমানোর পূর্বে চেরাগ/বাতি ও আগুন নিভিয়ে দেয়া সুন্নাত। বিশেষ প্রয়োজন না হলে ডিম লাইটও জ্বালিয়ে ঘুমানো ঠিক নয়। (گلزار سنت)

৪. ঘুমানোর পূর্বে খাদ্য-খাবার ও পানির পাত্র ঢেকে দেয়া সুন্নাত। ঢাকার জন্য কোন পাত্র না পেলে অন্ততঃ একটা লাঠি দিয়ে হলেও ঢেকে রাখবে।

৫. মেসওয়াক করে ঘুমানো সুন্নাত।

৬. উযূ অবস্থায় ঘুমানো সুন্নাত।

৭. উভয় চোখে তিনবার করে সুরমা লাগানো সুন্নাত।

৮. পূর্বে থেকেই বিছানো রয়েছে (যাতে ধুলা-বালি থাকার সম্ভাবনা) এমন বিছানা হলে তিনবার সে বিছানা ঝেড়ে নেয়া সুন্নাত।

৯. শোয়ার আগে কাপড় পাল্টানো সুন্নাত। (যাদুল মা'আদ)

১০. খুব বেশী নরম বিছানায় না ঘুমানো উত্তম।

১১. দরজার চৌকাঠের উপর কিম্বা যে ছাদে রেলিং বা ঘেরা নেই তাতে শোয়া নিষেধ।

১২. সূরা-আলিফ লাম মীম সাজদা (২১ পারা) তিলাওয়াত করা সুন্নাত।

১৩. সূরা-মুল্‌ক তিলাওয়াত করা সুন্নাত।

১৪. আয়াতুল কুরছী পাঠ করা সুন্নাত।

১৫. সূরা-বাকারার শেষ তিন আয়াত (آمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে শেষ পর্যন্ত) পাঠ করা সুন্নাত।

১৬. তাসবীহে ফাতেমী অর্থাৎ, ৩৩ বার সোবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বা ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়া সুন্নাত।

১৭. কালেমায়ে তইয়্যেবা পড়া সুন্নাত।

১৮. দুরূদ শরীফ পড়া সুন্নাত।

১৯. তিনকুল (সূরা-এখলাস, ফালাক ও নাছ) পড়ে হাতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীরে বুলানো। এভাবে তিনবার করা সুন্নাত।

২০. সূরা-কাফিরূন পড়া সুন্নাত। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

২১. তিনবার এস্তেগফার পড়া এবং গোনাহ থেকে তওবা করা।

২২. ঘুমানোর পূর্বে ওছীয়তের প্রয়োজন থাকলে তা করা।

২৩. মুর্দার মাথা কবরে যে দিকে রাখা হয় সে দিকে মাথা রেখে শোয়া (যেমন আমাদের দেশের জন্য উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শোয়া) সুন্নাত।

২৪. প্রথমে অন্ততঃ কিছুক্ষণ ডান হাত ডান গালের নীচে রেখে ডান কাতে শোয়া সুন্নাত। (ابو داؤد)

২৫. ডান হাত গালের নীচে রেখে এই দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ قِنِیْ عَذَابَكَ یَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ۔

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, যেদিন তোমার বান্দাদেরকে তুমি পুনরুত্থিত করবে, সেদিন তোমার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা কর।

২৬. এই দুআ পড়ে শোয়া সুন্নাত–

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমারই নামে বাঁচি ও মরি।

অথবা

بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ ـ (بخارى ومسلم)

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমার নামে আমার পার্শ্বদেশ রাখলাম এবং তোমার কুদরতে আবার তা উঠাব। আর এ অবস্থায় যদি আমার আত্মাকে ধরে রাখ (অর্থাৎ, মৃত্যু ঘটাও), তাহলে আত্মার মাগফেরাত করো। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ, জীবিত রাখ), তাহলে তার তত্ত্বাবধান করো যেভাবে তোমার নেক বান্দাদের ক্ষেত্রে তুমি তার তত্ত্বাবধান করে থাকো।

২৭. সর্বশেষে এই দুআ পড়বে। তাহলে ঐ ঘুমে মৃত্যু হলে ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجٰى مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ ـ (بخارى)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি আমার আত্মাকে তোমার কাছে সোপর্দ করলাম, আমার মনোযোগ তোমার প্রতি নিবদ্ধ করলাম, আমার বিষয় তোমার উপর ন্যাস্ত করলাম এবং তোমার প্রতি আগ্রহ ও তোমার ভয় সহকারে আমার পৃষ্ঠদেশ তোমার আশ্রয়ে রাখলাম, তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়ের স্থান নেই, কোন পরিত্রাণ লাভের জায়গা নেই। আমি ঈমান আনলাম তোমার কিতাবের প্রতি, যা তুমি নাযেল করেছ; আর তোমার নবীর প্রতি, যাকে তুমি রাসূল রূপে প্রেরণ করেছ।

২৮. উপুড় হয়ে শোয়া নিষেধ। (تعليم الدين)

২৯. এক পা খাড়া করে তার উপর অপর পা রেখে চিত হয়ে এমন ভাবে শয়ন করবে না, যাতে সতর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সতর না খুললে ক্ষতি নেই। (تعليم الدين)

৩০. যিকির করতে করতে ঘুমানো উত্তম।

৩১.শোয়ার পর ঘুম না আসলে পড়বে–

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ .

অর্থ ঃ আল্লাহর সমস্ত কালামের ওছীলা দিয়ে আমি তাঁর ক্রোধ, তাঁর শাস্তি, তাঁর বান্দাদের অনিষ্টকারিতা, শয়তানদের উস্কানী এবং আমার কাছে তাদের হাজির হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অথবা

اَللّٰهُمَّ غَارَتِ النُّجُوْمُ وَهَدَأَتِ الْعُيُوْنُ اَنْتَ حَيٌّ قَيُّوْمٌ لَا تَاْخُذُكَ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اَهْدِئْ لَيْلِيْ وَاَنِمْ عَيْنِيْ . (تنبيه الغافلين)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নক্ষত্র দূরে চলে গিয়েছে, চোখগুলো আরাম লাভ করেছে, আর তুমি চিরঞ্জীব, স্বপ্রতিষ্ঠ ও সবকিছু সংরক্ষণকারী, তোমাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। হে চিরঞ্জীব, হে আত্মপ্রতিষ্ঠ সংরক্ষণকারী! এই রাতে আমাকে আরাম দাও, আমার চোখে ঘুম দাও।

৩২. ঘুম থেকে উঠে হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় হালকাভাবে মর্দন করবে, যাতে ঘুমের প্রভাব কেটে যায়।

৩৩. ঘুম থেকে উঠে তিনবার আলহামদু লিল্লাহ বলা সুন্নাত।

৩৪. ঘুম থেকে উঠে তিনবার কালেমায়ে তইয়্যেবা পড়া সুন্নাত।

৩৫. ঘুম থেকে উঠে এই দুআ পড়া সুন্নাত–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ .

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (অর্থাৎ, নিদ্রা) দানের পর আবার জীবিত (অর্থাৎ, জাগ্রত) করেছেন এবং তাঁর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

তাহাজ্জুদের জন্য উঠলে এই দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَّالنَّارُ حَقٌّ وَّالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَّمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ ـ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ ـ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ (بخارى ومسلم)

তাহাজ্জুদের জন্য উঠলে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহও পাঠ করবে–

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ـ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ـ رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ـ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

৩৬. ঘুম থেকে উঠে মেসওয়াক করা সুন্নাত।

৩৭. ঘুম থেকে উঠে উযূ করা উত্তম।

৩৮. এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো নিষেধ। তবে একান্ত অসুবিধা বশতঃ ঘুমাতে হলে এশার নামাযের জন্য জাগ্রত করার লোক নির্ধারিত করে নিয়ে ঘুমানো যেতে পারে।

৩৯. আসরের পরও ঘুমাবে না। (مرقعة الاسلام)

৪০. সুযোগ হলে দুপুরে খাওয়ার পর কায়লূলাহ করা অর্থাৎ, কিছুক্ষণ শুয়ে থাকা সুন্নাত, ঘুম আসুক বা না আসুক।

৪১. এক কাপড়ের (এক কাথা বা এক লেপের) নীচে দুইজন পুরুষ বা দুইজন মেয়ে লোক শয়ন করা বড়ই খারাপ এবং লজ্জার কথা। (تعليم الدين)

স্বপ্ন বিষয়ক বিধি-নিষেধ সমূহ

* পছন্দ মত খাব (স্বপ্ন) দেখলে এবং তা বর্ণনা করতে চাইলে মহব্বত রাখে– এমন লোকের নিকট বা কোন আলেমের নিকট বর্ণনা করা সুন্নাত।

* দিনের শুরু ভাগে দুনিয়ার ঝামেলায় মশগুল হওয়ার পূর্বে রাতের স্বপ্ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা জেনে নিতে পারলে উত্তম। (مفاتيح الجنان نقلا عن شرح المصابيح)

* কোন দুঃস্বপ্ন অর্থাৎ, অপছন্দনীয় বা ভয়-ভীতির খাব দেখলে ৫টা আমল করবে, তাহলে কোন ক্ষতি হবে না ইনশাআল্লাহ।

(১) স্বপ্ন দেখে চক্ষু খোলার সাথে সাথে তিনবার বাম দিকে থুথু ফেলবে।

(২) তিনবার أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَشَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا[১] (আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম ওয়া শার্‌রি হাযিহির রুইয়া) পড়বে।

(৩) পার্শ্ব পরিবর্তন করে শোবে।

(৪) এই স্বপ্নের অপকারিতা থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الرُّؤْيَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا ـ

---

১. অর্থাৎ, বিতাড়িত শয়তান হতে এবং এই স্বপ্নের অপকারিতা হতে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে এই স্বপ্ন এবং এর অন্তর্নিহিত যা কিছু রয়েছে তার মঙ্গলটা কামনা করি। আর এই স্বপ্ন ও তার মধ্যকার অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।

(৫) এরূপ দুঃস্বপ্ন কারও নিকট বর্ণনা করবে না।

* কেউ স্বপ্ন বর্ণনা করলে ব্যাখ্যা ভাল মনে হলে তাই বলবে, নতুবা শ্রবণকারী ও ব্যাখ্যাদাতা উভয়েই বলবে خَيْرًا رَأَيْتَ وَخَيْرًا يَكُوْنُ অর্থাৎ, ভাল দেখেছেন, ভালই হবে। (كتاب الاذكار)

সহবাসের সুন্নাত, আদব ও বিধি-নিষেধ সমূহ

১. সঙ্গম শুরু করার পূর্বে নিয়ত সহীহ করে নেয়া; অর্থাৎ এই নিয়ত করা যে, এই হালাল পন্থায় যৌন চাহিদা পূর্ণ করা দ্বারা হারামে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, তৃপ্তি লাভ হবে এবং তার দ্বারা কষ্ট সহিষ্ণু হওয়া যাবে, ছওয়াব হাছেল হবে এবং সন্তান লাভ হবে।
২. কোন শিশু বা পশুর সামনে সংগমে রত না হওয়া।
৩. পর্দা ঘেরা স্থানে সংগম করা।
৪. সংগম শুরু করার পূর্বে শৃঙ্গার (চুম্বন, স্তন মর্দন ইত্যাদি) করবে।
৫. বীর্য, যৌনাঙ্গের রস ইত্যাদি মোছার জন্য এক টুকরা কাপড় রাখা।
৬. বিসমিল্লাহ বলে কার্য শুরু করা।
৭. শয়তান থেকে পানাহ চাওয়া।
উভয়টিকে একত্রে এভাবে বলা।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ـ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নাম নিয়ে এই কাজ আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ, শয়তানকে আমাদের থেকে দূরে রাখ এবং যে সন্তান তুমি আমাদেরকে দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ।

৮. সংগম অবস্থায় বেশী কথা না বলা। (شرعة الاسلام)

৯. সঙ্গম অবস্থায় স্ত্রী-যোনীর দিকে নজর না দেয়া।[1] (شرح النقاية)

১০. বীর্য পাতের সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتَنِي نَصِيبًا ـ

১. ইবনে উমর (রাঃ) সংগম অবস্থায় স্ত্রী-যোনীর দিকে দৃষ্টি দেয়া উত্তেজনা বৃদ্ধির সহায়ক বিধায় এটাকে উত্তম বলতেন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, যে সন্তান তুমি আমাদেরকে দান করবে তার মধ্যে শয়তানের কোন অংশ রেখনা।

১১. বীর্যের প্রতি দীর্ঘ দৃষ্টি না দেয়া।

১২. বীর্যপাতের পরই স্বামীর নেমে না যাওয়া বরং স্ত্রীর উপর অপেক্ষা করা, যেন সেও তার খাহেশ পূর্ণ মাত্রায় মিটিয়ে নিতে পারে। (مجمع زوائد)

১৩. সংগম শেষে পেশাব করে নেয়া জরুরী। (شرعة الاسلام)

১৪. সঙ্গমের পর সাথে সাথে গোসল করে নেয়া উত্তম। অন্ততঃ উযূ করে নেয়া।

১৫. স্বপ্নদোষের পর সংগম করতে হলে পেশাব করে নিবে এবং যৌনাঙ্গ ধুয়ে নিবে।

১৬. এক সংগমের পর পুনর্বার সঙ্গমে লিপ্ত হতে চাইলে যৌনাঙ্গ এবং হাত ধুয়ে নিতে হবে।

১৭. সংগমের পর অন্ততঃ কিছুক্ষণ ঘুমানো উত্তম।

১৮. জুমুআর দিন সঙ্গম করা মোস্তাহাব।

১৯. সংগমের বিষয় কারও নিকট প্রকাশ করা নিষেধ।

হায়েয নেফাস অবস্থার বিধি-নিষেধ সমূহ

* হায়েয নেফাস অবস্থায় যৌন সংগম থেকে বিরত থাকা ফরয এবং যৌন সংগমে লিপ্ত হওয়া হারাম।

* হায়েয অবস্থায় স্বামীর সঙ্গে একত্রে শয়ন ও একত্রে পানাহার অব্যাহত রাখা সুন্নাত। (এতে মাজূসী বা অগ্নি পূজারকদের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়)

* পুরাতন আকর্ষণহীন কাপড়-চোপড় পরিহিত থাকবে, যাতে তাকে দেখলে স্বামীর উত্তেজনা হ্রাস পায়, বৃদ্ধি না ঘটে।

* নামায পড়বে না।

* নামাযের সময়ে উযূ করে নামাযের স্থানে নামায আদায় পরিমাণ সময় বসে থেকে সুবহানাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে থাকবে, যেন ইবাদতের অভ্যাস বজায় থাকে। এটা মোস্তাহাব। (سراجية)

* হায়েযা মহিলা প্রতি নামাযের ওয়াক্তে সত্তর বার এস্তেগফার পাঠ করবে।[১]

---

১. এতে এক হাজার রাকআত নামাযের ছওয়াব হবে, সত্তরটা গোনাহ মাফ হবে এবং দরজা বুলন্দ হবে ইত্যাদি (مظاہر حق)

জানাবাত (বে-গোসল) অবস্থার বিশেষ বিধি-নিষেধ সমূহ

* জানাবাত অবস্থায় নখ, চুল কাটা বা নাভির নীচের হাজামত (ক্ষৌরকার্য) বানানো মাকরূহ। (عالمگیری)

* জানাবাত অবস্থায় মসজিদে গমন করা, কাবা শরীফ তওয়াফ করা, কুরআন শরীফ স্পর্শ করা বা তিলাওয়াত করা এবং নামায পড়া নিষেধ। তবে দুআ হিসেবে কোন আয়াত পড়তে পারে।

* জানাবাত অবস্থায় কালেমা, দুরূদ শরীফ, যিকির, এস্তেগফার বা কোন ওযীফা পাঠ করতে নিষেধ নেই।

* জানাবাত অবস্থায় কুলি করা ব্যতীত পানি পান করা মাকরূহ তানযীহী।

* জানাবাত অবস্থায় হাত ধোয়ার পূর্বে কিছু পানাহার করা মাকরূহ তানযীহী। (احسن الفتاوی ج ۲)

ঘরে প্রবেশের ওয়াজিব, সুন্নাত ও আদব সমূহ

(১) ঘরে প্রবেশের পূর্বে ঘরবাসীর অনুমতি গ্রহণ করা ওয়াজিব। এমন কি পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও পুত্র-কন্যার ঘর হলেও অনুমতি গ্রহণ করা জরুরী। একমাত্র যে ঘরে শুধু মাত্র প্রবেশকারীর স্ত্রী বা স্বামী থাকে সেখানে উক্ত প্রবেশকারীর জন্য অনুমতি গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়, তবে সেখানেও কাশি দিয়ে, জুতার শব্দ করে বা যে কোন ভাবে সাড়া দিয়ে প্রবেশ করা মোস্তাহাব ও উত্তম। আবার স্ত্রীর সাথে অন্য কেউ রয়েছে বলে নিশ্চিত জানা থাকলে বা তার প্রবল ধারণা হলেও অনুমতি গ্রহণ করা জরুরী।

* দোকান-পাট, কোর্ট-কাচারি, অফিস-আদালত, হোটেল, পার্ক ইত্যাদি যেসব স্থানে গণমানুষের প্রবেশ করার সাধারণ অনুমতি থাকে, সেখানে প্রবেশের জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই। তবে যেসব অফিস দপ্তর প্রাইভেট, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যদেরকে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

* **অনুমতি গ্রহণের সুন্নাত-তরীকা হল ঃ** দরজার বাইরে থেকে সালাম দিবে কিম্বা সালাম দিয়ে বলবে আসতে পারি? ভিতর থেকে সাড়া না পেলে আবার সালাম দিবে। এভাবে তিনবার করবে। তারপরও যদি ভিতর থেকে কোন সাড়া না আসে, তাহলে সেখান থেকে চলে আসবে। উল্লেখ্য যে, এই সালামকে বলা হয় 'সালামে ইস্তিযান' বা অনুমতি গ্রহণের সালাম। এই সালামের উত্তর ওয়ালাইকুমুস সালাম .... নয় বরং এর উত্তর হল প্রবেশের অনুমতি দেয়া বা না দেয়া। প্রবেশের অনুমতি দিলে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার সময় স্বাভাবিক সালাম জওয়াব আদান-প্রদান করতে হবে।

* অনুমতি চাওয়ার জন্য দরজায় করাঘাত করা, কড়া নাড়ানো কিম্বা বর্তমানে প্রচলিত কলিং বেল বাজানো, ভিজিটিং কার্ড বা আইডেন্টিটি কার্ড প্রেরণ পূর্বক অনুমতি চাওয়া-এগুলো দ্বারাও অনুমতি চাওয়ার হুকুম আদায় হয়ে যাবে।

* অনুমতি চেয়ে এমন স্থানে দাঁড়াবে, যাতে গায়র মাহরাম কেউ দরজা/জানালা খুললে বা পর্দা সরালে নজরে না পড়ে কিম্বা কোনভাবে গোপন কিছু নজরে না আসে।

* ভিতর থেকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় কে? তাহলে এরূপ বলবে না যে, "আমি" বরং পরিষ্কার নিজের নাম বলবে যে, আমি ওমুক বরং প্রয়োজনে নিজের পরিচয়ও বলবে।

(২) 'বিসমিল্লাহ' বলে ঘরে প্রবেশ করা সুন্নাত।

(৩) ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে।

(৪) প্রবেশকালে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا - (ابو داؤد)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি গৃহে প্রবেশ করতে এবং বের হতে তোমার কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করি। আমি আল্লাহর নাম নিয়ে গৃহে প্রবেশ করি এবং আল্লাহর নাম নিয়ে গৃহ থেকে বের হই। আর আল্লাহর উপরই ভরসা রাখি।

(৫) ঘরবাসীকে সালাম দিবে।

(৬) ঘরে কোন লোক না থাকলে এই বলে সালাম দিবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ[১] (মাআরেফুল কুরআন)

(৭) কেউ ঘুমন্ত এবং কেউ জাগ্রত থাকলে জাগ্রতদেরকে এমনভাবে সালাম দিবে যেন ঘুমন্তদের ঘুমের ব্যাঘাত না হয়।

(৮) ঘরের দরজা বন্ধ করতে হলে বিসমিল্লাহ বলে বন্ধ করবে।

(৯) তারপর আয়াতুল কুরছী পাঠ করবে। (شرعة الاسلام)

(معارف القرآن ও شرعة الاسلام، مسائل وآداب ملاقات প্রভৃতি থেকে গৃহীত)

---

১. অর্থঃ হে গৃহবাসী, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

ঘর থেকে বের হওয়ার সুন্নাত ও আদব সমূহ

১. বিসমিল্লাহ বলে দরজা খুলবে।

২. নিম্নোক্ত দুআ পড়বে−

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ
(ابو داؤد)

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নাম নিয়ে বের হলাম। আল্লাহরই উপর ভরসা করল্যাম। শক্তি সামর্থ কেবল আল্লাহর কাছ থেকেই আসে।

৩. ডান পা দিয়ে বের হবে। (যদি নেক কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়)

৪. সব রকম ভুলভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে মুক্তি চাওয়া বিষয়ক নিম্নোক্ত দুআ পড়বে−

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ - (ابو داؤد)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি নিজে বা অন্য কর্তৃক বিভ্রান্ত হওয়া, নিজে বা অন্য কর্তৃক বিচ্যুত হওয়া, জালেম হওয়া বা মাজলূম হওয়া, নাদানী করা বা নাদানীর স্বীকার হওয়া (এই সবকিছু) থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।

৫. বের হয়ে আয়াতুল কুরছী পড়বে। (شرعة الاسلام)

* মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলে আরও বিশেষ কয়েকটি আমল রয়েছে। (দ্রষ্টব্য ১৩৬ পৃষ্ঠা)

চলার সুন্নাত ও আদব সমূহ

* বড় রাস্তা হলে ডান দিক দিয়ে চলবে।

* দৃষ্টি নত করে চলবে।

* কিছুটা সম্মুখ পানে ঝুঁকে চলবে। নবী (সঃ) এরূপ চলতেন।

* হাত পা ছুড়ে ছুড়ে অহংকারের সাথে চলবে না।

* রাস্তা অতিক্রম করার সময় যথা সম্ভব দ্রুত চলবে।

* নারীদের জন্য রাস্তার কিনারা ছেড়ে দিবে।

* প্রয়োজনে চলার পথে কোথাও থামতে এবং অবস্থান করতে হলে এমন জায়গায় অবস্থান করবে, যাতে অন্যদের চলা ফেরা ইত্যাদির ব্যাঘাত না ঘটে।

* পথে কষ্টদায়ক কিছু পেলে তা সরিয়ে দিবে।

* মুসলমানদেরকে সালাম দিবে এবং তাদের সালামের উত্তর দিবে।

* প্রয়োজন ও সুযোগ অনুসারে আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার করবে।

* কোন অন্ধকে দেখলে প্রয়োজনে (ডান হাত দিয়ে তার বাম হাত ধরে) তাকে যতটুকু সে চায় এগিয়ে দিবে।

* পথ হারাকে পথের সন্ধান বলে দিবে। তবে কোন কাফেরকে তাদের উপাশনালয়ের সন্ধান বলে দিবে না।

* নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হলেও তার জন্য লোকদেরকে পথ থেকে ধাক্কা দেয়া বা সরানো হবে না। নবী (সঃ) এর জন্য এরূপ করা হতনা।

* বৃদ্ধ লোকদের জন্য চলার সময় লাঠি নেয়া সুন্নাত।

* উপর দিকে উঠার সময় ডান পা আগে বাড়ানো এবং 'আল্লাহু আকবার' বলা সুন্নাত।

* নীচের দিকে নামার সময় বাম পা আগে বাড়ানো এবং সোবহানাল্লাহ বলা সুন্নাত।

* সমতল স্থান দিয়ে চলার সময় 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সুন্নাত।

* ইয়াহূদী নাছারাদেরকে দেখলে তাদের জন্য পথ সংকুচিত করে দিবে−প্রশস্ত করে দিবে না; যাতে তাদের সম্মান প্রকাশ না পায়।

* যাদের বয়স এবং ইল্‌ম বেশী, তাঁদেরকে সামনে চলার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া আদব। উল্লেখ্য, বয়স এবং ইল্‌ম− এ দুটোর মধ্যে ইল্‌ম অধিক মর্যাদার হকদার, অতএব অধিক বয়সী ব্যক্তি অধিক ইল্‌মের অধিকারীকে (যদিও তার বয়স কম হয়) সামনে চলার জন্য অগ্রাধিকার দিবেন।

যানবাহনের সুন্নাত, আদব ও আমল সমূহ

* বিসমিল্লাহ বলে যানবাহনে আরোহণ করা সুন্নাত।

* প্রথমে ডান পা যানবাহনে রাখা সুন্নাত। বিসমিল্লাহ বলতে বলতে পা রাখবে।

* ভালভাবে আসন গ্রহণের পর আলহামদু লিল্লাহ বলবে।

* তারপর (যানবাহন চলতে শুরু করলে) নিম্নোক্ত দুআ পড়া সুন্নাত−

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

অর্থ ঃ পবিত্র ঐই আল্লাহ, যিনি একে আমাদের আয়ত্বাধীন করে দিয়েছেন, অথচ একে আমরা নিজেদের অধীন করতে পারতাম না। আর নিশ্চয় আমরা আপন প্রভূর কাছে ফিরে যাব।

* তারপর তিনবার "আলহামদু লিল্লাহ" বলবে।

* তারপর তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলবে।

* তারপর নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

سُبْحَانَكَ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, আমিতো আমার নিজের উপর অবিচার করেছি, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা, তুমি ছাড়া আর কেউ পাপরাশি ক্ষমা করার নেই।

বিঃ দ্রঃ নবী (সঃ) এই দুআটি পড়ে মুচকি হেসেছিলেন এবং কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা বান্দার এরূপ দুআ করায় খুশি হয়ে বলেন, আমার বান্দা জানে যে, আমি ছাড়া গোনাহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। উল্লেখ্য, দুআটির মধ্যে এই বলা হয়েছে যে, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, অবশ্যই তুমি ব্যতীত আর কেউ ক্ষমা করার নেই।

* নৌকা, জাহাজ, পুল ইত্যাদিতে চড়লে পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسٰهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

অর্থ ঃ আল্লাহর নামেই এর চলা ও থামা। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

* গাড়ীর মালিককে গাড়ীর সামনে এবং সওয়ারীর মালিককে সওয়ারীর সামনে বসতে দিবে, এটা তার হক। অবশ্য মালিক কাউকে সামনে বসার অনুরোধ করলে তিনি সামনে বসতে পারেন।

সফরে যাওয়ার সুন্নাত, আদব ও বিধি-নিষেধ সমূহ

* নবী কারীম (সঃ) বৃহস্পতিবার সফরে যাওয়াকে অধিক পছন্দ করতেন। সোমবার সফর করাও সুন্নাত। (مفاتيح الجنان نقلا عن المصابيح) এ ছাড়া যে কোন দিন সফর করা যায়। ইসলামে অমুক অমুক দিন বা অমুক অমুক সময় যাত্রা নাস্তি– এরূপ কোন ধারণা নেই।

* সফরের ইচ্ছা হলে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصُوْلُ وَبِكَ أَحُوْلُ وَبِكَ أَسِيْرُ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তোমার সাহায্যেই আমি (শত্রুর উপর) আক্রমণ করি, তোমার সাহায্যেই তাদের প্রতিরোধের চেষ্টা করি এবং তোমার সাহায্যেই সফর করি।

* যথা সম্ভব একাধিক ব্যক্তি সফরে যাওয়া উত্তম; একাকী সফরে না যাওয়া উচিত। কমপক্ষে তিনজনে সফর করার প্রতি নবী করীম (সঃ) উৎসাহিত করেছেন ([illegible]) চারজন হওয়া খুবই ভাল। ([illegible])

* তিনজনের (বা আরও অধিক হলে তাদের) মধ্যে এক জনকে আমীর বানিয়ে নিবে। (ابو داؤد)

* সফরে কুকুর এবং ঘন্টা সাথে রাখা নিষেধ। (مسلم)

* রওয়ানা হওয়ার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى ـ اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ لَنَا بُعْدَهٗ ـ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْحَوْرِ وَالْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ ـ (مشكوة)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, এই সফরে তোমার কাছে আমি নেকী ও পরহেযগারীর প্রার্থনা করি এবং ঐসব কাজের তাওফীক চাই যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। হে আল্লাহ, আমার এই সফর সহজ কর এবং ভ্রমণ পথের দূরত্ব কমিয়ে দাও (অর্থাৎ, সহজে অতিক্রম করিয়ে দাও)। হে আল্লাহ, তুমিই আমার সফরের সাথী এবং আমার অবর্তমানে আমার পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক। হে আল্লাহ, সফরের যাবতীয় কষ্ট-ক্লেশ থেকে তোমার কাছে পরিত্রাণ চাই এবং পানাহ চাই এই সফরের সমস্ত কুদৃশ্য হতে, ঘরে প্রত্যাবর্তন করে মাল ও পরিবারের দুরাবস্থা দর্শন হতে। আর তোমার কাছে পানাহ চাই গঠিত হওয়ার পর ভাঙ্গন হতে এবং মাজলূমের বদ-দুআ হতে।

* সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় দুই বা চার রাকআত নফল নামায পড়ে নেয়া উত্তম। (شرعة الاسلام)

* রওয়ানা হওয়ার সময় এই বলে পরিবার থেকে বিদায় নেয়া সুন্নাত–

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا يَضِيْعُ وَدَائِعُهُ ـ (شرعة الاسلام)

অর্থ ঃ তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে আমানত রেখে গেলাম, যার আমানত নষ্ট হয়না।

* বিদায় দানকারীগণ বলবেন ঃ

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ ـ

অর্থ ঃ তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানতদারীর গুণাবলী এবং তোমাদের কাজের ফলাফল আল্লাহর উপর সোপর্দ করলাম।

* বিদায় দেয়ার সময় অনেকে "খোদা হাফেজ" বলে বিদায় দেন, এ ব্যাপারে মাসআলা হল– যদি সালামের স্থলে খোদা হাফেজ বলা হয়, তাহলে এতে শরীয়তের বিকৃতি ঘটানো হয়, কেননা শরীয়ত বিদায়ের সময়ে সালাম ও উপরোক্ত দুআর তা'লীম দিয়েছে। আর যদি সালাম এবং উক্ত দুআর সাথে অতিরিক্ত এই "খোদা হাফেজ" কথাটা বলা হয়, তাহলে তা শরীয়তের একটি আমলের মধ্যে বৃদ্ধি ঘটানো হয়। অতএব এ সবের প্রেক্ষিতে খোদা হাফেজ বলা জায়েয নয়। আর যদি দুআ হিসেবে এ কথাটি মাঝে মধ্যে বলা হয় এবং কখনও অন্য বাক্যও দুআ হিসেবে বলা হয় তাহলে নাজায়েয হওয়ার কথা নয়, তবে বর্তমানে খোদা হাফেজ বলাটা একটা রছম ও নিয়মে পরিণত হয়েছে বিধায় এটা পরিত্যাগ করা উচিত। (ماخوذ احسن الفتاوى ج ١)

* ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এবং পথ চলার সময় সংশ্লিষ্ট আমল সমূহ করবে। এমনিভাবে সওয়ারীতে আরোহণের সময় সংশ্লিষ্ট আমল সমূহ করবে।

* কোন মঞ্জিল বা স্টেশনে নামলে পড়বে–

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ـ (مسلم)

অর্থ ঃ আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের ওছীলা দিয়ে আমি তার সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে পানাহ কামনা করছি।

* যে শহর বা গ্রামে যাবে, যখন দূর থেকে ঐ শহর বা গ্রাম নজরে পড়বে তখন এই দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ فَإِنَّا

نَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا ۔ (حصن حصين)

অর্থ ঃ আল্লাহ– যিনি সপ্ত আকাশ ও তার ছায়াতলে যা কিছু রয়েছে তার প্রভু, সপ্ত জমীন ও তার অভ্যন্তরস্থ সবকিছুর প্রভু, শয়তানদের এবং তারা যাদেরকে গোমরাহ করে তাদের প্রভু, বাতাসের এবং যা কিছু বাতাস উড়িয়ে নেয় তার প্রভূ– সেই আল্লাহর কাছে আমি এই গ্রাম/শহরের যাবতীয় কল্যাণ কামনা করছি। আর এখানকার অধিবাসী এবং এখানকার সবকিছুর অনিষ্ট থেকে পানাহ চাচ্ছি।

* উক্ত শহর/গ্রামে প্রবেশ করার সময় প্রথমে তিনবার পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا ۔

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি আমাদের জন্যে এর মধ্যে বরকত দাও।

* অতঃপর পড়বে–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا اِلٰى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِيْ اَهْلِهَا اِلَيْنَا

(حصن حصين)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, এখানকার ফল-ফলাদি আমাদের নসীব কর, এখানকার বাসিন্দাদের অন্তরে আমাদের ভালবাসা সৃষ্টি কর এবং এখানকার সৎ লোকদের ভালবাসা আমাদের অন্তরে দান কর।

* সফরের মধ্যে ভোর বেলায় পড়বে–

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَاَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ ۔ (مسلم)

অর্থ ঃ শ্রবণকারী (আল্লাহ) আমাদের কৃত আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর নেয়ামত ও আমাদেরকে উৎকৃষ্ট অবস্থায় রাখার স্বীকৃতির কথা শুনেছেন। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদের সঙ্গী হও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই জাহান্নামের আগুন থেকে।

* সফরে চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামাযকে দুই রাকআত পড়বে। একে কছর বলে। তবে ইমাম যদি চার রাকআত পড়নেওয়ালা হন, তবে তার পেছনে এক্তেদা করলে নামায পূর্ণই পড়তে হবে। বিশেষ ওযর না থাকলে সুন্নাত পড়তে

হবে এবং পূর্ণ পড়তে হবে। নিজের এলাকা বা স্টেশন ছেড়ে গেলেই কছরের হুকুম আরম্ভ হয় এবং ৪৮ মাইল (সোয়া সাতাত্তর কিলোমিটার) বা তার অধিক পথ সফরের এরাদায় রওয়ানা হলেই তখন পথিমধ্যে কছরের এই নিয়ম প্রযোজ্য হয়। আর গন্তব্য স্থানে পৌছার পর নিজের বাড়ি না হলে সেখানে ১৫ দিনের কম থাকার এরাদা হলেও কছর হবে। কিন্তু ১৫ দিন বা তার অধিক থাকার এরাদা হলে কছর নয় বরং নামায পূর্ণ পড়তে হবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ১৯০ পৃষ্ঠা।

* সফরে সাথী-সঙ্গীদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি এবং সঙ্গীদের মাল-সামানের প্রতি খুব খেয়াল রাখতে হবে। শরীয়তে সফরসঙ্গীদের হক প্রতিবেশীর হকের মত। তাই এদিকে খুব খেয়াল রাখা কর্তব্য।

* সফরে দুআ কবূল হয়, তাই দুআর প্রতি এহতেমাম রাখতে হবে।

সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের আমল সমূহ

* সফরের প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেলে যথা সম্ভব দ্রুত আপন স্থানে প্রত্যাবর্তন করবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সফরে থাকা ভাল নয়।

* সফর থেকে পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের জন্য কিছু হাদিয়া নিয়ে আসবে, এতে তার জন্য অপেক্ষমান লোকদের মহব্বত বৃদ্ধি পাবে। (شرح شرعة الاسلام)

* প্রত্যাবর্তনকালে নিজ শহর বা এলাকায় প্রবেশকালে পড়বে–

آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ـ (مسلم)

অর্থ ঃ আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের প্রভূর প্রশংসাকারী।

* দূর-দূরান্তের সফর থেকে অনেক দিন পর বাড়িতে আসলে ঘরে প্রবেশের পূর্বে পরিবারকে সংবাদ দিয়ে কিছুক্ষণ পরে ঘরে প্রবেশ করবে, যাতে স্ত্রী স্বামীর জন্য পরিপাটি হয়ে নিতে পারে।

* আর অনেক রাত হলে উত্তম হল সকালে ঘরে আসবে। অবশ্য ঘরবাসীরা যদি তার অপেক্ষায় থাকে তাহলে তখনই ঘরে প্রবেশ করলে অসুবিধে নেই।

* সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর জন্য সুন্নাত হল ঘরে প্রবেশের পূর্বে মসজিদে দুই রাকআত নফল নামাজ আদায় করে নিবে।

* ঘরে পৌছে পড়বে–

اَوْبًا اَوْبًا لِرَبِّنَا تَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا ـ (حصن حصين)

অর্থ ঃ ফিরে এলাম ফিরে এলাম, আমাদের রবের কাছে এমন তওবা করলাম যার ফলে আমাদের কোন গোনাহ আর বাকী থাকবে না।

* সফর থেকে ফিরে এসে সফরের মধ্যে যেসব বিপদ-আপদ বা কষ্ট ঘটেছে তার বর্ণনা পরিহার করতঃ তার প্রতি আল্লাহর যেসব নেয়ামত ও অনুগ্রহ ঘটেছে তা বর্ণনা করবে। এটাই উত্তম। (معارف القرآن)

বিপদ-আপদ ও বালা-মুছীবতের সময় যা যা করণীয়

* মানুষের উপর বিপদ-আপদ ও বালা-মুছীবত কখনও তার পাপের কারণে এসে থাকে, এটা এ জন্যে এসে থাকে যেন সে ভবিষ্যতে পাপের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যায়। অতএব এ বিপদ-আপদ তার প্রতি এক প্রকার রহমত। আবার কখনও বিপদ-মুছীবত তার পরীক্ষা স্বরূপ এবং তার দরজা বুলন্দ করার জন্যও এসে থাকে। এটাও তার প্রতি আল্লাহর রহমত। তবে বিপদ-আপদ আসলে এটা নিজের পাপের কারণেই এসেছে তাই মনে করতে হবে এবং সে প্রেক্ষিতে বিনয়ী হতে হবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে আর বিপদ থেকে পরিত্রাণ চাইতে হবে। এ কথা বলা যাবে না কিম্বা মনে করা যাবে না যে, আমার পরীক্ষা চলছে, কেননা এরূপ বলা বা মনে করার দ্বারা এটা প্রতীয়মান হতে পারে যে, আমার পাপ নেই অতএব পাপের কারণে আমার এ বিপদ ঘটেনি বরং আমি পরীক্ষা দিয়ে মর্যাদা বুলন্দ হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। এটা এক ধরনের বড়ায়ী বা অহংকারের শামিল হয়ে যেতে পারে। সারকথা–

(ক) বিপদ-আপদকে আল্লাহর রহমত মনে করতে হবে।

(খ) তা নিজের পাপের কারণে ঘটেছে ভেবে আল্লাহর কাছে বিনয়ী হতে হবে।

(গ) পরিত্রাণের জন্য দুআ করতে হবে। আল্লাহর নিকট বিপদ চেয়ে নেয়া ঠিক নয়।

(ঘ) ছবর করতে হবে– বে–ছবরী ও হাহুতাশ করা যাবে না।

* যে কোন সমস্যা ও বিপদ-মুছীবত দেখা দিলে দুই রাকআত সালাতুল হাজত নামায পড়ে আল্লাহর নিকট তা থেকে পরিত্রাণের জন্য দুআ করা সুন্নাত। বিপদ-আপদ বা সমস্যা দেখা দিলে সেই পেরেশানীতে পড়ে আল্লাহ থেকে বিমুখ হওয়া এবং ইবাদত ও আল্লাহর স্মরণ থেকে পিছিয়ে পড়া অন্যায়।

* ছোট-বড় যে কোন ধরনের বিপদ দেখা দিলে এমনকি শরীরে কাঁটাবিদ্ধ হলেও নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে–

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا . (مسلم)

অর্থ ঃ আমরাতো আল্লাহরই, আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাবো। হে আল্লাহ, এই মুসীবতে তুমি আমাকে প্রতিদান দিও এবং তার স্থলে তার চেয়ে উত্তম বদল দান কর।

* কোন কিছু হারিয়ে গেলে ৪১ বার ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়া অত্যন্ত ফলদায়ক এবং এটা পরীক্ষিত আমল।

* কোন রোগ-ব্যাধি হলে চিকিৎসা করাবে। চিকিৎসা করা মোস্তাহাব। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪৫০ পৃষ্ঠা।

* কোন বিষয়ে মনে দুশ্চিন্তা বা পেরেশানী থাকলে কিম্বা অশান্তির মধ্যে পড়লে পাঠ করবে–

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . (ترمذى)

অর্থ ঃ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম তত্ত্বাবধায়ক।

অথবা পড়বে– يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

অর্থ ঃ হে চিরঞ্জীব, হে সবকিছু ধারণকারী, আমি তোমার রহমতের ওছীলা দিয়ে তোমার কাছে ফরিয়াদ করছি।

অথবা পড়বে– لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِينَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তুমি অতি পবিত্র। আর আমি অবশ্যই গোনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত।

* শত্রুর ভয় হলে এই দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُبِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ .

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমাকে তাদের মোকাবেলায় দাঁড় করাচ্ছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি।

* শত্রু ঘিরে ফেললে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا . (حصن حصين)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমাদের ইজ্জত-আব্রু রক্ষা কর এবং ভয়ভীতি থেকে আমাদেরকে নিরাপত্তা দান কর।

* কোন আপনজন মারা গেলে তখন কি করণীয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪৫৯ পৃষ্ঠা।

* প্রচণ্ড মেঘ দেখলে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اُرْسِلَ بِهٖ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَّافِعًا - (حصن حصين)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, এই মেঘের সাথে যে অনিষ্টকারিতা রয়েছে তা থেকে আমরা তোমার কাছে পানাহ চাই। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ কর।

* বিদ্যুৎ চমকাতে দেখলে বা বজ্রপাতের শব্দ শুনলে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার গজব দিয়ে আমাদেরকে মেরে ফেল না, তোমার আযাব দিয়ে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিওনা। তার আগে আমাদেরকে শান্তি দাও।

* ভয়ংকর তুফান ও ঘূর্ণিবার্তা আসলে সে দিকে মুখ করে দু হাটু ফেলে বসে এই দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَّلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَّلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এই বাতাসকে রহমত বানাও, আযাব বানিও না, এবং একে উপকারী বাতাস বানাও, অপকারী বাতাস বানিও না। (مشكوة)

* অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হতে থাকলে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا - اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالْاٰجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ -

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, এই বৃষ্টি আমাদের আশে পাশে বর্ষণ কর, আমাদের উপর বর্ষণ করো না। হে আল্লাহ! উচ্চস্থান, বনজঙ্গল, পাহাড় প্রণালী ও বৃক্ষ উৎপাদনের স্থান সমূহের উপর বর্ষণ কর।

* কোন জায়গায় অগ্নিকাণ্ড হতে দেখলে পড়বে "আল্লাহু আকবার" অথবা পড়বে–

يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ -

অর্থ ঃ হে আগুন, তুমি ইবরাহীমের জন্য ঠান্ডা এবং শান্তিদায়ক হয়ে যাও।

অন্যকে বিপদ-আপদ ও মুছীবতগ্রস্ত দেখলে যা যা করণীয়

* কোন মুসলমানের বিপদ-মুছীবতে খুশি নয় বরং সমবেদনা প্রকাশ করতে হবে।

* কাউকে বিপদ গ্রস্ত দেখলে তাকে সান্ত্বনা দেয়া সুন্নাত।

* কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখলে তার সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া কর্তব্য।

* কাউকে কোন মুছীবত, পেরেশানী বা খারাপ অবস্থায় দেখলে পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا ـ (مشكوة)

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে ঐ অবস্থা থেকে রক্ষা করেছেন, যে অবস্থায় তোমাকে ফেলেছেন।

তবে দুআটি এমনভাবে পড়বে না যে, উক্ত মুছীবতগ্রস্ত ব্যক্তি বুঝতে পারে।

* কেউ রোগগ্রস্ত হলে তার শুশ্রূষা করা সুন্নাত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেখুন ৪৫৪ পৃষ্ঠায়।

* কারও আপন জন মারা গেলে তাকে সান্ত্বনা জানাবে এবং শোক প্রকাশ করবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪৭০ পৃষ্ঠা।

নিজের ভাল অবস্থায় বা সুখের অবস্থায় যা যা করণীয়

* সুখের অবস্থায় আল্লাহকে ভুলে যাওয়া, বে-পরোয়া হয়ে যাওয়া এবং ইবাদতে গাফেল হওয়া চরম না শুকরী। বরং সুখের অবস্থায় নেয়ামতের শুকর স্বরূপ বেশী বেশী আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হওয়া উচিত।

* কোন বিশেষ সুসংবাদ প্রাপ্ত হলে বা সুখের কিছু ঘটলে সাজদায়ে শোকর বা নামাযে শোকর আদায় করার নিয়ম রয়েছে। দেখুন ১৯৪ পৃষ্ঠা।

* ধন-সম্পদ, জ্ঞান-বুদ্ধি, মান-সম্মান প্রভৃতি যে কোন নেয়ামত প্রাপ্ত হলে সেটা আল্লাহর অনুগ্রহে ঘটেছে মনে করতে হবে। নিজের বাহু বলে হয়েছে ভেবে অহংকার বোধ করা অন্যায়।

* কেউ কোন সুসংবাদ নিয়ে এলে তাকে এনআম দেয়া নবীদের সুন্নাত।
(معارف القرآن ج/ ٥)

* খুশির কিছু ঘটলে বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি লোকদেরকে দাওয়াত করে খাওয়ানো সুন্নাত। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) সূরা বাকারা পড়ে শেষ করার পর খুশিতে উট জবাই করে লোকদেরকে খাওয়ান। (معارف القرآن)

* কোন পছন্দনীয় জিনিস দেখলে পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ ـ

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যার দানে যাবতীয় সৎকর্ম পূর্ণত্ব লাভ করে।

* নতুন ফসল দেখলে পড়বে– اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَلَا تَضُرَّهُ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি এতে বরকত দান কর এবং একে নষ্ট কর না।

অন্যের ভাল অবস্থা দেখলে যা যা করণীয়

* কোন মুসলমানের সুখের কিছু ঘটলে কিম্বা ভাল কিছু হলে তাতে নিজেকেও সুখী বোধ করা এবং সেটা প্রকাশ করা উচিত।

* কোন মুসলমানের ভাল কিছু হলে সেটা ধ্বংস হওয়ার কামনা করা অন্যায়। বরং এরূপ চেতনা ভিতরে এলে তার নেয়ামত আরও বৃদ্ধি পাক এরূপ দুআ করতে হবে, তাহলে সে চেতনা দূরীভূত হয়ে যাবে।

* কোন মুসলমানকে নতুন পোশাক পরিহিত দেখলে পড়বে–

تُبْلِىْ وَيُخْلِفُ اللّٰهُ ـ (حصن حصين)

অর্থাৎ, তুমি যেন এই কাপড় পুরাতন করতে পার (আল্লাহ তোমাকে এতটুকু হায়াত দরাজ করুন) এবং তারপর যেন আল্লাহ তোমাকে এ স্থলে নতুন কাপড় দান করেন।

* কোন মুসলমানকে হাসতে দেখলে পড়বে–

اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ ـ (مسلم وبخارى)

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে হাস্যোজ্জ্বল রাখুন।

চিকিৎসা বিষয়ক বিধি-বিধান

* রোগ-ব্যাধিতে চিকিৎসা করানো এবং ঔষধ সেবন করা মোস্তাহাব। (مرقاة ج/٨) কেউ কেউ বলেন চিকিৎসা করানো সুন্নাত। চিকিৎসা করাতে থাকবে, কিন্তু রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে।

* ঔষধে হারাম জিনিস ব্যবহার করবে না। কোন হারাম বস্তুকে ঔষধ হিসেবে সেবন করা বা হারাম বস্তু মিশ্রিত ঔষধ সেবন করা জায়েয নয়। তবে কখনও যদি এমন অনন্যোপায় অবস্থা হয় যে, উক্ত ঔষধ ব্যতীত জীবন রক্ষা করা মুশকিল, তাহলে জরুরত পূর্ণ হয়– এতটুকু পরিমাণ উক্ত ঔষধ সেবন করা

জায়েয হবে। আর যদি জীবনের আশংকা দেখা না দেয়, শুধু চিকিৎসার জন্য অনুরূপ ঔষধের প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি উক্ত ঔষধ ব্যতীত রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নয় বলে সিদ্ধান্ত দেন, তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েজ হবে। (امداد الفتاوى ج ٤ و درس ترمذى ج ١)

* শরীয়তের বরখেলাপ তাবীয-তুমার, ঝাড়-ফুঁক ব্যবহার করা জায়েয নয়। শরীয়ত সম্মত তাবীয ও ঝাড় ফুঁক হলে তা করা যায়, তবে উত্তম নয়। (تعليم الدين) এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৬২ পৃষ্ঠা।

* শরীরে যদি অস্বাভাবিকতা থাকে (যেমন আঙ্গুল বেশী আছে) তাহলে প্লাস্টিক সার্জারি করা জায়েয। নিছক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য জায়েয নয়।

* কারও উপর বদ নযর লাগলে তখন কি করণীয় সে সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৬৩ পৃষ্ঠা।

* কালজিরা এবং মধুর মধ্যে আল্লাহ তাআলা বহু রোগ নিরাময়ের শক্তি রেখেছেন বলে হাদীছে বর্ণিত রয়েছে।

* চিকিৎসা অবস্থায় রোগের জন্য ক্ষতিকর বস্তু থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। (رسول الله صلى الله عليه وسلم كى سنتيں)

* শরীরে রক্ত প্রদান এবং চক্ষু ও কিডনী সংযোজন সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৩২৮ পৃষ্ঠা।

খতমে ইউনুস/খতমে শেফা

* উলামায়ে কেরামের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সোয়া লক্ষ বার দুআয়ে ইউনুস পাঠ করে দুআ করা হলে রোগ-ব্যাধি ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এটাকে খতমে ইউনুস বা খতমে শেফা বলা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে আটকা পড়ে এই দুআটি পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেন। দুআয়ে ইউনুস এই ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তুমি পবিত্র আর আমি পাপীদের অন্তর্ভুক্ত।

* উল্লেখ্য যে, এই দুআটি সোয়া লক্ষ বার পাঠ করে দুআ করলে বিপদ-আপদ বা রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ হবে এ বিষয়টি কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়– এটা অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত। অতএব খতমে ইউনুস/খতমে শেফা-

কে সুন্নাত তরীকা মনে করা যাবে না, এরূপ মনে করলে তা বিদআত হয়ে যাবে।

* বিপদ-আপদ বা রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে খতমে ইউনুস পাঠ করা হলে পাঠকারীকে বিনিময় বা পারিশ্রমিক প্রদান করা ও পাঠকারীর জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয।

খতমে জালালী

কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে এক লক্ষ বার কালেমায়ে তইয়্যেবা পাঠ করলে সে উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে থাকে। এটাকে জালালী খতম বা লাখ কালেমা পাঠ বলা হয়ে থাকে। এটা অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত বিষয়– কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এটাকে সুন্নাত মনে করলে তা বিদআত হয়ে যাবে। কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে এ খতম পাঠ করা হলে তার পারিশ্রমিক দেয়া ও নেয়া উভয়ই জায়েয।

খতমে বোখারী

বোখারী শরীফ খতম করে দুআ করা হলে দুআ কবূল হয়ে থাকে এবং কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে বোখারী খতম করে দুআ করা হলে সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে থাকে। এটা ওলামা ও বুযুর্গদের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত– কুরআন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। পূর্বে খতমে ইউনুস ও জালালী খতমের ব্যাপারে যে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে, খতমে বোখারীর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

খতমে খাজেগান

খাজেগান অর্থ সাহেবগণ অর্থাৎ, মনীষী ও বুযুর্গানে দ্বীন। বুযুর্গানে দ্বীন যে খতম পড়ে দুআ করতেন সে খতমকে খতমে খাজেগান বলে। খতমে খাজেগান পাঠ করে দুআ করা হলে কবূল হয়ে থাকে– এ ব্যাপারে বুযুর্গানে দ্বীনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে এটা কুরআন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়, অতএব এটাকে সুন্নাত মনে করলে বেদআত হয়ে যাবে। পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে খতমে খাজেগান পাঠ করা হলে তার বিনিময় প্রদান ও গ্রহণ উভয়টি জায়েয। যেমন খতমে ইউনুস ও খতমে বোখারী ইত্যাদির ক্ষেত্রে মাসায়েল বর্ণনা করা হয়েছে।

খতমে দুরূদে নারিয়া

দুরূদে নারিয়া কি এবং খতমে দুরূদে নারিয়া কি এ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৫৭০ পৃষ্ঠা।

আসবাব গ্রহণ বা বর্জন সম্পর্কে মাসায়েল

* পার্থিব কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-মুছীবত দূর করার জন্য বা পার্থিব কোন উদ্দেশ্য হাছিল করার জন্য যে আসবাব বা উপায় উপকরণ গ্রহণ কিম্বা যে চেষ্টা তদবীর করা হয়ে থাকে তা তিন প্রকার এবং এই তিন প্রকারের হুকুম এক রকম নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন। যথাঃ

(১) আসবাব যদি স্বাভাবিকভাবে নিশ্চিত পর্যায়ের হয়ে থাকে তাহলে তা গ্রহণ করা জরুরী। যেমন ক্ষুধা বা পীপাসা দূর করার নিশ্চিত আসবাব বা উপায় হল খাদ্য পানীয় গ্রহণ করা। এ রকম আসবাব গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় বরং এ রকম আসবাব পরিত্যাগ করা নাজায়েয। যদি কেউ তাওয়াক্কুলের দোহাই দিয়ে জীবনের আশংকা দেখা দেয়ার মুহূর্তেও আসবাব বর্জন করে অর্থাৎ খাদ্য পানীয় গ্রহণ না করে, তাহলে এই আসবাব বর্জনটা হারাম হবে। এ পর্যায়ের আসবাব গ্রহণ না করা তাওয়াক্কুল নয়– বরং এ পর্যায়ে তাওয়াক্কুল হল আসবাব গ্রহণ করবে এবং সেই সাথে এই বিশ্বাসও রাখবে যে, খাদ্য পানীয় এবং তা গ্রহণের শক্তি আল্লাহর দেয়া– তিনি ইচ্ছা করলে এই খাদ্য পানীয় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কিম্বা তা গ্রহণের শক্তি আমার রহিত হয়ে যেতে পারে, কাজেই ভরসা চূড়ান্তভাবে আল্লাহরই প্রতি।

(২) যদি আসবাব এমন পর্যায়ের হয় যা দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়া নিশ্চিত নয় তবে অর্জিত হওয়ার প্রবল ধারণা করা যায়– যেমন, রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে ডাক্তার বা হেকীমদের ওষধ পত্র গ্রহণ কিম্বা সফরে গেলে পানাহার ও অন্যান্য প্রয়োজন পুরা করার উদ্দেশ্যে পাথেয় গ্রহণ, জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে আয় উপার্জনের কোন পন্থা গ্রহণ ইত্যাদি। এ ধরনের আসবাব বর্জন করা তাওয়াক্কুলের জন্য শর্ত নয়। এ ধরনের আসবাব গ্রহণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় বরং এ ধরনের আসবাব গ্রহণই পূর্ববর্তীদের সুন্নাত। তবে কেউ যদি এমন মজবূত কলবের অধিকারী হন যিনি এসব আসবাব গ্রহণ না করার ফলে কোন কষ্ট দেখা দিলে তখন পূর্ণ সবর করতে পারবেন– কোন রূপ হাহুতাশ করবেন না এবং ঈমান হারা হবেন না বা পাপ পথে অগ্রসর হবেন না, তাহলে তার জন্য এসব আসবাব বর্জন করা জায়েয হবে। আর এরূপ মজবূত অন্তরের অধিকারী না হলে তার জন্য এসব আসবাব পরিত্যাগ করা উচিত হবে না, তার জন্য এ ধরনের আসবাব গ্রহণই উত্তম।

(৩) যদি আসবাব এমন পর্যায়ের হয়, যা দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়াটা নিতান্তই ধারণা মাত্র, যেমন লোহা পুড়িয়ে দাগ দিলে কোন রোগ-ব্যাধি দূর

হওয়াটা নিতান্তই ধারণা মাত্র, এমনিভাবে জীবিকা বৃদ্ধির জন্য আয় উপার্জনের রকমারি পন্থায় ডুবে থাকা ইত্যাদি। এ পর্যায়ের আসবাব গ্রহণ না করার হুকুম রয়েছে। এ ধরনের আসবাব গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী।

উল্লেখ্য যে, এতক্ষণ পর্যন্ত আসবাব গ্রহণ বা বর্জন সম্পর্কে যা কিছু বলা হল তা পার্থিব বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যদি দ্বীনী বিষয় হয় তাহলে সে বিষয়টা যদি ফরয পর্যায়ের হয় তাহলে তার আসবাব গ্রহণ করাও ফরয, ওয়াজেব পর্যায়ের হলে তার আসবাব গ্রহণও ওয়াজিব হবে এবং মোস্তাহাব পর্যায়ের হলে তার আসবাব গ্রহণ করা মোস্তাহাব হবে। পক্ষান্তরে বিষয়টি হারাম বা মাকরূহ হলে তার আসবাব গ্রহণ করাও হারাম বা মাকরূহ হবে।

(ما خوذ از ارشاد القرآن و حاشیۃ کوکب الدری بحوالہ عالمگیریۃ و اربعین تلعر الی وغیرہا)

রোগী শুশ্রূষার সুন্নাত ও আদব সমূহ

* শুশ্রুষা করার জন্য প্রতিদিন যাবে না, দুই একদিন বিরতি দিয়ে দিয়ে যাবে। রোগীর সাথে শুশ্রুষাকারীর সম্পর্কের ভিত্তিতে এটার মধ্যে তারতম্য হবে।

* খুব জাঁক-জমকের পোশাক বা ছেড়া- ফাটা ও নোংরা পোষাক পরে শুশ্রুষা করতে যাবে না বরং স্বাভাবিক পরিষ্কার পোশাক পরিধান করে যাবে।

* দিনে রাত্রে সব সময় শুশ্রুষার জন্য গমন করা যায়।

* রোগীর হাটুর পাশে বসবে, মাথার দিকে নয়।

* রোগীর নিকট দীর্ঘ সময় থাকবে না, যাতে রোগীর কষ্ট না হয় বরং তাড়াতাড়ি চলে আসা সুন্নাত।

* রোগীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাবে না বরং কোমল দৃষ্টিতে তাকাবে।

* হাসি মুখে থাকবে; চেহারা মলিন করবে না।

* রোগী অচিরেই রোগ মুক্ত হয়ে যাবে, সে দীর্ঘজীবি হবে ইত্যাদি আশা ব্যাঞ্জক কথা রোগীকে শুনাবে- কোন হতাশা ব্যাঞ্জক কথা তাকে শুনাবে না।

* রোগীর কপাল বা হাতে হাত রেখে জিজ্ঞেস করবে সে কেমন আছে?

* রোগীকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলবে- لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ অর্থাৎ, কোন অসুবিধা নেই, আল্লাহ চাহেতো অচিরেই পবিত্রতা (সুস্থতা) লাভ হবে।

* রোগীর রোগ মুক্তির জন্য দুআ করা সুন্নাত।

* রোগীর কাছে থেকে তার রোগ আরোগ্যের জন্য সাতবার নিম্নোক্ত দুআ পড়বে-

أَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

অর্থ ঃ মহান আরশের মালিক আল্লাহর কাছে তোমার রোগমুক্তি কামনা করছি।

* শুশ্রূষাকারী তার জন্য রোগীকে দুআ করতে বলবে। কেননা, রোগীর দুআ কবূল হয়।

* রোগী কিছু খেতে চাইলে এবং সেটা তার জন্য ক্ষতিকর না হলে রাসূল (সঃ) তাকে তা দিতে বলেছেন। তবে রোগীকে কোন কিছু খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করা ঠিক নয়। (احکام میت از حصن حصین)

* রোগীর কাছে থেকে সাতবার নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَمِنْ شَرِّ مَا اُحَاذِرُ ـ (احکام میت)

অর্থ ঃ আল্লাহর মাহাত্ম ও কুদরতের কাছে পানাহ চাচ্ছি– যে কষ্টে আমি আছি তার অনিষ্ট থেকে এবং যার ভয় আমি পাচ্ছি তার অনিষ্ট থেকে।

রোগ অবস্থায় রোগীর যা যা করণীয়

* রোগকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করবে; কেননা, আল্লাহ যাকে ভালবাসেন তাকেই কোন বিপদ দিয়ে থাকেন। তবে রোগ মুক্তির জন্য চিকিৎসা করা বা দুআ করা এ ধারণার পরিপন্থী নয়। কারণ, রোগমুক্তি এবং নিরাপদ থাকাও আল্লাহর একটি নেয়ামত। দুর্বল বান্দার পক্ষে এই প্রকারের নেয়ামতই আহ্বান।

* রোগকে গোনাহ মোচনের ওছীলা মনে করবে।

* মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করবে। তবে মৃত্যু কামনা করা নিষেধ। একান্ত কষ্ট যন্ত্রণায় অপারগ হয়ে গেলে নিম্নোক্ত দুআ করা যায়–

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِنْ كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! যতক্ষণ আমার জন্য বেঁচে থাকা কল্যাণকর, ততক্ষণ তুমি আমাকে জীবিত রাখ। আর যদি মৃত্যুই আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তাহলে (ঈমানের সাথে) আমার মৃত্যু ঘটাও।

* অসুস্থ অবস্থায় সমস্ত গোনাহ থেকে তওবা করবে।

* ধৈর্য ধারণ করবে।

* নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِىْ بِبَلَدِ رَسُوْلِكَ ـ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমাকে তোমার রাস্তায় শাহাদাত নসীব কর এবং তোমার রাসূলের দেশে আমার মৃত্যু ঘটাও।

* চিকিৎসা করাবে। চিকিৎসা করানো সুন্নাত।

* যিকির, দুআ, নামায ও তিলাওয়াত পূর্বক শেফা কামনা করবে।

* কোন কুলক্ষণ গ্রহণ করবে না।

* মিথ্যা বলবে না, যেমনঃ রোগ যতটুকু আছে তার চেয়ে বাড়িয়ে বলা ইত্যাদি।

* রোগের মাত্রা অধিক করে প্রকাশ করবে না, যেমনঃ কেউ এলে বসা থেকে শুয়ে যাওয়া কিম্বা কাতরাতে থাকা ইত্যাদি।

* যত্ন– সেবাকারীদের প্রতি রাগান্বিত হবে না বা খাদ্য খাবারের প্রতি রাগ প্রকাশ করবে না।

* লোভ করবে না, যেমনঃ কিছু সাহায্য পাওয়ার আশায় আগন্তুক শুশ্রুষাকারীর পকেটের দিকে তাকানো। এরূপ করলে লোভ প্রকাশ পায়। অতএব এটা করবে না।

* রোগ যন্ত্রণায় কাতরালে যদি কষ্ট লাঘব হওয়া বোধ হয়, তাহলে তা করা যেতে পারে। তবে তা যেন আল্লাহর প্রতি অভিযোগ ও অস্থিরতা প্রকাশে রূপ না নেয়।

* অসুস্থ অবস্থায় চারশত বার দুআয়ে ইউনুস পড়বে। তাহলে ঐ রোগে মৃত্যু হলে শহীদের সমান ছওয়াব পাওয়া যাবে, আর সুস্থ হলে সমস্ত গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। (احکام میت)

* অসুস্থ অবস্থায় নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করলে এবং উক্ত রোগে তার মৃত্যু হলে জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

(احکام میت از ترمذی ـ نسائی وابن ماجه)

* রোগ মুক্তির পর গোসল করা মোস্তাহাব। (مفاتیح الجنان)

মুমূর্ষ অবস্থায় রোগীর যা যা করণীয়

* মুমূর্ষ অবস্থায় উপনীত হলে মনে আল্লাহর রহমত লাভের আশা প্রবল করা সুন্নাত।

* মুমূর্ষ ব্যক্তি জীবনের ভাল-মন্দ কার্যাবলী সম্পর্কে মনে মনে হিসাব নিকাশ ও পর্যালোচনা করবে না। কেননা, এতে মন্দের পরিমাণের আধিক্য দেখে আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

* ঋণ থাকলে তা পরিশোধ এবং নামায, রোযার ফিদয়া প্রদান বা যে কোন মালী ইবাদত অনাদায়ী থাকলে তা আদায় করার ওছীয়ত করবে। সে যদি এতটুকু সম্পদ রেখে যায় যা দ্বারা এসব আদায় করা সম্ভব, তাহলে মৃত্যুর পূর্বে এ ওছীয়ত করা ওয়াজিব। (احکام میت از در مختار)

* মৃত্যুর পর জানাযা, কবর নির্মাণ, দাফন-কাফন, ঈছালে ছওয়াব ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে সব অনিয়ম, বেদআত ও রছম পালন করা হয়, তা থেকে ওয়ারিছ ও আপনজনকে বিরত থাকার ওছীয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব। (احسن الفتاوی ج ٤)

* পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের মধ্যে মাদ্রাসা, মসজিদ, গরীব আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদির জন্য ওছীয়ত করে যাওয়া মোস্তাহাব, যদি তার ওয়ারিছগণ এমনিতেই সম্পদশালী হয়ে থাকে বা এমন হয় যে, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মাধ্যমে তারা অনেক ধনবান হয়ে যাবে– এরূপ ক্ষেত্রেই এরকম ওছীয়ত করে যাওয়া মোস্তাহাব। অন্যথায় এরকম ওছীয়ত না করাই উত্তম। (احکام میت)

* মৃত্যুকে ভাল মনে করবে। কেননা, মৃত্যু দ্বারা পাপ থেকে রক্ষা ও পৃথিবীর এই কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং মৃত্যু আল্লাহর কাছে তার পৌঁছে যাওয়ার মাধ্যম।

* বেশী বেশী আল্লাহর যিকিরে মাশগুল থাকা সুন্নাত।

* মৃত্যুর জন্য মনকে প্রস্তুত করে নিবে।

* খাঁটি অন্তরে এখলাসের সাথে মৃত্যুর সময় ঈমানের উপর টিকে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকবে।

* হত্যা করা হবে বা ফাঁসী দেয়া হবে জানলে দু'রাকআত নামাযে কতল বা নিহত হওয়াকালীন নামায (দেখুন ১৮৮ পৃষ্ঠা) পড়ে নেয়া সুন্নাত।

* মৃত্যুর সময় আসন্ন বুঝলে পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ وَارْحَمْنِیْ وَاَلْحِقْنِیْ بِالرَّفِیْقِ الْاَعْلٰی -

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমার প্রতি রহম কর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত কর।

এবং আরও পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّى عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ - (احكام ميت)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, মৃত্যুর বিভীষিকা এবং মৃত্যু যন্ত্রণার এই পর্যায়ে তুমি আমাকে সাহায্য কর।

মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট যারা উপস্থিত থাকে তাদের যা যা করণীয়

* মুমূর্ষ রোগীর পাশে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা মোস্তাহাব। এতে মৃত্যু যন্ত্রণা হ্রাস পায়। রোগী ছোট হোক বা বড় উভয়ের ক্ষেত্রে এটা করা মোস্তাহাব।

(احسن الفتاوى ج/٤)

* মুমূর্য রোগীকে আল্লাহর রহমত লাভের সুসংবাদ প্রদান করতে হবে, যাতে তার মনে আল্লাহর রহমত লাভের আশা প্রবল হয়।

* তার পাশে অনুচ্চস্বরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়তে থাকবে, যেন সে এটা শুনে নিজেও মুখে বা মনে মনে তা পড়তে উদ্বুদ্ধ হয়। তাকে এই কালেমা পড়ার নির্দেশ দিবে না, কেননা যন্ত্রণা এবং কষ্ট বশতঃ পড়তে অস্বীকার করে বসলে হীতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

* মুমূর্ষ রোগীর নিকট থেকে হায়েয নেফাছ ওয়ালী মহিলা এবং যার উপর গোসল ফরয– এরূপ ব্যক্তিদেরকে সরিয়ে দিবে।

* মুমূর্ষ রোগীকে কেবলা মুখী করে শুইয়ে দেয়া সুন্নাত। এই কেবলামুখী দুভাবে করা যায় (১) চিত শোয়া অবস্থায় পা কেবলার দিকে করে এবং মাথা উঁচুতে রেখে। (২) উত্তর দিকে মাথা রেখে ডান কাতে শুইয়ে। তবে কেবলা মুখী করতে গিয়ে রোগীর খুব বেশী কষ্ট হলে তাকে নিজের অবস্থায়ই থাকতে দিবে।

* তার নিকট সুগন্ধি উপস্থিত করবে এবং আশপাশ সুগন্ধিযুক্ত করবে। কেননা, মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ উপস্থিত হয়।

* নেককার লোকদেরকে পাশে সমবেত করবে।

* রূহ কবজ হওয়া পর্যন্ত তার নিকট কুরআন পাঠ করতে থাকবে।

মৃত্যু হওয়ার পর করণীয়

* নিজের সামনে কারও মৃত্যু হলে বা কারও মৃত্যু সংবাদ শুনলে পড়তে হয়–

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ـ এতদসঙ্গে নিম্নোক্ত দুআও যোগ করা উত্তম–

وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ اَللّٰهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِى الْمُحْسِنِيْنَ وَاجْعَلْ كِتَابَهُ فِىْ عِلِّيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ اَهْلِهٖ فِى الْغَابِرِيْنَ وَلَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ـ (كتاب الاذكار)

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! তুমি তাকে তোমার কাছে নেককারদের তালিকাভুক্ত করে নাও, তার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে রাখ এবং তার পরিবারের যারা অবশিষ্ট রয়েছে তাদের মধ্যে তার উত্তম বদলা দান কর। আর তার প্রতিদান থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করোনা এবং তার চলে যাওয়ার পর আমাদেরকে ফেতনায় ফেলনা।

* মৃত্যু হয়ে গেলে একটা চওড়া পট্টি দ্বারা মৃতের চিবুকের নীচ দিক থেকে নিয়ে মাথার উপর গিরা দিয়ে বেঁধে দিবে।

* মৃতের চক্ষু বন্ধ করে দিবে।

* মৃতের দুই পায়ের দুই বৃদ্ধ আঙ্গুল একত্রে মিলিয়ে বেঁধে দিবে।

(بهشتى زيور)

* মৃতের উভয় হাত ডানে বামে সোজা করে রাখবে, সিনার উপর রাখবে না।

* একটা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখবে। (احكام ميت)

* কোন চৌকি বা খাটের উপর মাইয়েতকে রাখবে; মাটির উপর রাখবে না। (احكام ميت)

* মৃতের পেটের উপর কোন লম্বা লোহা বা ভারী বস্তু দ্বারা চাপা দিয়ে রাখবে, যাতে পেট ফুলে যেতে না পারে। (احكام ميت)

* হায়েয নেফাস ওয়ালী মহিলাকে মাইয়েতের কাছে আসতে দিবে না।

(ايضا)

* সম্ভব হলে খুশবূ (আগরবাতি প্রভৃতি) জ্বালিয়ে মৃতের কাছে রাখবে।

(احكام ميت)

* যথা সম্ভব লোকদেরকে মৃত্যুর সংবাদ অবগত করাবে। (بهشتى زيور)

* মাইকেও মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা যায়। তবে মসজিদের মাইকে বাইরের লোকদের সংবাদ দেয়া যায় না। অবশ্য উক্ত মাইয়েতের জানাযা নামাযের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য মসজিদের মাইকে মসজিদে এ'লান করাতে বাঁধা নেই। (কাফন-দাফনের মাসলা মাসায়েল)

* মাইয়েতের জন্য এস্তেগফার করতে থাকবে। (احكام ميت)

* দ্রুত দাফন-কাফন সম্পন্ন করবে। এটাই উত্তম। জানাযার নামাযে অধিক লোক হওয়ার আশায় জানাযায় বিলম্ব করবে না। এরূপ করা মাকরূহ ও অনুচিত। (احسن الفتاوى)

* মৃতকে গোসল দেয়ার পূর্বে তার নিকট কুরআন শরীফ পাঠ করা নিষেধ। (বেহেশতী জেওর)

* আপনজনের মৃত্যু হলে এরূপ পড়বে-

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اٰجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا ـ

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাব। হে আল্লাহ, আমার এই মুসীবতে তুমি আমাকে প্রতিদান নসীব কর এবং তার স্থলে তার চেয়ে উত্তম বদলা আমাকে দান কর।

* কোন ইসলামের শত্রুর মৃত্যু সংবাদে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَصَرَ عَبْدَهٗ وَاَعَزَّ دِيْنَهٗ ـ (كتاب الاذكار)

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করলেন এবং তাঁর দ্বীনকে শক্তিশালী করলেন।

* আপনজনের মৃত্যুতে যে কষ্ট হয় তার জন্য ছওয়াব হবে- এই আশা রাখতে হবে।

* কারও মৃত্যুতে মাতম করা, জামা কাপড় ফাড়া চেড়া করা, বুক চাপড়ানো, ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদা, চিৎকার করে কাঁদা জায়েয নেই। মনের দুঃখে স্বাভাবিক যে চোখের পানি বা রোদন এসে যায় তা নিষিদ্ধ নয়।

* স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী "ইদ্দত" পালন করবে। তার গর্ভ থাকলে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত, অন্যথায় চার মাস দশ দিন পর্যন্ত এই ইদ্দত পালন করবে। এ সময়ে সে সাজ-সজ্জা এবং রূপ চর্চা থেকে বিরত থেকে শোক পালন করবে। স্বামীর মৃত্যুর সময় সে যে ঘরে বসবাস করত সেখানেই থাকবে, সেখান থেকে

বের হবে না। ভাড়ার বাসা হলে ভাড়া দেয়ার ক্ষমতা থাকলে সেখানেই থাকবে। তবে নিরাপত্তার অভাব হলে নিকটতম স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে ইদ্দত পালন করবে। এ সময়ের মধ্যে সে কারও সঙ্গে বিবাহ বসতে পারবে না।

কাফন-দাফন

কবর খননের নিয়ামবলী ঃ

* কবর মাইয়েত এর সমপরিমাণ লম্বা হবে।

* যতটুকু লম্বা তার অর্ধেক পরিমাণ চওড়া হবে।

* মাইয়েত এর দেহ যত লম্বা, কবর ততপরিমাণ গভীর হওয়া সবচেয়ে উত্তম, অন্ততঃ তার অর্ধেক গভীর করলেও চলে। এরূপ কবরকে সিন্দুক কবর বলে।

* আর এরূপ খনন করার পর কেবলার দিকে আর একটি ছোট্ট কুঠরির ন্যায় খনন করে তার মধ্যে মুরদাকে রাখা হলে তাকে বলে বুগলী কবর বা লাহ্‌দ। সিন্দুকের চেয়ে এরূপ কবর করা উত্তম। (فتاوی دار العلوم ج / ٥)

* কবরের উপরিভাগ অন্ততঃ এক ফুট গভীরতা সহকারে একটু অধিক প্রশস্ত করে খনন করতে হবে। এ স্থানে বাঁশ, কাঠ বা স্লিপার দিয়ে তার উপর মাটি দেয়া হবে। (احکام میت)

কাফনের কাপড় সংক্রান্ত বিষয় সমূহ ঃ

* মাইয়েতকে কাফনের কাপড় দেয়া ফরযে কেফায়া।

* মাইয়েত জীবনে সাধারণতঃ যে মানের কাপড় পরিধান করত, তার কাফনও উক্ত মানের হওয়া উচিত।

* কাফন সাদা রংয়ের হওয়া উত্তম। নতুন বা পুরাতন উভয়টিই সমান।

* কাফনের কাপড় পবিত্র হতে হবে।

* পুরুষের কাফনে তিনটা কাপড় হওয়া সুন্নাত। যথা ঃ

১। ইজার ঃ এটা মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা হয়।

২। লেফাফা/চাদর ঃ এটা ইজার থেকে ৪ গিরা (৯ ইঞ্চি) লম্বা হয়।

৩। কুর্তা/জামা ঃ (হাতা ও কল্লী বিহীন) এটা গর্দান থেকে পা পর্যন্ত লম্বা হয়।

* মহিলার কাফনে পাঁচটা কাপড় হওয়া সুন্নাত। উপরোক্ত তিনটা এবং

৪। সীনা বন্দ ঃ এটা বগল থেকে রান পর্যন্ত হওয়া উত্তম। নাভি পর্যন্ত হলেও চলে।

৫। সারবন্দ/ উড়না ঃ এটা তিনহাত লম্বা হয়।

কাফনের কাপড়ের পরিমাণ ও তৈরির বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	নাম	লম্বা	চওড়া	পরিমাণ
১	ইজার	২.৫০ গজ (আড়াই গজ)	১.২৫ থেকে ১.৫০ গজ (সোয়া এক গজ থেকে দেড় গজ)	মাথা থেকে পা পর্যন্ত
২	লেফাফা	২.৭৫ গজ (পৌনে তিন গজ)	১.২৫ থেকে ১.৫০ গজ (সোয়া এক গজ থেকে দেড় গজ)	ইজার থেকে চার গিরা (৯ ইঞ্চি) বেশী
৩	কুর্তা/জামা	২.৫০ থেকে ২.৭৫ গজ (আড়াই থেকে পৌনে তিন গজ)	১ গজ (এক গজ)	গর্দান থেকে পা পর্যন্ত
৪	সীনাবন্দ	১ গজ	১.২৫ গজ (সোয়া এক গজ)	বগলের নীচ থেকে রান পর্যন্ত
৫	সারবন্দ/উড়না	১.৫০ গজ (দেড় গজ)	.৭৫ গজ অর্থাৎ ১২ গিরা (২৭ ইঞ্চি)	যতদূর পৌছে

(উপরোক্ত পরিমাণটা সাধারণ বড় মানুষের জন্য, ছোটদের জন্য তার সাইজ অনুসারে কেটে নিতে হবে।)

* সর্বমোট কাফনের কাপড় পুরুষের জন্য ৭$\frac{৩}{৪}$ গজ (পৌনে আট গজ) থেকে ৮ গজ এবং মহিলার জন্য ১১$\frac{১}{৪}$(সোয়া এগার) গজ থেকে ১১$\frac{১}{২}$(সাড়ে এগার গজ)। মহিলাদের গোছল ও দাফনের সময় পর্দা রক্ষার জন্য যে কাপড়ের প্রয়োজন সেটা এ হিসাবের বাইরে।

মাইয়েতকে গোসল প্রদানের তরীকা ঃ

* পুরুষ মাইয়েতকে পুরুষ এবং নারী মাইয়েতকে নারী গোসল করাবে। আপনজন আপনজনকে গোসল করানো উত্তম।

* গোসলের স্থান পর্দা ঘেরা হতে হবে।

* যে খাটিয়ায় গোসল দেয়া হবে প্রথমে তিন পাঁচ বা সাত বার সেটায় আগরবাতি ইত্যাদির ধোঁয়া দিবে।

* মাইয়েতকে এমনভাবে খাটিয়ায় শোয়াবে, যেন কেবলা তার ডান দিকে থাকে, সম্ভব না হলে যে কোন ভাবে শোয়ানো যায়।

* একটা লম্বা মোটা কাপড় দিয়ে মাইয়েতের সতর ঢেকে তার ভিতর থেকে তার শরীরের কাপড় (প্রয়োজনে কেটে) খুলে নিবে।

* মাইয়েতের সতর দেখবে না বা সরাসরি হাত লাগবে না।

* বাম হাতে দস্তানা পরিধান করে বা কোন কাপড় পেঁচিয়ে তা দ্বারা মাইয়েতকে তিন বা পাঁচটা ঢিলা দ্বারা ইস্তেনযা করাবে, তারপর পানি দ্বারা ইস্তেনযার স্থান ধৌত করবে।

* অতঃপর তুলা ভিজিয়ে তা দ্বারা ঠোঁট, দাঁত ও দাঁতের মাঢ়ী মুছে দিবে এবং উক্ত তুলা ফেলে দিবে। এভাবে তিন বার করবে।

* অতঃপর অনুরূপভাবে তিনবার নাকের দুই ছিদ্র পরিষ্কার করবে। তবে গোসলের প্রয়োজন (ফরয) অবস্থায় মৃত্যু হলে বা মহিলার হায়েয নেফাস অবস্থায় মৃত্যু হলে মুখে এবং নাকে পানি দেয়া জরুরী। পানি দিয়ে কাপড় বা তুলা দ্বারা উক্ত পানি তুলে নিবে। (احکام میت)

* অতঃপর মুখ এবং নাক ও কানের ছিদ্রে তুলা দিয়ে দিবে, যেন পানি ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে।

* অতঃপর উযূর ন্যায় মুখ ও উভয় হাত ধৌত করাবে, মাথায় মসেহ করাবে এবং উভয় পা ধৌত করাবে।

* অতঃপর সাবান বা এজাতীয় কিছু দ্বারা মাথা (পুরুষ হলে দাড়িও) পরিষ্কার করাবে।

* অতঃপর মাইয়েতকে বাম কাতে শুইয়ে বরই এর পাতা জ্বালানো (অপারগতায় সাধারণ) কুসুম গরম পানি দ্বারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ডান পাশে তিনবার এতটুকু পানি ঢালবে যেন নীচের দিকে বাম পার্শ্ব পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

* অতঃপর অনুরূপ ভাবে ডান কাতে শুইয়ে বাম পাশে তিন বার পানি ঢালবে।

* অতঃপর গোসলদাতা মাইয়েতকে তার শরীরের সাথে ঠেক লাগিয়ে বসাবে এবং পেটকে উপর দিক থেকে নীচের দিকে আস্তে আস্তে মর্দন করবে এবং চাপ দিবে। এতে কিছু মল-মূত্র বের হলে তা মুছে ফেলে ধুয়ে দিবে।

* অতঃপর মাইয়েতকে বাম কাতে শুইয়ে কর্পূর মিলানো পানি ডান পাশে মাথা থেকে পা পর্যন্ত এমনভাবে ঢালবে, যেন নীচে বামপাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

* অতঃপর আর একটি দস্তানা পরিধান করে বা কাপড় হাতে পেঁচিয়ে সমস্ত শরীর কোন কাপড় দ্বারা মুছে শুকিয়ে দিবে। এরপর মাইয়েতকে কাফনের কাপড় পরিধান করাবে।

এ হল মাইয়েতকে গোসল দেয়ার সুন্নাত তরীকা।

* মাইয়েতকে গোসল দেয়ার পর গোসলদাতার নিজেরও গোসল করে নেয়া মোস্তাহাব। (شامی)

* গোসলদাতা মাইয়েতের কোন দোষ (যেমন চেহারা বিকৃত হওয়া, কাল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি) দেখলে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করবে না। পক্ষান্তরে তার কোন ভাল কিছু দেখতে পেয়ে থাকলে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করা মোস্তাহাব।

কাফন পরিধান করানোর নিয়ম (পুরুষের) ঃ

* কাফনের কাপড়ে সর্বপ্রথম তিন পাঁচ বা সাত বার আগরবাতি প্রভৃতির ধোঁয়া দিবে।

* তারপর প্রথম লেফাফা বিছাবে, তার উপর ইজার তার উপর কুর্তা/জামার নীচের অর্ধাংশ বিছাবে এবং অপর অর্ধাংশ মাথার দিকে গুটিয়ে রাখবে। তারপর মাইয়েতকে এই বিছানো কাফনের উপর চিতকরে শোয়াবে এবং কুর্তা/জামার গুটানো অর্ধাংশ মাথার উপর দিয়ে পায়ের দিকে এমনভাবে টেনে আনবে যেন কুর্তার/জামার ছিদ্র (গলা) মাইয়েতের গলায় এসে যায়। এরপর গোসলের সময় মাইয়েতকে যে কাপড় পরানো হয়েছিল সেটা বের করে নিবে এবং নাক, কানও মুখ থেকে তুলা বের করে নিবে। তারপর মাথা ও দাড়িতে আতর প্রভৃতি খুশবূ লাগাবে। অতঃপর কপাল, নাক, উভয় হাতের তালু, উভয় হাটু ও উভয় পায়ে (সাজদার অঙ্গ সমূহে) কর্পূর লাগাবে। তারপর ইজারের বাম পাশ উঠাবে অতপর ডানপাশ (ডান পাশ উপরে থাকবে) তারপর লেফাফার বাম পাশ অতঃপর ডানপাশ উঠাবে। অতঃপর কাপড়ের লম্বা টুকরা বা সুতা দিয়ে মাথা এবং পায়ের দিকে এবং মধ্যখানে (কোমরের নীচে) বেঁধে দিবে, যেন বাতাসে বা নড়াচড়ায় কাফন খুলতে না পারে।

কাফন পরিধান করানোর নিয়ম (মহিলার) ঃ

* কাফনের কাপড়ে সর্বপ্রথম তিন, পাঁচ বা সাত বার আগরবাতি প্রভৃতির ধোঁয়া দিবে।

* প্রথমে লেফাফা বিছাবে, তারপর ইজার, তারপর, সীনাবন্দ, তারপর কুর্তা/জামার নীচের অর্ধাংশ। তারপর মাইয়েতকে কাফনের উপর চিত করে

শোয়াবে। অতঃপর পূর্ববর্ণিত নিয়মানুযায়ী প্রথমে কুর্তা/জামা পরিধান করাবে, অতঃপর মাইয়েতের শরীরের থেকে গোসলের কাপড় বের করে নিবে এবং নাক, কান ও মুখ থেকে তুলা বের করে নিবে। অতঃপর পূর্বোক্ত নিয়মে খুশবূ এবং কর্পূর লাগাবে (মহিলাকে খুশবুর স্থলে জাফরানও লাগানো যায়) অতঃপর মাথার চুল দুইভাগ করে জামার উপর সীনার পরে রেখে দিবে– একভাগ ডান দিকে আরেক ভাগ বাম দিকে। অতঃপর সারবন্দ বা উড়না মাথা এবং চুলের উপর রেখে দিবে (বাঁধবে না বা পেঁচাবে না) অতঃপর সীনাবন্দ বগলের নীচ দিয়ে প্রথমে বাম দিক অতঃপর ডান দিক জড়াবে। অতঃপর ইজারের বাম দিক তারপর ডান দিক এমনভাবে উঠাবে যেন সারবন্দ তার ভিতর এসে যায়। তারপর লেফাফা অনুরূপ ভাবে প্রথমে বাম পাশে তারপর ডান পাশে উঠাবে এবং সবশেষে পূর্বোক্ত নিয়মে তিন স্থানে বেঁধে দিবে। উল্লেখ্য, সীনাবন্দ ইজার ও লেফাফার মধ্যে বা সব কাপড়ের উপর বাইরেও বাঁধা যায়।

জানাযা নামাযের বিবরণ

* জানাযা নামাযে মাইয়েত সামনে থাকা শর্ত। গায়েবানা জানাযা নামায হানাফী মযহাবে জায়েয নেই। (احکام میت نقلا عن الشامی والبحر وغیرهما)

* কেবলা মুখী হয়ে এবং দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়তে হবে। (এ দু'টো ফরয)

* ইমামের জন্য মাইয়েতের সীনা বরাবর দাঁড়ানো সুন্নাত। মুক্তাদীগণের কাতার তিনটা হওয়া মুস্তাহাব।

* নিয়ত করা ফরয। কারও কারও মতে নিয়তের মধ্যে মাইয়েত পুরুষ না মহিলা, ছেলে না মেয়ে তাও নির্ধারিত করা জরুরী।

* আরবীতে নিয়ত এভাবে করা যায়ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ صَلٰوةَ الْجَنَازَةِ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَدُعَاءً لِلْمَيِّتِ - (بہشتی گوہر)

* বাংলায় নিয়ত এভাবে করা যায়ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে এই মাইয়েতের জন্য দুআ করার উদ্দেশ্যে জানাযা নামাযের নিয়ত করছি।

* নিয়ত করার পর নামাযের তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় হাত উঠাবে।

* তারপর আল্লাহু আকবার বলবে (এটা ফরয)। ইমাম আল্লাহু আকবার ও সালাম জোরে এবং মুক্তাদী আস্তে বলবে। অন্যান্য সবকিছু সকলেই আস্তে পড়বে।

* আল্লাহু আকবার বলে নামাযের ন্যায় উভয় হাত বাঁধবে।

* অতঃপর ছানা পড়বে (এটা সুন্নাত)।

* ছানা পড়া শেষে আল্লাহু আকবার বলবে হাত উঠানো ব্যতীত। (এই তাকবীর বলা ফরয)

* অতঃপর দুরূদ শরীফ পড়বে (এটা সুন্নাত)। নামাযের দুরূদ পড়া উত্তম।

* অতঃপর পূর্বের ন্যায় আল্লাহু আকবার বলবে। (এই তাকবীরও ফরয)

* অতঃপর দুআ পড়বে (এটা সুন্নাত)।

* মাইয়েত বালেগ পুরুষ বা বালেগা নারী হলে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ـ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ـ

* আর মাইয়েত নাবালেগ ছেলে হলে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ـ

* আর মাইয়েত নাবালেগা মেয়ে হলে নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً ـ

* দুআ পড়ার পর পূর্বের ন্যায় আল্লাহু আকবার বলবে (এটা ফরয)।

* অতঃপর উভয় হাত ছেড়ে দিয়ে প্রথমে ডান দিকে তারপর বাম দিকে সালাম ফিরাবে। (احسن الفتاوى ج/٤ وبهشتى گوهر) উভয় সালাম ফিরানোর পর হাত ছাড়া যায় কিম্বা ডান দিকের সালামের পর ডান হাত এবং বাম দিকের সালামের পর বাম হাত ছাড়া যায়।

* নামাযে জানাযার পর সাথে সাথে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দুআ করা মাকরূহ ও বেদআত। (احكام ميت ـ خلاصة الفتاوى ـ نفع المفتى والسائل واحسن الفتاوى ج/١)

* জুতা খুলে মাটিতে দাঁড়িয়ে নামাযে জানাযা পড়া উত্তম। অবশ্য দাঁড়ানোর স্থান এবং জুতা পাক হলে জুতা পরেও নামায হয়ে যায়। আর জুতা খুলে জুতার

উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ইচ্ছা হলে জুতার উপরিভাগ পাক হওয়া শর্ত। (কাফন-দাফনের মাসলা মাসায়েল)

* জানাযার জন্য একাধিক লাশ একত্রিত হলে প্রত্যেকের জানাযা পৃথক পৃথক আদায় করা উত্তম। সে ক্ষেত্রে যাকে অধিক নেককার বলে মনে হয় তার জানাযা আগে পড়া ভাল। একত্রেও আদায় করা যায়। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের লাশ থাকলে পুরুষের লাশ ইমামের সম্মুখে, তারপর ছোট বাচ্চাদের, তারপর বয়স্কা মহিলাদের, তার নাবালেগা মহিলাদের– এই তারতীবে লাশ রাখবে। (ঐ)

* যদি ওলীর অনুমতি এবং শিরকতে জানাযার জামাআত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তাহলে পুনর্বার জানাযার নামায পড়া মাকরূহ এবং তা শরীয়ত সম্মত নয়। ওলীর অনুমতি ও শিরকত ব্যতীত প্রথম জানাযা হয়ে থাকলে ওলী দ্বিতীয় বার জামাআত করতে পারে। সেক্ষেত্রেও প্রথমবার যারা জানাযায় শরীক হয়েছে দ্বিতীয়বার তারা শরীক হতে পারবে না। (ঐ)

* কোন কোন স্থানে লাশ সম্মুখে রেখে লোকটা কেমন ছিল প্রশ্ন করা হয় আর উপস্থিত লোকেরা বলে ভাল ছিল, শরীয়তে এরূপ বলার কোন ভিত্তি নেই। (ঐ)

জানাযা বহন করার নিয়ম সমূহ

* মাইয়েত দুধের শিশু বা হাতে হাতে বহনযোগ্য ছোট হলে পর্যায়ক্রমে হাতে হাতে তাকে বহন করে নিয়ে যাবে। আর বড় হলে কোন খাটিয়া প্রভৃতিতে শুইয়ে নিয়ে যাবে, মাথা সামনের দিকে থাকবে।

* খাটিয়ার চার পায়াকে চার জনে উঠাবে।

* খাটিয়ার পায়াকে হাত দ্বারা উঠিয়ে কাঁধের উপর রাখবে।

* কবরস্থান দূর ইত্যাদি কোন ওযর না থাকলে জানাযা গাড়ী বা সওয়ারীতে উঠিয়ে নেয়া মাকরূহ।

জানাযা বহন করার মোস্তাহাব তরীকা ঃ

* প্রথমে মাইয়েতের ডান দিকের সম্মুখ পায়া হাত দিয়ে নিজের ডান কাঁধে উঠিয়ে কমপক্ষে দশ কদম চলবে। অতঃপর ঐদিকের পিছনের পায়া ডান কাঁধে রেখে কম পক্ষে দশ কদম চলবে। তারপর মাইয়েতের বাম দিকের সম্মুখের পায়া বাম কাঁধে রেখে দশ কদম তারপর পশ্চাতের পায়া অনুরূপ বাম কাঁধে রেখে দশ কদম চলবে।

* জানাযা নিয়ে দ্রুত কদমে চলা সুন্নাত। তবে দৌড়ে নয় কিম্বা খুব দ্রুত নয়।

* সঙ্গীরা জানাযার ডানে বায়ে নয় বরং পশ্চাতে চলবে।

* সঙ্গীদের পায়ে হেটে চলা মুস্তাহাব। কোন বাহনে থাকলেও জানাযার পশ্চাতে চলবে।

* জানাযার বহনকারী ও সঙ্গীগণ কোন দুআ, যিকির শব্দ করে পড়বে না। শব্দ করে পড়া মাকরূহ।

* জানাযা কাঁধ থেকে রাখার পূর্বে কেউ বসবে না।

* জানাযার সাথে চলার সময় কোন কথা বলবে না। রাসূল (সঃ) এ সময় খামূশ থাকতেন। (احکام میت)

* দাফন হওয়ার পূর্বে মাইয়েত ওয়ালাদের অনুমতি ব্যতীত কেউ ফিরে আসবে না।

* জানাযা মহিলা হলে খাটিয়া ঢেকে নেয়া মোস্তাহাব।

* জানাযার ইমামত ও দাফন সম্পর্কে মাইয়েতের কোন ওছীয়ত থাকলে সে সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৩৬১ পৃষ্ঠা

দাফনের নিয়ম-পদ্ধতি

* সাধারণ কবরস্থানে দাফন করা সুন্নাত।

* যেখানে যার মৃত্যু হয় সে এলাকার সাধারণ কবর স্থানে তাকে দাফন করা সুন্নাত। অন্যত্র (দুই তিন মাইলের অধিক দূরে) লাশ স্থানান্তর করা সুন্নাতের খেলাফ।

* প্রয়োজনে কবরের জন্য জমি ক্রয়ের অনুমতি রয়েছে।

কেবলা মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে মাইয়েতকে সতর্কতার সাথে উঠিয়ে কবরে নামাবে। (বেহেশতী গওহর)

* মাইয়েতকে কবরে রাখার সময় بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ[১] বলা মোস্তাহাব। (প্রাগুক্ত)

* মাইয়েতকে কেবলামুখী করে ডান কাতে শুইয়ে দেয়া সুন্নাত। চিত করে শুইয়ে শুধু মুখ কেবলামুখী করে দেয়া যথেষ্ট নয়। (বেহেশতী গওহর ও ইসলাহে ইনিকলাবে উম্মত)

* কবরে রাখার পর খুলে যাওয়ার আশংকায় কাফনে যে গিরা দেয়া ছিল তা খুলে দেয়া হবে। (বেহেশতী গওহর)

---

১. অর্থঃ আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর রাসূলের ধর্মের উপর তাকে রাখলাম।

* মহিলাকে কবরে রাখার সময় পর্দা করে নেয়া মোস্তাহাব আর মাইয়েতের শরীর প্রকাশ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে পর্দা করা ওয়াজিব। (প্রাগুক্ত)

* বুগ্‌লী (লাহ্‌দ) কবর হলে কাঁচা ইট, বাঁশ প্রভৃতি দ্বারা বন্ধ করবে আর সিন্দুক কবর হলে কাঠ, বাঁশ বা স্লিপার দিয়ে ঢেকে দিবে এবং ফাকাগুলো বন্ধ করে দিবে।

* তারপর মাটি ফেলবে। মাইয়েতের মাথার দিক থেকে মাটি ফেলতে শুরু করা মোস্তাহাব। (প্রাগুক্ত)

* প্রত্যেক ব্যক্তি উভয় হাতে মাটি নিয়ে তিনবার মাটি ফেলবে। প্রথমবার ফেলার সময় مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ দ্বিতীয়বার وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ এবং তৃতীয়বার وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى পড়বে। (ঐ)

* কবরের পিঠ উটের পিঠের ন্যায় এক বিঘৎ বা তার চেয়ে কিছু বেশী পরিমাণ উঁচু করে বানানো মোস্তাহাব। (ঐ)

* মাটি দেয়া সম্পন্ন হওয়ার পর সর্বশেষে কবরের মাটি জমানোর জন্য কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়া মোস্তাহাব। (احسن الفتاوى ج ٤)

* নিতান্ত অপারগতা ছাড়া এক কবরে একাধিক লাশ দাফন করবে না।

* কবরের দু পাশে খেজুরের ডাল বা যে কোন ডাল পুতে দেয়ার সাথে গলত আকীদা জড়িত হওয়ার কারণে এ থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

(فتاوى دار العلوم ج ٢ واحسن الفتاوى ج ١)

* যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাফন কাফন সারা উত্তম। এমনকি জানাযায় অধিক লোক হবে এজন্যেও বিলম্ব করা সুন্নাতের খেলাফ।

দাফনের পর যা যা করণীয়

* দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর কবরের নিকট কিছুক্ষণ অবস্থান করতঃ মৃতের ক্ষমার জন্য দুআ করবে অথবা কুরআন শরীফ পাঠ করে ছওয়াব পৌঁছে দিবে। এরূপ করা মোস্তাহাব। (احكام ميت)

* মৃত যেন মুনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয় তার জন্য দুআ করবে। এরূপ করা সুন্নাত। (ঐ)

* দাফনের পর কবরের মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরা-বাকারার শুরু থেকে مُفْلِحُونَ পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সূরা-বাকারার শেষ আয়াত সমূহ (آمَنَ الرَّسُولُ থেকে শেষ পর্যন্ত) আস্তে আস্তে পাঠ করা মোস্তাহাব।

(فتاوى دار العلوم ج ٥ واحكام ميت)

* দাফনের পর মাইয়েত পুরুষ হলে নিম্নোক্ত দুআ পড়া উত্তম–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ ـ

এবং মাইয়েত মহিলা হলে নিম্নোক্ত দুআ পড়া উত্তম–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْاِسْلَامِ وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا ـ

মাইয়েতের পরিবারের সাথে অন্যদের যা যা করণীয়

* প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনদের জন্য মোস্তাহাব হল মৃতের পরিবারের জন্য এক দিনের খাবার তৈরী করে পাঠাবে এবং দুঃখের কারণে তারা খেতে না চাইলে পীড়াপীড়ি করে খাওয়াবে। (احکام میت از شامی ودر مختار)

* মৃতের পরিবারকে তিন দিনের মধ্যে (এক বার) সান্ত্বনা জানানো মোস্তাহাব। দূরের লোকেরা শোকবার্তা প্রেরণের মাধ্যমে অর্থাৎ, পত্রের মাধ্যমেও এ মোস্তাহাব আদায় করতে পারেন। শরীয়তের পরিভাষায় এটাকে তাযিয়াত বলা হয়। প্রচলিত শোক প্রস্তাব অনুমোদন ও নীরবতা পালনের কোন শরয়ী ভিত্তি নেই। এটা বিধর্মীদের অনুকরণ বিধায় পরিত্যাজ্য।

* স্বতন্ত্রভাবে একাকী তাযিয়াত করা সুন্নাত। তবে ঘটনাক্রমে যদি একাধিক লোক একত্রিত হয়ে যায় তাতে কোন অসুবিধা নেই। (احسن الفتاوی)

* তাযিয়াতের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(ক) সান্ত্বনা বাণী।

(খ) ছবর ও ধৈর্যের ফযীলত বর্ণনা এবং ধৈর্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান।

(গ) আপনজনের মৃত্যু জনিত কষ্টের জন্য তাদের ছওয়াব লাভের উল্লেখ।

(ঘ) তাযিয়াতের সময় হাত উঠানো ব্যতীত নিম্নোক্ত দুআ পড়া–

اَعْظَمَ اللّٰهُ اَجْرَكَ وَاَحْسَنَ عَزَائَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ ۔ (احسن الفتاوی ج/٤)

* তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে তাযিয়াত করা মাকরূহ, তবে সফরে থাকার কারণে এ সময়ের মধ্যে তাযিয়াত করতে না পারলে এরপরও করতে পারেন।

* তাযিয়াতকারীগণ মৃতের পরিবারের উপর তাদেরকে আপ্যায়ন করানোর বোঝা চাপাবে না। এটা অমানবিকতা এবং সুন্নাতের পরিপন্থী। (احکام میت)

* শোক সভা করা এমনিতে খারাপ নয়। তবে এখন এটা রছমে পরিণত হয়েছে। তদুপরি পত্রপত্রিকায় নাম আসবে এরূপ গলত নিয়তও থাকে, তাই এটা পরিত্যাজ্য। (فتاوی محمودیۃ ج/٢)

কবরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিধি-নিষেধ

* কবরের উপর দিয়ে চলা, বসা এবং কবরের সাথে হেলান দেয়া থেকে বিরত থাকা সুন্নাত। (احکام میت)

* কবরের দেয়াল পাকা করা, কবরের উপর গম্বুজ বানানো বা যে কোন ধরনের ইমারত বানানো থেকে বিরত থাকবে। সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে এরূপ করা হারাম এবং মজবুত বানানোর উদ্দেশ্যে হলে তা মাকরূহ তাহরীমী, যা হারামের নিকটবর্তী। (احسن الفتاوی ج/٤)

* কবর বসে গেলে তাতে দ্বিতীয়বার মাটি দেয়া যায়।

* কবরে বাতি জ্বালানো নিষিদ্ধ। (احسن ج/٤ واحکام میت ۔ زاد المعاد)

* কবরে ফুল দেয়া নিষিদ্ধ ও বেদআত। (احسن الفتاوی ج/٤)

* চেনার জন্য কবরের উপরে কোন পাথর ইত্যাদি আলামত হিসেবে রাখা যায়। (احکام میت)

* প্রয়োজনে নাম ফলক স্থাপন করা যায়, তবে তাতে কুরআনের কথা লেখা নাজায়েয। (احسن الفتاوی ج/٤)

* কবর বা বুযুর্গদের মাজারে চাদর চড়ানো নিষিদ্ধ ও হারাম।
(احکام میت از سنت و بدعت)

* কোন মাজারে মান্নত মানা ও নজর প্রদান করা হারাম। (ঐ)

* মাজারে টাকা-পয়সা প্রদান করা হারাম।

কবর যেয়ারতের আহকাম

* পুরুষদের জন্য কবর যেয়ারত করা মোস্তাহাব। নারী যুবতী হলে তার জন্য কবর স্থানে যাওয়া জায়েয নেই। তবে বৃদ্ধা হলে কান্নাকাটি, মাতম ইত্যাদি শরীয়ত বিরোধী কাজ করবে না– এরূপ একীন থাকলে সাজসজ্জা না করে খুশবূ না মেখে পর্দার সাথে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে।

(احکام میت بحواله شامی ، امداد الفتاوی وامداد الاحکام)

* প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার কবর যেয়ারত করা মোস্তাহাব। (احکام میت)

* শুক্রবার কবর যেয়ারত করা অধিক উত্তম। বৃহস্পতিবার, শনিবার এবং সোমবারও উত্তম। (احسن الفتاوی ج ٤ واحکام میت)

* কবর স্থানে প্রবেশ করে সমস্ত কবরবাসীর উদ্দেশ্যে নিম্ন বাক্যে সালাম করবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ وَنَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ۔ (احسن الفتاوی ج / ٤)

অর্থ ঃ হে মুমিন সম্প্রদায়ের আবাস স্থলের অধিবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আমরাও আল্লাহ চাহেতো তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য শান্তির আবেদন করছি।

* অতঃপর উদ্দিষ্ট মাইয়েতের পায়ের দিক থেকে চেহারার (কেবলার) দিক যেয়ে দাঁড়াবে বা বসবে। বসলে জীবদ্দশায় তার সাথে যেরূপ সম্পর্ক ছিল সে অনুযায়ী নিকটে বা দূরে বসবে। (احسن الفتاوی ج / ٤)

* সালামের পর কেবলার দিকে পিঠ এবং মাইয়েতের (কবরের) দিকে মুখ করে যথা সম্ভব কুরআন শরীফ পড়ে মাইয়েতকে ছওয়াব পৌঁছে দিবে। বিশেষভাবে সূরা-বাকারার শুরু থেকে মুফলিহূন পর্যন্ত, আয়াতুল কুরছী, সূরা-বাকারার শেষ তিন আয়াত অর্থাৎ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে শেষ পর্যন্ত, সূরা-ফাতেহা, সূরা-ইয়াছীন, সূরা-মূল্‌ক, সূরা-তাকাছুর বা সূরা-এখলাস ১১/১২ বার কিম্বা ৭ বার বা যে পরিমাণ সহজে পড়তে পারে পড়ে দূআ করবে। মাইয়েতের মাগফিরাতের জন্যও দুআ করবে। (احکام میت واحسن الفتاوی ج / ٤)

* তিলাওয়াত ও দুআ দুরূদ পড়ার পর কেবলামুখী হয়ে (অর্থাৎ, মাইয়েতের দিকে পিঠ করে) দুআ করবে। (جواهر الفقه از ایصال ثواب للتهانوی)

ঈছালে ছওয়াব ও তার তরীকা

* নফল ইবাদত (যেমনঃ নফল নামায, নফল রোযা, নফল হজ্ব ইত্যাদি) তিলাওয়াত, যিকির-আযকার ও দান-সদকা করে তার ছওয়াব (মৃত বা জীবিতকে) পৌঁছে দেয়া এবং মাইয়েতের জন্য দুআ করাকে ঈছালে ছওয়াব বলে। ঈছালে ছওয়াব দ্বারা আমলকারীর ছওয়াব কমে না বরং আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আমলকারী ও মাইয়েত উভয়কেই পূর্ণ পরিমাণ ছওয়াব দিয়ে থাকেন। কোন আমলের ছওয়াব একাধিক মাইয়েতকে পৌঁছানো হলে আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতার ভিত্তিতে আশা করা যায় যে, সে ছওয়াব ভাগাভাগি করে নয় বরং প্রত্যেককেই আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ পরিমাণ দান করবেন, যদিও যুক্তি অনুযায়ী তা ভাগাভাগি হওয়ারই কথা।

* ইবাদাতে মালিয়া অর্থাৎ, দান সদকা দ্বারা ঈছালে ছওয়াব করা উত্তম। এর মধ্যে কয়েকটি স্তর রয়েছে। যথা ঃ

(ক) নগদ অর্থ প্রদান করা সবচেয়ে ভাল। এরূপ অর্থ সদকায়ে জারিয়ার কাজে ব্যয় করলে আরও উত্তম হবে।

(খ) তারপর কাঁচা খাবার (পাকানো ছাড়া) প্রদান করা।

(গ) আর সর্বনিম্ন স্তর হল খাদ্য-খাবার রান্না করে তা খাওয়ানো।

* ঈছালে ছওয়াবের একটি আদব এই যে, অন্ততঃ কিছু পাঠ করে হলেও (যেমন তিনবার সূরা-এখলাস পাঠ করে) রাসূল (সঃ)-এর রূহে মোবারকে তার ছওয়াব স্বতন্ত্র ভাবে পৌঁছে দিবে।

* মাইয়েতের আপনজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন সকলেই স্বতন্ত্র ভাবে নিজ নিজ স্থানে থেকে তিলাওয়াত ও যিকির-আযকার পূর্বক কিম্বা দুআর মাধ্যমে ঈছালে ছওয়াব করতে পারে। এর জন্য সকলে একত্রিত হয়ে সম্মিলিত ভাবে খতম পড়ার আবশ্যকতা নেই। তদুপরি আজকাল সম্মিলিতভাবে খতম পড়াটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। তাই এই রেওয়াজ পরিত্যাগ করা উচিত।

* টাকা-পয়সার বিনিময়ে কুরআন-খানী বা কোন খতম করালে তার কোন ছওয়াব পাওয়া যায় না। অতএব সেরূপ কুরআন খানী ও খতমের দ্বারা ঈছালে ছওয়াবও হবে না বরং এরূপ বিনিময় গ্রহণ পূর্বক খতম ও কুরআন খানী করা এবং করানো উভয়টা হারাম।

* ঈছালে ছওয়াবের জন্য কোন দিন তারিখ (যেমন ৪ঠা, চল্লিশা, বার্ষিকী ইত্যাদি) নির্ধারণ করা বিদআত। অতএব তা পরিত্যাজ্য। এসব নির্দিষ্ট দিনের অনুসরণ ছাড়াই ঈছালে ছওয়াব করা উচিত।

(احسن الفتاوی ج/١، جواهر الفقه و احکام میت প্রভৃতি থেকে গৃহীত)

পরিবার নীতি

পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার ঃ

পরিবারে বিভিন্ন কারণে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ সব কারণগুলো শুরু থেকেই যদি এড়িয়ে চলা যায়, তাহলে একটা সুখী ও আনন্দময় পরিবার গড়ে তোলা সম্ভব এবং সেই সুখ ও আনন্দকে ধরে রাখা সম্ভব। সাধারণতঃ যে সব কারণে পরিবারে অশান্তি দেখা দিয়ে থাকে নিম্নে সেগুলো প্রতিকার-ব্যবস্থাসহ উল্লেখ করা হল।

(১) **শ্বশুর-শাশুড়ী ও পুত্র-বধূর মাঝে সুসম্পর্ক না থাকা ঃ** সাধারণতঃ শ্বশুর শাশুড়ী পুত্রের উপর অধিকার থাকার সুবাদে পুত্র-বধূর উপরও কর্তৃত্ব করতে চায় এবং পুত্রের ন্যায় পুত্র-বধূকেও বাধ্যগত পেতে এবং রাখতে চায়। তারা পুত্র থেকে যে রকম আনুগত্য ও খেদমত পাওয়ার, পুত্র-বধূ থেকেও সে রকম পেতে চায়। এর ফলে পুত্র-বধূর সাথে কর্তৃত্ব সুলভ আচরণ ও ক্ষেত্র বিশেষে বাদী সুলভ ব্যবহারও করে থাকে। অনেক সময় পুত্র-বধূ প্রফুল্ল চিত্তে না চাইলেও জবরদস্তী তার থেকে শ্বশুর শাশুড়ী কাজ ও খেদমত নিয়ে থাকেন এবং জবরদস্তী পুত্র বধূকে একান্নভুক্ত রাখা হয়। এসব কারণে পুত্র-বধূর স্বাধীন চেতনা আঘাতগ্রস্ত হয়, কখনও কখনও সে আত্মমর্যাদায় আঘাতবোধ করে এবং এ সংসারকে সে আপন বলে মেনে নিতে পারে না, ফলে শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে শুরু হয় তার সম্পর্কের টানা পোড়েন এবং তখনই পুত্র-বধূ তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায়। পুত্র-বধূর আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা এবং তাদের আতিথেয়তা ও আপ্যায়নকে গুরুত্ব না দেয়ার কারণেও অনেক সময় শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি পুত্র-বধূ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

এর প্রতিকারের জন্য মনে রাখা দরকার যে, শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করা মৌলিকভাবে পুত্র-বধূর দায়িত্ব নয়, করলে সেটা তার অনুগ্রহ। বরং এ খেদমতের দায়িত্ব তাদের পুত্রের উপর বর্তায়। পুত্রের পক্ষ থেকে তার বধূ যদি সে খেদমতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয় তাহলে সেটা তার অনুগ্রহ। শ্বশুর-শাশুড়ী যদি পুত্র-বধূর খেদমতকে এ দৃষ্টিভঙ্গীতে মূল্যায়ন করেন, তাহলে পুত্র-বধূর প্রতি তারা প্রীত হবেন এবং তার প্রতি তাদের বাদী সুলভ মনোভাব সৃষ্টি হবে না। এ সম্পর্কে, 'স্ত্রীর অধিকার' অধ্যায়ে (৩৭৭ পৃষ্ঠা) বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(২) **যৌথ পরিবার থাকা ঃ** অনেক সময় একান্নভুক্ত পরিবার থাকার কারণেও সংসারের শান্তি বিনষ্ট হয়। বিশেষভাবে যদি স্ত্রীর জন্য থাকার ঘরও পৃথক করে দেয়া না হয়। স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যেক নারীই এ কামনা করবে যে, স্বামীকে নিয়ে সে স্বাধীনভাবে নিজের মত করে একটা সংসার গড়ে তুলবে, তার থাকার জন্য

একটা ভিন্ন ঘর থাকবে যেখানে সে তার মাল-সামান সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করতে পারবে, যেখানে সে স্বাধীনভাবে স্বামীর সাথে বিনোদন করতে পারবে। যৌথ পরিবার ও একান্নভুক্ত সংসার অনেক ক্ষেত্রেই এ কামনায় বাঁধা সৃষ্টি করে। ফলে শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ, দেবর প্রমুখদের সাথে পুত্র-বধূর বনিবনা হয়ে ওঠে না। অনেক পিতা-মাতাই মনে করে থাকেন তাদের পুত্রের ভিন্ন সংসার গড়ে উঠলে তারা অবহেলিত হবেন, তারা বঞ্চিত হবেন। কিন্তু পুত্রকে যদি তারা যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে পুত্রের সংসার ভিন্ন হলেও পুত্র তাদের অধিকার ও খেদমতে ত্রুটি করবে না– এটাও বাস্তব সত্য। তদুপরি জোর জবরদস্তী কিছুদিন একান্নভুক্ত রাখা হলেও চরম অবনিবনা সৃষ্টি হওয়ার পর এক সময়তো পৃথক হতেই হবে, সেই পৃথক হওয়াটা আগে ভাগে করে ফেললেইতো ভাল। মনে রাখা দরকার–যৌথ পরিবার সাময়িক বিচারে ভাল হলেও স্থায়ী সুসম্পর্কটা বড় কথা। তদুপরি স্ত্রীর অধিকার আছে পৃথক হয়ে যেতে চাওয়ার, অন্ততঃ একটা থাকার ভিন্ন ঘর পাওয়া স্ত্রীর অধিকার। এ সম্পর্কে "স্ত্রীর অধিকার" অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (দেখুন ৩৭৭ পৃষ্ঠা) হযরত থানবী (রহঃ) বলতেন, চুলার আগুন থেকেই সংসারের শান্তিতে আগুন লাগে, অতএব এই যুগে শুরু থেকেই চুলা পৃথক করে দেয়া সমীচীন। (تحفہ زوجین) তবে স্ত্রীরও মনে রাখা দরকার-বিনা প্রয়োজনে স্বামীকে তার মাতা-পিতা ও ভাই বোন থেকে পৃথক করে নিয়ে তাদের মনে কষ্ট দেয়া উচিত নয়।

(৩) **আয়-ব্যয়ের মাঝে ভারসাম্যতা না থাকা ঃ** প্রত্যেক মানুষেরই উচিত তার আয় অনুযায়ী ব্যয় করা। অনেকেই সংসার জীবনের প্রথম দিকে আবেগের বশবর্তী হয়ে সাধ্যের বাইরেও অনেক বেশী ব্যয় করে থাকে। সব ক্ষেত্রেই সে তার স্টাণ্ডার্ড ছাড়িয়ে চলে যায়। এভাবে তার স্ত্রী ও সন্তানাদির স্টাণ্ডার্ড বেড়ে যায় এবং এভাবে চলতে চলতে এক সময় সে ঋণী হয়ে পড়ে কিম্বা এভাবে চলা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। তখন পূর্বের স্টাণ্ডার্ড বজায় রাখার জন্য তাকে অবৈধ আয়ের পথে পা বাড়াতে হয় কিম্বা স্ত্রী পুত্র পরিজনের কাছে হেয় হতে হয়, তাদের মন রক্ষা করা সম্ভব হয় না, ফলে মানসিক শান্তি বিনষ্ট হয়। কুরআনে এক দিকে যেমন কার্পণ্য করতে নিষেধ করা হয়েছে, অপর দিকে এত বেশী হাত খোলা হতেও নিষেধ করা হয়েছে, যাতে পরবর্তীতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতে হয় এবং হেয় হতে হয়। সুতরাং আয় ব্যায়ের মধ্যে ভারসাম্যতা রক্ষা করে চলা উচিত। বিশৃংখল ব্যয় করা নিষিদ্ধ। বিশৃংখল ব্যয় করা বলতে বোঝায়-যা কিছু হাতে আছে তৎক্ষণাৎ তা ব্যয় করে ফেলা এবং ভবিষ্যতে শরীয়তসম্মত প্রয়োজন দেখা দিলে তা পূরণ করতে অক্ষম হয়ে পড়া। এতে বোঝা গেল কিছুটা সঞ্চয়ের নীতিতে চলা কর্তব্য। (ماخوذ از معارف القرآن واسلام کا اقتصادی نظام)

(৪) **স্ত্রীকে সংসার চালানো শিখিয়ে না দেয়া ঃ** কোন গাড়ীর আরোহীগণ যদি গাড়ীর চালককে সহযোগিতা না করে, তাহলে চালক সে গাড়ি নির্বিঘ্নে চালাতে সক্ষম হয় না। তদ্রূপ সংসার জীবনে পুরুষ হল গাড়ী চালকের ন্যায় আর স্ত্রী হল সে গাড়ীর আরোহী এবং কিছুটা সে চালকও বটে। তাই স্ত্রীকে সংসার চালানো শিখিয়ে দেয়া উচিত, যাতে পুরুষের আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে সংসার পরিচালনায় সে সহযোগিতা করতে পারে এবং যাতে স্বামীর আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন ভাবে সংসার চালিয়ে তাকে বিব্রতকর অবস্থায় না ফেলে। স্ত্রীর মধ্যে স্টাণ্ডার্ড বৃদ্ধি করার এবং আরও জাঁকজমকের সাথে চলার মনোবৃত্তি যেন সৃষ্টি হতে না পারে সে জন্য নিজের চেয়ে ধনবান পরিবারের বাড়িতে স্ত্রীকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার বা পাঠানোর এবং তাদের সাথে উঠা-বসার ব্যাপারে সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধু স্ত্রী নয় বরং সংসারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতিও এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

এতসব সতর্ক পদক্ষেপ নেয়ার পরও কখনও যদি স্ত্রী বা সংসারের অন্য সদস্যদের মধ্যে সাধ্যের বাইরে জাঁকজমকের সাথে এবং আড়ম্বরের সাথে চলার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে দুনিয়া ত্যাগের ওয়াজ নছীহত শুনাতে হবে, দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গ অলী-আউলিয়াদের জীবনী ও কাহিনী শুনাতে হবে বা এতদসম্পর্কিত পুস্তক পুস্তিকা পাঠ করাতে হবে এবং গরীবদের সাথে উঠা-বসার ব্যবস্থা করতে হবে। আর যে পরিবেশে যাওয়ার ফলে উক্ত মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়েছে সে পরিবেশ থেকে তাদেরকে যথা সম্ভব দূরে রাখতে হবে।

(৫) **স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সন্দেহ ঃ** স্বামী স্ত্রী একে অপরের চরিত্রের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়লে এ থেকে সংসারে চরম অশান্তি দেখা দিতে পারে। এর থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রথমতঃ উভয়কেই মনে রাখতে হবে যে, দলীল প্রমাণ ছাড়া কারও ব্যাপারে কুধারণা করা অন্যায় এবং পাপ। অতএব দলীল-প্রমাণ ছাড়া নিছক সন্দেহ হয়ে থাকলে মন থেকে সে সন্দেহ ঝেড়ে ফেলতে হবে। যদি মন থেকে সন্দেহ না যায় তাহলে, যে কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয় সে কারণ উল্লেখ করে তাকে স্পষ্ট বলতে হবে যে, এ কারণে আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে তুমি এ থেকে বিরত হও আর বিরত হতে না পারলে আমার জন্য দুআ কর যেন আমার মন থেকে এ সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং নিজেও মন থেকে কু-ধারণা দূর হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করতে থাকবে। এভাবে ইনশাআল্লাহ মন পরিষ্কার হয়ে যাবে। অন্যথায় মনে মনে সন্দেহ, ক্ষোভ চাপা রাখলে সেটা খারাপ পরিণতি ডেকে আনতে থাকবে।

আর বাস্তবিকই যদি দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে জানা যায় যে, স্ত্রীর চরিত্র নষ্ট হচ্ছে, তাহলে যে কারণে সেটা ঘটছে সেটা প্রতিহত করবে। এর জন্য সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল স্ত্রীকে শরীয়তসম্মত পর্দার মধ্যে রাখা। পর্দা ব্যবস্থাই হল চরিত্র ও সতীত্ব সংরক্ষণের সবচেয়ে নিশ্চিত ব্যবস্থা। আর যদি স্বামীর চরিত্র নষ্ট হতে থাকে, তাহলে স্ত্রী যেহেতু জোরপূর্বক স্বামীকে কোন কিছু মানাতে বাধ্য করতে পারবে না এবং এজন্য বকাঝকা করলে স্বামীর জিদ বেড়ে গিয়ে আরও হীতে বিপরীত হতে পারে, তাই স্ত্রীর তখন করণীয় হল ঃ (এক) স্বামীর মতি ভাল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবে। (দুই) যখন স্বামী নির্জনে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে থাকবে এবং ঠাণ্ডা মাথায় থাকবে তখন খুব নরম ভাষায় তাকে বুঝাতে থাকবে এবং (৩) স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য আগের চেয়ে বেশী নিজেকে নিবেদিত করবে। এভাবে হয়ত স্বামীর সংশোধন হয়ে যেতে পারে। এ না করে স্ত্রী যদি এরূপ মুহূর্তে স্বামীকে জব্দ করতে চায়, প্রকাশ্যে হেয় করতে চায় এবং স্বামীর মনোরঞ্জনে পূর্বের চেয়ে পিছিয়ে থাকে, তাহলে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী।

(৬) **একাধিক বিবাহ ঃ** ইসলাম বিভিন্ন প্রয়োজনের ভিত্তিতে একাধিক বিবাহ (এক সঙ্গে সর্বোচ্চ চারজন) পুরুষের জন্য জায়েয রেখেছে। তবে শর্ত হল পুরুষ তার সকল স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ ও সমতা বজায় রাখবে। স্বামী আরও স্ত্রী ঘরে আনুক, আরও একটা বিবাহ করুক সাধারণভাবে স্ত্রী তা মেনে নিতে চায় না এবং এ জন্য মনোমালিন্য ও সংসারে অশান্তি লেগে যায়। এ অশান্তির প্রতিকারের জন্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই কিছু করণীয় রয়েছে। স্বামীর করণীয় হল-যদি একান্তই তাকে আবার বিবাহ করতে হয় তাহলে যে কারণে আগের স্ত্রী পরবর্তী বিবাহকে মেনে নিতে পারছে না অর্থাৎ সে আশংকা করছে যে, অন্য স্ত্রীকেই বেশী আদর সোহাগ করা হবে এবং তার আদর সোহাগ কমে যাবে, তার সন্তানাদি অবহেলিত হবে ইত্যাদি– স্বামীর কর্তব্য কার্যতঃভাবে এ আশংকাকে দূর করা অর্থাৎ, সে সকল স্ত্রীর মধ্যে পূর্ণভাবে সমতা রক্ষা করবে, সকলকেই এক দৃষ্টিতে দেখবে, সকলের সাথে এক রকম আদর সোহাগের আচরণ করবে, তাহলে আস্তে আস্তে পূর্বের স্ত্রী স্বাভাবিক হয়ে আসবে। আর স্ত্রীর কর্তব্য হল প্রথমতঃ সে মনকে বুঝাবে যে, পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ করা যখন জায়েয, তখন আমার সেটা মেনে নিতে বাঁধা কোথায়। দ্বিতীয়তঃ সে জিদ ধরে স্বামীর খেদমত ও মনোরঞ্জনে ত্রুটি করবে না; তাহলে এই অবসরে পরবর্তী স্ত্রীর দিকে স্বামী বেশী ঝুঁকে পড়বে বরং তার জন্য উচিত হল স্বামীকে আরও বেশী আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা, যাতে স্বামীকে ভারসাম্যতার পর্যায়ে রাখা যায়। তৃতীয়তঃ সতীনকে প্রকাশ্যে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া। যদি সতীনের সাথে প্রকাশ্যে শত্রুতার আচরণ করা হয়, তাহলে সেও তাকে শত্রু ভাববে। এভাবে শুরু

থেকেই অমিল লেগে গেলে ভবিষ্যতে তাকে আপন করে নেয়া কঠিন হবে। মনে রাখতে হবে- নতুন সতীনকে আপন করে নিতে না পারলে সংসারে যে অশান্তি আসবে, সে অশান্তি শুধু নতুন সতীনই ভোগ করবে না, তাকেও ভোগ করতে হবে। তাই জিদ ধরা নয় বরং বুদ্ধিমত্তা হল শুরু থেকেই সতীনকে আপন করে নিয়ে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করা। আর নতুন স্ত্রীকেও মনে রাখতে হবে যে, তার স্বামীর পুরাতন স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে, যেমন তার অধিকার রয়েছে। অতএব পুরাতন স্ত্রী থেকে স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের কুক্ষিগত রাখার প্রচেষ্টা অত্যন্ত অন্যায়। নতুন স্ত্রী যদি স্বামীকে সব স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে, তাহলে এক দিকে স্বামী অন্যায় থেকে রক্ষা পাবে অপর দিকে আগের স্ত্রীও তাহলে নতুনের প্রতি মুগ্ধ হবে এবং সর্বোপরি সংসারের শান্তি রক্ষা হবে।

(৭) **তালাক সম্পর্কিত কুসংস্কার** ঃ তালাক দেয়া বা না দেয়া উভয় ক্ষেত্রেই সমাজে বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিকতা রয়েছে। কিছু লোক কথায় কথায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, নিতান্ত ঠেকা ছাড়াই সামান্য সামান্য কারণে রাগের মাথায় তালাক দিয়ে দেয় এবং তিন তালাক দিয়ে বসে, যাতে করে পরে হুঁশ ফিরে এলেও আর স্ত্রীকে রাখা তার জন্য জায়েয থাকে না, তখন সে নানান ভাবে পারিবারিক অশান্তিতে পড়ে যায়। মনে রাখতে হবে অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া বা নিতান্ত ঠেকা ব্যতীত তালাক দেয়া স্ত্রীর প্রতি জুলুম এবং অন্যায়। আর কখনও তালাক দিতে হলেও এক তালাক দেয়া সমীচীন, যাতে পরে সম্বিত ও হুশ ফিরে এলে প্রয়োজন বোধে আবার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যায়। সারকথা- রাগের মাথায় তালাক দেয়া পরিবারে অশান্তি ডেকে আনতে পারে।

আবার কতক লোক সমাজের নিন্দা সমালোচনার ভয়ে, পরিবারের তথাকথিত ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য নিতান্ত ঠেকায় পড়েও স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে না। স্ত্রীর সাথে কোনভাবেই তার বনিবনা হচ্ছে না, কোনভাবেই তারা মিলেমিশে চলতে পারছে না, দাম্পত্য জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, তবুও তালাক দিতে পারছে না, ফলে সারাটা জীবন তাদের অশান্তিতে কাটছে। এটাও এক ধরনের কুসংস্কার। হিন্দুয়ানী কুসংস্কারের ফলেই তালাককে এত জঘন্য মনে করা হয়। ইসলামে তালাক দেয়াটা অত্যন্ত গর্হিত বটে, কিন্তু তা সব সময়ে এবং সব পরিস্থিতিতে নয় বরং কোন কোন পরিস্থিতিতে তালাক দেয়াটা মোস্তাহাব এবং উত্তম হয়ে দাঁড়ায়। এমন কি কোন কোন পরিস্থিতিতে তালাক দেয়া ওয়াজিব ও জরুরী হয়ে পড়ে। ফেকাহায়ে কেরাম বলেছেন ঃ স্ত্রী যদি স্বামীকে কষ্ট দেয় বা নির্যাতন করে, কিম্বা মোটেই নামায না পড়ে, বা বোঝানো সত্ত্বেও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে উক্ত স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়াটাই মোস্তাহাব ও উত্তম। আর

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ব্যাপারটা যদি এমন দাঁড়ায় যে, স্বামী স্ত্রীর অধিকার আদায় করতে পারে না, তাহলে স্ত্রীকে তালাক দেয়া ওয়াজিব হয়ে পড়ে। (অবশ্য যদি স্ত্রী তার অধিকার ছেড়ে দেয় তাহলে ভিন্ন কথা) এতএব কোন ক্রমেই যে স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না নিন্দা সমালোচনার ভয়ে কিম্বা বংশে কেউ তালাক দেয়নি কাজেই তালাক দেয়া যাবে না-এই ঐতিহ্য রক্ষা করতে গিয়ে উক্ত স্ত্রীকে রেখে জীবনকে দুর্বিষহ করার কোন অর্থ নেই। যখন পারস্পরিক অনৈক্যের কোনই সমাধান করা সম্ভব হয় না, তখন তালাক দিয়ে দেয়াই সমীচীন।

(ماخوذ از تحفه زوجین واحسن الفتاوی ج ۵)

(৮) **অত্যাধিক মহর ধার্য করা ঃ** অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্প্রীতি না থাকা সত্ত্বেও স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে না শুধু এই কারণে যে, তার ঘাড়ে চেপে আছে বিরাট অংকের মহর, যেটা পরিশোধ করার সাধ্য তার নেই। আবার এই মহরের অংক বড় থাকার সুবাদে অনেক স্ত্রীও স্বামীর অবাধ্য হওয়ার বা স্বামীকে যথাযথভাবে তোয়াক্কা না করার দুঃসাহস পায় এই ভেবে যে, সে যতই করুক স্বামী তাকে ছাড়ার সাহস পাবে না মহর পরিশোধ করার ভয়ে। সাধ্যের বাইরে অত্যাধিক মহর ধার্য করলে এভাবে সেটা সংসারের অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, মহরটাই তখন হয়ে দাঁড়ায় জীবনের জন্য কাল, অশান্তি দূর করার পথে অন্তরায়। ইসলামের দৃষ্টিতে মহর পরিশোধ যোগ্য একটি ঋণ, অন্যান্য ঋণের ন্যায় এ ঋণও পরিশোধ করা ওয়াজিব- এই চিন্তা থাকলে কোন স্বামীই শুধু নাম শোহরতের জন্য তার সাধ্যের বাইরে মহর ধার্য করত না। কিম্বা করে থাকলেও ক্রমান্বয়ে তা পরিশোধ করে দিলে পরবর্তীতে তার জন্য সেটা কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। মূলতঃ সমাজ মহরকে শুধু ধার্য করার বিষয় মনে করে, এটা যে পরিশোধ করা জরুরী তা মনে করে না, যার ফলেই সাধ্যের বাইরে মোটা অংকের মহর বাঁধা হয় এবং এটা কোন এক সময় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

(৯) **যৌতুক প্রথা ঃ** আমাদের বর্তমান সমাজে যৌতুক একটি বিরাট পারিবারিক অশান্তির কারণ। এই যৌতুকের অভিশাপে বহু নারীকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়, বহু নারীকে জীবন দিতে হয় এবং বহু পরিবারে শান্তি বিনষ্ট হয়। যৌতুক একটি সামাজিক অভিশাপ এবং এটা সমাজের এক রকম মানসিক সংক্রামক ব্যাধি। এই ব্যাধি থেকে সমাজকে মুক্ত করা অপরিহার্য। যৌতুক চাওয়া যে অবৈধ, এটা একটা ঘৃণিত পন্থা, এটা অনধিকার চর্চা, এর কারণে যে স্ত্রীর কাছে হীন ও নীচ বলে প্রতিপন্ন হতে হয়-এসব কথাগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার হওয়া আবশ্যক, তাহলে হয়ত ধীরে ধীরে এই ব্যাধি সমাজের মন-মানসিকতা থেকে দূর করা সম্ভব হতে পারে। অগ্রীম প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে ব্যক্তিগত ভাবে যারা যৌতুক চায় বা যৌতুক পাওয়ার লালসা রাখে তাদের সাথে বৈবাহিক

সম্পর্ক স্থাপন না করাই উচিত। এরূপ সামাজিক অপরাধ প্রতিহত করার জন্য ইসলামের আলোকে কোন কঠোর আইনও প্রণয়ন করা যেতে পারে। যৌতুক সম্পর্কিত মাসায়েল এবং আরও কিছু কথা জানার জন্য দেখুন ৪৮৮ পৃষ্ঠা।

(১০) **সন্তানাদির দ্বীনদার না হওয়া ঃ** সন্তানাদি যদি পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, খারাপ পথে চলে, এক কথায় সন্তানাদি যদি দ্বীনদার ও ভাল না হয়, তাহলে সংসারে সেটা বিরাট অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর প্রতিকার হল সন্তানাদিকে দ্বীনদার বানানো। সন্তানাদিকে দ্বীনদার বানানো ও ভাল করে গড়ে তোলার পদ্ধতি সম্পর্কে দেখুন ৪৯৯ পৃষ্ঠা।

(১১) **পারস্পরিক অধিকার আদায় না করা ঃ** পরিবারের মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন ও ছেলে-মেয়ের মধ্যে একের প্রতি অপরের যে অধিকার তা আদায় না করলে, যার যা করণীয় তা না করলে পরস্পরে অমিল এবং এই অমিল থেকে অশান্তির সূত্রপাত ঘটতে পারে। এ সব অধিকার সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৩৬৬ পৃষ্ঠা থেকে ৩৯৯ পৃষ্ঠা।

উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও আরও বিভিন্ন কারণে পরিবারে অশান্তি দেখা দিতে পারে, বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম থেকে তার ইসলামী সমাধান জেনে নেয়া যেতে পারে।

স্ত্রী অবাধ্য হলে তখন যা যা করণীয়

* স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্য হয়ে যায় বা এমন আশংকা দেখা দেয় কিম্বা স্বামীর আনুগত্যের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে, তাহলে সে স্ত্রীকে সংশোধনের জন্য স্বামীদেরকে যথাক্রমে পাঁচটি উপায় বলে দেয়া হয়েছে ঃ

(১) প্রথম পর্যায়ে ধৈর্য ধারণ করবে।

(২) তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে, উপদেশ দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করবে।

(৩) তাতেও কাজ না হলে তৃতীয় পর্যায়ে স্ত্রীকে সতর্ক করার জন্য স্ত্রী থেকে ভিন্ন বিছানায় শয়ন করবে বা এক বিছানায় থেকেও ভিন্ন দিকে পাশ ফিরিয়ে শুয়ে থাকবে। এই ভদ্র জনোচিত শাস্তির পরও যদি সে তার দুষ্কর্ম থেকে এবং অবাধ্যতা থেকে ফিরে না আসে তাহলে চতুর্থ পর্যায়ে

(৪) তাকে সাধারণভাবে হালকা মারধর করার অনুমতি রয়েছে অর্থাৎ, এমন মারধর, যাতে তার শরীরে মারধরের প্রতিক্রিয়া বা জখম না হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পরবর্তী পরিচ্ছেদ দেখুন।

(৫) উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করার পরও যদি স্ত্রী কথা মানতে আরম্ভ না করে এবং মনোমালিন্য ও বিবাদ দীর্ঘায়িত হয়ে যায়-চাই তা স্ত্রীর স্বভাবের জটিলতা বা অবাধ্যতার কারণে হোক বা পুরুষের অহেতুক কড়াকড়ির কারণে হোক-তাহলে পঞ্চম পর্যায়ে সরকার বা উভয় পক্ষের মুরব্বী, অভিভাবক কিম্বা মুসলমানদের কোন শক্তিশালী সংস্থা তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে আপোষ করে দেয়ার জন্য দু'জন শালিস নির্ধারণ করে দিবেন– একজন পুরুষের পরিবার থেকে আর একজন স্ত্রীর পরিবার থেকে। তারা যদি আন্তরিকতার সাথে সৎ নিয়তে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি ও সমস্যার সমাধান করতে আগ্রহী হয়ে কাজ করেন, তাহলে আল্লাহ তাআ'লা তাদের কাজে সহায়তা দান করবেন এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করে দিবেন।

(معارف القرآن و تحفه زوجين)

স্ত্রীকে শাসন করার পদ্ধতি ও মাসায়েল

* হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী নারীগণ বক্র স্বভাবের হয়ে থাকে। তাদেরকে একেবারে ছেড়ে দিলে বক্রই থেকে যাবে, আবার অতিরিক্ত কড়া শাসন পূর্বক সম্পূর্ণ সোজা করতে চাইলে ভেঙ্গে যাবে। তাই নারীদেরকে শাসনও করতে হবে এবং শাসনের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। তাদেরকে সংশোধনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে, তবে পূর্ণ সংশোধন হবে– এমন আশা রাখা যায় না।

* স্ত্রী অবাধ্য হলে বা যথাযথ আনুগত্য না করলে তাকে সংশোধনের জন্য পূর্বের পরিচ্ছেদে বর্ণিত ধারায় পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থাৎ, প্রথমে তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে এবং উপদেশ দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। এ উদ্যোগ ব্যর্থ হলে বিছানায় তাকে ত্যাগ করতে হবে। এ পন্থায়ও সংশোধন না হলে তারপর তাকে কিছুটা হালকা মারধর করেও সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। অনেক মুফাসসিরদের মতে এ তিনটি পন্থার মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, বুঝানো এবং উপদেশ প্রদানের পূর্বেই বিছানায় ত্যাগ করা জায়েয নয় বা বুঝানো ও বিছানায় ত্যাগ করার পন্থাদ্বয় গ্রহণ না করে প্রথমেই মারধর করে সংশোধন করতে যাওয়া বৈধ নয়।

* স্ত্রীকে মারধর করার ব্যাপারে যে অনুমতি দেয়া হয়েছে সে ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে– এ মারধর অর্থ নির্যাতন করা নয়, তাকে কষ্ট দেয়া নয় কিম্বা তাকে লাঞ্ছিত করা নয় বরং তার আত্মমর্যাদায় আঘাত দিয়ে সঠিক পথে ফিরিয়ে

আনা। এ জন্যেই ফোকাহায়ে কেরাম শর্ত করেছেন, শরীরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়-এমন ভাবে মারা যাবে না, চেহারায় মারা যাবে না, কোন কোন মুফাসসির বলেছেনঃ এক স্থানে একাধিক বার আঘাত করা যাবে না এবং কোন কোন মুফাসসির বলেছেনঃ মারবে রুমাল বা কাপড় পেঁচিয়ে তা দ্বারা বা মেসওয়াক দ্বারা। তদুপরি এই যতটুকু মারধর করার অনুমতি দেয়া হয়েছে তাও সব ক্ষেত্রে নয় বরং ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেনঃ সাধারণভাবে চার কারণে মারা যেতে পারে। **(এক)** স্বামী যৌন চাহিদা পূরণ করতে আহবান করার পরও স্ত্রী যদি অমান্য করে। **(দুই)** শরীয়তসম্মত ওযর ছাড়া স্বামীর বিনা অনুমতিতে বাড়ির থেকে বের হলে। **(তিন)** স্বামীর বলা সত্ত্বেও যদি স্ত্রী সাজসজ্জা ও রূপচর্চা না করে **(চার)** শরীয়তের ফরয কর্ম পরিত্যাগ করলে; যেমন নামায না পড়লে, ফরয গোসল না করলে ইত্যাদি।

* সর্বোপরি কথা হল-মারধর করাটার অনুমতি রয়েছে বটে কিন্তু সেটা পছন্দনীয় পন্থা নয়। হযরত রাসূল (সঃ) এ পর্যায়ের শাস্তি দানকে পছন্দ করেননি বরং তিনি বলেছেন, ভাল লোক এমন করে না।

(معارف القرآن এবং المسائل الزوجية وحلها থেকে গৃহীত)

* স্ত্রীকে শাসন ও সংশোধন করার জন্য বকাঝকা করা, গালমন্দ করা বা মারধর করার ক্ষেত্রে অনেকেই রাগের বশে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। যার ফলে একদিকে শাসনের ফায়দা নষ্ট হয়ে যায়, আবার পরে নিজের বাড়াবাড়ির জন্য নিজেকেই লজ্জিত হতে হয়। এর থেকে বাঁচার উপায় হল। **(এক)** ঠিক রাগের মুহূর্তে কিছুই বলবে না বা কিছুই করবে না। **(দুই)** কি কি শব্দ বলে তাকে গালমন্দ করতে হবে কিম্বা কিভাবে কোন স্থানে কতটুকু প্রহার করবে তা আগে চিন্তা করে স্থির করে নিবে। **(তিন)** গালমন্দ বা প্রহার করার পূর্বে চিন্তা করে নিবে যে, পরে আবার তার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে কত কিছু করা হবে, তখন যেন শরম পেতে না হয়। এ তিনটি পন্থা গ্রহণ করলে শাসনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

* স্ত্রীকে শাসনের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে স্বামী শাসক আর স্ত্রী শাসিত নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শাসক শাসিতের সম্পর্ক নয় বরং তাদের মধ্যে সম্পর্কটা হল ভালবাসার সম্পর্ক, প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্ক। অতএব কোন শাসনই যেন ভালবাসার চেতনা বাদ দিয়ে নিছক রাগ ও ক্ষোভ চরিতার্থ করার জন্য না হয়।

(بتصرف تحفه زوجين)

স্ত্রীর প্রতি স্বামী রাগান্বিত হলে স্ত্রীর যা যা করণীয়

কোন কারণে স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত হয়ে যায় তখন স্বামীর রাগকে প্রশমিত করার জন্য এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্ত্রীর চারটা কাজ করণীয়। যথা ঃ

(১) স্ত্রীকে মনে করতে হবে যে, সে স্বামীর অধীনস্ত ও স্বামীর কর্তৃত্বাধীন এবং এই অধীনস্ত ও কর্তৃত্বাধীন থাকার মধ্যেই সাংসারিক ও পারিবারিক কল্যাণ এবং শৃংখলা নিহিত, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ীও এরকমই হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব স্বামীর রাগ সাময়িকভাবে তাকে সহ্য করে নিতে হবে, তার পক্ষেও উল্টা রাগ হওয়াটা সমীচীন হবে না।

(২) স্বামী যদি রাগান্বিত হয় আর প্রকৃত পক্ষে স্ত্রীর কোন অন্যায় নাও থাকে, তবুও সেই মুহূর্তে স্ত্রীর চুপ থাকা বাঞ্ছনীয়–স্বামীর সাথে তর্ক জুড়ে দেয়া ঠিক নয়। তর্ক শুরু করলে স্বামীর রাগ আরও বেড়ে যেতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে; যেমন মারধরের দিকে যেতে পারে বা খোদা নাখাস্তা তালাকের দিকেও যেতে পারে। রাগের মুহূর্তেই এসব ঘটে থাকে। অতএব রাগ বৃদ্ধি না করে তা প্রশমিত করা উচিত। স্ত্রীর যদি কোন অন্যায় না থাকে আর সে স্বামীর অন্যায় রাগের মুহূর্তেও চুপ থাকে– কথা কাটাকাটি না করে, তাহলে পরে স্বামীর যখন রাগ ঠাণ্ডা হবে তখন সে নিজের অন্যায় রাগের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং স্ত্রীর প্রতি মুগ্ধ হবে, তার অনুগত হয়ে পড়বে আর ভবিষ্যতে রাগ করতে গেলেও ভেবে চিন্তে রাগ করবে।

(৩) স্বামীর রাগের পেছনে স্ত্রীর অন্যায় থাকুক বা না থাকুক স্ত্রীর উচিত খোশামেদ তোশামোদ করে হলেও স্বামীর রাগ ভাঙ্গানো। স্ত্রীর যদি অন্যায় থাকে তাহলে তো তার জিদ ধরা চরম অন্যায় হবে বরং সে মুহূর্তে তার ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত। যদি তার অন্যায় নাও থাকে, তবুও সে জিদ ধরলে হয়তবা স্বামীকে নত করা সম্ভব হবে না। তাহলে তার সামান্য জিদের কারণে পরিণতি খারাপ হয়ে পড়তে পারে। স্ত্রীর একথা মনে করা উচিত নয় যে, আমার অন্যায় নেই, অতএব খোশামোদ করতে যাওয়া আমার জন্য অপমানজনক বরং এই খোশমোদের ফলে স্বামীকে স্বাভাবিক করতে পারলে পরে স্বামীর হুশ ফিরে আসার পর সে উক্ত স্ত্রীর প্রতি মুগ্ধ এবং তার অনুগত হয়ে যাবে। এভাবেই তার মান বেড়ে যাবে।

(৪) চুপ থেকে, তর্ক না করে, খোশামোদ-তোশামোদ করেও যদি স্বামীর রাগ ভাংগানো না যায়, তাহলে নির্জনে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে তার কাছে সত্যিকার অবস্থা তুলে ধরবে এবং নিজের অন্যায় থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিবে। ইনশাআল্লাহ স্বামীর রাগ প্রশমিত হবে।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর রাগ এলে স্বামীর যা যা করণীয়

কোন দোষ-ত্রুটির কারণে স্ত্রীর প্রতি রাগ এসে গেলে তখন স্বামীর করণীয় হল ঃ

(১) স্বামীর চিন্তা করা উচিত যে, প্রাকৃতিক নিয়মে এবং আইনগত ভাবে স্ত্রী তার কর্তৃত্বাধীন ও অধীনস্ত হলেও সেও স্ত্রীর ভালবাসা ও খেদমতের ঋণে তার কাছে দায়বদ্ধ। এ হিসেবে সে স্ত্রীর অনুগ্রহের অধীন। স্ত্রীর প্রতি তার অনুগ্রহ থাকলে তার প্রতিও স্ত্রীর অনুগ্রহ রয়েছে। স্ত্রীর যেমন স্বামীকে প্রয়োজন, স্বামীরও স্ত্রীকে প্রয়োজন, উভয়েই উভয়ের কাছে ঠেকা। অতএব এক তরফা ভাবে কর্তৃত্ব সুলভ মনোভাব নিয়ে কথায় কথায় স্ত্রীর প্রতি রাগ করা তার পক্ষে ঠিক নয়।

(২) স্বামীর সব সময়ই স্ত্রীর অসহায়ত্ব এবং তার জন্য স্ত্রীর আপনজন ছেড়ে চলে আসার কথা স্মরণ করা দরকার, তাহলে স্ত্রীর প্রতি রাগ নয় বরং সহানুভূতি জাগ্রত হবে এবং রাগের মুহূর্তে এটা স্মরণ করলে রাগ প্রশমিত হবে।

(৩) কোন একটা দোষের কারণে রাগ এসে গেলে তার অন্য অনেক গুণ রয়েছে সেগুলো স্মরণ করে তার প্রতি প্রীত হওয়ার চেতনা জাগ্রত করবে।

(৪) উপরোক্ত পন্থায় রাগ প্রশমিত না হলে রাগ দমন করার স্বাভাবিক যে পদ্ধতিগুলো রয়েছে তার উপর আমল করবে। এর জন্য দেখুন ৫৪৪ পৃষ্ঠা।

স্ত্রীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে তার প্রতিকার

দোষ-গুণে মানুষ। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু দোষ থাকে, আবার তার অনেক গুণও থাকে। স্ত্রীর মধ্যেও এমন কিছু পরিলক্ষিত হতে পারে যা স্বামীর কাছে অপছন্দ লাগবে। যদি স্ত্রীর মধ্যে এমন কিছু পরিলক্ষিত হয় যা স্বামীর কাছে অপছন্দ লাগে এবং তার কারণে স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করতে মনে চায় বা তাকে ছেড়ে দিতে মনে চায় কিম্বা তার প্রতি ভালবাসা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা বোধ হয়, সে মুহূর্তে তার প্রতিকারের জন্য স্বামীকে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো চিন্তায় আনতে হবে–

(১) তার অন্যান্য গুণাবলীর কথা চিন্তা করা এবং এভাবে তার প্রতি মুগ্ধ হওয়ার চেষ্টা করা।

(২) এই চিন্তা করা যে, এ সব দোষ দেখেও যদি সবর করা হয়, তাহলে ছওয়াব হবে এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। অতএব আল্লাহ আমাকে এ স্ত্রী দান করে আমার প্রতি অনুগ্রহই করেছেন-আমার ছওয়াব লাভ ও মর্যাদা বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছেন।

(৩) নিজের কিছু দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ করে ভাববে যে, আমার এসব দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেওতো স্ত্রী আমাকে ভালবেসে যাচ্ছে, সে ছবর করে যাচ্ছে, তাহলে আমি কেন তার দোষ-ত্রুটি দেখে ছবর করতে পারব না, আমি কেন এসব সত্ত্বেও তাকে ভালবাসতে পারব না?

(৪) একান্ত তাকে ছেড়ে দিতে মনে চাইলে এই চিন্তা করবে যে, আমি তাকে ছেড়ে দিলে সে অন্য কোন মুসলমান ভাইয়ের ঘরে যাবে এবং তার কষ্টের কারণ হবে। অতএব তাকে রেখে দিলে অন্য ভাইকে কষ্ট পাওয়া থেকে রক্ষা করার ছওয়াব পাওয়া যাবে। অন্যথায় অন্য আর এক ভাইকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমিও দায়ী হয়ে যাই কি না?

(৫) স্ত্রীর এমন কোন কিছুর কারণে যদি তাকে অপছন্দ লাগে, যা তার এখতিয়ার বহির্ভূত; যেমন স্বামী ছেলে কামনা করে অথচ স্ত্রীর গর্ভে শুধু কন্যাই জন্ম নেয় বা তার সন্তানই হয় না। কিম্বা স্ত্রীর একের পর এক রোগ ব্যাধি লেগে থাকে ইত্যাদি, আর এ কারণে যদি স্ত্রীকে স্বামীর অপছন্দ লাগে, তাহলে স্বামীর ভেবে দেখতে হবে যে, এ অপছন্দ লাগার জন্য স্ত্রী দায়ী নয়, এতে স্ত্রীর কোন দোষ নেই। এ ক্ষেত্রে রাগ করা হলে এ রাগ মূলতঃ তাকদীরের উপর এবং আল্লাহর ফায়সালার উপর গিয়ে পড়ে, যা মারাত্মক অন্যায়। তাকদীরের উপর সন্তুষ্টি এবং তাকদীরের উপর যথার্থ বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমেই এ রকম অপছন্দ লাগাকে দূর করা সম্ভব।

(৬) এই চিন্তা করবে যে, আমরা আল্লাহর কত নাফরমানী করি, আল্লাহর অপছন্দ লাগার কত কাজ করি, তারপরও আল্লাহ আমাদের সাথে করুণার আচরণ করেন। আল্লাহর এ চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে আমারও উচিত করুণার আচরণ করা।

স্বামীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে তার প্রতিকার

স্ত্রীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে তার প্রতিকারের জন্য স্বামীকে যে সব বিষয় চিন্তা করে দেখতে হবে–যা পূর্বের পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে, তদ্রূপ স্বামীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে মন থেকে সে অপছন্দ লাগাকে দূর করার জন্য স্ত্রীকেও সে বিষয়গুলো চিন্তা করতে হবে। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ দেখে নিন।

স্বামীকে বশীভূত করার পদ্ধতি ও মাসায়েল

* স্বামীকে বশীভূত করার অর্থ যদি এই হয় যে, স্বামী স্ত্রীর বাধ্যগত হয়ে থাকবে, তার কথায় স্বামী উঠা-বসা করবে এবং স্ত্রী স্বামীর নাকে রশি লাগিয়ে ঘুরাতে পারবে, এরকম বশীভূত করতে চাওয়া ঠিক নয়। এরকম বশীভূত করার

জন্য কোন তাবীয তুমার করাও হারাম। কেননা, এটা শরীয়তের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। শরীয়ত চায় স্বামী স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করবে এবং স্ত্রী স্বামীর অনুগত ও বাধ্যগত থাকবে। তবে হাঁ স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তাকে যথাযথ ভাল না বাসে, তার হক আদায়ে ত্রুটি করে, তাহলে তাকে বশীভূত করতে চাওয়া এই অর্থে যে, সে স্ত্রীর প্রতি যেন সন্তুষ্ট হয়ে যায়, স্ত্রীকে যেন যথার্থ ভালবাসে, তার হক সমূহ যেন আদায় করে, এরূপ বশীভূত করতে চাওয়া অন্যায় নয়। স্বামীকে এরূপ বশীভূত করার সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল স্ত্রী স্বামীর সাথে খোশামোদ-তোশামোদ করে চলবে, স্বামীর কল্যাণ ও স্বামীর খেদমতের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদিত করে দিবে। একথা মনে রাখা দরকার যে, জোরপূর্বক স্বামীকে বশীভূত করা যায় না। কোন স্ত্রী জোর জবরদস্তী করে, রাগারাগি করে, জিদ ধরে, তর্কাতর্কি করে, ঝগড়া ফ্যাসাদ করে স্বামীকে স্থায়ীভাবে বশীভূত করতে পারে না। একমাত্র খোশামোদ-তোশামোদ করেই স্বামীকে অনুগত করা যায়। তবে হাঁ, এভাবেও যদি স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে না পারে, এভাবেও যদি স্বামী থেকে ভালবাসা ও তার অধিকার আদায় করতে না পারে, তখন কুরআন হাদীসের যে কোন ঝাড়-ফুঁক বা তাবীজ ব্যবহার করলে করতে পারে। যেমন নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ পূর্বক কোন মিষ্টান্ন দ্রব্যে দম করে স্বামীকে খাওয়ানো হলে ইনশাআল্লাহ স্বামী স্ত্রীর প্রতি মেহেরবান হয়ে যাবে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ۔

তবে উল্লেখ্য যে, অবৈধ স্থানে এরকম করলে কোন আছর হবে না।

(تحفه زوجين থেকে গৃহীত)

শ্বশুর বাড়ীতে বসবাস ও সকলের সাথে মিলে মিশে থাকার নীতি

শ্বশুর বাড়ীতে বসবাসের কতিপয় আদব ও নীতি রয়েছে, যা মেনে চললে শ্বশুর বাড়ীর সকলের সাথে মিলে মিশে থাকা যায় এবং সকলের কাছে প্রিয় হওয়া যায়। এ নীতিগুলো অমান্য করলেই বিবাদ ও ঝগড়া কলহের সূত্রপাত ঘটে এবং অশান্তি সৃষ্টি হয়। নীতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

(১) স্বামীর হক যথাযথভাবে আদায় করা। স্বামীর হক সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৩৭৪ পৃষ্ঠা।

(২) যত দিন শ্বশুর শাশুড়ী জীবিত থাকবেন তাদের খেদমত ও আনুগত্যকে ফরয বলে জানবে এবং সে মতে তাদের খেদমত ও আনুগত্য করবে। তাদের সাথে কথা-বার্তা ও উঠা-বসায় আদব-সম্মানের প্রতি খুব লক্ষ্য রাখবে। শ্বশুর শাশুড়ীর খেদমত করা আইনতঃ ফরয না হলেও নৈতিক ফরয।

(৩) শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ প্রমুখদের থেকে স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ভিন্ন সংসার গড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে না। যদিও স্ত্রীর অধিকার রয়েছে ভিন্ন হতে চাওয়ার, কিন্তু সে এরূপ দাবী করলে, এর জন্য পীড়াপীড়ি করলে শ্বশুর শাশুড়ী যখন জানবে তখন তারা এই ভেবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে যে, পুত্র-বধূ আমাদের পুত্রকে আমাদের থেকে বিছিন্ন করতে চায়। এখান থেকেই ফ্যাসাদের সূত্রপাত ঘটবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৩৭৭ পৃষ্ঠা।

(৪) শ্বশুর বাড়ির কোন দোষ ত্রুটি মা-বাপের কাছে বলবে না বা শ্বশুরালয়ের কারও সম্পর্কে কোন গীবত শেকায়েত বাপের বাড়িতে করবে না। এ থেকেই ক্রমান্বয়ে উভয় পক্ষের মন খারাপ হয়ে নানান জটিলতার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

(৫) শ্বশুর-শাশুড়ী জীবিত থাকা অবস্থায় যদি একান্নভুক্ত সংসার হয় তাহলে স্বামী সংসার চালানোর টাকা-পয়সা স্ত্রীর হাতে দিতে চাইলে সে স্বামীকে বলবে শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে দেয়ার জন্য; যাতে শ্বশুর-শাশুড়ীর মন পরিষ্কার থাকে এবং তারা এই ভাবতে না পারে যে, পুত্র-বধূ আমাদের পুত্রকে কুক্ষিগত করে ফেলেছে।

(৬) শ্বশুর বাড়ির সকল বড়দেরকে আদব এবং ছোটদেরকে স্নেহ করবে।

(৭) শাশুড়ী, ননদ প্রমুখরা যে কাজ করবে তা করতে লজ্জাবোধ করবে না। তাদের কাজে সহযোগিতা করবে বরং তারা করার পূর্বেই সম্ভব হলে তাদের কাজ করে দিবে, তাহলে তাদের ভালবাসা লাভ করা যাবে।

(৮) নিজের কাজ কারও জন্য ফেলে রাখবে না এই ভেবে যে, অমুক করে দিবে। নিজের সব কিছুকে নিজেই সাজিয়ে গুছিয়ে ও পরিপাটি করে রাখবে।

(৯) দুই চারজনে কোন গোপন কথা বলতে থাকলে সেখান থেকে সরে যাবে, তারা কি বলছিল সেটা জানার জন্য খোঁজ লাগাবে না। অহেতুক এই সন্দেহ করবে না যে, তারা হয়ত আমার কোন দোষ বলাবলি করছিল।

(১০) শ্বশুর বাড়িতে প্রথম প্রথম মন না বসলেও মনকে বোঝানোর চেষ্টা করবে, কান্না জুড়ে দিবে না। এসে পারলে না– এরই মধ্যে আবার যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করবে না। এভাবে কিছুদিন পর মন ঠিক হয়ে যাবে।

(تحفۂ دلہن থেকে গৃহীত)

পুত্র-বধূর প্রতি শ্বশুর শাশুড়ীর যা যা করণীয়

(১) পুত্র-বধূ এলেই শাশুড়ী মনে করবে না যে, এখন থেকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, ঘরের কোন কাজ আর আমাকে করতে হবে না, এখন কাজের মানুষ এসে গেছে। পুত্র-বধূ ঘরের বাঁদী বা চাকরানী নয় বরং পুত্র-বধূ ঘরের শোভা, পুত্র-বধূকে চাকরানী মনে করবে না এবং চাকরানী সুলভ আচরণ তার সাথে করবে না।

(২) শ্বশুর শাশুড়ীর খেদমত করা পুত্র-বধূর আইনতঃ দায়িত্ব নয়, করলে সেটা তার অনুগ্রহ। অতএব শ্বশুর-শাশুড়ীর যতটুকু খেদমত সেবা সে করবে তার জন্য শ্বশুর-শাশুড়ী প্রীত হবেন এবং এটাকে তার অনুগ্রহ মনে করবেন। আর যতটুকু সে করবে না তার জন্য তাকে জবরদস্তী করতে পারবেন না। কিম্বা তার কারণে তার সাথে খারাপ আচরণ করতে পারবেন না।

(৩) পুত্র-বধূর অধিকার রয়েছে শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে একান্নভুক্ত না থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার, অতএব পুত্রবধূ যদি পৃথক হতে চায় তাহলে তাতে বাঁধা দিতে পারবে না। বরং হযরত আশরাফ আলী থানবী রহঃ বলেছেনঃ এই জমানায় একান্নভুক্ত থাকার কারণেই পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। কাজেই শুরুতেই ফ্যাসাদ লাগার আগেই পুত্র ও বধূকে পৃথক করে দেয়া সমীচীন। তাতে মহব্বত ভাল থাকবে। অন্যথায় যখন ফ্যাসাদ লাগবে তখন পৃথকও করে দিতে হবে আবার মহববত ও সুসম্পর্কও নষ্ট হয়ে যাবে। (تحفۂ زوجین)

(৪) পুত্রের সাথে পুত্র-বধূর অত্যধিক ভালবাসা হতে দেখলে ঈর্যাবোধ করবে না এবং অহেতুক এই সন্দেহ করবে না যে, বধূ আমাদের পুত্রের মাথা খেয়ে ফেলবে কিংবা আমাদের থেকে বুঝি তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা হয়ে যাওয়াইতো শরীয়তের কাম্য। তাদের মধ্যে মহববত হতে দেখলে ঈর্যাবোধ করবে, আবার অমিল হয়ে গেলে মিল করানোর জন্য তাবীজের সন্ধানে ছুটাছুটি করবে– এই বিপরীতমুখিতার কোন অর্থ হয় না।

(৫) পুত্র-বধূকে স্নেহ করবে, আদর সোহাগ করবে এবং তার আরাম ও সুবিধার প্রতি খেয়াল রাখবে, যেন পুত্রবধূ শ্বশুর-শাশুড়ীকে স্নেহময়ী পিতা-মাতার মত পেয়ে তাদেরকে আপন মনে করে নিতে পারে এবং তাদের জন্য সব রকম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করাকে নিজের গৌরব মনে করে নিতে পারে।

(৬) পুত্র-বধূর কাছে নিজেদেরকে তার কল্যাণকামী হিসেবে প্রমাণিত করতে হবে, যাতে তাদের প্রতি পুত্র-বধূর ভক্তি ও আজমত বৃদ্ধি পায়।

(৭) যৌতুকের জন্য পুত্র-বধূকে কোন রকম চাপতো দূরের কথা ইশারা ইঙ্গিতেও কিছু বলবে না। এমনকি পুত্র-বধূ তার বাপের বাড়ি থেকে কি কি

মাল সামান এনেছে, কি কি আনেনি বা কেন আনেনি-এ প্রসঙ্গে কোন আলোচনাই তুলবে না। মনে রাখতে হবে যৌতুক চাওয়া হারাম এবং এই যৌতুকের কারণে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে, এখন কোন পিতা-মাতা যৌতুকের কথা তুলে পুত্রের সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবে কি না, সেটা পিতা-মাতার উচিত হবে কি না, তা তাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। অনেক সময় পুত্র স্ত্রীকে এসব কথা কিছুই বলে না, পিতা-মাতাই নিজেদের থেকে এ সব আলোচনা তুলে থাকে, কিন্তু পুত্র-বধূ মনে করে স্বামীর ইশারাতেই এগুলো বলা হচ্ছে। এভাবে পিতা-মাতার এসব আলোচনা দ্বারা পুত্র ও পুত্রবধূর মধ্যে মন কষাকষি ও ভুল বুঝাবুঝি শুরু হয়ে যেতে পারে।

(৮) পুত্র-বধূকে সংসার চালানো শিখিয়ে দিবে।

(৯) পুত্র-বধূকে এই নতুন সংসারে এবং নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দান করবে।

(১০) পুত্র-বধূ এক হিসেবে শ্বশুর-শাশুড়ীর অধীনস্ত, অতএব পুত্র-বধূর দ্বীনদারী, ইবাদত বন্দেগী ও তার ইজ্জত আব্রুর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

সন্তান লালন-পালন

শিশুর শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত পরিচর্যা ঃ

* সন্তান জন্ম লাভ করার পরপরই তাকে গোসল দিবে। প্রথমে লবণ পানি দিয়ে তারপর খালেস পানি দিয়ে গোসল করাবে, তাহলে ফোড়া, গোটা ইত্যাদি অনেক ব্যাধি থেকে শিশু মুক্ত থাকবে। এরপর শরীরে বেশী ময়লা থাকলে কয়েক দিন পর্যন্ত এরূপ লবণ পানি দিয়ে গোসল করাবে, অন্যথায় শুধু খালেস পানি দিয়ে গোসল করাবে।

* গোসলের পর অন্ততঃ চার/পাঁচ মাস পর্যন্ত তেল মালিশ করা শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।

* ভেজা কাপড় দিয়ে শিশুর নাক, কান, গলা, মাথা ভালভাবে পরিষ্কার করবে।

* মায়ের বুকের দুধ শিশুর জন্য খুবই উপকারী।

* দুধ মায়ের দুধ খাওয়াতে হলে সুস্থ্য, সবল ও জওয়ান দুধমাতা নির্বাচন করতে হবে। যে মায়ের বাচ্চার বয়স ছয় সাত মাসের বেশী হয়নি-এরূপ মহিলার দুধ তাজা হয়ে থাকে, এরূপ মহিলাকে দুধমাতা নির্বাচন করা ভাল।

* শিশুকে খারাপ দুধ খাওয়াবে না। যে দুধ এক ফোটা নখের উপর রাখলে সাথে সাথে প্রবাহিত হয় বা মোটেই প্রবাহিত হয় না বা যে দুধের উপর মাছি

বসে না সেটাই খারাপ দুধ। আর যে দুধ সামান্য প্রবাহিত হয়ে থেমে যায় সেটা ভাল দুধ।

* দুধ পান করানোর পূর্বে মধু বা চিবানো খেজুর প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য আঙ্গুলে লাগিয়ে শিশুর গালে লাগিয়ে দিয়ে তারপর দুধপান করানো ভাল।

* শিশুদেরকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়ালে তাদের স্বাস্থ্য খারাব হবে।

* শিশুদেরকে নিজে বা কোন সমঝদার ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা খাওয়াবে, যাতে বে আন্দাজ খেয়ে তাদের রোগ-ব্যাধি দেখা না দেয়, কিম্বা পাকস্থলী দুর্বল হয়ে না যায়।

* ছোট শিশুদেরকে বার বার এ পাশ ওপাশ করে শোওয়াবে, যাতে এক দিকে বেশীক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে ট্যারা না হয়ে যায়, কিম্বা এক পাশে বেশীক্ষণ শুয়ে মাথা বাঁকা না হয়ে যায়।

* শিশুদেরকে সকলের কোলে যাওয়ার অভ্যাস করাবে, যাতে শিশু একজনের উপর নির্ভরশীল হয়ে না পড়ে। অন্যথায় তার অবর্তমানে শিশুর অসুবিধা হতে পারে।

* পেশাব পায়খানার পর শিশুকে শুধু মুছে দেয়া যথেষ্ট নয় বরং পেশাব পায়খানার পর তৎক্ষণাৎ পানি দিয়ে ধুয়ে মুছে দিতে হবে। প্রয়োজনে হালকা গরম পানি ব্যবহার করতে হবে।

* বাচ্চাকে বেশী কোলে রাখবে না, তাতে বাচ্চা দুর্বল হয়ে যেতে পারে বরং সম্ভব হলে কিছু কিছু দোলনায় ঝুলানো ভাল।

* শোয়ানো বা কোলে নেয়ার সময় শিশুর মাথা কিছুটা উঁচুতে রাখবে।

* শিশুদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ানোর অভ্যাস করানো ভাল, তাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

* শিশুদেরকে বিশেষ কোন এক ধরনের খাদ্যের প্রতি অভ্যস্ত করে তুলবে না বরং মৌসুমী সব ধরনের খাদ্য খাওয়াবে, তাহলে অভ্যাস ভাল হবে।

* টক দ্রব্য বেশী খাওয়াবে না।

* এক বার খাওয়ানোর পর হজম হওয়ার পূর্বে অন্য খাবার দিবে না। কিম্বা এত বেশী খাওয়াবে না যা হজম হতে পারবে না।

* সক্ষম হওয়ার পর শিশুদেরকে নিজের হাতে নিজের খাবার খেতে অভ্যস্ত করে তুলবে।

* খাওয়ার পূর্বে ভালভাবে হাত পরিষ্কার করে দিবে।

* শিশুদেরকে তাকিদ করবে যেন কেউ কোন খাবার দিলে মাতা-পিতাকে না দেখিয়ে তারা না খায়।

* শিশুদেরকে ঢিলে ঢালা পোশাক পরিধান করাবে।

* দুধ ছাড়ানোর সময় হলে এবং দুধের বাইরে বাড়তি খাবার শুরু করলে খেয়াল রাখতে হবে যেন শক্ত কিছু না চিবায়, অন্যথায় দাঁত উঠতে মুশকিল হবে এবং দাঁত চিরতরে দুর্বল হয়ে যাবে।

* বাচ্চাদের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে যেন নিজের কাজ নিজে করে।

* বাচ্চাদেরকে কিছুটা হালকা ব্যায়াম যেমন হাটা-চলা করা, দৌড়া-দৌড়ি করা ইত্যাদিতে অভ্যস্ত করাবে, তাহলে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং অলসতা আসবে না।

* কিছুটা খেলাধূলা ও ফুর্তির সুযোগ দিবে, তাহলে মন ও স্বাস্থ্য উভয়টার উপকার হবে।

* বাচ্চাদেরকে মাজন মেসওয়াক ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তুলবে।

* বাচ্চাদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে।

* ভাল খাবার ও মস্তিষ্কের জন্য উপকারী খাদ্য খাবার দিবে, তবে বিলাসিতায় যেন অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে।

* বদ নজর লাগলে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে বাচ্চাকে ফুঁক দিবে কিম্বা লিখে বেঁধে দিবে।

وَإِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ
وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ وَمَا هُوَ اِلَّاذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

* বদ নজর থেকে বাঁচার আর একটি পদ্ধতি ৬৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে।

* বাচ্চার দুধ ছাড়ানো মুশকিল হলে সূরা বুরূজ লিখে বেঁধে দিলে সহজেই দুধ ছেড়ে দিবে। শিশুদেরকে দু'বছরের বেশী দুধ পান করানো যাবে না। শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফার মতে আড়াই বৎসর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করানো যেতে পারে, তারপর অবশ্যই দুধ ছাড়াতে হবে। এরপরও দুধ পান করানো সকলের ঐক্যমতে হারাম।

* সময় মত শিশুর দাঁত না উঠলে সূরা ক্বাফ (২৬ পারা) -এর শুরু থেকে الخروج পর্যন্ত লিখে তা ধুয়ে পানি পান করালে সহজে দাঁত উঠবে। (اعمال قرآنى)

* মেয়েলোকের দুধ কমে গেলে সূরা হুজুরাত (২৬ পারা) লিখে তা ধুয়ে পান করালে দুধ বৃদ্ধি পাবে।

(معارف القرآن ও تربیت اولاد প্রভৃতি থেকে গৃহীত)

শিশুর মানসিক পরিচর্যা ঃ

* শিশু কিশোরদের সামনে বা তাদের সাথে কথাবার্তা ও আচার-আচরণ এমন হওয়া উচিত যাতে তাদের মনে খারাপ প্রতিক্রিয়া না হয় বরং ভাল প্রতিক্রিয়া হয়। মনে রাখতে হবে শিশু অবুঝ হলেও, তারা কোন কথা ও আচরণ পূর্ণ উপলব্ধি করতে না পারলেও তার ভাল বা মন্দ প্রতিক্রিয়া তার মনে পড়বে এবং তার মন-মানসিকতা গঠনে সেটা ভূমিকা রাখবে। শিশুর মন ভিডিও-এর ন্যায়, যা কিছুই তার সামনে বলা হবে বা করা হবে তার একটা চিত্র শিশুর মনে অংকিত হয়ে যাবে। যদিও সে এখন তা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন সে প্রকাশ করতে সক্ষম হবে তখন দেখা যাবে শিশুকালে যে সব চিত্র তার মনে অংকিত হয়ে ছিল এখন তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। তাই শিশুর সামনে অবলিলায় সব কিছু বলা বা করা যাবেনা বরং শুধু এমন সব কিছুই তার সামনে বলতে বা করতে হবে যাতে তার মন-মানসিকতা ভাল এবং উন্নত হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হল।

* জন্মের সময় শিশুর (ছেলে হোক বা মেয়ে হোক উভয়ের) কানে আযান ও ইকামতের শব্দগুলো বলবে (ডান কানে আযানের শব্দাবলী এবং বাম কানে ইকামতের শব্দাবলী) তাহলে একটা ফায়দা এ-ও হবে যে তার মনে ঈমানের শক্তি সৃষ্টি হবে।

* অবুঝ শিশুর জাগ্রত থাকা অবস্থায় তার সামনেও মাতা-পিতা অশ্লীল কথা-বার্তা ও যৌন আচরণে লিপ্ত হবে না, অন্যথায় শিশুর মধ্যে নির্লজ্জতা সৃষ্টি হতে পারে।

* শিশুর সাথে অনাদর ও অবহেলার আচরণ করবে না, তাহলে তাদের মন নিষ্ঠুর ও বিকারগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে।

* আবার শিশুকে মাত্রাহীন আদর সোহাগ করলে তারা লাগামহীন হয়ে যেতে পারে।

* শিশুদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাকে পরিধান করালে তাদের পরিচ্ছন্ন মানসিকতা গঠিত হবে। অন্যথায় তাদের মধ্যে নোংরা থাকার মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

* শিশু কিশোরদেরকে যতদূর সম্ভব নিজের কাজ নিজের হাতে করতে অভ্যস্ত করাবে, তাহলে তারা আত্মনির্ভরশীল মনোভাবাপন্ন হয়ে গড়ে উঠবে।

* শিশু কিশোরদেরকে অতি বেশী জাঁকজমক ও বিলাসিতায় লালন-পালন করলে তাদের মধ্যে বিলাসী মনোভাব সৃষ্টি হয়।

* শিশুদের সব জিদ ও সব দাবী পূরণ করতে নেই, তাহলে তাদের মধ্যে একগুঁয়েমি ও হটকারিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। তাই তাদের সব জিদ ও সব দাবী পূরণ করতে নেই। বিশেষভাবে অন্যায় জিদ ও অন্যায় দাবী পূরণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। আবার তাদের কোন দাবীই যদি পূরণ করা না হয়, তাহলে তাদের মন ছোট হয়ে যাবে এবং তারা সংকীর্ণ মানসিকতার অধিকারী হবে।

* অবাধ্য ও দুশ্চরিত্র শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে দিবে না। অন্যথায় তাদের চরিত্রের কুপ্রভাব ওদের মনে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই শিশুদের খেলার সাথী নির্বাচনের বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

* ছেলেদেরকে মেয়েদের সংগে একত্রে খেলাধুলা করতে দিলে ছেলেদের মধ্যে মেয়েলীপনা বা পর্দাহীনতার মনোভাব দেখা দিতে পারে।

* শিশুদেরকে বাঘের ভয়, শিয়ালের ভয়, ভূতের ভয় ইত্যাদি দেখাবে না, তাহলে তারা ভীরু প্রকৃতির হয়ে যেতে পারে।

* শিশুরা অন্যায় করলে আল্লাহর ভয় দেখাবে, জাহান্নামের আযাবের ভয় দেখাবে, তাহলে তাদের মনে খোদাভীরুতা সৃষ্টি হবে। আর তাদের অন্যায় কাজে বাঁধা না দিলে অন্যায়কে তারা ন্যায় বলে ভাবতে শিখবে।

* ভাল কাজের জন্য আল্লাহর খুশি হওয়ার কথা এবং জান্নাতের নেয়ামত লাভের কথা শোনালে তাদের মনে পরকালের চিন্তা গড়ে উঠতে সহায়ক হবে।

* প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহ সব কিছুই দেখেন ও জানেন–এ বিষয়টা তাদের সামনে তুলে ধরলে তাদের মধ্যে খোদামুখী চেতনা গড়ে উঠবে।

* শিশুদেরকে নেককার লোকদের কাহিনী শুনালে তাদের মধ্যে নেককার হওয়ার চেতনা সৃষ্টি হবে এবং বীর বাহাদুরের কাহিনী শুনালে তাদের মধ্যে বীরত্বের মনোভাব জাগ্রত হবে।

* শিশুদেরকে তাগিদ সহকারে অভ্যস্ত করাবে তারা যেন মুরব্বী ছাড়া কারও নিকট কিছু না চায় কিম্বা কেউ কিছু দিলে মুরব্বীর অনুমতি ব্যতীত যেন গ্রহণ না করে, এরূপ না করলে তাদের মনে লোভ লালসা জন্ম নিবে।

* গরীব মিসকীনকে দান-সদকা করতে হলে শিশুদের হাত দ্বারা সেটা দেওয়াবে, তাহলে শিশুদের মধ্যে দানশীলতা সৃষ্টি হবে।

* শিশুরা ভাল কাজ করলে বা ভাল লেখা পড়া করলে তাদেরকে সামান্য পুরস্কার প্রদান করবে এবং সাবাশী প্রদান করবে, তাহলে ভাল কাজের প্রতি তাদের উৎসাহ সৃষ্টি হবে। এর বিপরীত মন্দ কাজ করলে অবস্থা অনুযায়ী সামান্য তিরস্কার ও সামান্য শাস্তি প্রদান করবে, তাহলে তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, এটা মন্দ। তবে মনে রাখতে হবে খুব বেশী সাবাশী দেয়া বা খুব বেশী পুরস্কৃত করা ঠিক নয়, তাহলেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। পক্ষান্তরে খুব বেশী শাস্তি দিলে তারা খিটখিটে বা জেদী হয়ে যেতে পারে বা বেশী তিরস্কৃত করলে নিজের ব্যাপারে তার অনাস্থা জাগতে পারে। বস্তুতঃ সাবাশী বা পুরস্কার দান, কিম্বা তিরস্কার ও শাস্তি প্রদানের বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক– এ ব্যাপারে খুব বিবেচনা সহকারে মেপে মেপে পদক্ষেপ নিতে হবে।

* শিশুদেরকে কোন খাদ্য খাবার দিলে তারা যেন সকলের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে সকলে মিলে খায়– এরূপ অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। তাহলে তাদের মধ্যে স্বার্থপরতার মনোভাব সৃষ্টি হবে না।

* শিশুদের জন্য আদর্শ শিক্ষক নির্বাচন করতে হবে, তাহলে তারা আদর্শবান হওয়ার চেতনা লাভ করবে।

শিশুদের আদর সোহাগ প্রসঙ্গ ঃ

* বাচ্চাদের আদর সোহাগ করা সুন্নাত। পরিমিত আদর সোহাগ থেকে বঞ্চিত হলে বাচ্চাদের মানসিকতা বিকৃত হয়ে যেতে পারে।

* বাচ্চাদেরকে আদর সোহাগ খুব বেশী করা তাদের জন্য ক্ষতিকর। এতে তারা লাগামহীন হয়ে যেতে পারে।

* আদর করে ছেলেকে আব্বু ডাকা এবং মেয়েকে আম্মু ডাকা জায়েয, এতে কোন ক্ষতি নেই। (امداد الفتاوى)

* আদর সোহাগ করতে গিয়ে শিশুদেরকে খোঁচা দেয়া, আঁচড় দেয়া বা কোনরূপ উত্যক্ত করা হলে প্রকৃত পক্ষে এর দ্বারা যদি শিশুর মানসিক কষ্ট হয় বলে বোঝা যায়, তাহলে এরূপ করা জায়েয নয়। (حسن العزيز)

* আদর সোহাগ করে নাম বিকৃত করে ডাকা ঠিক নয়।

সন্তানের নাম রাখা ঃ

* ভাল অর্থপূর্ণ নাম রাখা উচিত, কারণ নামের অর্থের আছর হয়ে থাকে।

* সব চেয়ে উত্তম নাম আবদুল্লাহ, তারপর আবদুর রহমান। যে সকল নামের শুরুতে আব্দ এবং শেষে আল্লাহ তা'আলার নাম সমূহের যে কোন একটি থাকে এই প্রকারের নাম রাখাও উত্তম। আল্লাহর তা'আলার নাম সমূহের জন্য দেখুন ৪৯ পৃষ্ঠা।

* আম্বিয়া, সাহাবা ও ওলী আউলিয়াদের নামের অনুরূপ নাম রাখাও উত্তম।

* মেয়েদের নাম হুজুর (সঃ)-এর বিবি, হুজুর (সঃ)-এর কন্যা এবং অন্যান্য নেককার বিবিদের নামের অনুরূপ রাখবে।

* কারও নাম অপছন্দনীয় রাখা হলে তার নাম বদলে ভাল নাম রাখবে। হযরত রাসূল (সঃ) কারও নাম অপছন্দনীয় হলে তার নাম বদলে ভাল নাম রেখে দিতেন।

* একাধিক নাম রাখা জায়েয। তবে ভাল নামটি কাগজে কলমে রেখে বাজে অর্থহীন আর একটি ডাক নাম রেখে সেই নামে ডাকার যে প্রচলন আজকাল দেখা যায় তা কাম্য নয়। একাধিক নাম রাখলে প্রত্যেকটি নামই ভাল নাম হওয়া উচিত।

* সপ্তম দিবসে সন্তানের নাম রাখা মোস্তাহাব। (بہشتی زیور)

সন্তানকে কাপড়-চোপড়, খাদ্য-খাবার ও টাকা-পয়সা ইত্যাদি দেয়া সম্পর্কে কতিপয় নীতি ঃ

* সন্তানকে কাপড়-চোপড় দিবে তাদেরকে মালিক বানানোর নিয়তে নয় বরং তারা শুধু ব্যবহার করবে এই নিয়তে। মালিক নিজে থাকবে। কেননা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান যার মালিক হয়ে যায় সেটা আর কাউকে দেয়া যায় না, নিজে মালিক থাকলে পুরাতন হওয়ার পর অন্য কাউকে দিয়ে দেয়া যাবে। ছোট ছেলে মেয়েরা যার মালিক হয়ে যায় তা অন্য কাউকে দেয়া বা করয দেয়াও জায়েয নয়।

* ছোট ছেলে মেয়েকে দেখে আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবরা যে টাকা দিয়ে থাকে মাতা-পিতাই তার মালিক। অবশ্য যদি কেউ স্পষ্টতঃই বাচ্চাকে দেয়া উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করে বা বাচ্চার ব্যবহারের জিনিস দেয় তাহলে বাচ্চাই তার মালিক।

* প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য যে পোশাক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকেও সেরূপ পোশাক প্রদান নিষিদ্ধ।

* ছেলেদেরকে সাদা পোশাক পরিধান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে এবং রং চংয়ের পোশাকের প্রতি অনুৎসাহিত করবে এই বলে যে, এরূপ পোশাক মেয়েলী পোশাক, তুমি মাশাআল্লাহ পুরুষ ছেলে ইত্যাদি।

* সন্তানকে খাদ্য খাবার প্রদানের বিষয়ে পূর্বে শিশুদের স্বাস্থ্যগত পরিচর্যা শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। দেখুন ৪৮৯ পৃষ্ঠা।

* সন্তানকে অতিরিক্ত বিলাসী খাদ্য খাবার ও বিলাসী পোশাক প্রদান করবে না, এতে তাদের অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে।

* সন্তানদেরকে অবৈধ বস্তু ক্রয়ের জন্য টাকা-পয়সা প্রদান করা জায়েয নয়; যেমন পটকা ও আতসবাজী ক্রয়ের জন্য।

* সব সন্তানকেই একই মানের জিনিস ও কাপড় চোপড় দেয়া কর্তব্য, বিনা কারণে বৈষম্য করা মাকরূহ।

* সন্তানদেরকে টাকা-পয়সা, জায়গা-জমি ইত্যাদি হাদিয়া দিলে সকলকে সমান দেয়া কর্তব্য (উত্তম)। তবে কোন সন্তান যদি তালেবে ইল্‌ম হয়, দ্বীনের খাদেম হয় বা উপার্জনে অক্ষম হয় তাহলে তাকে কিছু বেশী দেয়া হলে তাতে কোন দোষ নেই।

* সন্তানদের যদি নিজস্ব সম্পদ থাকে, তাহলে তার ভরণ-পোষণ ও ব্যয়ভার তার সম্পদ থেকে হতে পারে। এমতাবস্থায় মাতা-পিতার উপর উক্ত সন্তানের ভরণ-পোষণ ও ব্যয়ভার ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে সন্তান বালেগ এবং উপার্জন করতে সক্ষম হলে তার ভরণ পোষণও আইনতঃ মাতা-পিতার উপর ওয়াজিব নয়। আর সন্তান যদি নাবালেগ হয় এবং তার নিজস্ব কোন সম্পদ না থাকে কিম্বা বালেগ হলেও সে আয় উপার্জন করতে সক্ষম না হয় এবং তার নিজস্ব সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় পিতা জীবিত থাকলে উক্ত সন্তানের ভরণ-পোষণ শুধু পিতার উপর ওয়াজিব, মাতার উপর ওয়াজিব নয়। আর পিতা জীবিত না থাকলে মাতার উপর ওয়াজিব এবং রক্ত সম্পর্কের নিকট আত্মীয় থাকলে সকলের উপর এ দায়িত্ব বন্টিত হবে।

* সন্তানকে দূধ পান করানোর মাসায়েল সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন 'সন্তানের অধিকার' পৃষ্ঠা নং ৩৬৮। (ماخوذ از تربیت اولاد وبہشتی زیور)

সন্তান ও শিশুদের শিক্ষা বিষয়ক নীতি ও মাসায়েল ঃ

* শিশুকে সর্বপ্রথম কালেমায়ে তইয়্যেবা শিক্ষা দিবে।

* নিয়মিত লেখা-পড়া শুরু করানোর পূর্বেও সময় সুযোগে তার ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ঈমানের কথা এবং ভাল মন্দ সম্পর্কে শিক্ষা দিবে এবং মৌখিকভাবে দুআ দুরূদ ইত্যাদি শিখাবে।

* শিশুদেরকে মাতা-পিতা ও দাদার নাম এবং বাড়ির ঠিকানা অবশ্যই শিক্ষা দিবে। যাতে খোদা নাখাস্তা হারিয়ে গেলে অন্যরা তাকে সেই পরিচয় অনুযায়ী পৌঁছে দিতে পারে।

* সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় দ্বীনী শিক্ষা দেয়া এবং কুরআন পাঠ শিক্ষা দেয়া কর্তব্য।

* কত বয়স থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখাপড়া শুরু করাতে হবে– এ ব্যাপারে কুরআন হাদীসে স্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে সাত বৎসর বয়স থেকেই সন্তানকে নামায পড়ার নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে। হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেনঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য অর্থাৎ, নামাযের জন্য যখন সাত বৎসর বয়সকে নির্ধারণ করা হয়েছে এর থেকে আমার মনে হয় এ বয়সটাই নিয়মাতান্ত্রিক লেখা পড়া শুরু করানোর উপযুক্ত সময়।

* স্কুল কলেজে পড়ানো এবং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার শর্ত ও প্রয়োজন অপ্রয়োজন সম্বন্ধে জানার জন্য দেখুন ৩৬ পৃষ্ঠা।

* শিশুদের শিক্ষা দানের জন্যও আদর্শ ও নেককার শিক্ষক নির্বাচন করা উত্তম।

* যতদূর সম্ভব বিজ্ঞ, দক্ষ ও পারদর্শী শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষাদান করানো প্রয়োজন, তাহলে সন্তানও তদ্রূপ বিজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে গড়ে উঠবে। শুধু সস্তা শিক্ষক খোঁজা হলে শুরু থেকেই শিশুর শিক্ষার মান বিগড়ে যাবে, তারপর সংশোধন করা কঠিন হয়ে পড়বে।

* নিয়মতান্ত্রিক লেখা-পড়া শুরু হওয়ার পর মামুলী ছুটি ব্যতীত বারবার ছুটি দেয়া চলবে না। তবে নিতান্ত জরুরত হলে ভিন্ন কথা।

* কঠিন পাঠগুলো সকালের দিকে এবং সহজ পাঠগুলো বিকালের দিকে পড়াবে। কেননা বিকালে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন কঠিন পাঠ দেয়া হলে তার মধ্যে জটিলতা দেখা দিতে পারে।

* শিশুদের পড়ার সময় ও পাঠের পরিমাণ আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করবে। যেমন প্রথম দিকে এক ঘন্টা করে তারপর দুই ঘন্টা করে। এমনিভাবে তার স্বাস্থ্য ও শক্তি অনুসারে সময় ও পাঠের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকবে, এক সঙ্গেই সারা দিন লেখা-পড়ার চাপ দিলে একদিকে ক্লান্তি বশতঃ সে পড়া চুরি করতে শুরু করবে, অপরদিকে ধারণ ক্ষমতার উপর অতিরিক্ত চাপ পড়লে তার স্মৃতি শক্তি ও মেধায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে।

* সন্তানদেরকে আয় উপার্জন করার মত একটা জ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা অবশ্যই শিক্ষা দিবে। এটা সন্তানের হক। (تربیت اولاد)

* শিশুদেরকে কথা-বার্তা, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, পান-আহার, সালাম-কালাম ইত্যাদির আদব-কায়দা ও চরিত্র শিক্ষা দেয়া মাতা-পিতার দায়িত্ব।

সন্তানের দাবী দাওয়া ও জিদ পূরণ করার বিষয়ে কতিপয় নীতি ও মাসায়েল ঃ

* সন্তানের বৈধ দাবী দাওয়া কিছু কিছু পূরণ করতে হয়, অন্যথায় তাদের মন ছোট হয়ে যায়।

* সন্তানের সব জিদ পূরণ করতে নেই, তাহলে তাদের মধ্যে একগুঁয়েমী ও হঠকারিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ সন্তান যদি কোন অবৈধ বিষয়ের জন্য দাবী করে বা জিদ ধরে তাহলেও তা করা জায়েয নয়– হারাম। এরূপ জিদ থেকে বিরত না হলে প্রয়োজনে তাকে শাসন করতে হবে।

* যেটা দেয়ার ইচ্ছা নেই, সন্তানকে ভুলানোর জন্য বা থামানোর জন্য এরূপ কোন বিষয়ের ওয়াদা করা নিষেধ। এটাও মিথ্যার শামিল। এরূপ কোন ওয়াদা করে ফেললে তা পূরণ করা জরুরী হয়ে পড়ে, যদি কোন অবৈধ বিষয়ের ওয়াদা না হয়ে থাকে।

শিশুদের শাসন করার পদ্ধতি ও মাসায়েল ঃ

* অনেক সময় নম্র কথায় এবং নম্র আচরণে শিশুর সংশোধন নাও হতে পারে। এরূপ মুহূর্তে কঠোরতা অবলম্বন ও শাসনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রয়োজনের মুহূর্তে কঠোরতা অবলম্বন পূর্বক শাসন না করা খেয়ানত।

* শাসন ও শাস্তি প্রদানের কয়েকটা পদ্ধতি হতে পারে যথা ঃ

(১) তিরস্কার করা (২) ধমক দেয়া (৩) কড়া কথা বলা। (৪) হাত বা লাঠি দ্বারা মারা (৫) আটক করে রাখা (৬) কান ধরে উঠা-বসা করানো (৭) ছুটি বন্ধ করে দেয়া। এই শেষোক্ত শাস্তিই সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি। শিশুদের মনে এর যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। (تربیت اولاد)

* মারধর অতিরিক্ত করা হলে, উঠতে বসতে লাথি জুতা করতে থাকলে শিশুরা নির্লজ্জ হয়ে যায় এবং মারের ভয় তাদের অন্তর থেকে উঠে যায়। তারপর তাকে শাসন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই মারধর-এর ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা অন্যায়। ফোকাহায়ে কেরাম স্পষ্টভাবে বলেছেনঃ যে মারপিট দ্বারা হাত পা ভেঙ্গে যায়, চামড়া ফেটে যায় বা চামড়ায় দাগ পড়ে যায়– সেরূপ মারপিট করা নিষিদ্ধ। এরূপ মারধর যে পিতা বা যে উস্তাদ করবে সে শাস্তির যোগ্য। (تربیت اولاد نقلا عن رد المحتار ج ۳) মনে রাখতে হবে– অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান করা জুলুম।

* মারধর-এর ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা থেকে বাঁচার উপায় হল রাগ এর মুহূর্তে মারধর না করা। কেননা রাগের মুহূর্তে ব্যালেন্স ঠিক থাকে না। রাগ ঠাণ্ডা

হওয়ার পর কতটুকু অন্যায় এবং তার জন্য কতটুকু কিভাবে শাস্তি দেয়াটা উপযোগী তা চিন্তা-ভাবনা করে শাস্তি দিতে হবে। হাদীসেও রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করতে নিষেধ করা হয়েছে। খুব বেশী রাগ এসে গেলে রাগ দমন করার পদ্ধতি সমূহের উপর আমল করবে। তার জন্য দেখুন পৃষ্ঠা নং ৫৪৪।

* কখনও অতিরিক্ত শাস্তি দেয়া হয়ে গেলে শাস্তি দেয়ার পর তাকে আদর সোহাগ করে, অনুগ্রহ করে খুশি করে দিবে।

* বকাবকি ও ভর্ৎসনা করার ক্ষেত্রেও সীমা অতিক্রম করবে না, লাগামহীন ভাবে মুখে যা আসে বলবে না বরং পূর্বে চিন্তা করে নিবে কি কি শব্দ প্রয়োগ করা সমীচীন।

সন্তানকে সচ্চরিত্রবান ও দ্বীনদার বানানোর তরীকা ঃ

* একটা সু-সন্তান লাভ করার জন্য এবং সন্তানকে সচ্চরিত্রবান ও দ্বীনদার বানানোর জন্য মাতা-পিতার অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। সন্তানের জন্মের পূর্বে থেকেই শুরু করতে হবে সন্তানকে ভাল বানানোর ফিকির ও প্রচেষ্টা, আর সেই ফিকির ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত। এই ফিকির ও প্রচেষ্টার একটা মোটামুটি রূপরেখা নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

* একটা সু-সন্তান পেতে হলে একটা সৎ ও ভাল নারীকে বিবাহ করতে হবে। ভাল নারীর গর্ভেই ভাল সন্তানের আশা বেশী করা যায়।

* মাতা-পিতা উভয়কেই হালাল খাবার গ্রহণ করতে হবে। কেননা হারাম খাদ্য থেকে সৃষ্ট বীর্যের মধ্যে খারাপ আছর হতে পারে, আর তার থেকে সৃষ্ট সন্তানের মধ্যেও তার প্রভাব থেকে যেতে পারে।

* স্ত্রী সহবাসের সময় সহবাসের সুন্নাত ও আদব সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। এর জন্য দেখুন ৪৩৫ পৃষ্ঠা।

* সুসন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে নিম্নোক্ত দুআ করবে–

رَبِّ هَبْ لِى مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে নিজ অনুগ্রহে পবিত্র বংশধর দান কর। অবশ্যই তুমি দুআ শ্রবণকারী।

* সন্তান গর্ভে আসার পর মায়ের চিন্তা-ভাবনা, মায়ের মন-মানসিকতা ও মায়ের আচার-আচরণ সবকিছুর প্রভাব পড়ে থাকে গর্ভস্থ সন্তানের উপর। তাই সন্তান গর্ভে আসার পর মাকে সব কু-চিন্তা ও পাপের চিন্তা পরিহার করতে হবে এবং নেক চিন্তা ও ভাল চিন্তা-ভাবনা রাখতে হবে, তাহলে সন্তানের উপর তার সুপ্রভাব পড়বে।

* সন্তান জন্ম নেয়ার পর তাকে গোসল দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তার ডান কানে আযানের শব্দগুলো এবং বাম কানে একামতের শব্দগুলো শুনাবে। এতে করে শুরু থেকেই তার মনে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের নাম ও কালেমা ইবাদতের সুপ্রভাব পড়বে। যদিও সে তখন আযান ইকামতের মর্ম বুঝতে সক্ষম নয় তবুও তার সুপ্রভাব পড়বে।

* অতঃপর কোন দ্বীনদার বুযুর্গ দ্বারা খেজুর বা কোন মিষ্টান্ন দ্রব্য চিবিয়ে তার সামান্যটা নব জাতকের তালুতে লাগিয়ে দিবে। এটা করা সুন্নাত। এতে করে বুযুর্গের মুখের লালার মাধ্যমে বুযুর্গীর সুপ্রভাব নবজাতকের মধ্যে প্রবেশ করবে।

* শিশুর একটা সুন্দর নাম রাখবে। এ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৪৯৪ পৃষ্ঠা।

* শিশুকে মা ব্যতীত অন্য কোন দুধ মাতার দুধ পান করালে দ্বীনদার পরহেযগার ও সুস্বভাবের অধিকারিনী মহিলার দুধ পান করাবে। কেননা, দুধের মাধ্যমে দুধ দাত্রীর স্বভাব, চরিত্র ও মন-মানসিকতার প্রভাব ছড়িয়ে থাকে।

* শিশুর মন-মানসিকতা ও মেজায প্রকৃতি যেন ভাল হয়ে গড়ে ওঠে তার জন্য পূর্বে "শিশুর মানসিক পরিচর্যা" শীর্ষক পরিচ্ছেদে (৪৯২ পৃষ্ঠায়) যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর উপর আমল করতে হবে।

* শিশুকে সুশিক্ষা প্রদান করতে হবে। এর জন্য পূর্বে সন্তান ও শিশুর শিক্ষা বিষয়ক যে নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে তার উপর আমল করতে হবে। দেখুন ৪৯৬ পৃষ্ঠা।

* শিশুকে প্রয়োজনে শাসন করতে হলে শাসন করার সুষ্ঠ পদ্ধতি ও মাসায়েল অনুযায়ী শাসন করতে হবে। এর জন্য দেখুন ৪৯৮ পৃষ্ঠা।

* কিছুটা বুঝ হওয়ার পর থেকেই প্রত্যেকটা পদে পদে ধীরে ধীরে শিশুকে আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে থাকতে হবে এবং অন্যায় ত্রুটি হলে সংশোধন করে দিতে হবে। প্রয়োজনে তম্বীহ ও মুনাছেব শাস্তিও দিতে হবে।

* সাত বৎসর বয়স থেকেই শিশুকে নামাযের হুকুম দিবে এবং পুরুষ ছেলে হলে জামাআতের সাথে নামায পড়তে অভ্যস্ত করাবে। দশ বৎসর বয়স হলে প্রয়োজনে মারপিট করে হলেও নামায পড়াতে হবে।

* শিশুদেরকে রোযা রাখানোর ক্ষেত্রে সাত বৎসরের কোন সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি, সে যখন যে কয়টা রোযা রাখতে সক্ষম হবে তখন তার দ্বারা তা রাখাতে হবে। শিশুর নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত ও আখলাক-চরিত্র গঠনের ব্যাপারে জননীকেই বেশী খেয়াল রাখতে হবে, কেননা তার কাছেই সন্তানরা বেশী সময় কাটায়।

* প্রতিদিন ঘরে একটা নির্ধারিত সময়ে দ্বীনী কথা-বার্তা আলোচনার বা দ্বীনী কিতাব তা'লীমের সিলসিলা জারী রাখতে হবে। এতে সন্তানদের সাথে সাথে পরিবারের অন্য সদস্যদেরও উপকার হতে থাকবে। রাতে শুতে যাওয়ার পূর্বে এর জন্য সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে, তখন সকলের সময় অবসর থাকে। প্রথম দিকে সকলে তা'লীম শুনতে না চাইলেও তা'লীম করে যেতে হবে, আস্তে আস্তে সকলে শুনতে অভ্যস্তও হবে এবং আছরও হতে থাকবে।

* শুরু থেকেই সতর্ক থাকতে হবে, যেন খারাপ সাথীদের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক গড়ে উঠতে না পারে। অধিকাংশতঃ কুসংসর্গ থেকেই সন্তানরা কুপথে ধাবিত হয়।

* সন্তানদেরকে মুসলমানদের সাথে, বিশেষভাবে গরীব সৎ মুসলমানের সাথে উঠা-বসা করতে অভ্যস্ত করাবে।

* সন্তানকে মাঝে মধ্যে দুই চার দিনের জন্য নেককার বুযুর্গদের সোহবতে থাকার ব্যবস্থা করবে। আর ছুটির সময় পুরা ছুটি না হলেও অন্ততঃ তার অর্ধেক বা একটা অংশ এ কাজের মধ্যে তাকে নিয়োজিত রাখবে।

* সন্তানকে অভ্যস্ত করাবে তারা যেন কোন কাজ গোপনে না করে। কেননা গোপনে সে এমন কাজই করবে যেটাকে সে অন্যায় বলে মনে করে, এভাবে গোপনে কাজ করতে অভ্যস্ত হওয়ার অর্থ অন্যায় কাজে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া।

* হালাল সম্পদ দ্বারা সন্তানের ভরণ-পোষণ করবে। হারাম সম্পদের দ্বারা কুস্বভাব, শরীয়ত বিরুদ্ধ চেতনা জন্ম নেয়।

* সন্তানকে শরীয়তের বরখেলাফ লেবাস-পোশাক পরিধান করতে দিবে না, শরীয়তের বরখেলাফ কোন কাজ করতে দিবে না।

* সন্তানকে যৌন বিষয়ক ও প্রেম প্রীতি বিষয়ক বই পত্র ও নভেল নাটক পড়তে বা দেখতে দিবে না।

* মনে রাখতে হবে– সন্তানের প্রথম বয়সই তার এছলাহের উপযুক্ত সময়। প্রথমে নষ্ট হয়ে গেলে পরে তার এছলাহ অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। প্রথম দিকে অবুঝ সন্তান বলে অবহেলা করে ছেড়ে দিলে পরবর্তীতে অনুতপ্ত হতে হয়।

* সন্তানদের সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রথম সন্তানকেই অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। কেননা পরবর্তী সন্তানরা প্রায়শঃই প্রথম জনের অনুকরণ করে থাকে।

* সন্তানের অধিকার পূর্ণ মাত্রায় আদায় করবে। এর জন্য দেখুন ৩৬৮ পৃষ্ঠা।

* সন্তান যেন নেককার হয়– অসৎ না হয়, তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ও দুআ করতে থাকবে। এরূপ কয়েকটি দুআ নিম্নে পেশ করা হলঃ

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (১)

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমাকে এবং আমার বংশধরকে নামায কায়েম করনেওয়ালা বানাও। হে আমার রব, আমার দুআ কবুল কর।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا (২)

অর্থঃ হে আমাদের রব, আমাদের বিবি ও সন্তানদেরকে আমাদের জন্য সুখের বানাও এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের অগ্রণী বানাও।

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اِنِّي تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (৩)

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমার সন্তানদেরকে এছলাহ করে দাও। আমি তোমার দিকে ধাবিত হয়েছি এবং আমি আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (৪)

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমাদের বিবি ও সন্তানদের মধ্যে বরকত দান কর এবং আমাদের তওবা কবূল কর। তুমিই তো তওবা কবূলকারী, অতি দয়ালু।

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ غَيْرَ ضَالٍّ وَّلَا مُضِلٍّ (৫)

অর্থঃ হে আল্লাহ, তুমি মানুষকে যে ভাল সন্তান, সম্পদ ও বিবি দান করে থাক, আমি তোমার নিকট তদ্রূপের প্রার্থনা করছি, বিভ্রান্ত বা অন্যকে বিভ্রান্তকারী সন্তান ও বিবি নয়।

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوذُبِكَ مِنْ وَّلَدٍ يَّكُوْنُ عَلَيَّ وَبَالًا (৬)

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট এমন সন্তান থেকে পানাহ চাই যা আমার জন্য বিপদের কারণ হবে।

কোন ক্রমেই সন্তানকে সুপথে আনতে না পারলে তখন কি করণীয় ঃ

* সন্তানকে সুপথে আনার চেষ্টা করা মানুষের আয়ত্বের মধ্যে, কিন্তু সে চেষ্টার ফলাফল মানুষের আয়ত্বাধীন নয়। অনেক সময় হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও সন্তান সুপথে না আসতে পারে এবং তার কারণে মাতা-পিতার পেরেশানীর অন্ত না থাকতে পারে। এরূপ মুহূর্তে পিতা-মাতার করণীয় হল ঃ

(১) চেষ্টা অব্যাহত রাখবে, কিন্তু ফলাফল লাভের অপেক্ষায় থাকবে না; অর্থাৎ, তারা যেমন চায় সন্তান তেমনই হয়ে যাবে– এই অপেক্ষায় থাকবে না, তাহলে পেরেশানী কমে যাবে।

(২) সন্তান সুপথে আসছে না এ জন্য স্বভাবতঃ যে কষ্ট ও দুঃখ হবে তার কারণে ছওয়াব হবে– এই বিশ্বাস রাখবে, তাহলেও মনে একটু তৃপ্তি পাওয়া যাবে। মনে করবে যে, এভাবেও হয়ত আল্লাহ আমার গোনাহ মোচন ও ছওয়াব লাভের পথ করে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করছেন।

(৩) সন্তানের সুমতি ও হেদায়েত হোক এ জন্য সর্বদা দুআ করতে থাকবে।

(৪) এরূপ সন্তানের কপাল ধরে الشهيد শব্দটি পাঠ করবে কিম্বা এক হাজার বার পড়ে সন্তানকে দম করবে, আল্লাহর ইচ্ছা হলে সন্তান ফরমাবরদার হয়ে যাবে।

([illegible] থেকে গৃহীত)

যার সন্তান মারা যায় তার জন্য কিছু কথা

যার সন্তান মারা যায় তার সান্ত্বনা লাভের জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় চিন্তা করতে হবে।

(১) যে সন্তান মারা গিয়েছে তার মরে যাওয়াই ভাল ছিল, সে বেঁচে থাকাটা তার জন্য খারাপ ছিল। এটা তার বুঝে না আসলেও আল্লাহ তাআলা সব কিছু জানেন ও বুঝেন, তিনি অত্যন্ত হেকমতওয়ালা।

(২) এই সন্তানের কারণে মানুষ কত রকম পেরেশানী ও মুসীবতের সম্মুখীন হয় সেগুলো চিন্তা করে মনে করবে যে, আল্লাহ আমাকে সে সব পেরেশানী থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যই হয়ত আমার সন্তানের মৃত্যু ঘটিয়েছেন, কাজেই এটা আমার প্রতি আল্লাহর এক অনুগ্রহ।

(৩) সন্তানের মৃত্যুর কারণে যে কষ্ট হয় তার বিনিময়ে ছওয়াব অর্জিত হয়। বিশেষ ভাবে নাবালেগ সন্তানের মৃত্যু হলে সে সন্তান পরকালে তার নাজাতের ওছীলা হয়ে দাঁড়াবে, সে সন্তান জাহান্নাম ও তার মাঝে আঁড় হয়ে দাঁড়াবে। এক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী বড় সন্তানের মৃত্যু হলেও সে কারণে যে কষ্ট হবে তার বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাত দান করবেন।

যার কোন সন্তান হয় না তার জন্য কিছু কথা

যার ছেলে মেয়ে কোন সন্তানই হয় না তাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চিন্তা করতে হবে ঃ

(১) সন্তান না হওয়াই তার জন্য ভাল। আল্লাহ পাক প্রত্যেকেরই কল্যাণ চান এবং সব কিছুর রহস্য তার জানা আছে। সে মতে তার সন্তান না হওয়ার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে, যা আল্লাহ অবগত আছেন।

(২) সন্তান থাকলে যে সব পেরেশানী হয় সেগুলো চিন্তা করে মনে করবে যে, আল্লাহ্ আমাকে সে সব পেরেশানী থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। বস্তুতঃ সন্তান দেয়া যে রকম আল্লাহর নেয়ামত, সন্তান না দেয়াও এক রকম নেয়ামত। সুতরাং সন্তান না হওয়ার জন্য শুকরের মনোভাব রাখতে হবে– না শুকরের মনোভাব নয়।

(৩) সন্তান না হওয়ার কারণে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া অন্যায়। কারণ এটা স্ত্রীর এখতিয়ার ভুক্ত বিষয় নয়, এটা স্ত্রীর কোন অন্যায় নয়। এজন্য আল্লাহর প্রতিও নারাজ হওয়া যাবে না, কেননা আল্লাহ হয়ত এরই মধ্যে তার কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

(৪) একথা মনে করবেনা যে, সন্তান ও বংশধর না থাকলে আমার নাম টিকে থাকবে না। মূলতঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারলেই নাম টিকে থাকে, সন্তান দ্বারা নয় বরং সন্তান হয়ে যদি খারাপ হয় তাহলে উল্টা বদনামী হয়ে থাকে।

(৫) সন্তান লাভের জন্য নিম্নোক্ত আমলগুলো করতে পারে।

(ক) এই দুআ করবে– رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে বংশধরহীন রেখ না, তুমিই উত্তম উত্তরাধিকারী।

(খ) উঠতে বসতে সর্বক্ষণ পাঠ করবে اَلْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

(গ) প্রত্যেক নামাযের পর তিনবার পড়বে–

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! তুমি নিজ অনুগ্রহে আমাকে উত্তম আওলাদ দান কর। অবশ্যই তুমি দুআ শ্রবণকারী।

(ঘ) বন্ধা মহিলা সাত দিন পর্যন্ত রোযা রাখবে এবং পানি দ্বারা ইফতার করবে এবং ইফতার করার পর ২১ বার নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করবে, তাহলে আল্লাহ চাহেতো গর্ভ সঞ্চার হবে।

اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّوْرٍ۔

যার পুত্র সন্তান হয় না তার জন্য কিছু কথা

(১) পুত্র না হওয়ার মধ্যেই তার কল্যাণ– একথা চিন্তা করবে।

(২) পুত্র সন্তানের কারণে মানুষ যে সব পেরেশানীর সম্মুখীন হয় সেগুলো চিন্তা করবে, তাহলে সান্ত্বনা পাবে এবং আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আসবে এই ভেবে যে, আল্লাহ আমাকে সে সব পেরেশানী থেকে হয়ত নাজাত দিতে চান। বাস্তবেও দেখা যায় পুত্র সন্তানই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মাতা-পিতার অবাধ্য হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে কন্যা সন্তান মাতা-পিতার অনুগত ও ফরমাবরদার হয়ে থাকে।

(৩) পুত্র সন্তান না হওয়ার কারণে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া এবং তার সাথে দুর্ব্যবহার করা অন্যায়। কারণ এটা স্ত্রীর এখতিয়ারভুক্ত বিষয় নয়, সে চাইলেই তার গর্ভে পুত্র সন্তান আনতে পারে না। এর জন্য আল্লাহর প্রতিও নারাজ হওয়া যাবে না, কেননা আল্লাহ হয়ত এরই মধ্যে তার কল্যাণ নিহিত রেখেছেন, যা হয়ত তার জানা নেই, তার বুঝে আসছে না কিন্তু আল্লাহ সব জানেন, সব বুঝেন, তিনি অত্যন্ত হেকমতওয়ালা!

(৪) শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) বলেছেনঃ যে মেয়েলোকের কন্যা ব্যতীত ছেলে না হয় তার পেটের উপর হাতের আঙ্গুল দিয়ে একটা গোল বেষ্টনী আঁকবে, তারপর আঙ্গুল দিয়ে সেই বেষ্টনীর মধ্যে يا متين শব্দটি সত্তর বার লিখবে এবং মুখেও বলতে থাকবে, তাহলে আল্লাহ চাহেতো পুত্র সন্তান লাভ হবে।

সতীনের সন্তান বা স্ত্রীর ভিন্ন ঘরের সন্তানের জন্য যা করণীয়

সতীনের সন্তান বা স্ত্রীর ভিন্ন ঘরের সন্তান বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়দের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আত্মীয়দের যা হক ও অধিকার রয়েছে তাদের বেলায়ও তা পালন করতে হবে। বরং অনেক আলেমের মতে বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয় আর রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের হক একই রকম। এমতে নিজের সন্তানের জন্য যা যা করণীয় সতীনের সন্তান বা স্ত্রীর ভিন্ন ঘরের সন্তানের জন্যও তা-ই করণীয়। বিশেষতঃ সতীন যদি মারা যায় তাহলে সৎ মাকে এ কথা চিন্তা করে দেখতে হবে যে, আমি সতীনের সন্তানের সাথে দুর্ব্যবহার করলে খোদা নাখাস্তা আমার সন্তান ছোট থাকা অবস্থায় আমার মৃত্যু হলে অন্য সতীন ঘরে এসে আমার সন্তানের প্রতিও দুর্ব্যবহার করতে পারে। স্ত্রীর ভিন্ন ঘরের সন্তানের বেলায় স্বামীকেও অনুরূপ ভেবে দেখতে হবে। এরূপ ভাবনা মনে উপস্থিত রাখলে সতীনের সন্তান ও স্ত্রীর ভিন্ন ঘরের সন্তানকে নিজের সন্তানের মত বরণ করে নেয়া সহজ হবে এবং দুর্ব্যবহারের মনোভাব জাগ্রত হবে না বরং করুণার মনোভাব জাগ্রত হবে।

প্রসবকালীন সময়ের কয়েকটি মাসআলা

* প্রসবের সময় প্রসব কাজে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত ধাত্রী বা নার্সের সামনে শরীরের এতটুকু খোলা জায়েয, যতটুকু না খুললে নয়। এমনিভাবে প্রসবের সময় বা অন্য কোন সময় ঔষধ লাগানোর স্বার্থেও ততটুকু পরিমাণই খোলা জায়েয– সম্পূর্ণ উলঙ্গ হওয়া জায়েয নয়। এর জন্য উত্তম সূরত হল চাদর দ্বারা প্রসূতির শরীর ঢেকে দিয়ে শুধু প্রয়োজনীয় স্থানটুকু ধাত্রী খুলে প্রয়োজন সেরে নিবে।

* প্রসব কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়– এমন কারও সামনে শরীর খোলা জায়েয নয়। অন্যান্য মহিলাদের জন্যও সামনে এসে তার সতর দেখা হারাম।

* ধাত্রীর দ্বারা পেট মর্দন করাতে হলে চাদর বা কাপড়ের নীচ দিয়ে হাত প্রবেশ করিয়ে মর্দন করাবে। নাভীর নীচে কাপড় উন্মুক্ত করে দেয়া জায়েয নয়।

* ধাত্রী বা নার্স যদি অমুসলিম হয়, তাহলে অমুসলিম মহিলাদের সামনে যেহেতু মুখ, হাতের কবজি পর্যন্ত এবং পায়ের টাখনু পর্যন্ত ব্যতীত শরীরের অন্য স্থান খোলা জায়েয নয়, তাই প্রসবের প্রয়োজনে যতটুকু না খুললে নয় তা ব্যতীত মাথা, হাত, চুল প্রভৃতি কোন অঙ্গ পর্দা মুক্ত করা জায়েয হবে না

(تربیت اولاد اور اسکے متعلقات)

* নিম্নোক্ত আয়াত লিখে প্রসূতির বাম রানে বেঁধে দিলে আল্লাহ চাহেতো আছানীর সাথে প্রসব হবে। প্রসব হওয়ার সাথে সাথে সেটি খুলে ফেলবে। আয়াতটি এই–

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۔

প্রসূতি সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা

* প্রসূতিকে অচ্ছ্যুৎ মনে করা ভিত্তিহীন। প্রসূতি কোন পাত্রে পানাহার করলে বা কোন পাত্র স্পর্শ করলে সেটা না ধুয়ে তাতে পানাহার করা যাবে না– এরূপ ধারণা ভিত্তিহীন।

* নেফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে গেলেও চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায পড়া যাবে না– এটাও ভুল ধারণা। চল্লিশ দিন হল নেফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ, এর পূর্বেও রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে গোসল করে নামায পড়া শুরু করবে। গোসলে ক্ষতির আশংকা থাকলে তাইয়াম্মুম করে নামায পড়বে।

* প্রসূতি গোসল না করা পর্যন্ত তার হাতের কোন কিছু খাওয়া যাবে না– এই ধারণা ভুল।

* চল্লিশ দিন পর্যন্ত স্বামী প্রসূতি-ঘরে প্রবেশ করতে পারবেনা– এই ধারণা ভুল।

* যে স্থান দেখা জায়েয নয় প্রসূতিকে গোসল দেয়ার সময় ধাত্রী বা অন্য কোন নারীও সে স্থানে সরাসরি হাত লাগিয়ে মর্দন করে দিতে পারবেনা বা সে স্থান দেখতে পারবেনা। প্রয়োজনে হাতে গেলাফ লাগিয়ে বা কোন কাপড় পেঁচিয়ে কাপড়ের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মর্দন করে দিতে পারবে।

* প্রসূতিকে গোসল দেয়ার সময় ধুমধাম করা, নাচ গান করা বা হৈহুল্লোড় করা সবই কুসংস্কার ও গোনাহের কাজ।

জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে মাসায়েল

জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচলিত তিনটি ব্যবস্থা রয়েছে। যথা ঃ

(১) স্থায়ী ব্যবস্থা ঃ যেমন পুরুষের জন্য ভ্যাসেকটমি ও মহিলাদের জন্য লাইগেশন। এ ব্যবস্থায় অপারেশনের মাধ্যমে পুরুষ বা নারীর সন্তান দেয়ার ও নেয়ার ব্যবস্থা চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়।

(২) মেয়াদী ব্যবস্থা ঃ যেমন নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ইনজেকশন, নিরাপদকাল মেনে চলা এবং আই, ইউ, ডি (এক ধরনের প্লাষ্টিক কয়েল) ব্যবহার করা ইত্যাদি।

(৩) সাময়িক ব্যবস্থা ঃ যেমন কনডম ব্যবহার করা, জন্মনিরোধক পিল/বড়ি ব্যবহার করা ইত্যাদি।

* জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নয় বরং হারাম, উদ্দেশ্য বা কারণ যাই হোক না কেন। কেননা, এর মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া একটা ক্ষমতা (প্রজনন ক্ষমতা)কে নষ্ট করা হয় এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করে দেয়া হয়, যা সম্পূর্ণ হারাম।

* জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় পদ্ধতি (মেয়াদী ব্যবস্থা) গ্রহণ করা মাকরূহ তাহরীমী। আর মাকরূহ তাহরীমী হারামের কাছাকাছি।

* জন্মনিয়ন্ত্রণের তৃতীয় পদ্ধতি (সাময়িক ব্যবস্থা) গ্রহণের পেছনে যদি উদ্দেশ্য এই থাকে যে, এতে করে পৃথিবীর লোক সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত থাকবে, খাদ্যের সংকট হবে না, বাসস্থানের সংকট হবে না ইত্যাদি, তাহলে এটা ঈমান বিরোধী চেতনা থেকে হওয়ার কারণে জায়েয নয়। মনে রাখতে হবে– আল্লাহর পরিকল্পনা সকলের পরিকল্পনার চেয়ে উত্তম, তিনি ভূত ভবিষ্যত এমনভাবে

জানেন যা কেউ জানে না, তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি জীবের রিয্‌কের দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন।

* আর তৃতীয় পদ্ধতি যদি স্ত্রী বা সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে অভিজ্ঞ দ্বীনদার ডাক্তারের পরামর্শক্রমে গ্রহণ করা হয় তাহলে তা জায়েয।

* আর তৃতীয় পদ্ধতি যদি বিলাসিতার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয় এই ভেবে যে, সন্তান কম হলে ঝামেলা কম হবে, ছিমছাম থাকা যাবে ইত্যাদি, তাহলে স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে তা গ্রহণ করা জায়েয, তবে এটা খেলাফে আওলা বা অনুত্তম, কেননা এটা ধর্মীয় চাহিদা বিরোধী। ধর্ম চায় রাসূলের উম্মত বৃদ্ধি পাক, রাসূলের উম্মত বৃদ্ধি পেলে রাসূল (সঃ) কিয়ামতের দিন এ নিয়ে গর্ব করবেন বলে হাদীসে উল্লেখ এসেছে।

(জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত উপরোক্ত মাসায়েল মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেবের ফতুয়া এবং দারুল উলূম দেওবন্দ-এর স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপূরী [দামাত বারাকাতুহুম]-এর বয়ান থেকে গৃহীত।)

* উল্লেখ্য যে, হাদীসে কোন কোন সাহাবী ব্যক্তিগতভাবে অনুমতি প্রার্থনা করার পর হযরত রাসূল (সঃ) আযল (সঙ্গম কালে বীর্য স্ত্রী যোনির বাইরে স্খালন করা)-এর অনুমতি দিয়েছেন বলে পাওয়া যায়। তবে অনুমতি দেয়ার সময় রাসূল (সঃ) ঈমানও দুরস্ত করে দিয়েছেন এই বলে যে, জেনে রাখ কিয়ামত পর্যন্ত যত সন্তান দুনিয়াতে আসার তারা আসবেই। তাছাড়া রাসূল (সঃ) এ অনুমতি প্রদানের সময় এটা না করার জন্য উৎসাহিত করেছেন এই বলে যে, না করলে তোমাদের ক্ষতি কি? সারকথা– রাসূল (সঃ) আযল (একটা সাময়িক ব্যবস্থা) সম্পর্কে অনুমতি দিয়েছেন ঈমান দুরস্ত করে– নষ্ট করে নয়, আবার তার জন্য অনুৎসাহিত করেছেন এবং এই অনুমতি প্রদান ছিল ব্যক্তিগত পর্যায়ে। এখন এই আযলের অনুমতি দেখে (যা সাময়িক ব্যবস্থা) জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থাকে জায়েয বলা ঠিক হবে না। তাছাড়া বর্তমানে প্রচলিত মেয়াদী ও সাময়িক অন্যান্য পদ্ধতিগুলোকেও এই আযলের উপর ঢালাওভাবে কেয়াছ বা অনুমান করা ঠিক নয়, কেননা বর্তমানে প্রচলিত এসব পদ্ধতিগুলোকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি বরং তাকে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়া হয়েছে আর বর্তমানে এর জন্য অনুৎসাহিত করা নয় বরং উৎসাহ দেয়া হচ্ছে, অধিকন্তু বাধ্যতামূলক করার চিন্তা ভাবনা চলছে। সর্বোপরি এসব পদ্ধতি গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে এমন সব বক্তব্য দিয়ে যা ঈমানী চেতনা বিরোধী। অতএব দেখা গেল– হাদীসে আযলের অনুমতি দেয়া হয়েছিল যে আঙ্গিকে এবং যে মানসিকতার ভিত্তিতে,

প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে তার সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিক ও ভিন্ন মানসিকতা গ্রহণ করা হয়েছে। তাই হাদীসের আযলের অনুমতি থেকে বর্তমানে প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সমূহকে ঢালাওভাবে অনুমোদন দেয়ার কোনই অবকাশ নেই।

গর্ভপাত ও এম আর বিষয়ক মাসায়েল

* দৈব কোন কারণে গর্ভ পড়ে গেলে তার জন্য গোনাহ হয় না।

* 'এম আর' অর্থ মাসিক নিয়মিত করণ অর্থাৎ, যে কোন কারণে মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে যান্ত্রিক উপায়ে গর্ভস্থ রক্ত ইত্যাদি বের করে দেয়ার মাধ্যমে মাসিক নিয়মিতকরণ। গর্ভে সন্তান আসার পর গর্ভপাত হলে বা এম আর করলে তার মাসআলা হল ঃ

* গর্ভপাত হলে বা এম আর করা হলে যদি সন্তানের মধ্যে হাত, পা, নখ, প্রভৃতি মানবের কোন অঙ্গ তৈরী হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে বাচ্চা ধরা হবে এবং যে রক্ত বের হবে সেটাকে নেফাসের রক্ত বলে গণ্য করা হবে। এ অবস্থায় নেফাসের আহকাম চালু হবে এবং সন্তানকে গোসল ও কাফন দাফন দিতে হবে। আর যদি কোন অঙ্গ প্রকাশ না হয়ে থাকে তাহলে সেটার গোসল ও কাফনের প্রয়োজন নেই বা নিয়ম মত দাফনও করা হবে না। তবে যেহেতু সেটা মানুষের অঙ্গ তাই এখানে সেখানে ফেলে না দিয়ে সম্মানের সাথে কোথাও মাটিতে গেড়ে দেয়া উচিত। আর এ অবস্থায় যে রক্ত বের হবে সেটা নেফাসের রক্ত বলে গণ্য হবে না বরং দেখতে হবে এর পূর্বে যে হায়েয হয়েছে তা যদি পনের দিন বা বেশী পূর্বে হয়ে থাকে এবং এখনকার রক্ত কমপক্ষে তিন দিন দীর্ঘায়িত হয় তাহলে এটা হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি এর পূর্বের হায়েয পনের দিনের কম সময় আগে হয়ে থাকে বা এখনকার রক্ত তিন দিনের কম দীর্ঘায়িত হয় তাহলে এটা এস্তেহাযার রক্ত বলে গণ্য হবে এবং এ অবস্থায় এস্তেহাযার হুকুম জারী হবে। (امداد الفتاوی ج ۱)

* উল্লেখ্য যে, বাচ্চার অঙ্গ প্রকাশ পাওয়ার পর (যার মেয়াদ ১২০ দিন) গর্ভপাত করানো জায়েয নয়। (فتاوی رحیمیه ج ٦)

রান্না-বান্না সম্পর্কিত নীতিমালা

* মহিলাদের জন্য ঘরের কাজ করা, রান্না-বান্না করা বা চাকর নওকর থাকলে এসব কাজে তাদের সহযোগিতা করা বা তত্ত্বাবধান করাও ইবাদতের শামিল এবং এতে তাদের ছওয়াব হয়ে থাকে। মহিলাদের এসব কাজ ছওয়াব মনে করে করা উচিত। স্বামীর চাকর– নওকরের ব্যবস্থা করার সঙ্গতি না থাকলে

এবং স্ত্রী রান্না-বান্না করতে সক্ষম হলে রান্না-বান্না করা তার উপর নৈতিক ওয়াজিব।

* রান্না-বান্না করার জন্য চাউল, আটা ইত্যাদি মেপে নিবে, তবে মূল পাত্রে কি পরিমাণ অবশিষ্ট থাকল সেটা মেপে দেখবেনা, তাহলে বরকত কমে যাবে।

* যখন গোসল ফরয সে অবস্থায়ও রান্না-বান্না করাতে কোন দোষ নেই। (احسن الفتاوى ج ٢)

* বিসমিল্লাহ্ বলে রান্না-বান্না শুরু করবে।

* গোবরের জ্বালানী দিয়ে রান্না-বান্না করা জায়েয। (فتاوى محمودية ج ٥)

* গোবর বা মনুষ্য মল থেকে তৈরী গ্যাস দ্বারা রান্না করা জায়েয।

(فتاوى رحيمية ج ٦)

* রান্না শেষ হওয়ার পর চুলার আগুন নিভিয়ে রাখবে, যাতে করে অন্য কিছুতে আগুন লাগতে না পারে। গ্যাসের চুলা হলেও নিভিয়ে রাখবে। একটা ম্যাচের শলাকা বাঁচানোর জন্য গ্যাস জ্বালিয়ে রাখলে অপব্যয়ের গোনাহ হবে। অপব্যয় করা কবীরা গোনাহ।

* রান্না শেষ হওয়ার পর খাদ্য-খাবার ঢেকে রাখবে।

যে সব পশু পক্ষী খাওয়া জায়েয ও হালাল

যে সব পশু পক্ষী পাঞ্জা দ্বারা শিকার ধরে খায়না তা (জবাই করে) খাওয়া জায়েয ও হালাল। যেমন পশুর মধ্যে গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, উভয় প্রকারের খরগোস, বন্য গরু এবং পক্ষীর মধ্যে হাঁস, মুরগি, বন্যহাস, বন্যমুরগি, ময়না, টিয়াপাখী, বক, সারস, চড়ুই, পানিকড়ি, কবুতর ইত্যাদি। ঘোড়া খাওয়া জায়েয তবে মাকরূহ। যে সব মুরগি খোলা থাকে এবং নাপাক খেয়ে বেড়ায় তাদেরকে তিনদিন না বেঁধে রেখে খাওয়া মাকরূহ।

(بہشتی زیور وفتاوی رشیدیة)

যে সব পশু পক্ষী খাওয়া জায়েয নয়

যে সব পশু পক্ষী পাঞ্জা দ্বারা শিকার ধরে খায় বা যাদের খাদ্য শুধু নাপাক বস্তু, সে সব পশু পক্ষী খাওয়া জায়েয নয়। যেমন বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, শিয়াল, কুকুর, বিড়াল, বানর, বেজী, গাধা, খচ্চর, সজারু, কচ্ছপ, গোসাপ, বাজ, চিল, শিকরা, শকুন, ঈগল, কালকাক ইত্যাদি। (বেহেশতি জেওর)

হালাল পশুপক্ষীর যা যা খাওয়া নাজায়েয

হালাল পশু পক্ষীর নিম্নোক্ত জিনিস গুলো খাওয়া জায়েয নয়ঃ পেশাব, পায়খানা, প্রবাহিত রক্ত, পিত্ত, মূত্রথলি, অণ্ডকোষ, পুরুষাঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ, পায়খানার রাস্তা, শরীরের অতিরিক্ত মাংসগ্রন্থি যেমন টিউমার ইত্যাদি ও মেরুদণ্ডের হাড়ের মগজ। কোন কোন আলেমের মতে মেরুদণ্ডের হাড়ের মগজ মাকরূহ তানযীহী আবার কেউ কেউ বলেছেন এটা মাকরূহ হওয়ার কোন কারণ নেই। তবে সতর্কতা হল তা না খাওয়া। কোন কোন রেওয়ায়াত অনুযায়ী গুর্দা খাওয়া মাকরূহ তানযীহী। হালাল জানোয়ারের নাড়ীভুঁড়ি খাওয়া জায়েয।

(فتاوى رشيديه وغيره)

মাছ ও পানির অন্যান্য প্রাণী সম্পর্কিত মাসায়েল

* পানির প্রাণীর মধ্যে মাছ (সব ধরনের মাছ) খাওয়া জায়েয।

* মাছ খাওয়া হালাল হওয়ার জন্য জবেহ করা শর্ত নয়।

* যে মাছ আপনা আপনি মরে চিৎ হয়ে ভেসে উঠে তা খাওয়া জায়েয নয়। তবে গরমের কারণে, আঘাতের কারণে, চাপাচাপির কারণে, ঔষধ দেয়ার কারণে বা কিছু খাওয়ার কারণে যদি মরে ভেসেও ওঠে, তবুও তা খাওয়া জায়েয। কিম্বা স্বাভাবিভাবে মরে ভেসে উঠেছে কিন্তু চিৎ হয়নি বরং পিঠ এখনও উপরের দিকে রয়েছে তাহলেও খাওয়া জায়েয। (شامى واحسن الفتاوى - ج ٧)

* ছোট মাছ হলেও তার পেটের মল আবর্জনা ইত্যাদি পরিষ্কার করা ব্যতীত খাওয়া জায়েয নয়। (احسن الفتاوى ج ٧)

* শুটকি মাছ খাওয়া জায়েয।

* কোন কোন আলেম চিংড়ি মাছকে পানির পোকা আখ্যায়িত করে তা খাওয়াকে মাকরূহ বলেছেন। আবার অনেকের মতে মাকরূহ নয়। আমাদের দেশে সমাজে এটাকে মাছ বলা হয় এবং মাছ মনে করা হয় তাই আমাদের ফতুয়া মতে তা খাওয়া মাকরূহ নয়।

* কচ্ছপ, কাঁকড়া, ঝিনুক, শামুক, বেঙ ইত্যাদি খাওয়া জায়েয নয়।

* পানির প্রাণীর মধ্যে মাছ ব্যতীত অন্য প্রাণী যেমন কুমির, শুশুক, জলহস্তি, সিন্ধুঘোটক ইত্যাদি খাওয়া জায়েয নয়। হাঙ্গর খাওয়া বিতর্কিত, অতএব তা পরিহার করাই শ্রেয়।

* পানির কোন পোকা মাকড় খাওয়া জায়েয নয়।

জবাই করার মাসায়েল

* জবাইকারীর মুসলমান হওয়া শর্ত– কাফেরের জবাই করা জন্তু খাওয়া হারাম।

* মুসলমান পুরুষ হোক বা মহিলা উভয়ের জবাই খাওয়া হালাল।

* নাবালেগ ছেলে মেয়ে জবাই করতে জানলে এবং বিসমিল্লাহ (আল্লাহর নাম) বললে তার জবাই খাওয়া হালাল।

* জবাই করার সময় জন্তু ও জবাইকারী উভয়ের মুখ কেবলার দিকে থাকা সুন্নাতে মুআক্কাদা।

* জবাই করার সময় জবাইকারীর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা শর্ত। বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবর বলে সাধারণতঃ এ শর্ত পূরণ করা হয়। ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ না বললে বা অন্য কোন বাক্যে আল্লাহর নাম না নিলে সে জন্তু খাওয়া হারাম হয়ে যায়। তবে ভুলে ছুটে গেলে খাওয়া দুরস্ত আছে।

* জবাইর মধ্যে জানোয়ারের চারটা রগ কাটতে হবে। তিনটা রগ কাটলেও দুরস্ত আছে। তিনটার কম কাটলে সে জন্তু মৃত বলে গণ্য এবং হারাম হয়ে যাবে। রগ চারটি এই ঃ শ্বাসনালী, খাদ্য নালী, দুইটা শাহরগ।

* ধারাল ছুরি দ্বারা জবাই করা উত্তম। ভোঁতা বা কম ধারাল ছুরি দ্বারা জবাই করা মাকরূহ।

* ছুরির অভাবে ধারাল পাথর, বাঁশ বা আখের ধারাল বাক্‌লা দ্বারা জবাই করা দুরস্ত আছে। পাথরের আঘাতে, বন্দুকের গুলিতে মারা গেলে খাওয়া দুরস্ত নয়। তবে বন্দুকের গুলি বা পাথরের আঘাত লাগার পর মরে যাওয়ার পূর্বে জবাই করতে পারলে তা খাওয়া জায়েয। দাঁত বা নখ দ্বারা জবাই করা দুরস্ত নয়।

* জবাই করার সময় জানোয়ারের মাথা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেলেও তা খাওয়া দুরস্ত আছে। তবে ইচ্ছাকৃত ভাবে এরূপ কেটে আলাদা করে দেয়া মাকরূহ। তবে এরূপ জানোয়ার খাওয়া মাকরূহ নয়।

* জবাই করার পর জানোয়ার ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বে চামড়া খসানো, হাত পা কাটা, ভাঙ্গা বা সমস্ত গলা কেটে দেয়া মাকরূহ।

* গোসল ওয়াজিব বা উযূ নেই– এমন অবস্থায়ও জবাই করা যায়।

(احسن الفتاوى ج/٧)

* হাঁস, মুরগি ইত্যাদির পালক ছাড়ানোর জন্য ফুটন্ত পানিতে হাস মুরগিকে যদি এতক্ষণ রাখা হয় যাতে তার পেটের নাপাকী গোশতের মেধ্য ভেদ করার প্রবল ধারণা হয়, তাহলে তার গোশত নাপাক হয়ে যায়– পাক করার আর কোন উপায় থাকে না। অবশ্য যদি পানি ফুটতে না থাকে শুধু গরম হয় তাহলে তাতে দীর্ঘক্ষণ চুবিয়ে রাখলেও অসুবিধা নেই কিম্বা ফুটন্ত পানিতে চুবিয়ে সাথে সাথে উঠিয়ে ফেললেও অসুবিধা নেই। (احسن الفتاوی ج/۷)

* জবাই করার পূর্বে প্রাণীকে ক্ষুধার্থ রাখা জুলুম।

ঘর সাজানো গোছানো ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মাসায়েল

* ঘর এবং ঘরের আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সুন্নাত। (ترمذی)

* বিনা প্রয়োজনে মাকড়সা মারা অনুচিত, তবে তার জাল ভেঙ্গে ঘর পরিষ্কার করা যাবে। (فتاوی رحیمیہ ج/٦)

* পিপড়া, ছারপোকা ইত্যাদি কোন প্রাণী আগুন দ্বারা পুড়িয়ে মারা নিষেধ। একান্ত ঠেকা অবস্থায় গরম পানি দিয়ে ছারপোকা তাড়ানো যায়।

* টিকটিকি ও গিরগিটি মারা ছওয়াবের কাজ। (فتاوی محمودیہ ج/۲)

* ঘরের জিনিসপত্রগুলো যথাস্থানে গুছিয়ে রাখা সাংসারিক সুব্যবস্থার অন্যতম কাজ।

* প্রাণীর ফটো বা মূর্তি রাখা হারাম। কোন বুযুর্গ বা গুরুজনের ফটোর বেলায়ও একই হুকুম। যে ঘরে ফটো বা মূর্তি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

* রাতের বেলায় ঘর ঝাড়ু দেয়ায় কোন দোষ নেই। (امداد الفتاوی ج/٤)

* আয়না বা কোন প্লেটে লিখিত আল্লাহ, রাসূলের নাম, কলেমা, আয়াত সৌন্দর্যের নিয়তে রাখা বে-আদবী। তবে বরকতের নিয়তে রাখাতে অসুবিধা নেই। (بضوء امداد الفتاوی - ج/٤)

* ঘরের দরজা জানালায় পর্দা দিবে শরীয়তের পর্দার হুকুম পালন করার নিয়তে, সৌন্দর্যের নিয়তে নয়।

সমাজনীতি

সমাজ সংস্কার ও নতুন সমাজ গঠনের জন্য যা যা করণীয় ঃ

(১) সমাজের কুসংস্কার, বেদআত, রছম ও প্রচলিত অনৈসলামিক ধ্যান-ধারণার প্রতি সমাজ সদস্যদের বীতশ্রদ্ধ করে তুলতে হবে।

(২) সেই সাথে সাথে ইসলামের নির্ভেজাল ও শাশ্বত আদর্শ এবং ইসলামী মূল্যবোধ সমাজের সামনে তুলে ধরতে হবে।

(৩) বিজাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির প্রভাব থেকে সমাজকে দূরে রাখার সর্বপ্রযত্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) ইসলামী মূল্যবোধ ও আদর্শের আলোকে ব্যক্তি গঠনপূর্বক আদর্শের নমুনা হিসেবে তাদেরকে দাঁড় করাতে হবে।

সমাজে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য যা যা করণীয় ঃ

শান্তি মূলত ঃ অশান্তি দূর হওয়ার নাম আর শৃংখলা বিধান হল বিশৃংখলা দূর করার নাম। অতএব সামাজিক অশান্তি ও বিশৃংখলার কারণ যা যা, তার প্রতিকার করলেই সমাজে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হবে। নিম্নে এই সামাজিক অশান্তি ও বিশৃংখলার কারণ কি কি এবং তার প্রতিকার ব্যবস্থা কি তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হল। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য অধমের রচিত 'ইসলামী মনোবিজ্ঞান' গ্রন্থের সমাজ মনোবিজ্ঞান অধ্যায় দেখা যেতে পারে।)

(১) প্রত্যেকের যা দায়িত্ব সে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে শুধু অধিকার আদায়ে সোচ্চার হলে পারস্পরিক সংঘর্ষ ও অশান্তির সূচনা হয়। এর প্রতিকারের জন্য সকলকে দায়িত্ব সচেতন করে তুলতে হবে এবং নিজের অধিকারের চেয়ে অন্যের অধিকারকে প্রাধান্য দেয়ার মনোভাব এবং নিজের অধিকার আদায় না হওয়ার ক্ষেত্রে ধৈর্য ও সহনশীল হওয়ার মনোভাব জাগ্রত করতে হবে।

(২) সুষ্ঠু নেতৃত্বের অভাব ঃ মানুষে মানুষে স্বার্থ নিয়ে সংঘাত লাগলে তা নিরসনের জন্য এবং সমাজকে সুষ্ঠ লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে পরিচালনার জন্য সুষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজন। অন্যথায় সামাজিক অশান্তি ও বিশৃংখলা রোধ করা সম্ভব হয় না। তাই এমন নেতার প্রয়োজন যার মধ্যে নেতৃত্বের সব গুণাবলী বিদ্যমান থাকবে এবং যিনি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন। নেতার গুনাবলী এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য কি কি এ সম্পর্কে পরবর্তি পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

(৩) নৈতিক অবক্ষয়ের ফলেও সমাজে অশান্তি ও বিশৃংখলা দেয়া দেয়। এর প্রতিকারের জন্য সমাজ শিক্ষায় নৈতিকতাকে গুরুত্ব সহকারে স্থান দিতে হবে।

(৪) সামাজিক অপরাধ ঃ চুরি, ডাকাতি, মদ, জুয়া, নেশা প্রভৃতি সামাজিক অপরাধের মোকাবিলা ও তা প্রতিহত করতে না পারলে সমাজে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে।

(৫) শ্রেণী বৈষম্য এবং তার ফলে সৃষ্ট দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সংঘাত সামাজিক অশান্তির একটি অন্যতম কারণ। এর প্রতিকারের জন্য ইসলামের বৈষম্যহীন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনের আশ্রয় গ্রহণের কোন বিকল্প নেই।

(৬) ইসলামের দেয়া সামাজিক রীতি-নীতি, মানবাধিকার প্রভৃতি লংঘন করলে সমাজে অশান্তি দেখা দেয়। এক কথায় মানুষের কৃতকর্মের দরুনই সমাজে অশান্তি দেখা দেয়।

নেতার গুণাবলী

নেতৃত্বের জন্য যে সব গুণ অপরিহার্য, নেতাকে যে সব গুণাবলী অর্জন করতে হবে, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা হল ঃ

(১) নেতার মধ্যে নেতৃত্বের মোহ থাকতে পারবে না। সে কাজ করবে দেশ ও জাতির স্বার্থে, ব্যক্তি স্বার্থে নয়। নেতৃত্বের প্রতি মোহ থাকলে মানুষ ব্যক্তি স্বার্থ ত্যাগ করে বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার তাগিদে কাজ করতে পারে না।

(২) নেতার মধ্যে বিনয় থাকতে হবে। কথা-বার্তা, আচার-আচরণে বিনয় না থাকলে বরং অহংকার থাকলে সেরূপ নেতাকে কেউ মনে প্রাণে গ্রহণ করতে চায় না।

(৩) সমস্যা ও সংকটের মুহূর্তে নেতাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে, যাতে দলীয় সদস্যরা নেতাকে স্বার্থপর, ভীরু ভাবতে না পারে কিম্বা নিজেদেরকে যেন তারা অসহায় না ভাবে।

(৪) নেতার মধ্যে অনুসারী ও দলীয় সদস্যদের প্রতি সহানুভূতি থাকতে হবে এবং তাদের সুবিধা অসুবিধা ও আশা আকাংখার খোঁজ-খবর রাখতে হবে।

(৫) ভালবাসা দিতে ও ভালবাসা নিতে পারার গুণ থাকতে হবে। এরূপ হলে নেতার উপস্থিতি কর্মী ও দলীয় সদস্যদের কাছে কাম্য হবে এবং নেতা কর্মীদের মন জয় করতে পারবেন।

(৬) নেতার মধ্যে বুদ্ধিমত্তা এবং সমস্যা ও তার সমাধান সম্বন্ধে পরিজ্ঞান থাকতে হবে, যাতে তিনি পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সমস্যার নানা দিক বিশ্লেষণ পূর্বক যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

(৭) নেতাকে আদর্শস্থানীয় হতে হবে, যাতে তার স্বভাব-চরিত্র ও নীতি নৈতিকতা দেখে তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয় এবং অনুসারীরা আদর্শচ্যুত হওয়ার দুঃসাহস না পায়। কেননা এরূপ নেতার নিকট আদর্শহীনতা প্রশ্রয় পাবে না।

(৮) নেতা চরমপন্থী হবেন না, নিজস্ব মতামত চাপিয়ে দেয়ার জন্য গোঁ ধরবেন না বরং প্রয়োজনের তাগিদে মূল আদর্শ বহাল রেখে নীতি নির্ধারণ ও পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে আপোষের মনোভাব নিয়ে চলবেন।

নেতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

(১) দলীয় সদস্যদের ঐক্য বজায় রাখা। যাতে দলীয় সদস্য ও সমাজ সভ্যগণ ঐক্যহীনতার ফলে বিপন্ন হয়ে না যায়।

(২) নেতা তার কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কর্মীদেরকে কাজের অনুপ্রেরণা যোগাবেন এবং তাদের মনোবল বৃদ্ধি করবেন।

(৩) নেতাকে বাস্তবমুখী কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে। যাতে দল ও সমাজের আশা-আকাংখার প্রতিফলন ঘটে এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে বৈসাদৃশ্য না হয়।

(৪) নেতাকে শুধু প্রতিভার অধিকারী হলে চলবে না বরং সেই সাথে সাথে সযত্নে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

(৫) নেতাকে যোগ্য উত্তরসূরী গড়ে যেতে হবে, যেন তার অবর্তমানেও কাজের ধারা অক্ষুন্ন থাকে এবং অব্যাহত গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে।

(৬) নেতৃত্ব যেহেতু জনগণের আমানত, তাই নেতাকে জবাবদিহিতার চেতনা নিয়ে কাজ করতে হবে।

(৭) বহুমুখী লোকদেরকে নিয়ে নেতাকে চলতে হয়, অনেক অবান্তর ও উল্টাসিধা সমালোচনার সম্মুখীনও তাকে হতে হয়, নেতাকে তাই ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে এবং ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টির সাথে চলতে হবে।

সামাজিক অপরাধ প্রতিকারের জন্য যা যা করণীয়

(১) ইসলামী আইনে বিভিন্ন অপরাধের যে শাস্তি রয়েছে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তার যথার্থ প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) আইন মানার জন্য মানসিকতা গঠন করতে হবে এবং আইন মানার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

(৩) জন সমক্ষে শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। যাতে অনুরূপ অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে জনগণের মনে ভীতির সঞ্চার হয় এবং এভাবে অপরাধ হ্রাস পেতে থাকে।

(৪) আইনের তড়িৎ প্রয়োগ করতে হবে। আইন প্রয়োগে বিলম্ব বা দীর্ঘসূত্রিতা অন্যান্য অনেক ক্ষতির পাশাপাশি অপরাধ বিরোধী চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে শাস্তির ভূমিকাকে হ্রাস করে দেয়।

(৫) অপরাধীদেরকে সৎ ও ভাল মানুষের সাহচর্যে এবং নীতি-নৈতিকতার পরিবেশে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) অপরাধের ক্ষতিকর দিক গুলো তুলে ধরে অপরাধ বিরোধী মানসিকতা গঠন করতে হবে।

(৭) নেশা জাতীয় অপরাধে জড়িত হলে ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে তার সে অভ্যাস ছাড়াতে হবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৫৪৯ পৃষ্ঠা।

বিঃ দ্রঃ সমাজনীতি অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়াবলীর দলীল প্রমাণ আমার রচিত ইসলামী মনোবিজ্ঞান গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

পঞ্চায়েত কোন সামাজিক অপরাধের কি শাস্তি দিতে পারেন

* শরীয়ত যেনা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি বিভিন্ন অপরাধের বিভিন্ন শাস্তির বিধান রেখেছে, তবে আইনতঃ এই শাস্তি প্রয়োগ করতে পারে ইসলামী কাজী বা হাকিম। যেখানে ইসলামী আদালত নেই সেখানে পঞ্চায়েত বা বেসরকারীভাবে নির্বাচিত বিচারকমণ্ডলী শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করার অধিকার রাখেন না। তারা সমীচীন মনে করলে অপরাধীকে তম্বীহ স্বরূপ সমাজ থেকে এক ঘরে করে রাখতে পারেন অর্থাৎ, অপরাধীর সাথে ক্রয়-বিক্রয়, উঠা-বসা, চলা-ফেরা ও মেলা-মেশা বন্ধ রাখার শাস্তি প্রয়োগ করতে পারেন কিম্বা তম্বীহ স্বরূপ কিছু চড় থাপ্পড় বা দু' চারটা বেত্রাঘাতও করতে পারেন। কিন্তু তারা শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি ৮০/১০০ দোর্‌রা বা রজম করা -এর অধিকার রাখেন না।

(فتاوى دار العلوم ج ١٢)

* কোন অপরাধের কারণে আর্থিক জরিমানা করা জায়েয নয়। করলে সে অর্থ তাকে ফেরত দিতে হবে কিম্বা তার মর্জি ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী সে অর্থ ব্যয় করতে হবে। (فتاوى دار العلوم ج ١٢)

রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি

রাজনীতি করা ও রাজনৈতিক দলে যোগ দেয়ার বিধান ঃ

* দ্বীনের হেফাজত ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য সাধ্য থাকলে ইসলামী খেলাফত স্থাপন তথা খলীফা/ ইমাম/ আমীরুল মু'মিনীন নিযুক্ত করা ফরযে কেফায়া। কোন খলীফা/ইমাম/আমীরুল মু'মিনীন না থাকলে আলেম, বুদ্ধিমান ও কর্তৃপক্ষীয় লোকগণ সাধ্য থাকলে অনতিবিলম্বে খলীফা নিযুক্ত করবেন এবং খলীফা হওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তি এ দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য নিজেকে পেশ করবেন। কোন একজন খলীফা/ ইমাম নিযুক্ত হয়ে গেলে সকলেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করবেন। (ملخص، الاحكام السلطانية و[illegible] الفتاوى ج ٢)

* ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে এবং ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাজনীতি করা হলে সেরূপ রাজনীতি করাও ফরযে কেফায়া হবে। অন্ততঃ কিছু লোক এ দায়িত্ব পালন না করলে সকলেই দায়ী থাকবেন। তবে রাজনীতি করতে গিয়ে নিজের দ্বীন ও ঈমান বাঁচানো সম্ভব না হলে সেরূপ রাজনীতি থেকে বিরত থাকাই জরুরী। কেননা রাজনীতি মূল উদ্দেশ্য নয়– মূল উদ্দেশ্য হল দ্বীন ও ঈমান আমল।

* আলেম নন–এরূপ লোকদের নেতৃত্বে পরিচালিত রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের কর্তব্য হল উলামায়ে কেরাম থেকে দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ গ্রহণ করে দলীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা এবং উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব হলো তাদেরকে রাহনুমায়ী করা। তবে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যদি উলামায়ে কেরামের রাহনুমায়ীতে পরিচালিত না হন সে রূপ ক্ষেত্রে সহীহ রাজনীতি করার জন্য বাহিশ্যত উলামায়ে কেরামকে এগিয়ে আসতে হবে।

(حکیم الامت حضرت تھانوی رح کے سیاسی افکار و العلم و العلماء)

* যে সব রাজনৈতিক দল ইসলামী খেলাফাত প্রতিষ্ঠার জন্য নয় বরং ক্ষমতার মোহে বা পার্থিব কোন স্বার্থে কিম্বা কুফর প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালিত হয় তাতে যোগদান করা বা তাদের সহযোগিতা করা জায়েয নয়।

হরতাল ও অবরোধ সম্পর্কিত বিধি-বিধান ঃ

* হরতাল ও অবরোধ ডাকা জায়েয কি না, এসম্পর্কে সাম্প্রতিক কালের উলামায়ে কেরামের মধ্যে দুটো মত লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ শর্ত সাপেক্ষে হরতাল অবরোধ ডাকা জায়েয বলতে চান। তাদের বক্তব্য হলঃ জনগণ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল অবরোধ পালন করে এবং হরতাল অবরোধ পালন করার

সময় কারও জান-মালের ক্ষতি সাধন করা না হয়, তাহলে এরূপ হরতাল অবরোধ ডাকা অবৈধ হওয়ার কোন কারণ নেই।

উলামায়ে কেরামের অপর একপক্ষ হরতাল অবরোধ ডাকা জায়েয নয় বলে মত পোষণ করেন। তারা বলেন, সাধারণতঃ নির্দিষ্ট কোন হরতাল অবরোধের ব্যাপারে সমস্ত জনগণ একমত হয় না এবং একমত না হওয়া সত্ত্বেও জানমাল ও ইজ্জত আব্রুর ভয়ে হরতাল পালন করতে হয় অর্থাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাড়ি ঘোড়া, দোকান-পাঠ ও যানবাহন বন্ধ রাখতে হয় এবং এতে করে বহু লোকের আয় উপার্জন বন্ধ থাকায় তাদেরকে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এভাবে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যেহেতু জায়েয নয়, অতএব যে হরতালের কারণে এটা হয় তাও অনিবার্য কারণেই নাজায়েয হবে।

আমাদের সমাজে হরতাল অবরোধের ডাক দেয়া হলে স্বাভাবিক ভাবেই জোর পূর্বক সকলকে হরতাল মানতে বাধ্য করা হয়, অন্যথায় জান-মাল ও ইজ্জত আব্রুর ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, জ্বালাও পোড়াও ও ভাঙ্গচুরের সম্মুখীন হতে হয়। এ হল সমাজের প্রচলিত অবস্থা। আর ফতুয়া হয়ে থাকে প্রচলিত প্রেক্ষাপটের আলোকেই। অতএব ফতুয়ার নীতি হিসেবে হরতাল অবরোধ সম্পর্কে শেষোক্ত মতটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। (والله اعلم بالصواب)

* হরতালের সময় কারও জান-মালের ক্ষতি সাধন করা বা ইজ্জত আব্রুর হানি করা হারাম ও কবীরা গোনাহ।

* জোরপূর্বক কাউকে হরতাল মানতে বাধ্য করা বা অবরোধ করা তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার নামান্তর। আর এভাবে কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা জায়েয নয়। অন্যায় করবে একজন আর সেই অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে, এটা শরীয়তের নীতি হতে পারে না।

অনশন ধর্মঘট প্রসঙ্গ ঃ

* রাজনৈতিক কর্মসূচী হিসেবে হোক বা এমনিতেই কোন দাবী-দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে হোক, অনশন ধর্মঘট করা শরীয়ত সম্মত নয়। অনশন ধর্মঘট আত্মহত্যার সমার্থবোধক। এভাবে মৃত্যু হলে হারাম মৃত্যু হবে এবং আত্মহত্যার পাপ হবে। (حکیم الامۃ حضرت تھانوی رح کے سیاسی افکار)

সরকারের আনুগত্য বা সরকার উৎখাতের আন্দোলন সম্পর্কে বিধি-বিধান ঃ

* যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার/রাষ্ট্রপ্রধান কোন পাপ কাজের জন্য বাধ্য না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। কোন পাপ কাজে তার আনুগত্য করা যাবে না।

* সরকার/রাষ্ট্র প্রধান কোন পাপ কাজের জন্য জনগণকে বাধ্য না করলে তাকে উৎখাতের জন্য আন্দোলন করা বৈধ নয়। তবে ধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য এবং পাপ প্রীতির কারণে কোন পাপ কাজের জন্য বাধ্য করলে তাকে উৎখাতের জন্য আন্দোলন করা বৈধ এই শর্তে যে, উৎখাতকারীগণ সরকার/ রাষ্ট্র প্রধানকে উৎখাত করার পর দেশ ও দেশের শাসন ব্যবস্থাকে সুসংহত রাখতে সক্ষম হবেন। (حضرت تھانوی رح کے سیاسی افکار وغیرہ)

বিবদমান পক্ষসমূহের যা যা করণীয় ও যা যা বর্জনীয় ঃ

* মানুষে মানুষে বা দলে দলের মধ্যে মতানৈক্য, মত বিরোধ বা বিবাদ প্রায়শঃই ঘটে থাকে এবং সাধারণতঃ এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক পক্ষই কিছু বাড়াবাড়ি করে ফেলেন ও ব্যালেন্স হারিয়ে বসেন, ফলে যা করার তা বর্জন করেন এবং যা বর্জন করার তা করে বসেন। এ জাতীয় ক্ষেত্রে প্রত্যেক পক্ষেরই নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মান্য করা উচিত ঃ

(১) প্রতিপক্ষের বক্তব্য, তাদের যুক্তি প্রমাণ ও তাদের অবস্থানকে সত্যিকারভাবে না বুঝেই তাদের প্রতি বদগোমানী করা অন্যায়। এরূপ না করা উচিত।

(২) এরূপ ক্ষেত্রে অনেক কথাই সত্য মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে বা অতিরঞ্জিত হয়ে কানে এসে থাকে। তাই নির্ভরযোগ্য মাধ্যম ছাড়া কোন কিছু কানে আসলে তাহকীক তদন্ত করা ব্যতীত তা বিশ্বাস না করা উচিত এবং তাহকীক তদন্ত ব্যতীত সে ব্যাপারে মুখ খোলা অনুচিত। অন্যথায় অনেক সময় পরবর্তীতে অনুতপ্ত হতে হয়।

(৩) প্রতিপক্ষের সমালোচনা ও প্রতিপক্ষের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ব্যালেন্স রক্ষা করে চলা উচিত– লাগামহীন হওয়া ঠিক নয়। যাতে পরবর্তীতে দুপক্ষের মধ্যে মিল মহব্বত হয়ে গেলে অতীতের কর্মকাণ্ড বা অতীতের অতিরঞ্জিত বক্তব্য স্মরণ করে লজ্জিত হতে না হয়। জবান সংযত না রাখা অনেক ক্ষেত্রেই পরবর্তীতে লজ্জিত হওয়ার কারণ ঘটে।

(৪) প্রতিপক্ষের ভালকে ভাল বলার উদারতা থাকা চাই। তাদের ভালকেও বিকৃত করে দেখা উচিত নয়।

(৫) অন্য যে কেউ কোন দোষ করলে সেটার জন্য প্রতিপক্ষকে অভিযুক্ত করে তাদেরকে ঘায়েল করার অপচেষ্টা একটা জঘন্য মনোবৃত্তি এবং মিথ্যাচারের শামিল বিধায় তা মহাপাপ।

(৬) এরূপ ক্ষেত্রে দেখা যায়, একপক্ষের সকলেই অন্যপক্ষের সকলের ব্যাপারে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেন এবং প্রতিপক্ষের সকলের ব্যাপারে বেধড়ক মন্তব্য শুরু করেন। এটা লক্ষ্য করা হয় না যে, আমি প্রতিপক্ষের যার

ব্যাপারে মুখ খুলছি তিনি আমার চেয়ে জ্ঞানে, গুণে, আমল আখলাকে অনেক উর্ধে, আমি তার সমপর্যায়ের নই, অতএব তার ব্যাপারে আমার মুখ খোলা শোভা পায় না, তার ব্যাপারে তিনিই মুখ খুলতে পারেন যিনি তার সমপর্যায়ের। তবে হাঁ স্পষ্টতঃই কোন অন্যায় কেউ করলে তার বিরোধিতা করতে হবে, তাই তিনি বড়ই হোন না কেন। তবে তিনি উস্তাদ/ গুরুজন হলে এবং বিরোধিতা করা প্রয়োজন হলে আদব রক্ষাপূর্বক বিরোধিতা করতে হবে।

বিবাদ নিরসন ও ঐক্য সংহতি সৃষ্টির জন্য যা যা করণীয় ঃ

* কয়েকজন বা কয়েক পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে কেউ বা কোন পক্ষ যদি স্পষ্টতঃ কুরআন সুন্নাহর উপর এবং ন্যায়ের উপর আর অন্যজন বা অন্যপক্ষ স্পষ্টতঃ কুরআন সুন্নাহর বিপক্ষে এবং অন্যায়ে থাকেন, তাহলে তাদের মধ্যে ঐক্য সংহতি সৃষ্টির একটাই মাত্র পদ্ধতি, আর তা হল যিনি বা যে পক্ষ কুরআন সুন্নাহর বিরুদ্ধে রয়েছেন তিনি বা সে পক্ষ নিজের মত পরিত্যাগ করে শরীয়তকে গ্রহণ করবেন। আর মতবিরোধ যদি ইজতেহাদগত বিষয়কে কেন্দ্র করে বা পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝির দরুন হয়ে থাকে, তাহলে সেরূপ ক্ষেত্রে পারস্পরিক ঐক্য সংহতি সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি সমূহ গ্রহণ করতে হবে।

(১) উভয়পক্ষকেই তাওয়াযু' বা বিনয় অবলম্বন করতে হবে এবং অহংকার বর্জন করতে হবে। অন্যথায় নিজের মত পরিত্যাগ করা সম্ভব হবেনা এবং ঐক্যও সৃষ্টি হবে না। কোন এক পক্ষ যদি গোঁ ধরেন বা অন্যের মত মেনে নিতে তার অহংকার বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হতে পারে না।

(২) বিবদমান লোক বা পক্ষসমূহের মধ্যে আপোষ ও ঐক্য সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন যোগ্য শালিস বা তৃতীয় ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে হবে, যিনি সকল পক্ষের বক্তব্য, সকল পক্ষের দলীল যুক্তি শুনবেন এবং সকল পক্ষের প্রকৃত অবস্থান অনুধাবন করবেন, তারপর যে পক্ষের অবস্থানকে অধিকতর সঠিক মনে করবেন তাদের অনুকূলে অন্যপক্ষকে মানার জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন এবং সে পক্ষ তা মেনে নিবেন।

(৩) উভয়পক্ষের মধ্যে যে বিষয় নিয়ে কোন বিরোধ নেই তাকে কেন্দ্র করে ঐক্য গড়ে উঠতে পারে যদি তাতে শরীয়তের বিধিবদ্ধ কোন বিষয় পরিত্যাগ করা অপরিহার্য হয়ে না দাঁড়ায়। (الاعتدال فى مراتب الرجال وغيره)

নির্বাচনে পদপ্রার্থী হওয়া সম্পর্কে শরীয়তের বিধান ঃ

* সাধারণভাবে নির্বাচনে পদপ্রার্থী হওয়া বা কোন পদের জন্য নিজে দাঁড়ান জায়েয নয়-মাকরূহ। তবে নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে বিশেষ কোন পদ চাওয়া ও তার জন্য নিজেকে পেশ করা জায়েয। শর্তগুলো এই ঃ

(১) যদি বিশেষ কোন পদ সম্পর্কে জানা থাকে যে, অন্য কোন ব্যক্তি এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে না এবং নিজে ভালরূপে তা সম্পাদন করতে পারবে বলে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকে।

(২) যদি উক্ত পদে গিয়ে কোন গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা না থাকে।

(৩) যদি প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ কড়ির মোহে না হয় বরং জনগণের বিশুদ্ধ সেবা ও ইনসাফের সাথে তাদের অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পদ চাওয়া হয়।

বিঃ দ্রঃ মানুষের উচিত যোগ্য ও সৎলোক জানা থাকলে তাকে ডেকে এনে পদ দান করা।

(معارف القرآن ও ভোট সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

ভোটের ক্যানভ্যাস ও নির্বাচনী প্রচারকার্য সম্পর্কে বিধি-বিধান ঃ

* অসৎ ও অবিশ্বস্ত লোক এবং যাদের জন্য পদপ্রার্থী হওয়া বৈধ নয় তাদের পক্ষে কারও থেকে ভোট দেয়ার ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি নেয়া দুরস্ত নয়। এরূপ ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি দেয়াও উচিত নয়। ভুল বশতঃ বা লজ্জায় পড়ে বা চাপের মুখে ওয়াদা দিয়ে থাকলেও সে ওয়াদা পালন করা উচিত নয়। তবে দেশের কোন দ্বীনদার ও প্রভাবশালী ব্যক্তি যদি তার ভোট কোন যোগ্য ও বিশ্বস্ত লোককে দেয়ার কথা প্রকাশ করেন এবং তার অনুসরণ করে অন্য লোকও সেদিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে যোগ্য ও বিশ্বস্ত লোককে ভোট দেয়ার জন্য মত প্রকাশ করা উচিত।

* মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া হারাম ও গোনাহে কবীরা। অতএব অযোগ্য ও অসৎ প্রার্থীর পক্ষে প্রচার করতে গিয়ে তাকে যোগ্য ও সৎ বলে প্রচার করা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার শামিল হিসেবে গোনাহে কবীরা ও হারাম।

* জালেম ও ফাসেকের প্রশংসা করা গোনাহে কবীরা এবং পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করা গোনাহে কবীরা। অতএব নির্বাচন প্রার্থী যদি ফাসেক বা জালেম হয়, তাহলে প্রচারকালে তার প্রশংসা করাও গোনাহে কবীরা হবে। প্রার্থী যদি এমন হয় যাকে ভোট দেয়া অন্যায়, তাহলে তার পক্ষে প্রচার করাও অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করার শামিল এবং গোনাহে কবীরা হবে।

* নিজের প্রশংসা নিজে করা গোনাহে কবীরা। অতএব নির্বাচনী প্রচারকালে নিজের প্রশংসা নিজে করলে গোনাহে কবীরা হবে। তবে কারও অন্যায় অভিযোগ থেকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে নিজের সঠিক অবস্থানকে মানুষের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বা মানুষকে ভাল কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনে যদি নিজের কোন ভাল বিষয়কে তুলে ধরা হয় তাহলে তার অনুমতি রয়েছে।

* নির্বাচনী প্রচার উপলক্ষে বক্তৃতা বিবৃতি দিতে গিয়ে প্রায়শঃই অন্য প্রার্থীদের দোষ চর্চা বা গীবত করা হয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক দোষ চর্চাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত এবং গীবত করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। তবে সত্যি সত্যিই কেউ যদি কাউকে হেয় করার উদ্দেশ্যে বা কাউকে হেয় করে নিজেকে বড় করে দেখানোর বা অহংকার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নয় বরং মানুষকে কারও সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তার সামনে অন্যের দোষের কথা আলোচনা করে, তাতে পাপ হবে না। তবে মনে রাখতে হবে, মনের গোপনতম কথাও আল্লাহ্ জানেন—আল্লাহর কাছে কোন লুকোচুরি চলে না।

ভোট প্রদান সম্পর্কে শরীয়তের বিধান ঃ

(১) যদি ইসলামের দাবী এবং জনগণের ন্যায্য দাবী পেশ করার বিশ্বস্ত, যোগ্য একজন মাত্র লোক থাকেন এবং তিনি কোন অনৈসলামিক দলভুক্ত না হন, তবে তাকে প্রতিনিধিত্বের পদে বরণ করে নেয়ার জন্য ভোট দেয়া ওয়াজিব।

(২) যদি অনুরূপ একাধিক ব্যক্তি পাওয়া যায়, তাহলে যিনি অধিক ইসলাম দরদী, অধিক গরীব দরদী হবেন তাকে সমর্থন করা মোস্তাহাব।

(৩) আত্মীয়তার খাতিরে বা দলপুষ্টির খাতিরে বা দেশী খেশী হওয়ার খাতিরে অযোগ্য, অসৎ বা দুর্নীতিপরায়ণ বা ধর্মদ্রোহীকে প্রতিনিধিত্বের পদের জন্য ভোট দেয়া মহাপাপ—হারাম।

(৪) যদি কেউ একবার অবিশ্বস্ত প্রমাণিত হয়ে থাকে অথচ আগামীতে বিশ্বস্ত দলভুক্ত হয়ে বিশ্বস্ত থাকার অঙ্গীকার করে এবং তার চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত লোক পাওয়া না যায় তাহলে তাকে ভোট দেয়া মাকরূহ।

(৫) যদি কারও অবিশ্বস্ত হওয়া প্রমাণিত না হয়ে থাকে অথচ সে বিশ্বস্ত থাকার অঙ্গীকার করে এবং তার চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত লোক মৌজুদ না থাকে, তাহলে তাকে ভোট দেয়া মোবাহ।

(৬) অসৎ, অবিশ্বস্ত লোককে ভোট দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দেয়া উচিত নয়। ভুল বশতঃ বা লজ্জায় পড়ে বা চাপে পড়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলেও সে প্রতিশ্রুতি পালন করা উচিত নয়।

(৭) যারা ভোটপ্রার্থী হয়েছে তাদের মধ্যে যদি কাউকে বিশ্বস্ত, ধার্মিক ও সৎকর্মী বলে অনুমিত না হয় এবং ইসলাম ও কুফরের মোকাবিলা না হয় তাহলে কাউকেই ভোট না দিয়ে ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকা উচিত। ভোটটাকে কেন নষ্ট করব? এই যুক্তিতে অপাত্রে ভোট দেয়া উচিত নয়। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে ভোট না দিলে পাপ হবে না, পক্ষান্তরে সে ভোটের দ্বারা জয়ী হয়ে গেলে সে জনগণের রক্ত শোষণ, ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে আইন পাশ ইত্যাদি করে যত পাপ অর্জন করবে, তাকে ভোট প্রদানকারীগণও সে পাপের অংশীদার হবে।

(৮) ইসলামের পক্ষ থেকে দাবী তুলবার মত যোগ্য প্রার্থী আছে কিন্তু তার একার কথায় কোন কাজ হবে না এ কথাও জানা আছে, এরূপ ক্ষেত্রেও তাকে সমর্থন করতে হবে, সে জয়ী হতে পারবে না–মনে হলেও। হকের সমর্থনের স্বার্থে, হকের আওয়াজ যেন মরে না যায় এ স্বার্থে তাকে সমর্থন করতে হবে। তার বিপক্ষে যাওয়া হারাম হবে।

(৯) কোন প্রার্থী যদি এমন হন যিনি ব্যক্তিগত ভাবে সৎ ও দ্বীনদার কিন্তু তিনি এমন একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, যে দল ইসলাম বিরোধী আইন পাশ করেছে বা করার প্রবল আশংকা আছে, যেহেতু তাদের দলে শরীয়ত মান্যতার কোন বাধ্যবাধকতা নেই বা শরীয়ত বিরোধিতারও কোন নিষেধ নেই, এরূপ সৎ লোককেও ভোট দেয়া জায়েয নয়।

(১০) যারা সাধারণতঃ ভোট আদায়ের সময় টাকা পয়সা ছড়িয়ে, দাওয়াত জিয়াফত খাইয়ে, স্কুল মসজিদ মাদ্রাসায় দান সাহায্য করে ভোট আদায় করে থাকে, তারা সাধারণতঃ যত টাকা ব্যয় করে তার চেয়ে বেশীগুণ জাতীয় সম্পদ খেয়ানত করে আদায় করার উদ্দেশ্যে করে থাকে, এরূপ প্রার্থীকে সমর্থন করা জায়েয নয়। এরূপ ক্ষেত্রে সমর্থনকারীগণ আমানতের খেয়ানতকারীদের দলভুক্ত হবে এবং পাপী হবে।

(হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী রচিত "ভোটারের দায়িত্ব ও ভোট সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ" গ্রন্থ থেকে গৃহীত)।

খলীফা/ রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

খলীফা/ রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য মৌলিকভাবে দশটি। যথা ঃ

(১) শরীয়তের প্রতিষ্ঠিত নীতি ও পূর্বসূরীদের ঐক্যমত অনুসারে দ্বীনের হেফাজত করা। বেদআত প্রতিহত করা এবং ফরয ওয়াজিবের উপর মানুষকে টিকিয়ে রাখা ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে সকলকে দূরে রাখা।

(২) বিবদমান লোকদের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করে দেয়া।

(৩) রাষ্ট্রের সংরক্ষণ করা এবং মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা।

(৪) রাষ্ট্রের সীমানা সংরক্ষণ করা এবং সীমান্ত প্রহরার ব্যবস্থা করা, যাতে সীমান্তের বাইরে থেকে কেউ অনুপ্রবেশ করে দেশের লোকদের জান-মালের ক্ষতি সাধন করতে না পারে।

(৫) শরীয়ত নির্ধারিত হুদূদ বা শাস্তির বিধানাবলী যথাযথভাবে প্রয়োগ করা।

(৬) ইসলামের দাওয়াত প্রদান করা। দাওয়াত গ্রহণ না করলে ইসলামের জেহাদের নীতি অনুসারে জেহাদ পরিচালনা করা।

(৭) কোনরূপ জুলুম অবিচার না করে শরীয়তের বিধান ও ফেকাহর মাসায়েল অনুসারে খারাজ (রাজস্ব/ খাজনা/ট্যাক্স) ও যাকাত উসূল করা।

(৮) বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন ভাতা নির্ধারণ করা এবং যথাযথভাবে (প্রয়োজনের চেয়ে কমও নয় বেশীও নয়) নির্দিষ্ট সময়ে তা পরিশোধ করা।

(৯) দ্বীনদার, আমানতদার, যোগ্য ও নির্ভরযোগ্য লোকদেরকে মন্ত্রী, গভর্নর, প্রতিনিধি ইত্যাদি দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করা।

(১০) নিজে সমস্ত রাজ্যের সবকিছুর তত্ত্বাবধান করা এবং খোঁজ-খবর রাখা।

(الاحكام السلطانية থেকে গৃহীত)

কোন পদে লোক নিয়োগের নীতিমালা

কোন পদে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ যে নীতিমালা রয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

(১) যে পদের জন্য লোক নিয়োগ করা হবে, সে পদের দায়িত্ব পালন করার মত প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও বিদ্যা বুদ্ধি তার মধ্যে থাকতে হবে।

(২) যাকে যে পদের জন্য নিয়োগ করা হবে তার মধ্যে উক্ত পদের দায়িত্ব পালন করার মত আমানতদারী ও সততা থাকতে হবে।

(৩) উক্ত পদের জন্য যে সব শর্তাবলী ও যোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে তার মধ্যে সে সব শর্তাবলী ও যোগ্যতা বিদ্যমান থাকবে হবে। যেমন কোন কোন পদের জন্য পুরুষ হওয়া শর্ত, কোন কোন পদের জন্য আলেম হওয়া শর্ত, কোন কোন পদের জন্য বিচক্ষণতা ও ইজতেহাদের ক্ষমতা থাকা আবশ্যক ইত্যাদি।

(৪) শ্রমের সময়, পারিশ্রমিক ও বেতন-ভাতা ইত্যাদি নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক।

(৫) চাকুরি এক ধরনের লেন-দেন, অতএব অন্যান্য বাকীতে লেনদেনের বিষয়ের ন্যায় চাকুরি সংক্রান্ত বিষয়েরও একটি লিখিত চুক্তিনামা থাকা উত্তম।

(৬) যোগ্যতা ও শর্তাবলী পূরণ হওয়ার ভিত্তিতে কোন আপনজন বা আত্মীয়কে নিয়োগ প্রদান করা স্বজনপ্রীতি ও অন্যায় নয়। যোগ্যতা ও শর্তাবলীর দিকটাকে উপেক্ষা করে নিছক আত্মীয়তার বা আপনজন হওয়ার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া অন্যায়।

(الاحكام السلطانية ও معارف القرآن প্রভৃতি থেকে গৃহীত)

অমুসলিম রাষ্ট্রে সরকারী পদ গ্রহণ সম্পর্কে বিধান

* কারও অধীনে পদ গ্রহণ করা তাকে সাহায্য সহযোগিতা করারই নামান্তর। আর অমুসলিমকে যেহেতু সাহায্য সহযোগিতা করা অবৈধ, তাই সাধারণ ভাবে অমুসলিম/কাফের সরকারের অধীনে সরকারী পদ গ্রহণ করা জায়েয নয়। তবে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পাওয়া গেলে জায়েয ঃ

(১) যদি এমন হয় যে, উক্ত পদ গ্রহণ না করলে জনগণের অধিকার খর্ব হওয়ার অথবা অত্যাচার উৎপীড়নের আশংকা রয়েছে আর উক্ত সরকারকে উৎখাত করারও ক্ষমতা নেই।

(২) যদি এরূপ বোঝা যায় যে, সে সরকার তাকে শরীয়ত বিরোধী কোন আইন জারী করতে বা মান্য করতে বাধ্য করবে না।

কয়েকটি বিশেষ রাষ্ট্রনীতি

* অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় রাষ্ট্রনীতিতেও মিথ্যা এবং ধোঁকার আশ্রয় গ্রহণ করা হারাম।

* ইসলাম সরকার-নির্বাচনের জন্য কোন পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেয়নি। তবে হযরত রাসূল (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকে কয়েকটি নমুনা পাওয়া যায়। যথা ঃ

(১) খলীফা/ রাষ্ট্রপ্রধান পরবর্তী খলীফা/ রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের বিষয়টি উম্মতের উপর ছেড়ে দিয়ে যাবেন। যেমন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর ক্ষেত্রে করা হয়েছিল।

(২) খলীফা/ রাষ্ট্রপ্রধান পরবর্তী খলীফা/ রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট নির্বাচক মণ্ডলী নির্ধারণ করে যাবেন। যেমন উমর (রাঃ) করেছিলেন।

(৩) খলীফা/রাষ্ট্রপ্রধান পরবর্তী খলীফা /রাষ্ট্রপ্রধানের নাম ঘোষণা করে যাবেন। যেমন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ)-এর নাম ঘোষণা করে যান।

* জনগণের মতের ভিত্তিতে খলীফা/ রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করতে হলে এ ব্যাপারে ইসলাম দায়িত্ব জ্ঞানশীল ও বিশ্বস্ত লোকদের মত গ্রহণের পক্ষপাতী। ইসলাম দায়িত্ব জ্ঞানহীন, অবিশ্বস্ত, বিক্রিত বা বিকৃতদের মত গ্রহণের পক্ষপাতি নয়।

* ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, জনগণ বা সর্বহারাদের নয়।

* ইসলামের দৃষ্টিতে আইনের উৎস আল্লাহ, জনগণ নয়। ইসলাম মানুষকে আইন প্রণয়নের অধিকার দেয়নি। তবে যার মূলধারা কুরআন সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে কিন্তু উপধারা বর্ণিত হয়নি এরূপ ক্ষেত্রে দায়িত্ব জ্ঞানশীল ইজতেহাদের ক্ষমতা সম্পন্ন আলেমদেরকে আইনের উপধারা রচনা করার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু সে উপধারা সমূহের Valid হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত এই যে, কুরআন সুন্নাহর খেলাফ যেন না হয়। সারকথা- ইসলাম জনগণকে Final authority বা Sovereign Power বলে বিশ্বাস করে না।

* কুরআন সুন্নাহর কোন ধারাকে ৯৯% ভোটের দ্বারাও বাতিল করা যাবে না।

* রাষ্ট্র পরিচালিত হবে মাশওয়ারা বা পরামর্শের ভিত্তিতে- কারও একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নয়।

(الاحكام السلطانية - معارف القرآن ও সংক্ষেপে ইসলাম প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

মাশওয়ারা বা পরামর্শ বিষয়ক নীতিমালা

* যে ব্যাপারে কুরআন সুন্নায় স্পষ্ট বিধান বর্ণিত নেই বা যে সব বিষয় করতেই হবে তা নয়- এমন সব বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে মাশওয়ারা বা পরামর্শ করে নেয়া সুন্নাত।

* মাশওয়ারা শুরু করার পূর্বে এই দুআ পড়ে নিবে-

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنَا مَرَاشِدَ اُمُوْرِنَا وَاَعِذْنَا مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا .

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, সঠিক বিষয়টি আমাদের অন্তরে উদিত করে দাও এবং আমাদের নফ্‌সের ধোঁকা ও কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

* মাশওয়ারার মজলিসে একজন আমীর বা মাশওয়ারা শেষে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী থাকতে হবে।

* মত সংগ্রহের বেলায় ইসলাম দায়িত্বজ্ঞানশীল বিশ্বস্তদের মত গ্রহণের পক্ষপাতী। তবে নিয়মতান্ত্রিক মাশওয়ারা গ্রহণের মত যোগ্য ব্যক্তি না থাকলে বা নিয়মতান্ত্রিক বড়রা না থাকলেও ছোট এবং সঙ্গীদের থেকে মাশওয়ারা গ্রহণও ফায়দা থেকে খালি নয়।

* মাশওয়ারা বা পরামর্শ ও মত প্রদানকারীকে কুরআন হাদীসের মূলনীতির আলোকে পরামর্শ ও মত দিতে হবে।

* মত গ্রহণের পর সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্টের মতের ভিত্তিতে দিতে হবে, না আমীর যেটা ভাল মনে করেন সেটার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হবে–এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে দু' ধরনের মত পাওয়া যায়। অনেকে বলেন সংখ্যাগরিষ্টের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হতে হবে। আবার অনেকে বলেন আমীর যেটা ভাল মনে করেন সেটাই হবে সিদ্ধান্ত, চাই সেটা সংখ্যাগরিষ্টের মত হোক বা অল্প সংখ্যকের মত হোক বা সেটা একান্তভাবে আমীরের একারই মত হোক। তবে এই অধিকার বলে আমীর গোঁ-ধরে অন্যদের উপযুক্ত রায়কেও উপেক্ষা করে নিজের মতকে চালিয়ে দিয়ে মাশওয়ারাকে প্রহসনে পরিণত করতে পারবেন না।

* কোন পরামর্শদাতা তার পরামর্শ গ্রহণ করা হল না কেন এ জন্য অভিযোগ তুলতে পারবেন না বা তার পরামর্শ গ্রহণ হল না বিধায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে বা মন খারাপ করতে পারবেন না।

* পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে কাজ শুরু করতে হবে।

* মাশওয়ারার মজলিসে মজলিসের অন্যান্য যে সব সুন্নাত, আদব ও নীতিমালা রয়েছে সে দিকেও লক্ষ্য রাখবে। এ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৪০২ পৃষ্ঠা।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

যে আত্মশুদ্ধি করে সে সফলকাম হয়। আর যে আত্মাকে কলুষিত করে সে ব্যর্থ হয়।

(সূরাঃ আশ্-শাম্স)

পঞ্চম অধ্যায়

আখলাকিয়্যাত

(চরিত্র এবং আত্মশুদ্ধি বিষয়ক)

নামাজ রোজা– প্রভৃতি শরীয়তের জাহিরী বিধানের উপর আমল করা যেমন জরুরী তদ্রূপ এখলাস, তাকওয়া, ছবর, শোকর প্রভৃতি কলবের গুণাবলী অর্জন এবং রিয়া, তাকাব্বুর প্রভৃতি অন্তরের ব্যাধি দূর করা তথা শরীয়তের বাতিনী বিধানাবলীর উপর আমল করাও জরুরী ও ওয়াজিব। এই বাতিনী বিধানাবলীর উপর আমল করাকে বলা হয় তায্কিয়া বা আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধির এই সাধনাকে আধ্যাত্মিক সাধনাও বলা হয়। আর এই শাস্ত্রকে বলা হয় তাসাউফ বা সূফীবাদ।

কয়েকটি আত্মিক গুণ ও তা অর্জনের পন্থা

এখ্লাস ও সহীহ নিয়ত ঃ

ইবাদত একমাত্র আল্লাহকে রাজী খুশি করার নিয়তে করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে রাজী খুশি করার ইচ্ছা বা নিজের নফসের কোন খাহেশকে মিশ্রিত না করার নাম হল এখলাস তথা খাঁটি নিয়ত। কোন কোন ইবাদতে কিছু কিছু পার্থিব ফায়দাও হাছেল হয়ে থাকে তবে সেটাকে উদ্দেশ্য বানিয়ে ইবাদত করা ঠিক নয়। এই এখলাস ও খাঁটি নিয়ত না হলে কোন ইবাদতের ছওয়াব পাওয়া যায় না। নিয়ত খাঁটি করা তথা এখলাস হাছিল করার পদ্ধতি হলঃ

(১) ইবাদত করার পূর্বে আল্লাহর উদ্দেশ্যে করছি এই চিন্তা করে নেয়া এবং দেলের মধ্য থেকে অন্যান্য বাজে উদ্দেশ্য দূরে নিক্ষেপ করা।

(২) অন্তর থেকে 'রিয়া' দূর করার পদ্ধতি গ্রহণ করা। (৫২৩ পৃষ্ঠায় দেখুন) বস্তুতঃ রিয়া দূর করাই হল এখলাস।

তাকওয়া ও খোদাভীতি ঃ

"তাকওয়া" কথাটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) ভয়। (২) বিরত থাকা। বস্তুতঃ ভয় আসলেই মানুষ কোন কিছু থেকে বিরত থাকে; তাই ভয় হল বিরত থাকার কারণ আর বিরত থাকা (অর্থাৎ গোনাহ থেকে বিরত থাকা) হল আসল উদ্দেশ্য। তাকওয়ার কয়েকটি স্তর রয়েছে।

(ক) কুফ্র ও শির্ক থেকে বিরত থাকা।

(খ) হারাম ও গোনাহে কাবীরা থেকে বিরত থাকা।

(গ) গোনাহে ছগীরা থেকে বিরত থাকা।

(ঘ) যেখানে হালাল না হারাম-এই সন্দেহ থাকে সেখান থেকে বিরত থাকা।

(ঙ) অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা।

(চ) যে সব মোবাহ কাজ গোনাহের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে তা থেকে বিরত থাকা।

তাকওয়া অর্জনের পন্থা হল ঃ

(১) আল্লাহর আযাব গজবের কথা, পরকালের আযাবের কথা চিন্তা করা এবং স্মরণ করা।

(২) বুযুর্গদের সোহবত গ্রহণ করা।

(৩) ওলী-আউলিয়াদেরকে কষ্ট না দেয়া।

(৪) সঠিক কথা বলা।

(شریعت اور طریقت এবং معارف القرآن প্রভৃতি থেকে গৃহীত)

ছবর ঃ

ছবর অর্থ মনকে মজবুত রাখা, মনকে ধরে রাখা। ছবর কয়েক প্রকারঃ (ক) ইবাদতের সময় ছবর, অর্থাৎ ইবাদত ও নেক কাজের উপর মনকে পাবন্দির সাথে ধরে রাখা এবং ধৈর্য সহকারে সহীহ তরীকায় তা আদায় করা। (খ) গোনাহের সময় ছবর, অর্থাৎ মনকে গোনাহ থেকে দূরে ধরে রাখা (গ) কষ্ট ও বিপদ-আপদের সময় ছবর, অর্থাৎ কেউ কোন কষ্ট দিলে প্রতিশোধ না নেয়া এবং রোগ-ব্যাধি হলে বা জান মালের ক্ষতি হলে বে-ছবর হয়ে শরীয়তের খেলাফ কোন কথা মুখ থেকে বের না করা বা বয়ান করে ক্রন্দন না করা। এই ছবর হাছিল করার পন্থা হল ঃ

(১) খাহেশাতে নফসানীকে দুর্বল করা।

(২) ইবাদত করলে, গোনাহ থেকে বিরত থাকলে এবং কষ্ট ও বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তাআলা যে ছওয়াবের ওয়াদা করেছেন তা স্মরণ করা।

(৩) রোগ-ব্যাধি ও জান মালের ক্ষয়-ক্ষতি হলে মনকে এই বলে বুঝানো যে, এ সবই আমার কোন না কোন মঙ্গলের জন্য হচ্ছে, যদিও আমি বুঝছি না। তাছাড়া ধৈর্য ধরলে এতে আমার পাপ মোচন হয়ে দরজা বুলন্দ হবে। তদুপরি আমি ছবর না করলেও তাকদীরে যা আছে তাতো হবেই, আমি বে-ছবরী করে অহেতুক ছওয়াব হারাব কেন?

হিল্‌ম বা সহনশীলতা ঃ

রাগ দমন করার গুণটি যখন স্বভাবে পরিণত হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে, তখন সে গুণটিকে বলা হয় হিল্‌ম বা সহনশীলতা। যেমন– রাগের মুহূর্তে উত্তেজনাকে বলপূর্বক দমন করে রাখলে সেটা হবে রাগ দমন আর সর্বক্ষণ এরূপ করতে করতে যখন রাগ দমন করাটা তার স্বভাবে পরিণত হবে তখন সেটা সহনশীলতা বলে আখ্যায়িত হবে।

রাগ-দমন করার যে সব পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে, উপর্যুপরি সেগুলো অবলম্বন করতে থাকলে সহনশীলতার গুণ অর্জিত হবে। বিশেষ ভাবে সহনশীলতার গুণ আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়– একথাও স্মরণে রাখতে হবে। রাসূল (সঃ) সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য গুণের প্রশংসা করেছেন।

তাফবীয বা নিজেকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করা ঃ

মানুষ তার সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, তারপর তার জাহিরী, বাতিনী, শারিরীক, মানসিক যা কিছু অনুকূলে বা প্রতিকূলে ঘটবে

সেটাকে সে আল্লাহর হস্তক্ষেপ মনে করবে। এভাবে সে নিজেকে আল্লাহর সোপর্দ করবে। মানুষ চেষ্টা করবে কিন্তু ফলাফল আল্লাহর সোপর্দ করবে। এটাকে বলা হয় তাফবীয। কেউ এরূপ করলে ব্যর্থতা আসলেও তার মনে কষ্ট আসবে না– সর্বাবস্থায় আরাম বোধ হবে। তবে আরামের নিয়তে তাফবীয করা দ্বীন নয় বরং দুনিয়া; এতে তাফবীযের ছওয়াব নষ্ট হয়ে যাবে বরং তাফবীয করা কর্তব্য এবং এটা আল্লাহর হক– এই নিয়তে তাফবীয করতে হবে। এটা হাছিল করার তরীকা হল ঃ

(১) কোন অযাচিত বা অপছন্দনীয় বিষয় ঘটালে সেটাকে আল্লাহর হস্তক্ষেপ মনে করা।

রেযা-বিল কাযা বা আল্লাহর ফয়সালায় রাজী থাকা ঃ

আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহর ফয়সালার উপর অভিযোগ পরিত্যাগ করাকে বলা হয় 'রেযা বিল কাযা'। মানুষ আসবাব গ্রহণ করবে, চেষ্টা চরিত্র করবে, দুআ করবে সুন্নাত এবং আনুগত্য হিসেবে। তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফয়সালা ঘটবে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে এবং মুখে বা অন্তরে কোন অভিযোগ আনবে না। স্বয়ং চেষ্টা এবং দুআ করার সময়ও মনের এই অবস্থা রাখবে যে, উদ্দেশ্য মোতাবেক না ঘটলেও তাতে আমি সন্তুষ্ট। এটাই হল রেযা বিল কাযা। এটা হাছিল করার তরীকা হল ঃ

(১) আল্লাহর মহব্বত হাছিল হলেই রেযা বিল কাযা হাছিল হয়ে যাবে। অতএব এর জন্য আল্লাহর মহব্বত হাছিল করার পন্থা গ্রহণ করতে হবে। (দেখুন ৫৩৬ পৃষ্ঠা)

(২) বিশেষভাবে এই চিন্তা করা যে, আল্লাহ ভাল, তাঁর সব কাজই ভাল, তিনি পরম দয়ালু, বিন্দুমাত্রও নিষ্ঠুর নন; অতএব তিনি যা করেন তাতেই মঙ্গল নিহিত।

তাওয়াক্কুল ঃ (আল্লাহর উপর ভরসা)

আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু হতে পারে না– এই বিশ্বাস রাখা ঈমানের অংশ। যেহেতু তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু হতে পারে না, তাই শরীয়তের নিয়মানুযায়ী যে কোন চেষ্টা-তদবীর গ্রহণ করার পর কামিয়াবী-র জন্য মনে মনে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে। এরূপ ভরসা রাখাকে বলা হয় তাওয়াক্কুল। উল্লেখ্য যে, চেষ্টা তদবীর না করে হাত পা গুটিয়ে অকর্মন্য হয়ে বসে থাকা বা চেষ্টা না করে ফলের আশা করা শরীয়তের বিধান নয় এবং এটাকে তাওয়াক্কুলও

বলা হয় না বরং নিয়ম মত চেষ্টা তদবীর করে, নিয়ম মত আসবাব গ্রহণ করে তার ফলের জন্য এবং কামিয়াবী-র জন্য মনে মনে আল্লাহর উপর ভরসা রাখাকেই বলা হয় তাওয়াক্কুল।

তায়াক্কুল হাছিল করার পন্থা হল ঃ

(১) কিছুক্ষণ সময় নির্ধারিত করে এই চিন্তা করা যে, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, আল্লাহ দয়াময়, তিনিই মঙ্গলময়, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কারও কিছু করার ক্ষমতা নেই।

(২) অতীতে আল্লাহর অনুগ্রহে যে সব কামিয়াবী হাছিল হয়েছে সে গুলোকে স্মরণ ও চিন্তা করা।

(বিঃ দ্রঃ আসবাব গ্রহণ করা না করার বিস্তারিত নীতি সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৪৫৩ নং পৃষ্ঠা)

শোকরঃ

নেয়ামতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করা, আর যে ব্যক্তি নেয়ামতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করবে, স্বাভাবিকভাবে তার ফলশ্রুতি স্বরূপ সে আল্লাহর প্রতি মনে মনে প্রফুল্ল হবে এবং সর্বাগ্রহে সেই অনুগ্রহ দানকারী আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হবে, তাঁর নির্দেশ পালনে তৎপর হবে এবং তাঁর দেয়া নেয়ামতকে তাঁর নাফরমানীর কাজে লাগাবে না। এটাকেই বলা হয় শোকর বা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা।

শোকর হাছিলের তরীকা হল ঃ

(১) আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ সমূহকে স্মরণ করা এবং চিন্তা করা।

(২) সব নেয়ামতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করা।

উল্লেখ্য-আল্লাহর কোন নেয়ামতের ভিত্তিতে শুধু মুখে "আলহামদু লিল্লাহ" বললেই শোকর আদায় হয়ে যায় না বরং প্রকৃত শোকর হল নেয়ামতের ভিত্তিতে মনে মনে আল্লাহর প্রতি প্রফুল্ল হওয়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে নেয়ামত দাতা আল্লাহর হুকুম পালনে তৎপর হওয়া। তবে এর সাথে সাথে খুশিতে জবান থেকে "আলহামদু লিল্লাহ" বের হলে সেটাও ইবাদত বলে গণ্য হবে এবং ছওয়াবের হবে।

তাওয়াযু' ঃ (বিনয়/নম্রতা)

তাওয়াযু' অর্থাৎ, বিনয় বা নম্রতা বলা হয় নিজেকে ছোট মনে করাকে, নিজের অহমিকাবোধ বিলীন করাকে। সমস্ত মোসলমানের চেয়ে নিজেকে ছোট

মনে করতে হবে। যদিও আপাতঃ ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাউকে নিজের চেয়ে অধিক পাপী ও অপরাধী বলে মনে হয় তবুও তার থেকে নিজেকে ছোট মনে করতে হবে এই ভেবে যে, হতে পারে তার মধ্যে এমন কোন গুণ রয়েছে যার ভিত্তিতে আল্লাহর নিকট সে আমার চেয়ে অনেক বেশী পছন্দনীয়, কিম্বা ভবিষ্যতে সে আমার চেয়ে অধিক গুণাবলীর অধিকারী হবে এবং সে অবস্থায়ই সে আল্লাহর নিকট হাজির হবে। পক্ষান্তরে আমার পরিণতি কি হবে তা আমার জানা নেই। পরিণামের দিকে নজর দিয়ে একজন কাফের থেকেও নিজেকে বড় মনে করার উপায় নেই, কেননা মৃত্যুর পূর্বে তারও ঈমান নসীব হতে পারে। পক্ষান্তরে ঈমানের সাথে আমার মৃত্যু হওয়ার কোন গ্যারান্টি আমার কাছে নেই। তবে বর্তমান অবস্থায় একজন কাফেরের যেহেতু ঈমান নেই আর আমার ঈমান নসীব হয়েছে, তাই বর্তমানের বিচারে আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ– এই বোধ রাখতে হবে। এটা তাওয়াযু' বা বিনয়ের পরিপন্থী অর্থাৎ অহংকার নয়– এটা হল দ্বীনী আত্মমর্যাদা বোধ এবং আল্লাহ আমাকে ঈমানের মত বড় নেয়ামত দান করেছেন সেই নেয়ামতের প্রতি বড়ত্ববোধ। মনে রাখতে হবে তাওয়াযু' প্রকাশ করতে গিয়ে যেন আল্লাহর কোন নেয়ামতের না– শুকরি প্রকাশ হয়ে না পড়ে।

তাওয়াযু' হাছিল করার পন্থা ঃ

(১) তাকাব্বুর দূর করার পন্থাই হল তাওয়াযু' হাছিল করার পন্থা। (দেখুন পৃষ্ঠা নং ৫৪২)

(২) অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করলে তাওয়াযু' পয়দা হয়। (আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার পন্থা দেখুন ৫৩৫ পৃষ্ঠা)

খুশু' খুযু' ঃ (স্থিরতা ও একাগ্রতা)

দেহ মন স্থির করে ইবাদত করা, একাগ্রতা সহকারে ইবাদত করা এবং চলা-ফেরা, উঠা-বসায় উগ্রতা পরিহার করাকে বলা হয় খুশু' খুযু'। ইবাদতের মধ্যে দেহ স্থির করার অর্থ হল অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া না করা। আর মন স্থির করার অর্থ হল ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে উপস্থিত না করা এবং ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্য কিছু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করা। অনিচ্ছাকৃত ভাবে যেটা মনে এসে যায়, বান্দা তার জন্য দায়ী নয়।

এই খুশু' খুযু' হাছিল করার তরীকা হল ঃ

(১) এই চিন্তা করবে যে, আমি আল্লাহর সামনে উপস্থিত, আল্লাহ আমার সব কিছু শুনছেন এবং দেখছেন আর আল্লাহর কাছে আমাকে ফিরে যেতে হবে।

(২) আল্লাহর ভয় অন্তরে বসানো। এর জন্য পরবর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টির পদ্ধতি সমূহ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষভাবে নামাযে মন স্থির করার পদ্ধতির জন্য দেখুন ১৫৯ পৃষ্ঠা)।

খাওফ বা আল্লাহর ভয় ঃ

শরীয়তে খাওফ বা ভয় বলতে নিজের ব্যাপারে আল্লাহর আযাবের ভয়-ভীতির সম্ভাবনা বোধ করাকে বুঝানো হয়। এই ভয় এত উত্তম জিনিস যে, এটা এসে গেলে মানুষ থেকে কোন গোনাহ হতে পারে না। খাওফ বা আল্লাহর ভয় অর্জন করার উপায় হল ঃ

(১) আল্লাহর আযাব গযবের কথা স্মরণ করা এবং চিন্তা করা।

রজা বা আল্লাহর রহমতের আশা ঃ

আল্লাহর আযাবের যেমন ভয় রাখতে হবে তেমনি ভাবে আল্লাহর রহমত, মাগফেরাত, জান্নাত এবং অনুগ্রহ লাভের আশাও মনে থাকতে হবে– নিরাশ হওয়া যাবে না। ভয় এতটা কাম্য নয় যে, আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে হতাশা জন্মাবে। আবার আল্লাহর রহমতের আশাও এতটা প্রবল হওয়া ঠিক নয় যাতে আল্লাহর বিধান লংঘন করার মত দুঃসাহস দেখা দেয় এই ভেবে যে, আল্লাহ তাআলা রহমত করবেন বরং ভয় ও আশা এতদুভয়ের মধ্যে ব্যালেন্স ও ভারসাম্য থাকতে হবে। এই রজা হাছিলের উপায় হল ঃ

(১) আল্লাহর অসীম ও অপার রহমতের কথা চিন্তা করা।

উল্লেখ্য, কেউ যদি শুধু আল্লাহর রহমত-মাগফেরাত ও জান্নাত লাভের আশা করে আর তা লাভের পদ্ধতি অর্থাৎ নেক আমল, তওবা প্রভৃতি অবলম্বন না করে, তাহলে সেটাকে রজা বা আশা বলা হবে না বরং সেটা হবে বীজ বপন না করে ফসল অর্জনের আশা করার মত অলীক কল্পনা।

আল্লাহর মহব্বত ও শওক ঃ

আল্লাহর সঙ্গে মহব্বত বা ভালবাসার অর্থ হল আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অন্য সকলের সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দেয়া। এরূপ মহব্বত রাখা ওয়াজিব। এরূপ মহব্বতের সর্বনিম্ন স্তর হল কুফ্‌র-এর উপর ঈমান–কে প্রাধান্য দেয়া। এটা না হলে মানুষ মুমিনই থাকে না। তারপরের স্তর হল আল্লাহর বিধানকে অন্যের বিধানের উপর প্রাধান্য দেয়া। বিধান যে পর্যায়ের, তার প্রতি ভালবাসা বা সেটাকে প্রাধান্য দেয়ার হুকুমও সেই পর্যায়ের-ওয়াজিব হলে ওয়াজিব, মোস্তাহাব হলে মোস্তাহাব। উপরোক্ত ভালবাসাকে বলা হয় মহব্বতে আক্‌লী বা বুদ্ধিজাত ভালবাসা। আর এক প্রকারের ভালবাসা রয়েছে যাকে মহব্বতে ত্বাব্‌য়ী বা স্বভাবজাত ভালবাসা বলে। তা হল আল্লাহর সঙ্গে প্রাণের টান হয়ে যাওয়া, তাঁর কথা শুনলে তা মানার জন্য মন উদ্বেল হয়ে ওঠা এবং তাঁর নাফরমানী ছেড়ে তাঁর

আনুগত্য শুরু করে দেয়। প্রথম প্রকারের ভালবাসা মানুষের এখতিয়ারভুক্ত এবং তার উপর টিকে থাকলে ধীরে ধীরে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভালবাসা মনে সৃষ্টি হয়ে যায়। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টির জন্য বুযুর্গানে দ্বীন নিম্নোক্ত পন্থা সমূহ গ্রহণের কথা বলেছেন ঃ

(১) দ্বীনের ইল্‌ম শিক্ষা করা।

(২) হিম্মত সহকারে শরীয়তের জাহিরী বাতিনী সব ধরনের আমলের পাবন্দী করা, জাহের এবং বাতেন উভয়কে শুদ্ধ ও পবিত্র করা।

(৩) আমলের মধ্যে যে দিকটি আরামের সে দিকটি গ্রহণ করা। (যদি তা গ্রহণে শরীয়তের কোন বাঁধা না থাকে)

(৪) আল্লাহর হুকুম আহকাম পুরাপুরি মেনে চলা। ফরযসমূহকে পুরাপুরি আদায় করার সাথে সাথে বেশী বেশী নফলে লিপ্ত হওয়া।

(৫) সাথে সাথে আল্লাহর মাহবূব হযরত রাসূল (সঃ)-এর পূর্ণ পায়রবী করা। আল্লাহর মহব্বত বৃদ্ধি করার নিয়তে নেক আমলে অটল থাকা।

(৬) কিছুক্ষণ নির্জনে বসে 'আল্লাহ আল্লাহ' করা।

(৭) আল্লাহর সঙ্গে যাদের মহব্বত সৃষ্টি হয়েছে এরূপ বুযুর্গদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা, তাদের সাহচর্য গ্রহণ করা, তাদের কাছে যাতায়াত করা, সম্ভব না হলে অন্ততঃ চিঠি-পত্রের মাধ্যমে সম্পর্ক অব্যাহত রাখা।

(৮) নিজে কি করছি এবং তা সত্ত্বেও আল্লাহর কত দয়া এবং নিয়ামত তা স্মরণ করা (নির্জনে বসে কিছুক্ষণ এটা চিন্তা করবে)।

(৯) দুআ করবে যেন আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে মহব্বত বৃদ্ধি করে দেন।

(১০) এই মোরাকাবা (ধ্যান) করা যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে ভালবাসেন, তিনি আমাকে চান। এর দ্বারা বান্দার অন্তরেও ভালবাসা সৃষ্টি হবে।

(১১) আল্লাহর আছমায়ে হুছনা (উত্তম নামসমূহ)-এর সাথে মহব্বত পয়দা করা এবং বেশী বেশী সেগুলো পাঠ করা। (দেখুন ৪৯ পৃষ্ঠা)

(১২) বেশী বেশী তওবা করা।

হুব্ব ফিল্লাহ ও বুগয ফিল্লাহঃ

ঈমান পূর্ণ করার জন্য যেমন আল্লাহকে ভালবাসতে হবে, আল্লাহর প্রতি ভক্তি রাখতে হবে তদ্রুপ আল্লাহ যে ব্যক্তিকে, যে বস্তুকে বা যে কাজ ও যে গুণকে

ভালবাসেন তাকেও ভালবাসতে হবে। একে বলা হয় হুব্ব ফিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর জন্য দুস্তী রাখা বা আল্লাহর ভালবাসার পাত্রকে ভালবাসা। এর বিপরীত আল্লাহ যে ব্যক্তিকে, যে বস্তুকে বা যে কাজ ও যে দোষকে ঘৃণা করেন, না পছন্দ করেন তাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করতে হবে। একে বলে বুগয ফিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করা বা আল্লাহর দুশমনের সঙ্গে দুশমনী রাখা। এমনি ভাবে রাসূলের প্রিয় যারা তাদেরকে ভালবাসা এবং রাসূলের দুশমন যারা অন্তর থেকে তাদের সাথে দুশমনী রাখাও ঈমানের জন্য জরুরী।

দেশাত্মবোধ বা দেশ প্রেম ঃ

নিজের জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা ও প্রেমানুভূতিকে বলা হয় দেশাত্মবোধ। শরীয়তের দৃষ্টিতে দেশাত্মবোধ একটি প্রশংসনীয় গুণ। তিরমিযী শরীফের হাদীছে বর্ণিত আছে– রাসূল (সঃ) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা রওয়ানা হন, তখন বার বার মক্কাভূমির দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন এবং বলছিলেন ঃ হে মক্কার মাটি, আমার গোত্র যদি আমাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য না করত, তাহলে কখনো তোমায় আমি ছেড়ে যেতাম না। এখানে একথাও উল্লেখ্য যে, দেশ প্রেমের এই প্রেরণা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশংসনীয় যতক্ষণ তা জাতীয় গোঁড়ামী ও বিদ্বেষে পরিণত না হয় এবং মানবীয় ভ্রাতৃত্বের সাথে তার সংঘাত না ঘটে, যেমনটি ঘটেছিল হিটলার ও নাজিবাদের আধুনিক ইউরোপীয় দেশাত্মবোধের ফলশ্রুতিতে এবং যা সূচনা করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের।

দেশাত্মবোধ একটি স্বভাবজাত প্রেরণা, জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণকে গভীরতর পর্যায়ে নিয়ে গেলেই তা দেশাত্মবোধে পরিণত হয়। আল্লাহ যে ভূখণ্ডকে আমার জন্মভূমি বানিয়েছেন আমার জীবন কর্মময়তায় মণ্ডিত হবে সেখানে, সে-ই আমার আপনভূমি– এরূপ চিন্তা থেকে দেশাত্মবোধ জন্ম নিয়ে থাকে।

গায়রত বা আত্মমর্যাদা বোধ ঃ

শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বা শ্রদ্ধেয় বস্তুর নিন্দা বা অবমাননা দেখলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে একটা ক্রোধ ভাবের উদ্রেক হয়, এই ক্রোধ ভাবকে বলা হয় গায়রত বা আত্মমর্যাদা বোধ। যেমন মাতা পিতাকে কেউ গালি দিলে বা নিন্দা করলে আত্মামর্যাদা বোধে আঘাত লেগে থাকে। এরূপ আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, কুরআন, কা'বা, ইসলাম, দ্বীন, ঈমান প্রভৃতির অবমাননা বা তিরস্কার ও তুচ্ছ

তাচ্ছিল্য হতে দেখলে মুসলমানদের অন্তরে এই গায়রত জাগ্রত হওয়া উচিত। এই গোস্বা দূষণীয় নয় বরং প্রশংসনীয় এবং ঈমানের পরিচায়ক। আর এই চেতনা না থাকা ঈমানহীনতার পরিচায়ক। নিজের সম্মান, পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবের সম্মান এবং দেশ ও জাতির সম্মান সংরক্ষণের জন্য সৃষ্ট ক্রোধের অনুপ্রেরণা এই আত্মমর্যাদা বোধের পরিধিভুক্ত।

যুহ্দ বা দুনিয়ার মোহ ত্যাগ ঃ

বৈধ আসবাব ও সম্পদ বর্জন করা নয় বরং সম্পদের মোহ বর্জন করার নাম হল যুহ্দ। সম্পদ পেলেও খুব আনন্দিত নয়, আবার না পেলেও বা পেয়ে হাতছাড়া হলেও দুঃখিত নয়– মনের এই অবস্থাই হল যুহ্দের উচ্চস্তর একজন যাহেদ বা দুনিয়ার মোহত্যাগকারী ব্যক্তি সম্পদ উপার্জনের জন্য চেষ্টা করবে সম্পদের প্রতি মোহের কারণে নয় বা প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে নয় বরং প্রয়োজন পূরণ করার এবং আল্লাহর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে। তার নজর থাকবে আল্লাহর ও আল্লাহর নিকট যে পুরস্কার রয়েছে তার প্রতি– পার্থিব সম্পদের প্রতি নয়। যুহ্দ হাছিল করার উপায় হল ঃ

(১) এই চিন্তা করা যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাত স্থায়ী, দুনিয়ার সব কিছুই ত্রুটিপূর্ণ ও দোষযুক্ত আর পরকালের সবকিছু ত্রুটি ও দোষমুক্ত।

মোরাকাবা ঃ (আল্লাহর ধ্যান)

প্রত্যেকটা কথা এবং কাজের সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখা যে, তিনি আমাকে দেখছেন এবং শুনছেন। তাই কোন মন্দ কথা বা কাজ হলে এই ভাবা যে, আল্লাহ্ এতে অসন্তুষ্ট হবেন এবং শাস্তি দিবেন; দুনিয়াতেই শাস্তি দিবেন না হয় পরকালেতো দিবেনই। পক্ষান্তরে কোন ভাল কথা বা কাজের ব্যাপারে এই ভাবা যে, আল্লাহ এতে সন্তুষ্ট হবেন এবং পুরস্কৃত করবেন। এরূপ মোরাকাবা বা আল্লাহর ধ্যান অমূল্য রতন। এটা হাছিলের তরীকা হল ঃ

(১) প্রথম দিকে বার বার জোর করে মনে এই চিন্তা টেনে আনা। পরে এটা করা সহজ হয়ে যাবে।

(২) মুখে অনবরত আল্লাহর যিকির করতে থাকা।

(৩) আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতে থাকা।

(معارف القرآن . بصائر حکیم الامت . شریعت اور طریقت প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

কানায়াত ঃ (অল্পেতুষ্টি)

অল্পে তুষ্ট থাকাকে বলে কানাআত। জীবিকার ব্যাপারে, অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে সদুপায়ে চেষ্টা করতে হবে কিন্তু সীমাহীন দুরাকাংখাকে মনে স্থান দেয়া যাবে না বরং বৈধ উপায়ে স্বাভাবিক চেষ্টা সাধনার পর যা পাওয়া যাবে তাতেই তুষ্ট থাকতে হবে। এতেই প্রকৃত শান্তি। অন্যথায় কোটি কোটি টাকার উপর শুয়ে থেকেও মনে শান্তি জুটবে না। দুনিয়ার মহব্বত ও সম্পদের মোহ অন্তর থেকে দূরীভূত করতে পারলে এই অল্পেতুষ্টির গুণ অর্জিত হবে।

ফিক্‌র (চিন্তা-ভাবনা) ও মুহাছাবা (হিসাব-নিকাশ)ঃ

ফিকর বা চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে আত্মসংশোধনের একটি মৌলিক বুনিয়াদ। প্রত্যেকটা কথা এবং কাজের শুরুতে চিন্তা-ভাবনা করে নিতে হবে যে, এর পরিণাম কি হবে, এটা করা উচিত হবে কিনা, এতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন না অসন্তুষ্ট। এমনিভাবে আরও চিন্তা করা উচিত যে, দিন দিন আমার আমলের উন্নতি হচ্ছে না অবনতি। এর জন্য প্রতি দিন নিজের আমলের মুহাছাবা অর্থাৎ, হিসাব-নিকাশ নিতে হবে এবং যা কিছু নেক কাজ হয়েছে তার জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে আর যা গোনাহ হয়েছে তার জন্যে তওবা করতে হবে এবং আগামীতে তা না করার সংকল্প করতে হবে। বিশেষভাবে ফিক্‌রে আখিরাত বা পরকালের চিন্তা মানুষকে গোনাহ থেকে বিরত রাখে এবং নেক কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এই ফিক্‌র হাছেল করার পন্থা হল ঃ

(১) দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জগতের স্বরূপ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

(২) বিশেষ ভাবে ফিক্‌রে আখেরাত আসবে মৃত্যুকে স্মরণ করলে।

কয়েকটি মনের রোগ এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায়

রিয়া বা লোক দেখানোর মনোভাব ঃ

ইবাদত ও আল্লাহর আনুগত্যের কাজে এই উদ্দেশ্য রাখা যে, এতে মানুষের চোখে আমার সম্মান বৃদ্ধি পাবে– একে বলে রিয়া বা লোক দেখানো, এটা মহাপাপ। রিয়া নানাভাবে হয়ে থাকে-কখনও মুখে বলে, কখনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে, কখনও হাটা, চলা, ভাব-ভঙ্গি, আওয়াজ ইত্যাদির মাধ্যমে, কখনও পোশাক-পরিচ্ছদের মাধ্যমে, কখনও ইবাদত সুন্দর ও দীর্ঘভাবে আদায়ের মাধ্যমে ইত্যাদি। মোটকথা– ইবাদত ও আনুগত্যের কাজে যে কোন ভাবে মাখলূকের প্রতি নজর রাখা হল রিয়া। এমনকি লোকে দেখবে– এজন্য ইবাদত গোপনে করার প্রতি জোর দেয়াও রিয়া। কেননা গোপনে ইবাদত করার প্রতি

জোর সেই দিবে যার নজর মাখলুকের প্রতি রয়েছে। কেউ দেখবে কি দেখবে না এই চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়াই হচ্ছে পূর্ণ রিয়া থেকে মুক্তি এবং এটাই হল পূর্ণ এখলাস। এখানে উল্লেখ্য যে, আমার নেক কাজ দেখে অন্য কেউ তা করতে উদ্বুদ্ধ হবে– এরূপ চেতনা থেকে নেক কাজ প্রকাশ্যে করলে তা রিয়া বলে গণ্য হবে না। এমনি ভাবে আমাকে কেউ নেক কাজ করতে দেখলে স্বভাবতঃ আমার মনে যে খুশি হয় এই ভেবে যে, আলহামদু লিল্লাহ লোকটা আমাকে ভাল অবস্থায় দেখেছে এটাও রিয়া নয় বরং রিয়া হল এই চিন্তা এবং এই খুশি যে, প্রকাশ্যে ইবাদত করলে মানুষের কাছে আমার সুনাম হবে, আমার প্রতি লোকদের ভক্তি বৃদ্ধি পাবে ইত্যাদি।

এই রিয়া অত্যন্ত সাংঘাতিক রোগ, এতে আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থলে মানুষের সন্তুষ্টিকে স্থান দেয়া হয়। তাই রিয়াকে এক ধরনের শিরক (শির্‌কে আছগর বা ছোট শির্‌ক) বলা হয়। এ থেকে মুক্তির উপায় হল ঃ

(১) হুব্বে জাহ বা সম্মান- প্রীতি অন্তর থেকে বের করতে হবে।

(২) রিয়ার চেতনা এসে গেলেও তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না বরং সহীহ নিয়ত অন্তরে উপস্থিত করে কাজ করে যেতে থাকবে, এভাবে আস্তে আস্তে সেটা আদত বা অভ্যাসে পরিণত হবে এবং আদত থেকে ইবাদত ও এখলাসে পরিণত হবে।

(৩) যে ইবাদত প্রকাশ্যে করার বিধান, তাতো প্রকাশ্যেই করতে হবে, এ ছাড়া অন্যান্য ইবাদত প্রকাশ করারও নিয়ত রাখবে না, গোপন করারও উদ্যোগ নিবে না।

হুব্বে জাহ ঃ (প্রশংসা ও যশ-প্রীতি)

প্রশংসা, সুনাম ও সম্মানের লোভকে বলা হয় হুব্বে জাহ। এ লোভ মনে এলে অন্যের প্রশংসা, সুখ্যাতি ও সম্মান দেখে মনে আগুন জ্বলে ওঠে এবং হিংসা লাগে এবং অন্যের অপমান বা পরাজয়ের কথা শুনে মনে আনন্দ জন্মে। এমনি ভাবে অনেক খারাবী এ রোগের কারণে দেখা দেয়। এ রোগের প্রতিকার হল ঃ

(১) এই চিন্তা করা যে, আমি যাদের নিকট ভাল হতে চাই তারাও থাকবে না আমিও থাকব না। অতএব, এমন অসার জিনিসের প্রতি মন লাগানো নির্বুদ্ধিতা বৈ কি?

(২) এমন কোন কাজ করা, যা শরীয়তের খেলাফ নয় কিন্তু লোক চক্ষে সেটা লজ্জাজনক, যেমন বাড়ির কোন নগন্য জিনিস বিক্রি করা ইত্যাদি।

দুনিয়া এবং মালের মহব্বত ঃ

টাকা-পয়সার লোভ এত বড় খারাপ জিনিস যে, একবার তা মনে ঢুকলে সেখানে আল্লাহর মহব্বত ও আল্লাহর স্মরণ থাকতে পারে না। এমনি ভাবে ঘর-বাড়ি, বাগ-বাগিচা, আসবাব-পত্র, কাপড়-চোপড় ইত্যাদির মহব্বত এক কথায় দুনিয়ার মহব্বত তথা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সব কিছুর মহব্বত এমন এক জঞ্জাল, যার মধ্যে আল্লাহর মহব্বত থাকতে পারে না। এই দুনিয়ার মহব্বতের কারণে মানুষ হক– না হক, হালাল-হারাম ও সত্য-মিথ্যার বিচার হারিয়ে ফেলে, এমনকি মৃত্যুর সময় আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ঈমান হারা অবস্থায়ও মৃত্যুবরণ করতে পারে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা। তবে উল্লেখ্য যে, ধন-সম্পদ, মাল-আসবাব ইত্যাদির প্রতি স্বভাবগত ভাবে মানুষের কিছু আকর্ষণ থাকে, এটা শরীয়তে নিন্দনীয় নয়। এমনি ভাবে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে (দ্রঃ ৩১৩ পৃষ্ঠা) সম্পদ উপার্জন করাও নিন্দনীয় নয় বরং নিন্দনীয় হল যদি কেউ সম্পদের প্রতি মনের আকর্ষণকে এতটা বল্গাহীন ছেড়ে দেয় বা এমন ভাবে সম্পদ উপার্জনে মত্ত হয় যে, আল্লাহর হুকুম-আহকামের পরোয়া থাকেনা এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের আদর্শের চেয়ে সেটাকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

এ রোগের প্রতিকার হল ঃ

(১) এ সব কিছু একদিন ছেড়ে যেতে হবে এবং মৃত্যুবরণ করতে হবে– একথা বেশী বেশী স্মরণ করা।

(২) ব্যবসা-বাণিজ্য, জায়গা-জমি, আসবাবপত্র, মানুষের সঙ্গে দুস্তী-মহব্বত, আলাপ-পরিচয় জরুরতের চেয়ে বেশী না করা চাই।

(৩) অপব্যয় না করা। কেননা অপব্যয় থেকে আয় বৃদ্ধির লোভ জন্মে।

(৪) সাধারণ খাওয়া পরার অভ্যাস করা চাই।

(৫) দরিদ্রদের সংসর্গ গ্রহণ ও ধনীদের সংসর্গ বর্জন করা।

(৬) দুনিয়াত্যাগী বুযুর্গদের জীবনী পাঠ করা।

(৭) যে জিনিসের প্রতি মন বেশী লেগে যায়, তা হয় কাউকে দিয়ে দেয়া (দান স্বরূপ দিতে মনে না চাইলে অন্ততঃ জাকাত সদকা স্বরূপ হলেও দিয়ে দেয়া) কিম্বা বিক্রি করে দেয়া।

বুখ্‌ল বা কৃপণতা ঃ

শরীয়তের আলোকে যেখানে ব্যয় করা জরুরী বা মানবিক কারণে যেখানে ব্যয় করা জরুরী, সেখানে ব্যয় করতে সংকীর্ণতা করাকে বলা হয় বুখ্‌ল বা কার্পণ্য। প্রথম স্থানে ব্যয় না করা গোনাহ আর শেষোক্ত স্থানে ব্যয় না করা

গোনাহ নয় তবে খেলাফে আওলা বা অনুত্তম। এই কৃপণতা এত খারাপ জিনিস যে, এর কারণে অনেক ফরয ওয়াজিব পর্যন্ত আদায় হয় না। যেমন যাকাত দেয়া, কোরবানী করা, অভাবীকে সাহায্য করা, গরীব আত্মীয়-স্বজনের উপকার করা ইত্যাদি। এগুলো হল দ্বীনী ক্ষতি। আর কৃপণকে সকলে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এটা হল পার্থিব একটা বড় ক্ষতি। এ রোগের প্রতিকার হল ঃ

(১) দুনিয়ার মহব্বত ও মালের মহব্বত অন্তর থেকে বের করতে হবে। (দেখুন পূর্বের পৃষ্ঠা)

(২) প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস মনে না চাইলেও মনের উপর জোর দিয়ে সেটা কাউকে দিয়ে দেয়া। কৃপণতা দূর না হওয়া পর্যন্ত এরূপ করতে থাকা।

হিরছ বা লোভ-লালসা ঃ

অর্থ-সম্পদ, মান-সম্মান ইত্যাদির প্রতি মনের লোভকে বলা হয় হিরছ। প্রশংসা ও যশ-প্রীতি এবং দুনিয়া ও মালের মহব্বত পরিচ্ছেদে বর্ণিত চিকিৎসাই এ রোগের চিকিৎসা। এছাড়া এই চিন্তা করতে হবে যে, লোভী ব্যক্তি সর্বদা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় জিনিসের প্রতি লোভ বা আগ্রহ নিন্দনীয় নয় বরং তা পছন্দনীয়।

এশ্‌রাফে নফ্‌ছ ঃ

কারও থেকে কিছু পাওয়ার আশায় এমন ভাবে অপেক্ষায় থাকা যে, তা না পেলে মন খারাপ হয়ে যায় এবং যার থেকে পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল তার প্রতি রাগ জন্মে, এটাকে বলা হয় এশ্‌রাফে নফ্‌ছ। এও এক প্রকারের হিরছ বা লোভ এবং এটা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী হওয়ার কারণে নিন্দনীয়। তবে শুধু যদি পাওয়ার চিন্তা মনে উদয় হয় কিন্তু না পেলে মনে কষ্ট আসে না বা তার প্রতি রাগ জন্মে না, তাহলে এতটুকু গর্হিত নয়। এমনিভাবে কোন পেশাদার যে গ্রাহকের অপেক্ষায় থাকে তাও এশ্‌রাফে নফ্‌ছের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন ডাক্তার রোগীর অপেক্ষায় থাকে ইত্যাদি। হিরছ বা লোভ-লালসার প্রতিকার যা, এ রোগের প্রতিকারও তাই।

তাকাব্বুর বা অহংকার ঃ

জ্ঞান-বুদ্ধি, ইবাদত-বন্দেগী, মান-সম্মান, ধন-দৌলত ইত্যাদি যে কোন দ্বীনী বা দুনিয়াবী গুণে নিজেকে বড় মনে করা এবং সেই সাথে অন্যকে সে ক্ষেত্রে তুচ্ছ মনে করাকে বলে তাকাব্বুর বা অহংকার। অহংকার গোনাহে কবীরা। কেউ এ রোগে আক্রান্ত হলে সে কারও উপদেশ গ্রহণ করে না, কারও সৎপরামর্শও গ্রহণ

করে না। এ রোগ হক ও সত্য গ্রহণের পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা। এ হল দ্বীনী ক্ষতি। আর অহংকারীকে মনে প্রাণে সকলে ঘৃণা করে এবং সময় সুযোগে তার থেকে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করে, এভাবে দুনিয়াতেও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এ সব কিছুর প্রেক্ষিতে তাকাব্বুর বা অহংকারকে সর্বরোগের মূল বলা হয় এবং তাকাব্বুর হারাম ও বড় গোনাহ। এ রোগ থেকে পরিত্রাণের উপায় হল ঃ

(১) নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা যে, আমি নাপাক পানি থেকে তৈরী এবং বর্তমানেও আমার পেটে নাপাক ভরা, চোখে মুখে ও নাকের ভিতর ময়লা ভরা। আর মৃত্যুর পর আমার সব কিছু পচে গলে দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। ইত্যাদি।

(২) এ কথা চিন্তা করা যে, সমস্ত গুণ মূলতঃ আল্লাহরই একান্ত দান, আমার বুদ্ধি বা বাহু বলে তা অর্জিত হয়নি, নতুবা আমার চেয়ে কত বুদ্ধিমান বা শক্তিশালী ব্যক্তি এ গুণ অর্জন করতে পারেনি। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহে যা অর্জিত হয়েছে তার জন্য আমার অহংকার বা বড়ত্ববোধ করা বোকামী বৈ কি? বরং এর জন্য আল্লাহর সামনে আমার বিনয়ী হওয়া উচিত।

(৩) যাকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে হবে, মনে না চাইলেও জোর জবরদস্তী তার সাথে নম্র ব্যবহার করতে হবে।

(৪) অভাবী ও গরীব শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে বেশী উঠা-বসা রাখবে।

(৫) মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করবে।

(৬) নিজের দোষ-ত্রুটি, নিন্দা-অপবাদ শুনেও প্রতিবাদ না করা।

(৭) ক্রোধ প্রকাশ পেলে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। (ছোটদের থেকে হলেও)

(৮) একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নিজের ছোট খাট কাজ নিজেই করা, মজদুর বা চাকর-নওকর না লাগানো।

(৯) সকলকে আগে সালাম দেয়া।

(১০) তাকাব্বুর দূর করার সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল তাকাব্বুরের ধরন ও বিবরণ জানিয়ে হক্কানী পীর ও শায়খে তরীকত থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা জেনে সে অনুযায়ী আমল করা।

উজ্‌ব বা আত্মগর্ব ঃ

"অহংকার"-এর সংজ্ঞায় নিজেকে বড় মনে করার সাথে সাথে অন্যকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি কোন বিষয়ে অন্যকে তুচ্ছ মনে না করে শুধু নিজেকে বড় মনে করে গর্ববোধ করে, তাহলে সেটাকে বলা হয় উজ্‌ব বা আত্মগর্ব। আত্মগর্ব করাও গোনাহে কবীরা। এর প্রতিকার হল ঃ

(১) নিজের দোষ-ত্রুটি চিন্তা করে দেখা।

(২) গুণকে আল্লাহর দান মনে করা।

(৩) উক্ত দানের জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করা।

(৪) এই আশংকা রাখা যে, আল্লাহর শক্তি আছে যে কোন সময় তিনি এটা ছিনিয়ে নিতে পারেন।

(৫) দুআ করা যেন আল্লাহ উক্ত দান থেকে মাহরূম না করেন, সেটা যেন ছিনিয়ে না নেন।

রাগ বা গোস্বা ঃ

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রক্তের মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তাকে বলে রাগ (غضب) বা গোস্বা। এই রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মানুষের বুদ্ধি ঠিক থাকে না, তখন মুখ দিয়েও অনেক অন্যায় কথা বের হয়ে যায়। আবার অনেক অন্যায় কাজও করে ফেলে এবং পরিণামে অনেক ক্ষতি ও লজ্জার সম্মুখীন হতে হয়। রাগ স্বভাবগত বিষয়, এর জন্য মানুষ দায়ী নয়। তবে রাগ চরিতার্থ করা না করা মানুষের ইচ্ছার অধীন, তাই এর জন্য সে দায়ী। রাগ দমনের পন্থা হল ঃ

(১) রাগ হলেই আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম পড়ে নেয়া।

(২) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ পড়া।

(৩) যার উপর রাগ হয় তাকে সম্মুখ থেকে সরিয়ে দেয়া বা নিজে অন্যত্র সরে যাওয়া।

(৪) তারপর এ চিন্তা করা যে, সে আমার নিকট যতটুকু অপরাধী, আমি আল্লাহর নিকট তার চেয়ে বেশী অপরাধী। আমি যেমন চাই আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন আমারও তেমন উচিত তাকে ক্ষমা করা।

(৫) এতেও রাগ না গেলে দাঁড়ানো থাকলে বসে পড়বে, বসে থাকলে শুয়ে পড়বে।

(৬) তাতেও রাগ না গেলে ঠাণ্ডা পানি পান করবে বা উযূ কিম্বা গোসল করে নিবে।

(৭) এই চিন্তা করবে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হয় না, অতএব আমি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করার কে?

(৮) স্বভাবগতভাবে যিনি বেশী রাগী, তার রাগ দমনের পন্থা হল−যার উপর রাগ হয় রাগ ঠাণ্ডা হওয়ার পর জনসমক্ষে তার হাত পা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তার জুতা সোজা করে দিবে। দু একবার এরূপ করলেই রাগের হুশ ফিরে আসবে।

বিঃ দ্রঃ রাগ সব স্থানেই নিন্দনীয় নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে জায়েয বরং জরুরী হয়ে পড়ে। অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে রাগ শক্তির ব্যবহার করা অনেক সময় ওয়াজিব হয়ে পড়ে। আর রাগ দমন করার গুণটি যখন স্বভাবে পরিণত হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে তখন সেটাকে বলা হয় সহনশীলতা। আল্লাহর নিকট এই সহনশীলতার গুণ অনেক পছন্দনীয়।

বুগ্য (বিদ্বেষ/মনোমালিন্য) ও স্বভাব সংকুচন ঃ

রাগ চরিতার্থ করতে না পারলে রাগ দমনের দ্বারা মনের মধ্যে ক্ষোভ, মনস্তাপ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং অন্যভাবে তার প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তা-ভাবনা ও অন্যভাবে তাকে কষ্ট দেয়ার প্রয়াস জাগে, এই প্রয়াস বা মনোভাবকে বলা হয় বুগ্য বা কীনা। আর অন্যভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের মনোভাব যদি জাগ্রত না হয় কিম্বা সেরূপ উদ্যোগ গ্রহণের চিন্তা ভাবনা না আসে বরং রাগের কারণে মনের মধ্যে শুধু একটা সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয় এবং যার উপর রাগ হয় তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে মন না চায়, তাহলে সেটাকে বলে ইনকিবাযে তব্য়ী বা 'স্বভাব সংকুচন', সেটা নিন্দনীয় নয়। কারণ সেটা স্বভাবগত বিষয়, যা ইচ্ছার অধীন নয়। তবে কারও ব্যাপারে স্বভাবের মধ্যে সংকুচন ভাব আসলে সেটা দূর করার জন্য কখনও কখনও এই ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে যে, তাকে বলে দিবে আপনার এই কথা বা আচরণে আমার কষ্ট লেগেছে। এতে অন্তর পরিস্কার হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, বিদ্বেষ ও শত্রুতা যদি পার্থিব কোন বিষয়ের কারণে হয় তবেই তা নিন্দনীয় ও গর্হিত। পক্ষান্তরে কোন মুসলমান দ্বীনের কারণে আল্লাহর ওয়াস্তে যদি কারও সাথে বিদ্বেষ বা শত্রুতা রাখে তবে তা নিন্দনীয় নয় বরং প্রশংসনীয় ও উত্তম। এই বুগয বা কীনার প্রতিকার হল ঃ

(১) যার প্রতি বিদ্বেষ হয় তাকে ক্ষমা করে দেয়া।

(২) মনে না চাইলেও তার সাথে মেলামেশা অব্যাহত রাখা।

হাছাদ (হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা) ও গেবতা ঃ

কারও জ্ঞান, বুদ্ধি, সম্পদ, মান-ইজ্জত, সুখ-স্বাচ্ছন্দ ইত্যাদি ভাল কিছু দেখে মনে কষ্ট লাগা এবং আকাংখা হওয়া যে, সেটা না থাকুক বা ধ্বংস হয়ে যাক এবং তা হলেই মনে আনন্দ লাগা-এই মনোবৃত্তিকে বলা হয় হাছাদ (হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা) সাধারণতঃ তাকাব্বুর (নিজের বড়ত্ববোধ) বা শত্রুতা থেকে এই মনোভাব সৃষ্টি হয় কিম্বা কারও মন যদি খবীছ হয় তাহলেও এই মনোবৃত্তি

জাগতে পারে। হাছাদের কারণে নেক আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হতে হয়। হিংসুক ব্যক্তি চিরকাল মনের কষ্টে কাল যাপন করতে থাকে, জীবনে কখনও মনে শান্তি পায় না।

এখানে উল্লেখ্য যে, কারও ভাল কিছু দেখে সেটা ধ্বংসের কামনা না করে শুধু নিজের জন্য অনুরূপ হয়ে যাওয়ার কামনা করা গর্হিত নয় বরং এরূপ কামনা করার ক্ষেত্রে মাসআলা হল সেটা ওয়াজিব পর্যায়ের বিষয় হলে এরূপ কামনা করা ওয়াজিব, মোস্তাহাব পর্যায়ের হলে মোস্তাহাব আর মোবাহ পর্যায়ের হলে মোবাহ। এটাকে হাছাদ নয় বরং গেবতা বলা হয়। হাছাদ রোগের প্রতিকার হলঃ

(১) যার প্রতি হাছাদ বা হিংসা হয়, মনে না চাইলেও লোক সমাজে তার প্রশংসা করা।

(২) যার যে নেয়ামতের কারণে হাছাদ হয়, সেটা তার জন্য আরও বৃদ্ধি পাক– আল্লাহর কাছে এই দুআ করতে থাকা।

(৩) মনে না চাইলেও দেখা হলে তাকে সালাম করা, তার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা দেখানো এবং নম্র ব্যবহার করা।

(৪) মাঝে মধ্যে তাকে হাদিয়া প্রদান করা।

বিঃ দ্রঃ কোন কাফের, মুরতাদ, ফাসেক ও বেদআতী লোকের কোন বিষয় সম্পদ ও নেয়ামত অর্জিত হলে এবং সে তা দ্বারা ফেতনা ফাসাদ ও দ্বীনের ক্ষতি করতে থাকলে তার সে সম্পদ ও নেয়ামত ধ্বংস হওয়ার কামনা করা নিন্দনীয় নয় বরং কোন কোন অবস্থায় তা উত্তম ইবাদত বলে গণ্য হবে।

বদগোমানী বা কু-ধারণা রোগ ঃ

যে সব মুসলমান বাহ্যিক অবস্থার দিক দিয়ে সৎকর্মপরায়ণ ও নেককার বলে মনে হয়, তার সম্পর্কে কোন প্রমাণ ব্যতীত কুধারণা পোষণ করা হারাম ও গোনাহে কবীরা। এ রোগ দেখা দিলে তার প্রতিকার হল ঃ

(১) নির্জনে বসে এই চিন্তা করা যে, কুধারণা পোষণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, এটা করলে আল্লাহর আযাবের আশংকা রয়েছে। হে নফস, তুমি কিভাবে আযাব বরদাশত করবে ?

(২) তওবা করবে।

(৩) আল্লাহর নিকট অন্তর সাফ হয়ে যাওয়ার জন্য দুআ করবে।

(৪) যার প্রতি কুধারণা হয়েছে তার উভয় জগতের কামিয়াবী ও সুখ শান্তির জন্য দুআ করবে।

(৫) প্রতিদিন তিনবার উপরোক্ত আমল সমূহ একাধারে তিন দিন করার পরও যদি মন থেকে কুধারণা না যায়, তাহলে যার প্রতি কুধারণা হয়েছে তাকে যেয়ে বলবে যে, অহেতুক আপনার প্রতি আমার বদগোমানী হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য দুআ করুন যেন আমার মন থেকে এটা দূর হয়ে যায়।

গোনাহের প্রতি আকর্ষণ ঃ

তাকওয়া বা পরহেযগারীর স্বাদ এবং নূর ভেতরে না থাকার কারণে গোনাহের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়– বিকর্ষণ সৃষ্টি হয় না। তাকওয়ার স্বাদ অর্জিত হলে গোনাহের প্রতি বিকর্ষণবোধ সৃষ্টি হবে এবং গোনাহ করতে তখন খারাপ লাগবে। অতএব গোনাহের প্রতি আকর্ষণ-রোগের চিকিৎসা হল তাকওয়া অর্জনের পন্থা গ্রহণ করা। (দেখুন পৃষ্ঠা ৫৩০) গান বাদ্যের প্রতি আকর্ষণ থাকলে তার প্রতিকারের জন্য দেখুন পরবর্তী পৃষ্ঠা। অশ্লীল নভেল নাটক, খেলাধুলা ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ থাকলে তার জন্য দেখুন ৫৪৯ পৃষ্ঠা।

([illegible] -বেহেশতী জেওর- [illegible] - [illegible] ও [illegible] প্রভৃতি থেকে গৃহীত)

অবৈধ প্রেম ঃ

কোন নারী বা বালকের অবৈধ প্রেমে পড়লে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য যা করতে হবে ঃ

(১) প্রথমতঃ বুঝতে হবে যে, সাহস কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা ব্যতীত কোন সহজ কাজও হয় না। শরীরের সামান্য রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে গেলেও তিক্ত ঔষধ সেবন করতে হয়। জাহিরী রোগের যখন এই অবস্থা, তখন আভ্যন্তরীণ রোগের ক্ষেত্রেতো আরও বেশী ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের জন্য মনকে প্রস্তুত করতে হবে।

(২) তার সাথে কথা-বার্তা, দেখা-শুনা, আসা-যাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে। অন্য কেউ তার আলোচনা করলে তাকে বাঁধা দিতে হবে এবং লৌকিকভাবে হলেও যার প্রেমে পড়েছে পরিকল্পিতভাবে এক এক বাহানায় তার সমালোচনা করতে থাকবে।

(৩) একটা নির্জন সময়ে গোসল করে পরিষ্কার কাপড় পরিধান করে আতর ও সুগন্ধি মেখে দুই রাকআত তওবার নামায (১৮৮ পৃষ্ঠা দেখুন) পড়বে এবং কেবলামুখী অবস্থায় বসে খুব তওবা এস্তেগফার করবে এবং এই বিপদ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করবে এবং পাঁচশত থেকে এক হাজার বার লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ এর যিকির করবে। লা-ইলাহা বলার সময় ঘাড় ডান

দিকে ঘুরাবে এবং এই ধ্যান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুকে অন্তর থেকে বের করে দিলাম। অতঃপর ইল্লাল্লাহ বলার সময় বাম স্তনের সামান্য নীচের দিকে খেয়াল করে মাথা সেদিকে স্বজোরে ঝুঁকাবে আর এ ধ্যান করবে যে, আল্লাহর মহব্বত অন্তরে গেঁথে দিলাম।

(৪) যে বুযুর্গের প্রতি ভক্তি আছে তাঁর সম্পর্কে এই কল্পনা করবে যে, তিনি আমার অন্তরের মধ্যে বসে আমার অন্তর থেকে সব জঞ্জাল ধীরে ধীরে বাইরে নিক্ষেপ করছেন।

(৫) দোযখের বর্ণনা এবং আল্লাহর নাফরমানীর কারণে আল্লাহ কিরূপ অসন্তুষ্ট হন–এ জাতীয় বর্ণনা যে কিতাবে আছে এমন কোন কিতাব বা হাদীছের গ্রন্থ পাঠ করবে।

(৬) একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্জনে বসে এ চিন্তা করবে যে, আমি কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান রয়েছি আর আল্লাহ আমাকে ধমক দিয়ে বলছেন, "হে বেহায়া, বেশরম! তোমার লজ্জা হয় না, আমাকে ছেড়ে একটা মুরদার দিকে ঝুঁকে পড়লে ? এর জন্য তোমাকে আমি পয়দা করে ছিলাম? বেহায়া, আমার দেয়া চোখ আমার দেয়া অন্তরকে তুমি আমার নাফরমানীর কাজে ব্যবহার করলে ? তোমার শরম হয় না ? ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ এ সব আমল করতে থাকবে, ফল পেতে দেরী হলেও পেরেশান হবে না। চেষ্টাতেও তো ছওয়াব পাওয়া যাবে।

কয়েকটি বদ অভ্যাস ও পাপ এবং তা বর্জনের উপায়

গান বাদ্য শ্রবণঃ

আবূ দাঊদ, ইবনে মাযা, ইবনে হিব্বান, মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি হাদীছের কিতাবে বর্ণিত নির্ভর যোগ্য হাদীছে গান-বাদ্য হারাম হওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ এসেছে। কুরআন শরীফেও এরূপ বর্ণনা এসেছে। কেবল সুললিত কণ্ঠে যদি কোন কবিতা পাঠ করা হয় এবং পাঠক কোন নারী বা কিশোর না হয়, সাথে সাথে কবিতার বিষয়বস্তু অশ্লীল বা অন্য কোন পাপ পঙ্কিলযুক্ত না হয় তবে তা জায়েয। যদি কেউ গান-বাদ্য শ্রবণের বদঅভ্যাসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তবে তার থেকে পরিত্রাণের উপায় হল ঃ

(১) গানবাদ্যের প্রতি স্বভাবগত আকর্ষণ থেকে থাকে, এ আকর্ষণ সম্পূর্ণ বিলীন করে দেয়া স্বাভাবিকভাবে অসম্ভব। তবে মনে চাইলেই ইচ্ছাকৃত ভাবে মনের চাহিদার বিরুদ্ধে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। এতে কষ্ট হলেও কারও তাড়াতাড়ি বা কারও ধীরে ধীরে সেই চাহিদা দুর্বল হয়ে যাবে।

(২) গান বাদ্যের উপকরণ ও পরিবেশ থেকে দূরে থাকতে হবে।

অশ্লীল উপন্যাস, কবিতা ও নভেল নাটক পাঠ ঃ

অনেক যুবক-যুবতী অশ্লীল উপন্যাস, নভেল, নাটক, পেশাদার-অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠের বদ অভ্যাসে অভ্যস্ত। এসব বিষয়ও নিষিদ্ধ। এ সবের বদ অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত পন্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃতভাবে মনের চাওয়ার বিরুদ্ধে তা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এসবের উপকরণ থেকে দূরে থাকবে। কিছু দিন এরূপ করলেই মন থেকে এসবের চাহিদা দুর্বল হয়ে যাবে।

সিনেমা, বাইস্কোফ ও অশ্লীল ছায়াছবি দর্শন ঃ

এগুলোর মধ্যে পাঁচ রকমের পাপ রয়েছে। (১)সময় নষ্ট (২) সম্পদ নষ্ট (৩) স্বভাব-চরিত্র নষ্ট (৪) স্বাস্থ্য নষ্ট (৫) ঈমান ও আমল নষ্ট। যদি নারী চরিত্র ও অশ্লীলতাকে বাদ দিয়ে শিক্ষামূলক ফিল্ম তৈরি করা হয়, তাহলে তার মধ্যে এতগুলো পাপ থাকবে না শুধু জীবের ছবি তোলার পাপ থাকবে। আর জীবের ছবিও বাদ দিয়ে শুধু সু-শিক্ষামূলক ফিল্ম তৈরি করা হলে তাতে কোন পাপ থাকবেনা। সিনেমার পার্ট ও প্লে করা, এর ব্যবসা করা এবং এডভারটাইজ করা সবই কাবীরা গুনাহ। সিনেমা বাইস্কোপ দেখার বদ অভ্যাস থেকে পরিত্রাণের জন্য পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত পন্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে।

মদ, গাজা, ভাং, আফিম, হেরোইন প্রভৃতি নেশা ঃ

শরীয়তে এসব নেশাকর দ্রব্য সম্পূর্ণ হারাম, অল্প হোক চাই বেশী হোক। এ সবের শারীরিক, আত্মিক, নৈতিক, আর্থিক ও জাগতিক বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতির কারণেই শরীয়ত এগুলোকে নিষিদ্ধ করেছে। এ সবের বদ-অভ্যাসে কেউ জড়িত হয়ে পড়লে তা ছাড়ানো কঠিন ও কষ্টকর। তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতি সমূহ গ্রহণ করলে ফল পাওয়া যাবে।

(১) প্রথমতঃ এসব নেশার মন্দ ও ক্ষতিকর দিকগুলো নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির মনে বদ্ধমূল করাতে হবে এবং তার মনে এর প্রতি ভয়, আতংক ও ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে হবে।

(২) যে কোন নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর, তাই ধীর মন্থর গতিতে অল্প অল্প করে তাকে ছাড়াতে হবে।

(৩) তার কাছ থেকে নেশার উপকরণ এবং পাত্র, তৈজস পত্র ইত্যাদি দূরে সরিয়ে দিতে হবে বা তাকে নেশাটির উপকরণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, যত দিন পর্যন্ত তার মন থেকে নেশার ঘোর সম্পূর্ণ কেটে না যায়।

(৪) সবচেয়ে বড় কথা মানুষ ইচ্ছা ও সাহস করলে অনেক কঠিন কিছুও করে ফেলতে পারে– নেশাখোর ব্যক্তির মনে এরূপ ইচ্ছা ও সাহস জাগিয়ে তুলতে হবে। ([illegible])

বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা ও তামাক সেবনঃ

বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা ইত্যাদি ধুম্রপান ও তামাক সেবন মাকরূহ তানযীহী। আর এগুলোর দুর্গন্ধ মুখে থাকা অবস্থায় মসজিদে গমন করা হারাম। ([illegible]) ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫ম খণ্ডে বলা হয়েছে, তামাক যদি নেশা যুক্ত হয় তাহলে নিষিদ্ধ, দুর্গন্ধযুক্ত হলে মাকরূহ, অন্যথায় জায়েয। বিড়ি সিগারেট প্রভৃতির বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করার জন্য পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত নিয়মাবলী প্রযোজ্য। যথা ঃ

(১) প্রথমতঃ এ সব নেশার মন্দ ও ক্ষতিকর দিকগুলো নেশাখোর ব্যক্তির মনে বদ্ধমূল করাতে হবে এবং তার মনে এর প্রতি ভয়, আতংক ও ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে হবে।

(২) যে কোন নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর, তাই ধীর মন্থর গতিতে অল্প অল্প করে তাকে ছাড়াতে হবে।

(৩) তার কাছ থেকে নেশার উপকরণ এবং পাত্র, তৈজসপত্র ইত্যাদি দূর করে দিতে হবে বা তাকে নেশার উকপরণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, যত দিন তার মন থেকে নেশার ঘোর সম্পূর্ণ কেটে না যায়।

(৪) সবচেয়ে বড় কথা মানুষ ইচ্ছা ও সাহস করলে অনেক কঠিন কিছুও করে ফেলতে পারে– নেশাখোর ব্যক্তির মনে এরূপ ইচ্ছা ও সাহস জাগিয়ে তুলতে হবে।

অপব্যয় ঃ (تَبْذِير)

শরীয়তের আলোকে যে ক্ষেত্রে ব্যয় করা নিষেধ সে ক্ষেত্রে ব্যয় করাকে বলা হয় তাবযীর বা অপব্যয়। কুরআন অপব্যয়কারীকে 'শয়তানের ভাই' বলে আখ্যায়িত করেছে। অপব্যয় করা গোনাহে কবীরা।

অমিতব্যয় ঃ (إِسْرَاف)

যেসব ক্ষেত্রে ব্যয় করা জায়েয সে সব ক্ষেত্রেও প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করাকে বলা হয় এছরাফ বা অমিতব্যয়। এটা শরীয়তে নিষিদ্ধ। এটাকে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সীমালংঘন বা অতিরিক্ত ব্যয় বলেও আখ্যায়িত করা যায়।

'প্রয়োজন' বলতে বুঝায় এতটুকু পরিমাণ, যা না হলে কোন দ্বীনের কাজ বা দুনিয়ার কাজ করা সম্ভব হয়না বা অত্যন্ত কষ্ট ও পেরেশানীর সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় কল্পিত প্রয়োজনকে আমরা জরুরত বা প্রয়োজন মনে করে বসি; অথচ সেটা জরুরত বা প্রয়োজন নয় বরং তা হল খাহেশাত বা লোভ। দুনিয়ার মহব্বত এবং লোভ প্রতিকারের জন্য যে ব্যবস্থা, অমিতব্যয়ের বদ অভ্যাস প্রতিকারের জন্যও তাই গ্রহণ করতে হবে। (দেখুন ৫৪১ পৃষ্ঠা)

যেনা ঃ (ব্যভিচার)

যেনা অর্থাৎ, নারীর সতীত্ব নষ্ট এবং পুরুষের চরিত্র নষ্ট করা। এটা অতি জঘন্য কবীরা গোনাহ। বিবাহিত অবস্থায় যেনা করলে এবং তা স্বীকার করলে অথবা চারজন সত্যবাদী চাক্ষুস সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণিত হলে তার শাস্তি পাথর মেরে প্রাণে বধ করে ফেলানো। আর অবিবাহিত অবস্থায় অনুরূপ ভাবে যেনা প্রমাণ হলে তার শাস্তি একশত বেত্রাঘাত। তবে উল্লেখ্য যে, একমাত্র শরয়ী কাযীই এ শাস্তি প্রয়োগ করতে পারে অন্যকে নয়।

যেনার থেকে বেঁচে থাকার জন্য যা করতে হবে ঃ

(১) যেনার উপসর্গ যেমন প্রেমালাপ, গোপন যোগাযোগ, গায়র মাহরামের সাথে নির্জন বাস, পর্দা লংঘন ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা।

(২) যেনার কারণে জাহান্নামের যে কঠিন শাস্তি হবে তা স্মরণ করা।

(৩) একথা স্মরণ করা যে, আল্লাহ সব কিছুই দেখেন আমার এ অবস্থাও তিনি দেখবেন এবং কোন মানুষ এখন না দেখলেও কিয়ামতের ময়দানে সকলের সামনে এটা প্রকাশ করে দেয়া হবে।

(৪) বিবাহ না করে থাকলে বিবাহ করা, না পারলে রোযা রাখা। আর স্ত্রী থাকার পরও কোন নারীর প্রতি খাহেশ হলে এই চিন্তা করা যে, তার যা আছে আমার স্ত্রীরওতো তা আছে, তাহলে অহেতুক কেন তার প্রতি ঝুঁকতে হবে?

(৫) যেনার খাহেশ প্রবল হলে নিম্নোক্ত আয়াত তিনবার পড়ে শরীরে ফুঁক দিবে–

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاۤءُ

(৬) যে নারীর সাথে যেনার কামনা জাগে বা যে পরিবেশে যেনার সুযোগ সৃষ্টি হয় সেখান থেকে দূরে সরে যাওয়া।

(৭) যে বুযুর্গের প্রতি ভক্তি আছে তার সম্পর্কে নির্জনে কিছুক্ষণ বসে এই কল্পনা করবে যে, তিনি আমার অন্তরের মধ্যে বসে আমার অন্তর থেকে সব জঞ্জাল ধরে ধরে বাইরে নিক্ষেপ করছেন।

(৮) যে সব কথা শুনলে, যেখানে গেলে বা যা দেখলে কিম্বা যা পড়লে অথবা যা চিন্তা করলে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বা যেনার মনোভাব জাগ্রত হয় তা থেকে বিরত থাকা।

হস্তমৈথুন ঃ

হস্তমৈথুন করা মহাপাপ। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য পূর্বের পরিচ্ছেদে বর্ণিত ২, ৩, ৭ ও ৮ নং পন্থা গ্রহণ করতে হবে।

বালক মৈথুন ঃ

বালকের সাথে কুকর্ম করা যেনার চেয়েও বড় পাপ। এ জন্যেই বালকের সাথে কুকর্মকারীর শাস্তি বলা হয়েছে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া। যেনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য যে সব পন্থা গ্রহণীয়, বালক মৈথুন থেকে পরিত্রাণের জন্যেও সে সব পন্থা গ্রহণীয়।

বদনজর ঃ

গায়র মাহরাম মহিলার দিকে নজর করা বা শ্মশ্রুবিহীন বালকের দিকে খাহেশাতের দৃষ্টিতে তাকানো হল বদনজর। বদনজর দ্বারা কলব অন্ধকার হয়ে যায়, ইবাদতের নূর নষ্ট হয়ে যায়। এতে নজরের যেনা হয়। আবার তাকে নিয়ে কোন পাপের চিন্তা করলে মনের যেনা হয়। অনিচ্ছাকৃত হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে যায় তাতে কোন পাপ নেই, কিন্তু তারপর ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিকে দীর্ঘায়িত করলে বা বারবার দেখলে পাপ হবে। এই বারবার কিম্বা দীর্ঘক্ষণ দেখতে চাওয়া আসলে মনের একটা রোগ বিশেষ। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় হল ঃ

(১) এ চিন্তা করা যে, আল্লাহ আমার মনের অবস্থা দেখছেন এবং কিয়ামতের দিন এ নিয়ে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, তখন সবার সামনে লজ্জিত হতে হবে এবং এই পাপের দরুন জাহান্নামের আযাব হবে।

(২) এ চিন্তা করবে যে, আমার আপনজনকে কেউ এভাবে দেখলেতো আমার অপছন্দ লাগে, তাহলে আমার দেখাটা কি তাদের অপছন্দনীয় নয়?

(৩) এরপরও তাকে সুন্দর মনে হলে এবং নজর দিতে মনে চাইলে তাকে কুৎসিত কল্পনা করবে।

(৪) হিম্মত এবং এরাদা করা যে, এ থেকে বিরত থাকব। আর হঠাৎ নজর পড়ে গেলে তার থেকে নজর ফিরিয়ে নিলে কলবে নূর পয়দা হয়–এই ফিকির রাখা।

গীবত ঃ (অপরের দোষ চর্চা)

হেয় করে তোলার উদ্দেশ্যে পশ্চাতে কারও প্রকৃত দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করাকে গীবত বলে। আর প্রকৃতপক্ষে সে দোষ তার মধ্যে না থাকলে সেটাকে বলে বুহতান, যা গীবতের চেয়েও বড় অপরাধ। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, পোশাক-পরিচ্ছদ, শারীরিক গঠন, বংশ ইত্যাদি যে কোন বিষয়ের দোষ বর্ণনাই গীবতের অন্তর্ভুক্ত। মুখে বলা দ্বারা যেরূপ গীবত হয়, তদ্রূপ অঙ্গভঙ্গী এবং ইশারা ইঙ্গিতেও গীবত হয়। গীবত যেমন জীবিত মানুষের হয় তেমনি মৃত মানুষেরও হয়। ছোট-বড় মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের দোষ চর্চাই গীবত। গীবত করা হারাম, যেনার চেয়েও গুরুতর কবীরা গোনাহ। অবশ্য ন্যায্য বিচার প্রার্থনা করতে গিয়ে বিচারকের নিকট প্রতিপক্ষের যে দোষ বর্ণনা করতে হয়, কিম্বা কাউকে অপরের দ্বীনী বা দুনিয়াবী ক্ষতি থেকে সাবধান করার উদ্দেশ্যে বা গুরুজনের নিকট অধীনস্তদেরকে শাসন করানোর জন্য যে দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা হয় তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

স্বেচ্ছায় এবং মনোযোগ সহকারে গীবত শ্রবণ করাতেও গীবতের গোনাহ হয়। কারও গীবত করে ফেললে নিজে এস্তেগফার করা, যার গীবত করা হয়েছে তার জন্য এস্তেগফার করা এবং সম্ভব হলে ও সংগত মনে করলে তার নিকট ওযরখাহী করা উচিত, এভাবেই গীবতের পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। কাউকে গীবত করতে শুনলে তাকে বাঁধা দাও, না পারলে সে মজলিস ত্যাগ কর, না পারলে সে কথা থেকে মনোযোগ হটিয়ে মনে মনে অন্য কিছু ভাবতে বা পড়তে থাক। গীবত শোনার পর কয়েকটা কাজ করা উচিত।

(১) এ শোনা কথা অন্যের কাছে বর্ণনা না করা।

(২) যার দোষ শোনা হল তার দোষ খুঁজতে শুরু না করা।

(৩) তার উপর বদগোমানী না করা।

(৪) গীবতকারীকে পারলে এই গীবতের অভ্যাস পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেয়া।

(৫) প্রয়োজন মনে করলে আসল ব্যক্তির থেকে জেনে নেয়া যে, ব্যাপারটা কতদূর সত্য। অবশ্য এ ক্ষেত্রে গীবতকারীর নাম উল্লেখ করা উচিত নয়।

গীবতের বদ অভ্যাস পরিত্যাগের জন্য করণীয় হল ঃ

(১) কারও গীবত করে ফেললে তার প্রশংসা করা।

(২) তার জন্য দুআ ও এস্তেগফার করা।

(৩) তাকে এ বিষয়টা জানিয়ে দিয়ে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। তবে হিতে বিপরীত হওয়ার আশংকা থাকলে তাকে জানাবে না।

(৪) কারও সম্পর্কে কিছু বলতে মনে চাইলেও চিন্তা করে নেয়া যে, এটা গীবত হয়ে যাচ্ছে না তো ? যদি গীবতের পর্যায়ভুক্ত হয় তাহলে তা না বলা।

(৫) গীবত হয়ে গেলে নিজে তওবা এস্তেগফার করা এবং ভবিষ্যতে আর গীবত না করার প্রতিজ্ঞা করা।

(৬) গীবত কখনো ক্রোধ থেকে করা হয়, কখনও অহংকারের কারণে হয়, কখনও সম্মানের মোহ থেকে হয় আবার কখনও হিংসা-বিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্যে হয়ে থাকে। যে কারণে গীবত হয় সে কারণের চিকিৎসা করা দরকার।

চোগলখোরী ঃ (কোটনাগিরি)

চোগলখোরী অর্থ কারও এমন কথা বা কাজ সম্পর্কে অন্যকে অবহিত করে দেয়া, যা সে তার কাছে গোপন করতে ও গোপন রাখতে চায় এবং তার শ্রুতিগোচর হওয়াকে সে অপছন্দ করে। এটা কোন দোষের কথা বা দোষের কাজ হলে চোগলখোরীর সাথে সাথে গীবতও হয়ে যাবে, তাহলে তা একই সাথে দুটো পাপের হবে। আর প্রকৃত পক্ষে সে দোষ তার মধ্যে না থাকলে বুহতান বা মিথ্যা অপবাদের গোনাহও হবে। চোগলখোরী করা কবীরা গোনাহ, যা মানুষের পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ককে ধ্বংস করে দেয় এবং সামাজিক ফ্যাসাদ ঘটায়।

তোষামোদ বা চাটুকারিতা ঃ

তোষামোদ বা চাটুকারিতা হল নিজের স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে অন্যকে খুশী করার জন্য নিজের ধারণা ও বিশ্বাসের বিপরীতে তার প্রশংসা করা। এটা এক ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণা। পক্ষান্তরে পক্ষ-বিপক্ষ নির্বিশেষে সকলের সাথে স্বচ্ছ ও খোলা মন নিয়ে বাস্তবতার নিরিখে মনের কথা যথাযথ ভাবে প্রকাশ করাকে বলা হয় বাস্তববাদিতা বা স্বচ্ছতা। তবে স্বচ্ছতা বা বাস্তববাদিতার অর্থ আদৌ এই নয় যে, সব সত্য কথা সব স্থানে প্রকাশ করে দিতে হবে। বরং অনেক স্থানে বলার চেয়ে চুপ থাকাটাই শ্রেয় হতে পারে। বিনা প্রয়োজনে অন্যের অনুভূতিতে আঘাত হানবে বা অন্যকে বিব্রত করবে- এরূপ কথা বলাকে বাস্তববাদিতা আখ্যা দেয়া যাবেনা। কিম্বা বাস্তববাদিতার দোহাই দিয়ে নিজের কৃতিত্বের কথা গেয়ে বেড়ানো বা আপনজন ও বন্ধু-বান্ধবের গোপন রহস্য প্রকাশ করে দেয়াও সমীচীন

নয়। বাস্তববাদিতার অর্থ হল– যতটুকু বলতে হবে তা যেন অবশ্যই বাস্তবানুগ হয় এবং তাতে কোনরূপ কপটতা না থাকে।

তোষামোদ বা চাটুকারিতা যে প্রতারণা, কপটতা ও পাপ-এই চেতনা মনে বদ্ধমূল রাখলে তোষামোদের মনোবৃত্তি অবদমিত হবে।

গালি-গালাজ ও অশ্লীল কথা বলা ঃ

যেটা প্রকাশ করতে মানুষ শরম বোধ করে, এটাকেই পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করাকে বলা হয় গালি বা অশ্লীল কথা। আর যদি সেটা অবাস্তব হয় তাহলে মিথ্যা অপবাদের গোনাহও হবে। কাউকে গালি দেয়া হারাম, এমনকি কাফের বা জীবজন্তুকেও[১]। মিথ্যা ও বেশী কথা বলার বদঅভ্যাস পরিত্যাগের জন্য যে চিকিৎসা এর চিকিৎসাও অনুরূপ। (দেখুন পরবর্তী পৃষ্ঠা)

রসিকতা ও ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ করা ঃ

কারও চলা-ফেরা, উঠা-বসা, বলা, দেখা, গঠন-আকৃতি ইত্যাদি যে কোন বিষয়ের দোষ এমনভাবে প্রকাশ করা যে মানুষের হাসির উদ্রেক করে, কিম্বা কাউকে লোক সমক্ষে হেয় করাকে বলা হয় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা। শরীয়তে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা নিষিদ্ধ। তদ্রূপ এমন রসিকতাও শরীয়তে নিষিদ্ধ যাতে কেউ মনে কষ্ট পায়। রসিকতা শরীয়তে জায়েয, যদি রসিকতার মধ্যে অবাস্তব কিছু বলা না হয় এবং শ্রোতার মনে আঘাত না লাগে। যে রসিকতা দ্বারা শ্রোতার অন্তরে আঘাত লাগা নিশ্চিত, সেরূপ রসিকতা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম[২]। তাছাড়া রসিকতাকে অভ্যাস বানানোও ঠিক নয়, মাঝে মধ্যে উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে করা যেতে পারে। এ রোগের চিকিৎসাও পূর্বে উল্লেখিত রোগের চিকিৎসার ন্যায়।

রুক্ষ কথা বলা ঃ

কথা নরমে এবং মিষ্টভাবে বলা শরীয়তের কাম্য। এমনকি হক কথাও এমন রুক্ষভাবে বলা ঠিক নয় যাতে শ্রোতার মনে আঘাত লাগে। কারণ তাতে হীতে বিপরীত হতে পারে। অনেক সময় রুক্ষ কথা স্বভাবগত কারণে হয়ে থাকে আবার বদ-অভ্যাসের কারণেও হয়। স্বভাবেরতো পরিবর্তন হয় না তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করলে অভ্যাসগত কারণে হয়ে থাকলে তার পরিবর্তন হবে এবং স্বভাবগত কারণে হয়ে থাকলেও কিছুটা মার্জিত হবে।

---

১. شریعت وطریقت

২. شریعت وطریقت

(১) কথা বলার সময় এই অভ্যাসটা ক্ষতিকর– এই ভেবে লৌকিকতা করে হলেও নরমে এবং মিষ্টভাবে বলার চেষ্টা করা।

(২) হক কথা কারও কাছে তিক্তবোধ হলেও বলব– এই মনোভাব যখন আসবে তখন সে হক কথা তখনই বলার একান্ত প্রয়োজন হলে নিজে না বলে অন্যের দ্বারা বলাবে, আর তখনই বলার আবশ্যকতা না থাকলে কিছুদিন সে নছীহত করা ও এরূপ কথা বলা বন্ধ রাখবে। এভাবে কিছু দিনের মধ্যে তবীয়তে ভারসাম্যতা পয়দা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

মিথ্যা বলা ঃ

যেটা বাস্তব নয় এরূপ কথা হল মিথ্যা। মিথ্যা বলা গোনাহে কবীরা। তাহকীক তদন্ত ও যাচাই না করেই কোন কথা বর্ণনা করা বা তাহকীক ছাড়াই যে কোন কথা শুনে সাথে সাথে তা বলে দেয়াও মিথ্যা বলার মত গোনাহ। তবে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে কোন কথা জানলে তা তাহকীক ছাড়াই বলা ও বর্ণনা করা যায়। তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা হারাম ও গোনাহে কবীরা এবং হাদীসে মিথ্যাকে গোনাহের মাতা অর্থাৎ, বহু গোনাহের জন্মদাত্রী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যে তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বা অবাস্তব কিছু বলার অনুমতি রয়েছে তা হল–

(১) বিবদমান দুইজন বা দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ নিরসন ও মিল মহব্বত সৃষ্টি করে দেয়ার উদ্দেশ্যে।

(২) স্ত্রীকে খুশি করার উদ্দেশ্যে।

(৩) যুদ্ধের সময় যুদ্ধের কৌশল হিসেবে। তবে কেউ কেউ এ ক্ষেত্রেও সরাসরি মিথ্যা না বলে প্রকৃত সত্য উহ্য থাকে এমনভাবে কিছু ইঙ্গিত করে দেয়ার কথা বলেছেন। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৪০৩ পৃষ্ঠা।

মিথ্যা বলার বদ অভ্যাস পরিত্যাগের জন্য একটা জিনিসেরই প্রয়োজন, আর তা হল "ইচ্ছা"। প্রত্যেকটা কথা বলার পূর্বে চিন্তা করা যে, এটা মিথ্যা নয়তো? হলে তা বর্জন করা। এভাবেই মিথ্যা বর্জনের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

বেশী কথা বলা ঃ

দ্বীনী ও প্রয়োজনীয় কথা[১] ছাড়া বেশী কথা বলাও একটি বদ অভ্যাস। এর দ্বারাও মানুষ শত শত গোনাহে লিপ্ত হয়– যেমন মিথ্যা বলা, গীবত করা, নিজের বড়াযী বয়ান করা, কাউকে অভিশাপ দেয়া, কারও সাথে অহেতুক তর্ক জুড়ে

১. প্রয়োজনীয় কথা হলঃ (এক) যা নেকী অর্জনের উদ্দেশ্যে বলা হয়। (দুই) যা গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য বলা হয়। (তিন) যা না বললে পার্থিব ক্ষতি হয়।

দেয়া, অতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা করতে গিয়ে কাউকে কষ্ট দিয়ে ফেলা ইত্যাদি। এর বিপরীত কম কথা বলার অভ্যাস থাকলে বহু পাপ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। তাই কম কথা বলা ভাল। বেশী বলার রোগের চিকিৎসা হল ঃ

(১) কথা বলার পূর্বে চিন্তা করে নেয়া-ছওয়াবের বা দরকারী হলে বলা আর অনুরূপ না হলে বর্জন করা।

(২) ভিতর থেকে নফস বলার জন্য খুব বেশী তাগাদা করলে তাকে এই বলে বোঝানো যে, এখন চুপ থাকতে যে কষ্ট, তার চেয়ে বেশী কষ্ট হবে দোযখের আযাবে। একান্ত না বলে থাকতে না পারলে অল্প বলে চুপ হয়ে যাবে। এভাবে কথা কম বলার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

(৩) একান্ত জরুরত না হলে কারও সাথে দেখা সাক্ষাৎ করবে না।

খেলাধূলা করা ও দেখা ঃ

যে খেলা শারীরিক ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে অথবা কোন ধর্মীয় বা পার্থিব উপকারিতা লাভের উদ্দেশ্যে অথবা কমপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার লক্ষ্যে হয়, সে খেলা শরীয়ত অনুমোদন করে, যদি তাতে বাড়াবাড়ি না করা হয়, শরীয়তের কোন হুকুম লংঘন করা না হয় এবং এতে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম বিঘ্নিত না হয়। পক্ষান্তরে যে খেলায় কোন ধর্মীয় বা পার্থিব উপকারিতা নেই, কিম্বা যে খেলায় শরীয়তের বিধান লংঘন হয় যেমন সতর খোলা হয়, বা যাতে মত্ত হয়ে নামায রোযা ইত্যাদি ফরয কর্ম বিঘ্নিত হয় অথবা জুয়ার ভিত্তিতে হার জিতে যে সকল প্রকার খেলা হয়ে থাকে সেগুলো শরীয়তে নিষিদ্ধ- কতক পরিষ্কার হারাম আর কতক নিষিদ্ধ। খেলাধূলা করার ও দেখার বদ অভ্যাসে যারা অভ্যস্ত তাদের এই বদ অভ্যাস পরিত্যাগের জন্য নিম্নোক্ত পন্থা সমূহ গ্রহণ করতে হবে।

(১) মনে চাইলেও ইচ্ছাকৃতভাবে তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

(২) খেলাধূলার আলোচনা করা ও আলোচনা শোনা থেকে বিরত থাকতে হবে।

(৩) খেলাধূলার উপকরণ ও পরিবেশ থেকে দূরে থাকতে হবে। কিছুদিন এরূপ করলে মন থেকে খেলাধূলার আকর্ষণ হ্রাস পেতে থাকবে।

কয়েকটি খেলা সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা

দাবা ও ছক্কা পাঞ্জা ঃ

এ জাতীয় খেলা হারাম। কেননা এসবে অনেক ক্ষেত্রেই টাকা পয়সার বাজি ধরা হয়ে থাকে, ফলে তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর বাজি ধরা না হলেও অনর্থক বিধায় তা নিষিদ্ধ।

তাশ, পাশা, চৌদ্দগুটি ইত্যাদি ঃ

যদি টাকা পয়সার হার জিত শর্ত থাকে তাহলে হারাম। এরূপ শর্ত না থাকলেও যেহেতু এতে কোন ধর্মগত ব্য স্বাস্থ্যগত উপকারিতা নেই তাই মাকরূহ।

ফুটবল ও ক্রিকেট ঃ

এ খেলা শরীরের ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে খেললে জায়েয যদি সতর খোলা না হয়, অতিরিক্ত সময় নষ্ট পয়সা নষ্ট না হয়, যদি নামায ইত্যাদি জরুরী কাজকর্ম ও ইবাদত নষ্ট না হয়। এ খেলাতেও টাকা পয়সার হার জিত শর্ত থাকলে তা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। তবে উল্লেখ্য যে, যদি শুধু একদিক থেকে পুরস্কার নির্ধারণ করা হয়, যেমন যে ব্যক্তি অমুক কাজ করবে তাকে পুরস্কার দেয়া হবে আর এতে যদি চাঁদা নেয়া না হয় তবে তাতে কোন দোষ নেই। ক্রিকেট খেলা জায়েয নয় কারণ, এতে শারীরিক ক্ষতি বা অঙ্গহানির আশংকা বিদ্যমান।

কেরাম বোর্ড, ফ্লাস ও ঘোড় দৌড় ঃ এ সবের মধ্যে বাজি রাখা হলে হারাম আর তা না হলে মাকরূহ তাহরীমী।

(معارف القرآن - هداية ج ٤ ও বেহশতী জেওর থেকে গৃহীত)

বিঃ দ্রঃ বর্তমান যুগে খেলাধূলার জন্য যেরূপ অতিরিক্ত আড়ম্বর করা হচ্ছে, সময় ও সম্পদ নষ্ট করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। (فروع الايمان)

জুয়া ঃ

জুয়া বলা হয় এমন লেন-দেনকে, যেখানে কোন মালের মালিকানা এমন সব শর্ত নির্ভর হয় যাতে মালিক হওয়া না হওয়ার উভয় সম্ভাবনাই সমান থাকে। যার ফলে পূর্ণলাভ বা পূর্ণ লোকসান উভয় দিকই থাকে–কেউ কেউ প্রচুর সম্পদ পেয়ে যায় এবং অনেকে কিছুই পায় না। শরীয়তে সব ধরনের জুয়াই হারাম। আজকাল প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের লটারী জুয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং তা হারাম। কেননা এ সবেও অনেক ক্ষেত্রেই টাকা পয়সার বাজি ধরা হয়ে থাকে, ফলে তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।

তাশ খেলাতে যদি টাকা পয়সার হার-জিত শর্ত থাকে অর্থাৎ বাজি ধরা হয়, তবে তাও হারাম ও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। খেলাধূলা করা ও দেখার বদ অভ্যাস থেকে পরিত্রাণের যে পন্থা, জুয়ার বদ অভ্যাস থেকে পরিত্রাণের জন্যও সে সব পন্থা গ্রহণীয়। দেখুন ৫৫৭ পৃষ্ঠা।

কয়েকটি উত্তম চরিত্র

সততা ও সত্যবাদিতা ঃ

ইসলামে সততা ও সত্যবাদিতার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, মোআমালা-মোআশারা যাবতীয় ক্ষেত্রে সত্য কথা বলা ও সততার উপর টিকে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সত্যবাদী ও সত্যপরায়ণ লোকদের সঙ্গ ও পক্ষ অবলম্বন করতে বলা হয়েছে এবং এর বিপরীত মিথ্যাকে করা হয়েছে হারাম। মিথ্যাচারিতার পরিণাম হল ধ্বংস ও ব্যর্থতা।

আমানতদারী ঃ

আমানতদারী হল সততা ও সত্যবাদিতার একটি বিশেষ অংশ। মানুষ অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখলে তা যথাযথভাবে আদায় করা যেমন আমানতদারী, তেমনিভাবে কেউ কোন গোপনীয় কথা জানালে বা কোনভাবে কারও কোন গোপনীয় বিষয় জানতে পারলে তা গোপন রাখাও আমানতদারীর অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপক অর্থে আল্লাহ্ আমাদেরকে শরীয়তের যে বিধি-বিধান দিয়েছেন তা সমুদয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আমানত, তার হক আদায় করাও আমাদের উপর ওয়াজিব। টাকা-পয়সার আমানত, কথার আমানত, কাজের আমানত, দায়িত্বের আমানত ইত্যাদি যে কোন আমানতের খেয়ানত করা কবীরা গোনাহ।

সদ্ব্যবহার ঃ

ইসলাম আপন-পর, ছোট-বড়, মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলের সাথে, এমনকি অবলা প্রাণীর সাথেও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে। কারও সাথে সদ্ব্যবহার করার অর্থ হল তার সাথে যা করণীয় তা করা এবং তার হক বা অধিকার আদায় করা। তাই মাতা-পিতার অধিকার থেকে শুরু করে জীব-জন্তুর অধিকার পর্যন্ত সব কিছু রক্ষা ও আদায় করা এই সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। (দেখুন ৩৬৬ পৃষ্ঠা থেকে ৩৯৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) মনকে সকলের অধিকার আদায়ের জন্য সচেতন করে তুললেই সদ্ব্যবহার গুণ অর্জিত হবে।

আত্মীয়তা রক্ষা করা ঃ

এর জন্য দেখুন "আত্মীয় স্বজনের অধিকার পৃষ্ঠা নং ৩৮৫

অতিথিপরায়ণতা ঃ

অতিথিপরায়ণতা মূলতঃ একটি মনের চরিত্র। মেহমানকে শুধু পর্যাপ্ত আপ্যায়ন করানোর নাম অতিথি পরায়ণতা নয়, বরং সাধ্য অনুযায়ী মেহমানকে আপ্যায়নতো রয়েছেই, সেই সাথে প্রফুল্যচিত্তে এবং বিকশিত মনে মেহমানকে গ্রহণ করা ও তার সাথে সম্মানজনক আচরণ করাই হল সত্যিকার অতিথিপরায়ণতা।

মেহমান এলে আমার পানাহারে শরীক হবে, আর্থিক ক্ষতি হবে, ঝামেলা বাড়বে– এরূপ দুঃশ্চিন্তা মনকে বিকশিত হতে দেয়না, আর এটাই অতিথিপরায়ণতা গুণ সৃষ্টি হওয়ার অন্তরায়। পক্ষান্তরে যদি কেউ চিন্তা করে যে, তাকদীরের বিশ্বাস অনুসারে মেহমান তারই হিস্যা ভোগ করবে– আমার নয়, তদুপরি আমি মেজবানের প্রতি মেহমানের হক বা অধিকার রয়েছে, তাহলে আতিথ্যের জন্য মন আর সংকুচিত হবে না বরং বিকশিত হবে এবং তখনই সৃষ্টি হবে অতিথিপরায়ণতা চরিত্র। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে ঃ অবশ্যই তোমার প্রতি তোমার মেহমানের হক বা অধিকার রয়েছে।

ভ্রাতৃত্ব ও স্নেহ-মমতা ঃ

ভ্রাতৃত্ব ও স্নেহ-মমতা উত্তম চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। হৃদয়ের যে কমনীয়তা, মাধুর্য, আবেগ, অনুরাগ এবং অনুগ্রহ; ক্ষেত্র বিশেষে সেটাকে স্নেহ-মমতা বলা হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে সেটাকে প্রেম ভালবাসা বলে ব্যক্ত করা হয়, আবার গুরুজন ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির প্রতি সেটাকে নিবেদন করা হলে তা ভক্তি শ্রদ্ধা বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। আর এ সব অনুভূতি যখন আপন মনের গন্ডি ছাড়িয়ে সার্বজনীন মানুষের প্রতি মানুষ হিসাবে নিবেদিত হয় তখন তাকে বলা হয় সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং শুধু মুসলমানদের প্রতি নিবেদিত হলে সেটাকে বলা হয় ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।

ইসলামে স্নেহ-মমতা ও ভ্রাতত্বের গুরুত্ব এত বেশী যে, কারও মধ্যে এ গুণ উপস্থিত না থাকলে সে যেন মুসলমান বলেই আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য থাকে না। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে ঃ যারা ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা এবং বড়দের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনা তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। (তিরমিযী)

ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছে ঃ সমস্ত মুসলমান একটা দেহের ন্যায়, একটা দেহের কোন অঙ্গ যদি পীড়িত হয় তাহলে অন্যান্য অঙ্গ যেমন তা উপলব্ধি করতে পারে, তদ্রূপ সমস্ত মুসলমানের মধ্যে একের প্রতি অন্যের এরূপ একাত্মতা ও সহমর্মিতা থাকতে হবে।

সমস্ত মানুষ একই পরিবারভুক্ত, সকলেই এক আল্লাহর বান্দা, সকলেই এক আদমের সন্তান– মনের মধ্যে এই উপলব্ধি বদ্ধমূল ও উজ্জীবিত থাকলে পারস্পরিক একাত্মতা ও সহমর্মিতা বোধ উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। এক হাদীছে বলা হয়েছে ঃ তোমরা সকলে এক আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে জীবন যাপন কর। (বোখারী ও মুসলিম) হাদীছে আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ তোমরা সকলেই এক আদমের সন্তান। আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। একথা বলে ভ্রাতৃত্ববোধকে উদ্বেলিত করা হয়েছে।

ত্যাগ ও বদান্যতা ঃ

ত্যাগ হল কৃপণতার বিপরীত এবং দানশীলতার চূড়ান্ত পর্যায়। আর বদান্যতা অর্থ দানশীলতা। দানশীলতার তিনটি স্তর রয়েছে। যথা ঃ

(১) নিজের প্রয়োজন পূরণে যেন কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে এই পরিমাণ অন্যের জন্য খরচ করা।

(২) অন্যকে এই পরিমাণ দান করা যার সম পরিমাণ বা তার চেয়ে কিছুটা কম নিজের কাছে অবশিষ্ট থাকে।

(৩) নিজের প্রয়োজনে ব্যয় না করে নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয়া। এই শেষোক্ত পর্যায়টিকে বলা হয় ত্যাগ।

ত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টির জন্য আল্লাহর হক ও বান্দার হকের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে ও কৃপণতা বা বখীলী চেতনা থেকে মনকে নিয়ন্ত্রণ ও কৃপণতার বিপরীত প্রেরণা লাভ করতে হবে এবং সুন্দর চরিত্রের প্রতি আকর্ষণ বোধ সৃষ্টি করতে হবে। (নীতিদর্শন গ্রন্থ থেকে গৃহীত)।

উদারতা ঃ

ব্যক্তি স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে সার্বজনীন স্বার্থের চিন্তায় মনের বিকশিত হওয়াকে বলা হয় উদারতা। উদারতার বিপরীত চরিত্রকে বলা হয় সংকীর্ণতা। চিন্তার সংকীর্ণতা বহু ধরনের পংকীলতার উৎস হয়ে থাকে। সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে উন্নত চরিত্র সৃষ্টি হয়না। এরূপ মানসিকতা মানুষের জ্ঞানকে পক্ষপাত গ্রস্থ

ও অনুভূতিহীন করে ফেলে। এই সংকীর্ণ মন-মানসিকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ মানুষ আমিত্বকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ফলে ব্যক্তি স্বার্থের বাইরে সে কিছু চিন্তা করতে পারে না। সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য কোন বিরাট অবদান রাখতে পারে না। ক্ষমা, দয়া, আত্মত্যাগ, প্রভৃতি বহু গুণ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়ে যায় এই উদারতা না থাকার ফলে। এদিক থেকে চিন্তা করলে উদারতা এমন এক চরিত্র যা বহু চরিত্রের উৎসমূল। আমি শুধু আমার জন্য নই, আমার সবকিছু শুধু আমারই জন্য নয়– আমি পূর্ণাঙ্গ সমাজদেহের একটি অংশ মাত্র– এরূপ চিন্তা অর্থাৎ, চিন্তার পরিধিকে বিস্তৃত করা উদারতা সৃষ্টির সহায়ক হয়ে থাকে। তদুপরি– উদার মানুষের সাহচর্য এবং এমন মহামনীষীদের জীবনী পাঠও উদারতার মনোভাব জাগ্রত করে থাকে, যারা আত্মত্যাগ ও সার্বজনীন সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন।

হায়া বা লজ্জাশীলতা ঃ

নিন্দা সমালোচনার ভয়ে কোন দুষণীয় কাজ করতে মানুষের মধ্যে যে জড়ত্ববোধ হয়ে থাকে সেটাকে বলে হায়া বা লজ্জা। এই লজ্জা মানুষকে ভাল কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। এ জন্যেই হাদীছে বলা হয়েছে ঃ লজ্জা কেবল সুফল ও কল্যাণই বয়ে আনে। (বোখারী ও মুসলিম) এর বিপরীত লজ্জা না থাকলে মানুষ সে যে কোন অন্যায় কাজই করতে পারে। তাই প্রবাদ আছে– যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখন যা ইচ্ছা তাই কর।

এখানে উল্লেখ্য যে, কোন ভাল কাজ করতে যদি কখনও জড়তা বোধ হয় তাহলে সেটা লজ্জা বা প্রশংসনীয় গুণ বলে আখ্যায়িত হবেনা। যেমন-পর্দা করতে বা দাড়ি রাখতে বা টুপি মাথায় দিতে জড়তা বোধ হল, এটা লজ্জা বা হায়া নয় বরং এটা হল ধর্মীয় হীনমন্যতাবোধ। এমনিভাবে নিজেকে অত্যন্ত ছোট করে প্রকাশ করা, যেখানে সেখানে চুপ করে থাকা এবং হীনতা প্রকাশ করা এটাও লজ্জা বা হায়া বলে প্রশংসিত হবার নয় বরং এটা হল স্বভাবগত দুর্বলতা।

যদি কেউ দৈহিক ও আত্মিক শক্তিকে যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ ও যথাস্থানে প্রয়োগ করে এবং পানাহারের চাহিদা ও আত্মিক কামনাসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও যথাস্থানে প্রয়োগ করে, তাহলে তার মধ্যে লজ্জার যথার্থ বিকাশ ঘটবে। (আদাবুদ্দুনিয়া ওয়াদ্দীন)

বড়কে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা ঃ দেখুন ৩৮১ পৃষ্ঠা

ছোটকে স্নেহ করা ঃ এর জন্য দেখুন ৩৮৩ পৃষ্ঠা।

ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন ঃ

বিপদ-আপদে মানুষের প্রতি দয়া করা এবং অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করাও উত্তম চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী যে মানুষের প্রতি দয়া করে না তার প্রতিও দয়া করা হবেনা। যে মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে না আল্লাহও তার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। এখানে ক্ষমা করার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। যদিও যে পরিমাণ জুলুম কেউ করে ততটুকুর প্রতিশোধ তার থেকে নেয়া জায়েয, তবে উত্তম হল প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দেয়া। তবে উল্লেখ্য যে, এই ক্ষমা করার প্রশ্ন ব্যক্তিগত হক নষ্ট করার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে কেউ দ্বীনের হক নষ্ট করলে যেমন মুরতাদ হয়ে ধর্মের অবমাননা করলে তা ক্ষমাযোগ্য নয়। এমনি ভাবে বিচারক আইন অনুযায়ী অপরাধের বিচার করবেন, অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারবেন না, কারণ সেটা তার ব্যক্তিগত হক নষ্ট হওয়ার সাথে জড়িত বিষয় নয়।

দয়া শুধু মুসলমানদের প্রতি নয় বা আপনজনদের প্রতি নয়। আপন-পর, শত্রু-বন্ধু, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের প্রতি এমন কি অবলা জীব-জন্তুর প্রতিও দয়া প্রদর্শনের আদর্শ ইসলামে রয়েছে। এই দয়া যেমন পার্থিব কষ্ট ক্লেশ দূর করার জন্য হবে, তেমনি পরকালীন কষ্ট ক্লেশ দূর করার জন্যও দয়া প্রদর্শিত হতে হবে। ঈমানহীনের ঈমান এবং আমলহীনের আমল পয়দা করার জন্য মনের পেরেশানীও তাই বড় দয়া বলে গণ্য।

ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা ঃ

যার যা হক ও প্রাপ্য তাকে তা যথাযথ ভাবে দেয়াকে বলা হয় ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা। আর তার চেয়ে কম করা হল জুলুম বা অবিচার। ইসলামে ইনসাফ ও ন্যায্য বিচারের গুরুত্ব এত বেশী যে, অমুসলিমদের সাথেও তা রক্ষা করার হুকুম দেয়া হয়েছে। জুলুম ও অবিচারকে হারাম করা হয়েছে। ফয়সালার ক্ষেত্রে নিজের ও অন্যের মধ্যে ব্যবধান করার তথা পক্ষপাতিত্ব করার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ইনসাফ করতে হবে, যদিও তা আপনজনের বিরুদ্ধে চলে যায়।

অঙ্গীকার রক্ষা করা ঃ

অঙ্গীকার রক্ষা করা তথা ওয়াদা খেলাফ না করা সততা-রই অংশ বিশেষ। অঙ্গীকার রক্ষা করা ওয়াজিব। এমনকি বালক বা শিশুকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য কোন কিছু প্রদানের অঙ্গীকার করলেও তা পূরণ করা জরুরী। পূরণ করার নিয়ত

না থাকলে অঙ্গীকার করবে না। তবে কোন পাপ কাজের অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করা যাবে না। অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, হযরত রাসূল (সঃ) তাঁর ভাষণে প্রায়ই বলতেনঃ যে ব্যক্তি নিজ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের বিষয়ে যত্নবান নয়, দ্বীন ইসলামের মধ্যে তার কোন অংশ নেই।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঃ

পাক-ছাফ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাকে আল্লাহ পছন্দ করেন। এজন্যেই ইসলাম শরীর, কাপড়-চোপড়, ঘর-বাড়ির আঙ্গিনা ইত্যাদিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছে। শরীরের অবাঞ্ছিত পশম নিয়মানুযায়ী কেটে বা উপড়ে ফেলা, খতনা করা, নখ কাটা, মোচ কাটা এসবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার আওতাভুক্ত। এসব হল জাহিরী অর্থাৎ বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা। এর সাথে রয়েছে বাতিনী অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার দিক, মনের রোগ থেকে নফস ও আত্মাকে এবং কুচরিত্র থেকে আখলাককে পবিত্র করার মাধ্যমেই এ দিকটি অর্জিত হবে।

আমর বিলমা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার ঃ এর জন্য দেখুন ৪০৬ পৃষ্ঠা।

আধ্যাত্মিক সংশোধন ও আমল আখলাক হাছিলের জন্য পীর বা শায়খে তরীকতের প্রয়োজনীয়তা

নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি শরীয়তের জাহিরী বিধানের উপর আমল করা যেমন জরুরী তেমনিভাবে এখলাস, আল্লাহর মহব্বত, রেজা, প্রভৃতি কলবের গুণাবলী হাছিল করা এবং রিয়া, তাকাব্বুর প্রভৃতি অন্তরের ব্যাধি দূর করা তথা বাতিনী বিধানের উপর আমল করাও জরুরী এবং ওয়াজিব। এই বাতিনী বিধানাবলীর উপর আমল করাকে বলা হয় তায্‌কিয়া, এসলাহে বাতেন বা রূহানী এসলাহ। ফত্‌ওয়ার ভাষায় দ্ব্যর্থহীনভাবে একথা বলা হয় না যে, পীর ধরা ফরয বা ওয়াজিব। তবে তায্‌কিয়া বা এসলাহে বাতেন ওয়াজিব। সাধারণভাবে যেহেতু উস্তাদ বিহনে কোন শাস্ত্র সঠিকভাবে আয়ত্ব করা যায় না এবং পথ প্রদর্শক ছাড়া পথ চলা যায়না বা চলা গেলেও বিপথগামী হওয়ার ও ভুলপথে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমনিভাবে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়া রোগ নির্ণয় করা যায়না বা করা সম্ভব হলেও নিজে নিজে চিকিৎসা করতে যাওয়াতে হীতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এসবের ভিত্তিতে একজন সঠিক উস্তাদ, একজন সঠিক পথ প্রদর্শক ও একজন অভিজ্ঞ রূহানী চিকিৎসক হিসেবে পীর বা শায়খে তরীকতের সহযোগিতা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী।

হযরত থানবী (রহঃ) লিখেছেনঃ হযরত রাসূল (সঃ) সমস্ত মুসলমানের খায়েরখাহী করা, ধর্ম সম্বন্ধে কারও নিন্দাবাদ গালির পরওয়া না করার কারও সামনে হাত না পাতা ইত্যাদি বিষয়ের জন্য বায়আত গ্রহণ করেছেন। এসব দলীলের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, বায়আতে সুলূক (অর্থাৎ, পীরের হাতে বায়আত) সুন্নাত। এক সময় খেলাফতের বায়আতের সাথে গোলামাল না হয় এই ভয়ে সালাফে সালেহীন (পূর্বসূরীগণ) বায়আতে সুলূক বাদ দিয়ে শুধু ছোহবতের উপর ক্ষান্ত করেন। আবার বায়আতের পরিবর্তে খের্কার রছমও জারী হয়। পরে যখন খেলাফতের বায়আতের সাথে গোলমালের আর কোন ভয় না থাকে, তখন সুফিয়ায়ে কেরাম আবার এই মুরদা সুন্নাত যিন্দা করেন।

পীর বা শায়খে তরীকত মুরীদকে আল্লাহর হুকুম আহকাম পালন এবং তাঁর জাহিরী বাতিনী ভুল-ত্রুটি সংশোধনের পন্থা বাতলে দিবেন এবং মুরীদ সে অনুযায়ী চলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে। এই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও তাঁর রেজামন্দী হাছিল করা তথা আল্লাহকে পাওয়াই হল পীর-মুরীদী ও ফকীরী-দরবেশী শিক্ষা করার আসল উদ্দেশ্য। এছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্য, যেমন মুরীদ হলে নানা রকম কারামত লাভ করা যাবে বা পীর সাহেব কেয়ামতের দিন পার হওয়ার ব্যবস্থা করবেন বা পীর তাওয়াজ্জুহ দিয়ে সব ঠিক করে দিবেন বা পীরের থেকে নানা রকম তাবীয তদবীর লাভ করা যাবে, অন্তরে জযবা এসে একেবারে মস্ত দিওয়ানা হয়ে যাবে ইত্যাদি। এসব উদ্দেশ্য ঠিক নয়– এগুলো পীর মুরীদীর উদ্দেশ্য নয়।

সারকথা– পীর বুযুর্গের হাতে বায়আত গ্রহণ করা সুন্নাত এবং নফসের এসলাহ করা জরুরী। আর এই জরুরী দায়িত্ব পালনে হক্কানী পীরের ছোহবত ও দিক নির্দেশনা অত্যন্ত উপকারী। তবে স্মরণ রাখা দরকার যে, ভণ্ড ও ঠগবাজ পীরের হাতে বায়আত হওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর। হক্কানী পীর না পেলে হক্কানী ওলামায়ে কেরাম থেকে মাসলা-মাসায়েল জেনে এবং সহীহ দ্বীনী কিতাবাদী পড়ে, জেনে সে অনুযায়ী আমল করতে থাকবে। হক্কানী বুযুর্গের সুহবত লাভের সুযোগ না পেলে তাদের কিতাব ও মালফূজাত পাঠ করেও বহু ফায়দা পাওয়া যাবে। শায়খে কামেলের অনেকটা বিকল্প হল তাঁদের কিতাব ও মালফূজাত পাঠ করা।

(তাসাউফ তত্ত্ব فروع الايمان ، تعليم الدين ، شريعت وطريقت থেকে গৃহীত।)

কামেল ও খাঁটি পীরের আলামত

(১) পীর তাফসীর, হাদীস, ফেকাহ–অভিজ্ঞ আলেম হওয়া দরকার। অন্ততঃপক্ষে মেশকাত শরীফ ও জালালাইন শরীফ বুঝে পড়েছেন এতটুকু পরিমাণ ইল্‌ম থাকা আবশ্যক।

(২) পীরের আকীদা ও আমল শরীয়তের মোয়াফেক হওয়া দরকার এবং স্বভাব-চরিত্র ও অন্যান্য গুণাবলী যে রকম শরীয়ত চায় সে রকম হওয়া দরকার।

(৩) পীরের মধ্যে টাকা-পয়সার ও সম্মান-সুখ্যাতির লোভ থাকবে না। নিজে কামেল হওয়ার দাবী করবে না।

(৪) তিনি কোন কামেল ও খাঁটি পীরের কাছ থেকে এসলাহে বাতেন ও তরীকত হাছিল করে থাকবেন।

(৫) সমসাময়িক পরহেযগার মোত্তাকী আলেমগণ এবং খাঁটি সুন্নাত তরীকার পীর মাশায়েখগণ তাকে ভাল বলে মনে করেন।

(৬) দুনিয়াদার অপেক্ষা সমঝদার দ্বীনদার লোকেরাই তার প্রতি বেশী ভক্তি রাখে।

(৭) তার মুরীদদের অধিকাংশ এমন যে, তারা শরীয়তের পাবন্দী করে এবং দুনিয়ার লোভ-লালসা কম রাখে।

(৮) পীর মনোযোগ সহকারে মুরীদদের তালীমে তালকীন ও এসলাহে বাতেন করান, তাদের কোন দোষ-ত্রুটি দেখলে সংশোধন করে দেন, তাদের মতলব ও মর্জি মত স্বাধীন ছেড়ে দেন না।

(৯) তার ছোহবতে কিছুদিন থাকলে দুনিয়ার মহব্বত কম ও আখেরাতের চিন্তা বেশী হতে থাকে।

(১০) পীর নিজেও রীতিমত যেকের শোগল করেন। (অন্ততঃপক্ষে করার এরাদা রাখেন) কেননা নিজে আমল না করলে তার তালীম তালকীনে বরকত হয় না। *(কছদুছ ছবীল ও তাসাওউফ তত্ত্ব থেকে গৃহীত)*

পীরের জন্য মুরীদের করণীয়ঃ (৩৮০ পৃষ্ঠা দেখুন)

মুরীদের জন্য পীরের করণীয়ঃ (৩৮২ পৃষ্ঠা দেখুন)

কয়েকটি বিশেষ আমল, যার প্রতি যত্নবান হলে অন্যান্য বহু আমলের পথ খুলে যায়

১। **ইলমে দ্বীন হাসিল করা ঃ** চাই কিতাব পড়ে হোক অথবা ওলামাদের সোহবতে গিয়ে। কিতাবের শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ওলামাদের সোহবতে যাওয়া আবশ্যক। ওলামা বলতে আমি বুঝাতে চাই যারা ইলম অনুযায়ী

আমল করে এবং শরীয়ত ও মারেফতের জ্ঞানে প্রাজ্ঞ। এরকম বুযুর্গ আলেমদের সোহবত যত বেশী লাভ করা যায় ততই মঙ্গল। যদি প্রতিদিন সম্ভব না হয়, তবে সপ্তাহে অন্ততঃ এক/আধ ঘন্টা বুযুর্গদের সোহবতে থাকা দরকার। এর সুফল কিছু দিন গেলে স্বচক্ষেই দেখতে পাবে।

২। **নামায ঃ** যেভাবেই হোক পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করবে। যথা সম্ভব জামাতের পাবন্দী করার চেষ্টা করবে। এতে করে দরবারে এলাহীর সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। এর বরকতে ইনশাআল্লাহ নিজের হালাত ঠিক থাকবে। অশ্লীল গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

৩। **কম কথা** বলা, **কম মেলা-মেশা** করা এবং যথা সম্ভব ভেবে চিন্তে কথা বলার চেষ্টা করবে। হাজারো বিপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য ইহা একটি বড় উপায়।

৪। **মুহাছাবা ও মুরাকাবা ঃ** অন্তরে সর্বদা এই খেয়াল রাখবে যে, আমি আমার মালিকের দৃষ্টি সীমার মধ্যে আছি। তিনি আমার সমস্ত কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম ও গতি বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখছেন। ইহাই মুরাকাবা। আর কোন একটি সময় নির্দিষ্ট করে নির্জনে বসে সারা দিনের আমল স্মরণ করে খেয়াল করবে যে, এখন আমার হিসাব হচ্ছে এবং আমি জবাব দিচ্ছি। এটা হল মুহাছাবা।

৫। **তওবা ও ইস্তিগফার ঃ** যখনই কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, তখন দেরী না করে সঙ্গে সঙ্গে নির্জন পরিবেশে সাজদায় গিয়ে ক্ষমা চাইবে, কান্না-কাটি করবে। যদি কান্না না আসে, তবে কান্নার ছুরত ধারণ করবে। যাহোক এখানে পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করা হলো। যথাঃ উলামাগণের সোহবত, পাঞ্জেগানা নামায, কম কথা বলা ও কম মেলা-মেশা, মুহাছাবা মুরাকাবা এবং তওবা ও ইস্তিগফার। ইনশাআল্লাহ এই পাঁচটি বিষয়ের প্রতি যত্নবান হলে– যা মোটেও কঠিন নয়– সমস্ত ইবাদতের দরজা খুলে যাবে।

কয়েকটি বিশেষ গুনাহ যা থেকে বিরত থাকলে প্রায় সকল গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়

১। **গীবত ঃ** সবারই জানা-এর দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতের নানা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। আজকাল অনেক লোক এই রোগে আক্রান্ত। এর থেকে বাঁচার সহজ উপায় এই যে, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কারো সম্পর্কে ভাল-মন্দ আলোচনা করবে না, শুনবেও না। নিজের প্রয়োজনীয় কাজ নিয়ে মশগুল থাকবে। আলোচনা করতে হলে নিজের আলোচনাই করবে। নিজের কাজই তো শেষ করা যায় না, অপরের আলোচনা করার অবকাশ কোথায় ?

২। **জুলুম ঃ** অন্যের জান-মালের উপর জুলুম করা, কথার দ্বারা কষ্ট দেয়া, কম হোক বেশী হোক কারো হক নষ্ট করা, কাউকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া অথবা কাউকে বে-ইজ্জত করা এ সবই জুলুম।

৩। **নিজেকে বড় মনে করা এবং অন্যদের ছোট মনে করা ঃ** এ রোগ থেকেই জুলুম ও গীবত জন্ম নেয়। এছাড়া হিংসা-বিদ্বেষ এবং ক্রোধের মত নিন্দনীয় প্রবৃত্তিও এর থেকেই সৃষ্টি হয়।

৪। **ক্রোধ ঃ** ক্রোধে আক্রান্ত হলে পরিণামে পস্তাতে হয়। কারণ ক্রোধ অবস্থায় বুদ্ধি-বিবেচনা হারিয়ে যায়। সুতরাং এ সময় সব কাজই হয় বিবেক বুদ্ধির পরিপন্থী। মুখ দিয়ে এমন মারাত্মক কথা বের হয়ে পড়ে, অথবা হাত দিয়ে এমন অশোভন কাজ সংঘটিত হয় যা অনেক সময় মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে যায়। ক্রোধ অবদমিত হওয়ার পর তখন আর কিছু করার থাকে না এবং তা সারা জীবন মনোপীড়ার কারণ হয়ে থাকে।

৫। **বেগানা নারী-পুরুষের সাথে যে কোন ধরনের (অবৈধ) সম্পর্ক রাখা ঃ** দেখা করা, কথা-বার্তা বলা, নির্জনে ঘনিষ্টভাবে বসা, অথবা তাকে খুশী করার জন্য নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা বা মোলায়েম ও মিষ্ট স্বরে কথা বলা এসবই অবৈধ সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত। এই অবৈধ সম্পর্ক খুবই খারাপ পরিণতি ডেকে আনে, বর্ণনাতীত বিপদের সম্মুখীন করে।

৬। **হারাম খাওয়া ঃ** এর থেকেই সমস্ত পাপ-পঙ্কিলতার জন্ম। কারণ, খাদ্যরস থেকে রক্ত সৃষ্টি হয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং খাদ্য যে রকম হবে, সেই প্রভাব সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সৃষ্টি হবে। এবং সেই ধরনের কাজই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সংঘটিত হবে। যাহোক ছয়টি গুনাহ উল্লেখ করা হলো। এই গুনাহ সমূহ বর্জন করলে অন্যান্য গুনাহ থেকে দূরে থাকা সহজ হয়ে যাবে বরং আশা করা যায় আপনা আপনিই দূর হয়ে যাবে।

(এ পরিচ্ছেদ ও পূর্বের পরিচ্ছেদ জাযাউল আ'মাল– গ্রন্থ থেকে গৃহীত)

যিকিরের সুন্নাত ও আদব সমূহ

(১) যিকিরের জন্য উযূ করা শর্ত নয় তবে উযূ-র সাথে যিকির করলে যিকিরের আছর বেশী হয় এবং নূরানিয়্যাত হাছেল হয়।

(২) কেবলা মুখী হয়ে যিকিরে বসা উত্তম।

(৩) হুজুরে কল্‌ব বা একাগ্রতার সাথে যিকির করতে হবে।

(৪) এই একীনের সাথে যিকির করবে যে, আল্লাহ আমার যিকির শুনছেন, তাই আল্লাহর আযমত ও মহব্বতের সাথে যিকির করতে হবে।

(৫) এখলাসের সাথে যিকির করতে হবে।

(৬) যিক্‌রে খফী বা অনুচ্চ স্বরে যিকির করা উত্তম। তবে রিয়ার সম্ভাবনা না থাকলে এবং কারও নিদ্রা, ইবাদত বা জরুরী কাজে ব্যাঘাত না ঘটলে যিকরে জলী বা উচ্চ স্বরে যিকির করাও জায়েয বরং কোন কোন মাশায়েখ উক্ত শর্ত স্বাপেক্ষে সেটাকেই উত্তম বলেছেন, কেননা উচ্চস্বরে যিকির করার মধ্যে মনোযোগ নিবদ্ধ থাকা, ওয়াছওয়াছা হ্রাস পাওয়া এবং যিকিরের আওয়াজের বরকত ছড়িয়ে পড়া প্রভৃতি বহুবিধ ফায়দা রয়েছে। তবে খুব বেশী উচ্চ স্বরে না হওয়া চাই এবং উচ্চস্বরে করাকে ছওয়াবের বা ইবাদতের মনে না করা চাই। (شرعة الاسلام اور شریعت و طریقت)

(৭) শুধু সংখ্যা পূরণ করার নিয়তে নয় বরং যিকির দ্বারা ফায়দা ও বরকত লাভ হবে এই নিয়তে যিকির করতে হবে, অন্যথায় যিকিরের বরকত লাভ হবে না। (بصائر حکیم الامت)

(৮) যে শব্দের দ্বারা যিকির করবে তার অর্থের দিকে খেয়াল রাখবে।

(৯) পীর/মুর্শিদের নির্দেশ মোতাবেক যিকির করবে। আর নিজের থেকে যিকির করলে তার জন্য সময় ও সংখ্যা নির্ধারণ করে নেয়া উত্তম।

কয়েকটি বিশেষ যিকির

(১) কুরআন তিলাওয়াত

(২) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

(৩) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

(৪) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

(৫) তাসবীহে ফাতিমী (৪৩৩ পৃঃ দ্রঃ)

(৬) আল্লাহ, আল্লাহ ...

দুরূদ শরীফের বিধি-বিধান প্রসঙ্গ

* হযরত রাসূল (সঃ)-এর নাম উচ্চারণ করলে বা শুনলে দুরূদ শরীফ পাঠ করতে হয়। জীবনে অন্ততঃ একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করা ফরয।

* যদি কোন মজলিসে একাধিক বার রাসূল (সঃ)-এর নাম মোবারক উল্লেখ করা হয় তাহলে একবার দুরূদ পাঠ করা ওয়াজিব, অবশিষ্ট বারগুলোতে মোস্তাহাব।

* খতীব খুতবার মধ্যে রাসূল (সঃ)-এর নাম উল্লেখ করলে কিংবা يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا আয়াত পাঠ করলে জিহ্বা নাড়ানো ব্যতিরেকে মনে মনে দুরূদ পাঠ করে নিবে।

* দুরূদ শরীফ পাঠ করার জন্য উযূ থাকা জরুরী নয়। থাকলে ভাল।

* উঠা-বসা, হাটা-চলা, সর্বাবস্থায় দুরূদ পাঠ করা যায়।

* দুরূদ পাঠের সময় শরীরে ঝাঁকুনি দেয়া বা আওয়াজ উচ্চ করা মূর্খতা।
(شرح فیض الکلام علی تنویر الاعمال)

* ওয়াজের সময় শ্রোতাদের সম্মিলিত ভাবে জোর আওয়াজে দুরূদ পড়া মাকরূহ। (فتاوی محمودیہ ج ١٠)

* দুরূদে তাজ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এর ফজিলতে যা লেখা হয় তা ভিত্তিহীন। তদুপরি তার মধ্যে কিছু শিরক পূর্ণ কথা রয়েছে, অতএব তা পরিত্যাজ্য। পড়তে হলে সেই অংশ বাদ দিয়ে পড়া যায়। (فتاوی رحیمیہ ج ٢)

* ছোট এবং বড় দুরূদের মধ্যে যেটাই ভাল লাগবে সেটাই পড়বে।

* সাধারণভাবে عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বললেই দুরূদ ও সালাম হয়ে যায়।

* সংক্ষেপে চাইলে নিম্নের দুরূদ শরীফ পাঠ করা যায়

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِه

* যে কোন বিপদে বা সমস্যার সম্মুখীন হলে দুরূদে নারিয়া ৪৪৪৪ (চার হাজার চারশত চুয়াল্লিশ বার) একই উযুতে একই বৈঠকে যে কোন সংখ্যক লোক মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা উক্ত বিপদ থেকে মুক্তি দেন ও সমস্যার সমধান করে দেন। এটা বুযুর্গদের পরীক্ষিত আমল, হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এটাকে সুন্নাত তরীকা মনে করা যাবে না।

দুরূদে নারিয়া এই ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلاَةً كَامِلَةً وَّ سَلِّمْ سَلاَمًا تَامًّا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ الَّذِىْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَ تَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَ تُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ وَ تُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَ حُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِه وَ صَحْبِه فِىْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَّ نَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ (رسول اللہ ﷺ کی سنتیں)

(مجالس حکیم الامت ও اسلام کیا ہے - شرح فیض الکلام থেকে গৃহীত)

তওবা এস্তেগফারের নিয়ম পদ্ধতি

তওবা অর্থ গোনাহ থেকে আনুগত্যের দিকে এবং গাফলত থেকে আল্লাহর স্মরণের দিকে ফিরে আসা। আর এস্তেগফার অর্থ ক্ষমা চাওয়া। প্রত্যেক বান্দার উপর তার পাপ থেকে তওবা এস্তেগফার করা ওয়াজিব।

তওবার জন্য মোট পাঁচটি কাজ করতে হবে ঃ

(১) খাঁটি অন্তরে তওবা করতে হবে। অর্থাৎ, শুধুমাত্র আল্লাহর আযাবের ভয় ও তাঁর নির্দেশের মহত্বকে সামনে রেখে তওবা করতে হবে।

(২) অতীত পাপের প্রতি অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে।

(৩) উক্ত পাপ থেকে এখনই বিরত হতে হবে।

(৪) ভবিষ্যতে উক্ত পাপ না করার জন্য মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে।

(৫) আল্লাহর হক বা বান্দার হক নষ্ট হয়ে থাকলে তার সংশোধন ও প্রতিকার করতে হবে। যেমন নামায, রোযা, হজ্, যাকাত ইত্যাদি আল্লাহর হক আদায় না করে থাকলে তা আদায় করতে হবে। আর বান্দার হকের মধ্যে অর্থ সম্পদ বিষয়ক হক নষ্ট করে থাকলে উক্ত অর্থ বা উক্ত পরিমাণ অর্থ হকদারের নিকট বা তার মৃত্যু হয়ে থাকলে তার উত্তরাধিকারীর নিকট ফেরত দিতে হবে। আর সম্ভব না হলে তাদের থেকে মাফ করিয়ে নিতে হবে এবং অর্থ সম্পদ ব্যতীত অন্য কোন হক নষ্ট করে থাকলে যেমন গীবত বা গালি গালাজ করে থাকলে বা মুখে কিম্বা কথায় কষ্ট দিয়ে থাকলে তার থেকে মাফ করিয়ে নিতে হবে। কোন ফিতনার আশংকা না থাকলে উক্ত অন্যায় উল্লেখ পূর্বক ক্ষমা চাইতে হবে, অন্যথায় অন্যায় উল্লেখ করা ছাড়াই ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। তার মধ্যেও ফেতনার আশংকা থাকলে শুধু আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিবে। নেক কাজ করবে এবং দান সদকা করবে। আর হকদার ব্যক্তি মৃত হলে তার উদ্দেশ্যে কিছু সদকা করে দিবে।

বিঃ দ্রঃ উপরোল্লিখিত পাঁচটি বিষয় পূর্ণ করা ব্যতীত শুধু গতানুগতিকভাবে মুখে তওবা/এস্তেগফারের বাক্য আওড়ালেই তওবা হয়ে যায় না। যদিও শুধু তওবার বাক্য মুখে আওড়ানোটাও ফায়দা থেকে খালি নয়।

কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে করণীয় আমল সমূহ

* কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে মিসওয়াক করে নেয়া উত্তম।

* কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে উযূ করে নেয়া উত্তম, আর কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে হলে উযূ করে নেয়া জরুরী।

* ভাল পোশাক পরিধান করে খুশবু মেখে এবং পরিপাটি হয়ে তিলাওয়াতে বসা আদব। (شرعة الاسلام)

* কেবলা মুখী হয়ে বসে (হেলান বা টেক না দিয়ে) তিলাওয়াত করা আদব (شرعة الاسلام)

* এখলাসের সাথে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করতে হবে।

* তিলাওয়াতের সময় এই মনোভাব জাগ্রত রাখবে যে, সে মহান আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করছে, আল্লাহর সাথে তার একান্ত কথাবার্তা হচ্ছে, আল্লাহ তাকে দেখছেন। (كتاب الاذكار)

* খুশু-খুযু ও বিনয়ের সাথে তিলাওয়াত করা উত্তম। (ঐ)

* আমলের নিয়তে তিলাওয়াত করবে।

* কুরআনের বিষয় বস্তুর প্রতি খেয়াল ও চিন্তা সহকারে তিলাওয়াত করা উত্তম। তবে কেউ না বুঝে পড়লেও তার তিলাওয়াত অর্থহীন নয়। কেউ যদি বলে যে, না বুঝে পড়লে কোন লাভ নেই, তাহলে সে ব্যক্তি মূর্খ বা বে-দ্বীন। কেননা, কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারা নিম্নোক্ত ফায়দা গুলো সর্বাবস্থায় লাভ হয়ে থাকে। (১) তিলাওয়াতের দ্বারা দেলের জং (গুনাহের কালিমা) মুছে যায়। (২) কুরআন তিলাওয়াত করলে প্রতি হরফে অন্ততঃ ১০টা নেকী অর্জন হয়। (৩) কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা আল্লাহর মহব্বত বাড়ে।

* তিলাওয়াতের শুরুতে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম" ও "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম" বলা ওয়াজিব। তিলাওয়াতের মধ্যে কোন নতুন সূরা আসলে তার শুরুতে শুধু বিসমিল্লাহ বলবে সূরা তাওবা ব্যতীত, তবে তওবা থেকেই তিলাওয়াত শুরু করলে তখন বিসমিল্লাহ বলবে। সূরা তওবার শুরুতে আউযু বিল্লাহি মিনান্নারি-- যে দুআটি পড়ার রেওয়াজ রয়েছে এ দুআটির কোন প্রমাণ নেই।

* তাজবীদ ও তারতীল সহকারে তিলাওয়াত করা। তাজবীদ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন ৫৭৫ পৃষ্ঠা

* দরূদ এবং ওয়াজ্দ (মহব্বত) এর স্বরে তিলাওয়াত করবে।

* রোদন বা রোদনের ভঙ্গি সহকারে তিলাওয়াত করা উত্তম। (كتاب الاذكار)

* সুন্দর আওয়াজে তিলাওয়াত করা উত্তম। সুন্দর আওয়াজ বলতে বুঝায় এমন স্বরে তিলাওয়াত করা যেন শ্রবণকারী বুঝতে পারে যে, সে আল্লাহর ভয় নিয়ে তিলাওয়াত করছে। (شرعة الاسلام)

* রিয়ার আশংকা থাকলে কিম্বা কোন নামাযী বা ঘুমন্ত ব্যক্তি প্রমুখের অসুবিধার আশংকা থাকলে নিম্ন স্বরে তিলাওয়াত করা উত্তম। অন্যথায় মধ্যম জোর আওয়াজে তিলাওয়াত করা উত্তম। (كتاب الاذكار)

* কুরআন শরীফ রেহাল/বালিশ প্রভৃতি উঁচু কিছুর উপর রেখে তিলাওয়াত করবে।

* কুরআন খতম হলে তখনই আবার শুরু থেকে কিছুটা আরম্ভ করে রাখা সুন্নাত

* কুরআন খতম করার প্রাক্কালে দুআ করা মোস্তাহাব। (كتاب الاذكار)

* তিলাওয়াতের শুরু বা শেষে কুরআনকে চুমু দেয়া বা চোখে মুখে ছোয়া লাগানো জায়েয। (خير الفتاوى ج / ١)

(নামাযের বাইরে) কুরআন পাঠের প্রাক্কালে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াতের পর নিম্নোক্ত বাক্য বলা বা নিম্নরূপ করা সুন্নাত/মোস্তাহাব।

কুরআনের আয়াত	সূরা	যা বলা/করা মোস্তাহাব
সূরা ফাতেহা শেষ করার পর		آمِين বলা
سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُوْنَ	বাকারাহ	উঁচু আওয়াজে পড়বে
সূরা বাকারাহ শেষ করার পর		آمِين বলা
اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّ هُمْ نَائِمُوْنَ	আ'রাফ	উঁচু আওয়াজে পড়বে
সূরা বানী ইসরাঈল শেষ করে		اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا পড়া
وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِلَّا اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا	মারইয়াম	উঁচু আওয়াজে পড়বে
প্রত্যেকটি فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ এর পর	আর-রহমান	وَلَا بِشَيْءٍ مِّنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ পড়া
اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ	ওয়াকেয়াহ	بَلٰى يَا رَبِّ তিন বার বলা
ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ	ওয়াকেয়াহ	بَلٰى يَا رَبِّ তিন বার বলা
ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ	ওয়াকেয়াহ	بَلٰى يَا رَبِّ তিন বার বলা

কুরআনের আয়াত	সূরা	যা বলা/করা মোস্তাহাব
اَاَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ	ওয়াকেয়াহ	بَلٰى يَا رَبِّ তিন বার বলা
সূরা ওয়াকেয়াহ শেষ করে		سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়া
اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ ... الخ	হাদীদ	بَلٰى يَا رَبِّ বলা
সূরা মুলক শেষ করে		اَللّٰهُ يَاْتِيْنَا وَ هُوَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ পড়া
সূরা হাক্কাহ শেষ করে		سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়া
اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى	কেয়ামাহ	بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا	দাহর	اَيْ وَ عِزَّتِكَ বলা
فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ	মুরসালাত	اٰمَنَّا بِاللّٰهِ বলা
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى	আ'লা	سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى পড়া
فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَ تَقْوٰهَا	শামস	اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِيْ تَقْوٰهَا وَ زَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلٰهَا পড়া
সূরা وَ الضُّحٰى থেকে نَاس পর্যন্ত প্রত্যেক সূরা শেষে		لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ এবং এর সংগে اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ বলা
اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ	ত্বীন	بَلٰى وَ اَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ	এখলাস	اَنْتَ اللّٰهُ اَحَدٌ
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ	ফালাক	اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ	নাস	اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

কুরআনের আদব ও আযমত সম্পর্কিত আরও কয়েকটি বিধান

* পড়ার অযোগ্য ছেড়া ফাটা পুরাতন কুরআন শরীফ পবিত্র কাপড়ে পেঁচিয়ে দাফন করে দেয়া উত্তম। (فتاوی محمودیہ ج ۱)

* ভুলে কুরআন শরীফ পড়ে গেলে তওবা এস্তেগফার করে নিবে। (ایضا) এর জন্য কুরআনের ওজনে কোন কিছু দান করা জরুরী বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে তা ভুল।

* কুরআন শরীফ বরাবর রাখা থাকলে সে দিকে পা ছড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে কুরআন শরীফ উচুঁতে থাকলে সেদিকে পা ছড়িয়ে দেয়াতে অসুবিধা নেই। (فتاوی محمودیہ ج ۱)

* গ্রামোফোন হল ক্রিড়া কৌতুকের উপকরণ, তাই তাতে কুরআন তিলাওয়াত রেকর্ড করা নিষিদ্ধ। পয়সার বিনিময়ে তিলাওয়াত রেকর্ড করা জায়েয নয়। এরূপ রেকর্ড বিক্রি করাও নিষিদ্ধ। (فتاوی محمودیہ ج ۱)

* রেকর্ড করার জন্য টেপরেকর্ডে তিলাওয়াত বা ওয়াজ করা জায়েয। টেপরেকর্ড থেকে তিলাওয়াত বা ওয়াজ শোনাও জায়েয। (آلات جدیدہ کے شرعی احکام)

* রেডিওতে কুরআন তিলাওয়াত কালামুল্লাহ (আল্লাহর কালাম)-এর আযমতের খেলাফ। (فتاوی محمودیہ ج ۲)

* মুফতী শফী সাহেব (রহঃ) রেডিওতে তিলাওয়াতকে জায়েয বলেছেন তবে হাটে-বাজারে, হোটেলে, দোকানে ইত্যাদি নানাবিধ ব্যস্ততা ও আমোদ-প্রমোদের মজলিসে- যেখানে কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি লক্ষ্য দেয়া হয় না—এরূপ স্থানে রেডিও, টেপের তিলাওয়াত শুনানোকে বে—আদবী ও নাজায়েয বলেছেন। (آلات جدیدہ کے شرعی احکام)

তাজবীদের বয়ান

প্রত্যেকটা হরফ-কে সঠিক মাখরাজ থেকে পূর্ণ ছিফাত সহকারে আদায় করাকে তাজবীদ বলে। তাজবীদ রক্ষা করে কুরআন পাঠ করা ফরয। (غنیۃ القاری) হরফের মাখরাজ ও ছিফাত সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা পেশ করা হল। উল্লেখ্য, শুধু এসব বর্ণনা দেখে কুরআন সহীহ শুদ্ধ ভাবে পাঠ করা সম্ভব নয়। যিনি সহীহ শুদ্ধ ভাবে কুরআন পাঠ করতে পারেন—এরূপ লোকের নিকট মশ্‌ক করা ব্যতীত কুরআন সহীহ শুদ্ধ ভাবে পাঠ শিক্ষা করা যায় না। এখানে প্রয়োজনে নিয়ম কানুন দেখে নেয়ার সুবিধার জন্যই প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন লিখে দেয়া হল।

মাখরাজের বর্ণনা

হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে। আরবী হরফ ২৯টি। এই ২৯টি হরফ উচ্চারণের স্থান তথা মাখরাজ ১৭টি।

১. নাম্বার মাখরাজ ঃ হলকের শুরু থেকে ه - ء

২. নাম্বার মাখরাজ ঃ হলকের মধ্যখান থেকে ح - ع

৩. নাম্বার মাখরাজ ঃ হলকের শেষ ভাগ থেকে خ - غ

৪. নাম্বার মাখরাজ ঃ জিহ্বার গোড়াকে তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে - ق

৫. নাম্বার মাখরাজ ঃ জিহ্বার গোড়া থেকে একটু আগে বেড়ে তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে ك

৬. নাম্বার মাখরাজ ঃ জিহ্বার মধ্যখানকে তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে ج - ش - ى

৭. নাম্বার মাখরাজ ঃ জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ীর দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে ض

৮. নাম্বার মাখরাজ ঃ জিহ্বার আগার কিনারা তার বরাবর উপরের দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে ل

৯. নাম্বার মাখরাজ ঃ জিহ্বার আগাকে তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ن

১০. নাম্বার মাখরাজ ঃ জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ر

১১. নাম্বার মাখরাজ ঃ জিহ্বার আগাকে সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে ط - د - ت

১২. নাম্বার মাখরাজ ঃ জিহ্বার আগাকে সামনের নীচের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে ص - س - ز

১৩. নাম্বার মাখরাজ ঃ জিহ্বার আগাকে সামনের উপরের দুই দাতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে ظ - ذ - ث

১৪. নাম্বার মাখরাজ ঃ নীচের ঠোটের পেটে সামনের উপরের দুই দাঁতের আগা লাগিয়ে ف

১৫. নাম্বার মাখরাজ ঃ দুই ঠোঁট হতে و - م - ب

ب এবং م উচ্চারণের সময় উভয় ঠোঁট মিলে যায় আর و উচ্চারণের সময় দুই ঠোঁট গোল হয়ে মধ্যখানে ছিদ্র হয়ে যায়।

১৬. নাম্বার মাখরাজ ঃ মুখের খালি জায়গা থেকে মদের হরফ পড়া যায়। যেমন بَا - بُوْ - بِیْ

১৭. নাম্বার মাখরাজ ঃ নাকের বাঁশী হতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়। যেমন اَنَّ - اَنْتَ

ছিফাতের বর্ণনা

* হরফের গুণাবলী বা উচ্চারণের অবস্থাকে ছিফাত বলে। যেমন উচ্চারণের সময় নরম হওয়া বা শক্ত হওয়া ইত্যাদি। এর মধ্যে কতক ছিফাত এমন আছে যা ছাড়া হরফ হরফই হয়না বা এক হরফ অন্য হরফ থেকে পৃথক হয়না বা আরবদের ন্যায় উচ্চারণ হয়না– এরূপ আবশ্যকীয় ছিফাত (صفات ذاتيه / لا لازمة / مميزه) ১৮টি। যথা ঃ

(১) হাম্‌ছ ঃ (همس) অর্থাৎ, এমন নরম করে আদায় করা যাতে শ্বাস জারী থাকে এবং আওয়াজে এক ধরনের পস্তী বা দুর্বলতা মনে হয়। হামছের হরফ ১০টি যথা ঃ فحثه شخص سكت যে হরফের মধ্যে এই ছিফাত পাওয়া যায় তাকে 'মাহ্‌মূছা' বলে।

(২) জিহ্‌র ঃ (جهر) এই ছিফাত হল হামছ্‌ এর বিপরীত অর্থাৎ, যা এমন শক্তভাবে আদায় করা হয় যে, আওয়াজ ও শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। যে হরফের মধ্যে এই ছিফাত পাওয়া যায় তাকে 'মাজহূরা' বলে। হামছের ১০টি হরফ ব্যতীত অন্য হরফগুলোতে এই ছিফাত পাওয়া যায়।

(৩) শিদ্দাত ঃ (شدت) অর্থাৎ, এমন শক্তভাবে আদায় করা যাতে হরফে সাকিন করলে আওয়াজ থেমে যায়। এর হরফ ৮টি যথা ঃ اجد قط بكت যে হরফের মধ্যে এই ছিফাত পাওয়া যায় তাকে 'শাদীদাহ' বলে। উল্লেখ্য, জিহ্‌র-এর মধ্যে আওয়াজ বন্ধ হয় স্বয়ং হরফের কারণে আর শিদ্দাত-এর মধ্যে আওয়াজ বন্ধ হয় আওয়াজের শক্তির কারণে।

(৪) রিখ্‌ওয়াত ঃ (رخوت) এই ছিফাত হল শিদ্দাত-এর বিপরীত। অর্থাৎ, যা এমন নরম ভাবে আদায় করা হবে যে, হরফে সাকিন করলে আওয়াজ জারী

থাকবে। যে হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায় তাকে 'রাখওয়াহ' (رخوه) বলে। শাদীদাহ ও মুতাওয়াছ্ছিত ব্যতীত অন্যান্য হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায়।

(৫) তাওয়াচ্ছুত ঃ (توسط) শিদ্দাত ও রিখওয়াত-এর মাঝামাঝি হল তাওয়াচ্ছুত। অর্থাৎ, যা উচ্চারণের সময় আওয়াজ একেবারেও বন্ধ হবেনা বা বেশীক্ষণ জারীও থাকবে না। যে হরফের মধ্যে এই ছিফাত পাওয়া যায় তাকে 'মুতাওয়াচ্ছিত' বলে। এর হরফ ৫টি যথা ঃ لن عمر

(৬) **ইস্তি'লা** ঃ (استعلاء) অর্থাৎ, যা আদায় করার সময় জিহ্বার গোড়া তালুর দিকে উঠে যায়– যার কারণে হরফ মোটা হয়ে উচ্চারিত হয়। এর হরফ ৭টি যথা ঃ خص ضغط قظ যে হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায় তাকে 'মুস্তা'লিয়া' বলে।

(৭) **ইস্তিফাল** ঃ (استفال) এই ছিফাতটি ইস্তি'লা-র বিপরীত অর্থাৎ, যা আদায় করার সময় জিহ্বার গোড়া তালুর দিকে উঠে না। ইস্তি'লার ৫টি হরফ ব্যতীত অবশিষ্ট হরফে এই ছিফাত রয়েছে। যে হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায় তাকে 'মুস্তাফিলাহ' বলে।

(৮) **ইত্বাক্ব** ঃ (اطباق) অর্থাৎ, যা আদায় করার সময় জিহ্বার মধ্যখান উপরের তালুর সাথে মিলিত হয়। ص ض ط ظ এই চারটি হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায়। যে হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায় তাকে 'মুতবাক্বাহ' বলে।

(৯) **ইনফিতাহ** ঃ (انفتاح) অর্থাৎ, যা আদায় করার সময় জিহ্বার মধ্যখান উপরের তালু থেকে পৃথক থাকে (ইত্বাক্ব এর বিপরীত) যে হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায় তাকে 'মুনফাতিহাহ' বলে। ইতবাক্ব-এর ৪টি হরফ ব্যতীত অবশিষ্ট সব হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায়।

(১০) **ইয্‌লাক্ব** ঃ (اذلاق) অর্থাৎ, জিহ্বা ও ঠোটের কিনারা থেকে সহজে দ্রুত আদায় হয়ে যাওয়া। ৬টি হরফের মধ্যে এই ছিফাত পাওয়া যায়। যথা ঃ فرمن لب এই ছিফাত যুক্ত হরফকে 'মুয্‌লাক্বাহ' বলা হয়।

(১১) **ইস্‌মাত** ঃ (اصمات) ইসমাত ইযলাকের বিপরীত। ইযলাকের ৬টি হরফ ব্যতীত অবশিষ্ট হরফের মধ্যে ইসমাত ছিফাত পাওয়া যায়। সেগুলোকে 'মুসমাতাহ' বলা হয়।

(১২) **সাফীর** ঃ (صفير) অর্থাৎ, সিটির ন্যায় তেজ আওয়াজ বের হওয়া। তিনটি হরফের মধ্যে এই ছিফাত পাওয়া যায়। যথা ঃ ز س ص এই হরফ গুলোকে 'সাফীরিয়্যাহ' বলা হয়।

(১৩) **ক্বাল্ক্বালাহ** ঃ (قلقلة) এর হরফ পাঁচটি। ق ط ب ج د এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। এই হরফগুলোকে 'হুরূফে ক্বালক্বালাহ' বলা হয়।

(১৪) **লীন** ঃ (لين) অর্থাৎ, মাখরাজ থেকে এমন নরম ভাবে আদায় করা যে, তার উপর মদ করতে চাইলে করা যায়। و সাকিন বা ى সাকিনের পূর্বে যবর থাকলে সে দুটো লীনের হরফ বলে গণ্য হয়। এই হরফগুলোকে 'হুরূফে লীন' বলা হয়।

(১৫) **ইন্হিরাফ** ঃ (انحراف) অর্থাৎ, ঝুঁকে যাওয়া। এর হরফ দুইটি ل এবং ر - লাম আদায় করার সময় জিহ্বার কিনারা এবং ر আদায় করার সময় জিহ্বার পিঠের দিকে এবং কিছুটা লামের স্থানের দিকে ঝোক পাওয়া যায়। এই হরফগুলোকে 'মুনহারিফাহ' বলা হয়।

(১৬) **তাকরীর** ঃ (تكرير) অর্থাৎ, উচ্চারণের সময় জিহ্বায় একটা কাঁপুনির মত হওয়া। এক মাত্র ر হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায়। ছিফাতটিকে তাকরার (تكرار) ও বলা হয়।

(১৭) **তাফাশ্শী** ঃ (تفشى) অর্থাৎ উচ্চারণের সময় মুখের ভিতর আওয়াজ ছড়িয়ে পড়া। একমাত্র ش হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায়।

(১৮) **ইস্তিত্বালাত** ঃ (استطالت) অর্থ দীর্ঘ হওয়া। একমাত্র ض হরফে এই ছিফাত পাওয়া যায়। ض উচ্চারণের সময় জিহ্বার পার্শ্বের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আওয়াজ দীর্ঘায়িত হয়ে থাকে। এই হরফকে 'মুস্তাত্বীলাহ' বলা হয়।

১৮টি ছিফাতের মধ্যে কোন্ কোন্ হরফে কি কি ছিফাত পাওয়া যায় তার একটি নকশা

হরফ	যে যে ছিফাত পাওয়া যায়
ا	জিহ্‌র, রিখওয়াত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ,
ب	জিহ্‌র, শিদ্দাত, ইস্তিফাল, ইনফিতাহ ও ক্বালক্বালাহ
ت	হামছ, শিদ্দাত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ
ث	হামছ, রিখওয়াত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ
ج	জিহ্‌র, শিদ্দাত, ইস্তিফাল, ইনফিতাহ ও ক্বালক্বালাহ
ح	হামছ, রিখওয়াত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ
خ	হামছ, রিখওয়াত, ইস্তি'লা ও ইনফিতাহ
د	জিহ্‌র, শিদ্দাত, ইস্তিফাল, ইনফিতাহ ও ক্বালক্বালাহ
ذ	জিহ্‌র, রিখওয়াত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ
ر	জিহ্‌র, তাওয়াস্সুত, ইস্তিফাল ইনফিতাহ ও তাকরীর
ز	জিহ্‌র, রিখওয়াত, ইস্তিফাল ও ছফীর
س	হামছ, রিখওয়াত, ইস্তিফাল ইনফিতাহ ও ছফীর
ش	হামছ, রিখওয়াত, ইস্তিফাল, ইনফিতাহ ও তাফাশ্‌শী
ص	হামছ, রিখওয়াত, ইস্তি'লা, ইতবাক ও ছফীর
ض	জিহ্‌র, রিখওয়াত, ইস্তি'লা, ইতবাক্ব ও ইস্তিত্বালাত
ط	জিহ্‌র, শিদ্দাত, ইস্তি'লা, ইতবাক্ব ও ক্বালক্বালাহ
ظ	জিহ্‌র, রিখওয়াত, ইস্তি'লা ও ইতবাক্ব
ع	জিহ্‌র, তাওয়াস্সুত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ
غ	জিহ্‌র, রিখওয়াত ইস্তি'লা ও ইনফিতাহ
ف	হামছ, রিখওয়াত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ
ق	জিহ্‌র, শিদ্দাত, ইস্তি'লা, ইনফিতাহ ও ক্বালক্বালাহ
ك	হামছ, শিদ্দাত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ
ل	জিহ্‌র, তাওয়াস্সুত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ
م	জিহ্‌র, তাওয়াস্সুত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ
ن	জিহ্‌র, তাওয়াস্সুত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ
و	জিহ্‌র, রিখওয়াত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ
ه	হামছ, রিখওয়াত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ
ء	জিহ্‌র, শিদ্দাত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ
ى	জিহ্‌র, রিখওয়াত, ইস্তিফাল ও ইনফিতাহ

([illegible] থেকে গৃহীত)

* হরফের আর এক ধরনের ছিফাত রয়েছে যা রক্ষা করলে হরফের সৌন্দর্য ও খুবী রক্ষা হয়। এ ধরনের ছিফাতকে "সৌন্দর্য সূচক গুনাবলী" (صفات محليه/ مزينه/ محسنه/ عارضية) বলে। এ ধরনের ছিফাত সব হরফের মধ্যে নেই বরং আটটি হরফের মধ্যে রয়েছে। যথা ঃ

(১) ل (২) ر (৩) সাকিন বা তাশদীদ যুক্ত م

(৪) সাকিন বা তাশদীদ যুক্ত نْ কিম্বা তানবীন যুক্ত ن

৫) আলিফ; যার পূর্বে যবর থাকে।

(৬) و সাকিন; যার পূর্বে পেশ থাকে।

(৭) ى সাকিন যার পূর্বে যের থাকে।

(৮) ء (হামযা)। এই হরফগুলোর প্রকারের ছিফাত কতকটা উস্তাদের নিকট পড়া শিখলেই এসে যায় আর কতক গুলো সামনে বর্ণিত এসব হরফের সাথে সংশ্লিষ্ট গুন্নাহ, মদ, পূর/বারীক ইত্যাদি সম্পর্কিত নিয়ম-নীতি পালনের মাধ্যমে এসে যাবে।

নূন সাকিন/তানবীনকে পড়ার নিয়ম

نْ - একে নূন সাকিন বলে।

দুই যবর, দুই যের, দুই পেশ্‌কে তানবীন বলে।

নূন সাকিন ও তানবীনকে পড়ার চারটি নিয়ম। যথা ঃ

(১) **কল্‌ব/ইক্‌লাব** ঃ কলব/ ইকলাব অর্থ পরিবর্তন করে পড়া। কলবের একটি হরফ ب - নূন সাকিন বা তানবীনের পর কলবের হরফ আসলে নূন সাকিন ও তানবীন (উচ্চারণ করতে যে নূন হয় সেটা)-কে م দ্বারা পরিবর্তন করে পড়তে হবে এবং গুন্নাহও হবে। যেমন–

مِنْ بَعْدُ ـ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ـ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ ـ رَجْعٌ بَعِيْدٌ

(২) **ইদ্‌গাম** ঃ ইদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া। ইদগামের হরফ ৬টি ى ـ ر ـ م ـ ل ـ و ـ ن এর মধ্যে ى ـ م ـ و ـ ن এই চারটি ইদগামে বাগুন্নাহ-র হরফ এবং ر ـ ل এই দুইটি ইদগামে বেলাগুন্নাহ-র হরফ। নূন সাকিন বা তানবীনের পর ইদগামে বাগুন্নাহ-র হরফ আসলে সেই হরফে তাশদীদ দিয়ে মিলিয়ে পড়তে হবে এবং গুন্নাহও হবে। যেমন–

مَنْ يَّفْجُرُكَ ـ مِنْ مَّسَدٍ ـ مِنْ وَّرَى ـ مِنْ نِّعْمَةٍ ـ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

তবে একই শব্দে নূন সাকিনের পর ইদগামে বাগুন্নাহ-র হরফ আসলে গুন্নাহ হবে না এবং সেই হরফে তাশদীদ দিয়েও পড়া হবে না। একে 'এজহারে মুতলাক্ব' বলে। যেমন– صِنْوَانٌ - قِنْوَانٌ - بُنْيَانٌ - دُنْيَا

আর নূন সাকিন বা তানবীনের পর ইদগামে বেলাগুন্নাহ-র হরফ আসলে সেই হরফে তাশদীদ দিয়ে মিলিয়ে পড়া হবে তবে গুন্নাহ হবে না।

যেমন– اَنْ لَّا اِلٰهَ - مِنْ رَّبِّهِمْ

(৩) **ইজহার** ঃ ইজহার অর্থ স্পষ্ট করে (গুন্নাহ ছাড়া) পড়া। ইজহারের হরফ ৬টি– خ - غ - ح - ع - ه - ء নূন সাকিন বা তানবীনের পর ইজহারের হরফ আসলে নূন সাকিন/তানবীনকে স্পষ্ট করে গুন্নাহ ছাড়া পড়তে হয়। একে 'ইজহারে হালক্বী' বলে। যেমন–

مَنْ اَحْيَيْتَه - عَنْه - اَنْعَمْتَ - لِمَنْ حَمِدَه - مِنْ غَيْرِ - مِنْ خَوْفٍ - مُحَمَّدًا
عَبْدُه - غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ - اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ -

(৪) **ইখফা** ঃ ইখফা অর্থ লুকিয়ে পড়া। ইখফার হরফ ১৫টি ت - ث - ج - د - ذ - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ف - ق - ك - নূন সাকিন/ তানবীনের পর ইখফার হরফ আসলে নূন সাকিন/তানবীনকে লুকিয়ে পড়তে হয় অর্থাৎ জিহ্বা উপরের তালুতে না লাগিয়ে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। একে 'ইখফায়ে হাক্বীক্বী' বলে। যেমন–

اَمَنْتُ - مِنْ جُوْعٍ - عِنْدَكَ - اَنْزَلْنَاهُ - نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ - وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ -
كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

মীম সাকীনকে পড়ার নিয়ম

(জযম ওয়ালা মীমকে [যেমন مْ] মীম সাকিন বলে)

* মীম সাকিনকে পড়ার তিনটি নিয়ম। যথা ঃ

(১) মীম সাকিনের পরে ب থাকলে মীমকে ইখফা করে (অর্থাৎ গুন্নাহ সহকারে) পড়তে হয়। একে 'ইখফায়ে শাফাবী' বলে। যেমন–

قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ - عَلَيْكُمْ بِمُصَيْطِرٍ

(২) মীম সাকিনের পরে م থাকলে ইদগাম করে পড়তে হয় অর্থাৎ পরবর্তী মীমে তাশদীদ দিয়ে গুন্নাহ সহকারে পড়তে হয়। একে 'ইদগামে শাফাবী' বলে। যেমন– عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ۔ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا

(৩) মীম সাকিনের পরে ب এবং م ব্যতীত অন্য কোন হরফ আসলে ইজহার করে (অর্থাৎ মীমকে নাকে না নিয়ে গুন্নাহ ছাড়া) পড়তে হয়। একে 'ইজহারে শাফাবী' বলে। যেমন– لَمْ يَلِدْ۔ وَلَمْ يُوْلَدْ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

ওয়াজিব গুন্নাহর বিবরণ

* নূন (ن) বা মীমে (م) তাশদীদ থাকলে ঐ নূন ও মীমকে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। এই প্রকার গুন্নাহকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে। গুন্নাহর পরিমাণ এক আলিফ। (ادب القرآن، فیض مکیہ) এই প্রকারের গুন্নাহ আদায় করার সময় জিহ্বার আগার পিঠ উপরের তালুর সাথে লাগবে।

মদ-এর বিবরণ

* 'মদ' অর্থ লম্বা করা, টেনে পড়া। মদের হরফ তিনটি (১) আলিফ খালী; যার পূর্বে যবর থাকে। (২) ওয়াও সাকিন (و) যার পূর্বে পেশ থাকে। (৩) ى সাকিন যার পূর্বে যের থাকে।

১। মদের হরফের বামে সাকিন ও হামযা না থাকলে সেই মদের হরফকে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। এই প্রকার মদকে 'মদ্দে ত্ববায়ী' বলে। যেমন نُوْحِيْهَا উল্লেখ্য যে, এক আলিফ টানা অর্থ দুইটা হরকত উচ্চারণ করতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ টানা। কেউ কেউ বলেছেন একটা বন্ধ আঙ্গুল খুলতে বা একটা খোলা আঙ্গুল বন্ধ করতে যতটুকু সময় লাগে সেটাই হল এক আলিফ-এর পরিমাণ (غنية القاري و ادب القرآن)। যবর, যের ও পেশকে হরকত বলে।

২। খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টো পেশ-কে এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যেমন– الرَّحْمٰنُ۔ لَهٗ۔ بِهٖ এবং খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টো পেশ মদের হরফ এবং এটাও মদ্দে ত্ববায়ীর হুকুমে।

৩। মদের হরফের পরে আরযী সাকিন (অর্থাৎ ওয়াকফ বা থামার কারণে যে সাকিন হয়) থাকলে তাকে 'মদ্দে আরযী' বলে। এই প্রকার মদকে এক থেকে তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়া যায়। সবচেয়ে উত্তম তিন আলিফ টানা, তারপর দুই আলিফ, তারপর এক আলিফ। (جمال القرآن)

যেমন– رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ عَزِيْزُ الْغَفَّارْ۔ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

৪। মদের হরফের পরে একই শব্দের মধ্যে হামযা আসলে চার আলিফ বা তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। একে 'মদ্দে মুত্তাছিল' বলে।

যেমন- سَوَآءٌ - سُوْٓءٌ - شَآءَ

৫। মদের হরফের পরে ভিন্ন শব্দের শুরুতে হামযা আসলে চার আলিফ বা তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়; একে 'মদ্দে মুনফাছিল' বলে। তবে উক্ত মদের হরফের উপর যদি ওয়াকফ করা হয় এবং পরবর্তী শব্দকে পৃথক ভাবে পড়া হয় তাহলে সেটা মদ্দে মুনফাছিল হবে না। (ادب القرآن)

মদ্দে মুনফাছিলের উদাহরণ - اِنَّآ اَعْطَيْنَا - قَالُوْٓا اٰمَنَّا -

৬। দুই যবরের বামে ওয়াক্ফ করলে সেখানে এক যবর পড়তে হবে এবং এক আলিফ পরিমাণ টানতে হবে। যেমন وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا একে 'মদ্দে এওয়াজ' বলে।

৭। যবরের বামে و সাকিন বা যবরের বামে ى সাকিন থাকলে ঐ و এবং ى কে হরফে লীন বলে। হরফে লীনের পরে আর্যী সাকিন (অর্থাৎ ওয়াক্ফ বা থামার কারণে যে সাকিন হয় তা) থাকলে তাকে 'মদ্দে লীন' বলে। মদ্দে লীনে সবচেয়ে উত্তম এক আলিফ টানা, তারপর দুই আলিফ, তারপর তিন আলিফ। তবে এই তিন পদ্ধতির যেটাই গ্রহণ করবে কুরআনের শেষ পর্যন্ত সে ভাবেই করবে- একেক স্থানে একেক রকম করা ভাল নয়। (ادب القرآن) মদ্দে লীনের উদাহরণ যেমন- لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ - وَاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ -

৮। মদের হরফের পরে আস্লী সাকিন (অর্থাৎ, আর্যী সাকিন নয়) বা তাশদীদ থাকলে তাকে "মদ্দে লাযেম" বলে। মদ্দে লাযেম-কে চার আলিফ বা তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়। মদ্দে লাযেম চার প্রকার যথা ঃ

(ক) মদ্দে লাযেম কাল্মী মুছাক্কাল। অর্থাৎ, যদি মদের হরফের পর তাশদীদ থাকে, যেমন- دَآبَّةٍ - تَاْمُرُوْٓنِّيْ - ضَآلِّيْنَ -

(খ) মদ্দে লাযেম কাল্মী মুখাফফাফ। অর্থাৎ, যদি মদের হরফের পর সাকিন থাকে। যেমন- آٰلْئٰنَ

(গ) মদ্দে লাযেম হরফী মুছাক্কাল, অর্থাৎ, যদি হুরুফে মুকাত্তাআত (সূরার শুরুতে যেসব বিচ্ছিন্ন হরফ ব্যবহৃত হয়)-এর পর তাশদীদ থাকে।

যেমন- الٓمّٓ - طٰسٓمّٓ

(ঘ) মদ্দে লাযেম হরফী মুখাফ্‌ফাফ। অর্থাৎ, হুরুফে মুকাত্তাআত–এর শেষে যদি সাকিন হয় যেমন– يٓسٓ ۔ نٓ ۔ قٓ ۔

لْ এবং اللّٰه (আল্লাহ) শব্দ পড়ার নিয়ম

১. আল্লাহ (اللّٰه) শব্দের ডানে যবর বা পেশ যুক্ত হরফ থাকলে আল্লাহ শব্দের লামকে পুর করে (অর্থাৎ, মুখকে গোল করে) পড়তে হবে।

যেমন– اَللّٰهُمَّ ۔ اَرَادَ اللّٰهُ ۔ رَفَعَهُ اللّٰهُ

২. আল্লাহ (اللّٰه) শব্দের ডানে যের যুক্ত হরফ থাকলে আল্লাহ শব্দের লামকে বারীক করে (অর্থাৎ পুর করা ছাড়া) পড়তে হবে। যেমন– بِسْمِ اللّٰهِ

৩. আল্লাহ (اللّٰه) শব্দের লাম ব্যতীত অন্যান্য যত লাম আছে সব লামকে বারীক করে পড়তে হবে। যেমন– مَا وَلّٰهُمْ ۔ كُلَّهٗ ۔ اِنَّ الَّذِيْنَ

ر পুর কিম্বা বারীক পড়ার নিয়ম

* ر -এর উপর যবর বা পেশ থাকলে ر -কে পুর পড়তে হয়। যেমন رُبَمَا رَبَّكَ

* ر - এর নীচে যের থাকলে ر কে বারীক পড়তে হয়। যেমন رِجَالٌ

* তাশদীদ যুক্ত ر - কেও উপরোক্ত নিয়মে পুর বা বারীক পড়তে হবে, যেমন سِرًّا কে পুর এবং دُرِّيٌّ কে বারীক পড়তে হবে। তাশদীদ যুক্ত ر কে এক ر হিসেবে পড়তে হবে। অনেকে তাশদীদযুক্ত ر কে দুই ر ধরে প্রথমটা সাকিন এবং দ্বিতীয়টাকে হরকত যুক্ত ধরে পড়ে থাকেন– এটা ভুল। (جمال القرآن)

* ر -এর উপর সাকিন থাকলে তার পূর্বের হরফকে দেখতে হবে; যদি পূর্বের হরফে যবর বা পেশ থাকে তাহলে ر কে পুর পড়তে হবে। যেমন بَرْقٌ ۔ يُرْزَقُوْنَ ۔ قُرْاٰن আর পূর্বের হরফে যের থাকলে ر কে বারীক পড়তে হবে। যেমন تُنْذِرْهُمْ তবে তিন ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে–

(১) পূর্বের যের ও ر – ভিন্ন ভিন্ন শব্দে হলে –ر কে পুর পড়তে হবে।

যেমন رَبِّ ارْجِعُوْنَ ۔ اَمِ ارْتَابُوْا

(২) এমনিভাবে ر সাকিন পূর্বে যের থাকা সত্ত্বেও যদি ر -এর পরে خص ضغط قظ -এই সাতটি বর্ণের কোন একটি থাকে তাহলেও ر কে পুর পড়তে হবে। যেমন قِرْطَاسٌ ۔ اِرْصَادٌ ۔ فِرْقَةٌ ۔ مِرْصَادٌ – (কুরআনে এই নিয়মের মাত্র এই চারটি শব্দই পাওয়া যায়) সূরা শুআরার فِرْقٍ শব্দটি উভয় রকম পড়া যায়।

(৩) ر - সাকিনের পূর্বের যের যদি আসলী না হয়– আরযী হয়, তাহলেও ر কে পুর পড়তে হবে যেমন – اِرْجِعِىْ - اِنِ ارْتَبْتُمْ তবে আরবী গ্রামার জানা ব্যতীত এরূপ যের চেনা মুশকিল, তাই কোথাও সন্দেহ হলে জানা লোকদের থেকে জেনে নিতে হবে।

* ر - সাকিনের পূর্বের হরফের উপরও যদি সাকিন থাকে (এরূপ অবস্থা ওয়াকফের সময় হয়ে থাকে) তাহলে তার পূর্বের হরফের হরকত দেখতে হবে– যদি যবর বা পেশ থাকে তাহলে ر - কে পুর পড়তে হবে। আর যের থাকলে ر -কে বারীক পড়তে হবে। যেমন اَلْقَدْرُ - اَلْعُسْرِ - اَلْغَفَّارُ শব্দে ر পুর এবং اَلذِّكْرُ শব্দে ر বারীক পড়তে হবে। তবে ر - সাকিনের পূর্বে যদি ى সাকিন হয় তাহলে তখন ى -এর পূর্বের হরকত দেখা হবে না বরং তখন সর্বাবস্থায় ر -কে বারীক পড়তে হবে যেমন بَصِيْرٌ - خَيْرٌ আর ر - সাকিনের পূর্বের সাকিন যুক্ত হরফ خص ضغط قظ এই সাতটির কোন একটি হলে সেই ر -কে পুর বা বারীক উভয় রকম পড়া যায়। তবে مِصْرَ শব্দের ر - কে পুর পড়া উত্তম এবং عَيْنَ الْقِطْرِ ও اِذَا يَسْرِ শব্দ দ্বয়ের ر - কে বারীক পড়া উত্তম। (ادب القرآن)

ক্বলক্বলার আহকাম

* ق - ط - ب - ج - د এই পাঁচটি হরফে সাকিন থাকলে বা এর উপর ওয়াকফ করলে ক্বলক্বলা করতে হয়। ক্বলক্বলা অর্থ ধাক্কা লাগা এবং আওয়াজ জোর হওয়া। ওয়াকফের অবস্থায় ক্বলক্বলা একটু বেশী প্রকাশ করতে হবে এবং কিছুটা যবরের ভাব প্রকাশ করতে হবে (পুরো যবর উচ্চারণ নয়) যেমন حِسَابْ - شَدِيْدْ আর মধ্যবর্তী স্থানে সাকিন হওয়ার কারণে হলে ক্বলক্বলা হালকা হবে এবং যবরের ভাব প্রকাশ পাবে না। (نزهة القارى)

সাক্তাহ্ -এর বর্ণনা

(পড়ার সময় থামতে হবে কিন্তু শ্বাস ছাড়া যাবে না– একে সাক্তাহ্ বলা হয়)

* কুরআন শরীফে ৪ জায়গায় সাক্তাহ্ করতে হয়। যথা ঃ

(১) সূরা কাহ্ফ-এর শুরুতে عِوَجًا শব্দের আলিফ-এর উপর।

(২) সূরা ইয়াছীন-এর مِنْ مَّرْقَدِنَا শব্দের আলিফ এর উপর।

(৩) সূরা ক্বিয়ামাহ-এর مَنْ رَاقٍ এর مَنْ -এর নূন -এর উপর।

(৪) সূরা মুতাফফিফীন-এর بَلْ رَانَ এর بَلْ শব্দের লামের উপর।

ওয়াক্ফ বা থামার নিয়মনীতি

* কুরআন শরীফে যেখানে যে ওয়াকফের চিহ্ন রয়েছে সেই চিহ্ন অনুযায়ী আমল করতে হবে। ওয়াক্ফের চিহ্নাদি সম্পর্কে পরবর্তী পরিচ্ছেদ দেখুন।

* যেখানে ওয়াক্ফের কোন চিহ্ন নেই সেখানে শ্বাস নিতে বাধ্য হওয়ার কারণে থামতে হলে শব্দের শেষ হরফে সাকিন দিয়ে থামতে হবে, তারপর আবার পড়ার সময় সেই শব্দ বা আরও দুই এক শব্দ পেছন থেকে মিলিয়ে নিয়ে পড়তে হবে।

* যে শব্দের উপর ওয়াক্ফ করা হবে তার শেষ হরফে গোল তা (ة) ব্যতীত অন্য কোন হরফে দুই যবর থাকলে এক যবর পড়তে হবে এবং শেষে একটা আলিফ যোগ করে (অনেক স্থানে আলিফ লেখা থাকে) এক আলিফ টেনে পড়তে হবে। যেমন وَإِنْ كُنَّ نِسَآءً -এর উপর ওয়াক্ফ করলে পড়তে হবে। وَإِنْ كُنَّ نِسَآءً

* যে শব্দে ওয়াকফ করা হবে তার শেষে গোল তা (ة) থাকলে ওয়াকফের সময় ঐ গোল তা-কে হা (ه) পড়তে হবে।

* হরকত যুক্ত হরফের উপর ওয়াক্ফ করলে একটি নিয়ম হল শেষের হরফকে সাকিন দিয়ে পড়া, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও দুইটি নিয়ম রয়েছে–

(১) শেষ অক্ষরের হরকতকে খুব হালকা ভাবে প্রকাশ করতে হবে অর্থাৎ, সেই হরকতের এক তৃতীয়াংশ উচ্চারণ হবে এবং এমন ভাবে উচ্চারণ হবে যেন শুধু নিকটের লোকেরাই শুনতে পারে। এরূপ করাকে 'রূম' (روم) বলে। শেষ হরফে যের বা পেশ থাকলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে–যবর থাকলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

(২) শেষ হরফে সাকিন করা হবে তবে আওয়াজ বন্ধ হওয়ার পর ঠোটের ইশারায় শেষ হরকত প্রকাশ করা হবে।এরূপ করাকে এশমাম (اشمام) বলে। শেষ হরফে পেশ থাকলেই কেবল এশমাম করা হয়– যবর বা যের থাকলে এশমাম করা যাবে না।

* তাশদীদ যুক্ত হরফের উপর ওয়াক্ফ করলে মাখরাজের উপর একটু বিলম্ব করতে হবে যাতে দুই হরফ বোঝা যায়। যেমন مُسْتَقَرٌّ - وَتَبَّ

ওয়াক্ফের চিহ্ন সমূহ

১। ◯ আয়াতের শেষে এরূপ চিহ্ন থাকে। এ-কে ওয়াক্ফে তাম বলে। এরূপ চিহ্নিত স্থানে ওয়াক্ফ করতে হবে। কিন্তু ওয়াক্ফে তাম-এর উপর অন্য কোন চিহ্ন থাকলে (যেমন م - ط - ج - ز - ص ......) সেই চিহ্ন অনুসরণ করতে হবে।

২। م - এই চিহ্নকে 'ওয়াকফে লাযেম' বলে। এরূপ স্থানে ওয়াকফ না করলে অর্থ বিগড়ে যেতে পারে; তাই ওয়াকফ করা দরকার।

৩। ط - এই চিহ্নকে 'ওয়াকফে মুতলাক' বলে। এখানে ওয়াকফ করা উত্তম– ওয়াকফ না করা ভাল নয়।

৪। ج এই চিহ্নকে 'ওয়াকফে জায়েয' বলে। এখানে ওয়াকফ করা না করা উভয়ই জায়েয তবে ওয়াকফ না করা ভাল।

৬। ص - এই চিহ্নকে 'ওয়াক্ফে মুরাখ্খাছ' বলে। এরূপ স্থানে পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়া ভাল। তবে নিঃশ্বাস শেষ হয়ে গেলে ওয়াক্ফের অনুমতি আছে।

৭। قف - এই চিহ্নকে 'ওয়াকফে আমর' বলে। ইহা ওয়াক্ফ করার জন্য নির্দেশ করে।

৮। ق - এই চিহ্নকে 'ক্বীলা আলাইহি ওয়াক্ফুন' বলে। অর্থাৎ কেউ কেউ এখানে ওয়াক্ফ আছে বলেন আবার কেউ কেউ ওয়াক্ফ না করার কথা বলেন। এখানে ওয়াক্ফ না করা ভাল।

৯। لا - একে 'লা ওয়াক্ফা আলাইহি' বলে। এখানে ওয়াক্ফ না করার হুকুম।

১০। صل - একে 'ক্বাদ ইউছালু' বলে। অর্থাৎ কোন কোন সময় এতে ওয়াক্ফ করা হয় আবার কখনও মিলিয়ে পড়া হয় কিন্তু ওয়াক্ফ করাই উত্তম।

১১। صلے - একে 'আল-ওয়াছ্লু আওলা' বলে। এখানে মিলিয়ে পড়া উত্তম। ওয়াক্ফ করলেও ক্ষতি নেই।

১২। سكتہ - একে 'সাক্তাহ' বলে। সাক্তাহ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

১৩। وقفہ- এখানে সাক্তার চেয়ে একটু বেশী সময় থামতে হয়, তবে শ্বাস ছাড়া যাবে না।

১৪। ∴ ∴ - এই চিহ্নকে 'মুআনাকা' বলে। এই চিহ্ন শব্দ বা বাক্যের ডানে ও বামে দুই পার্শ্বে আসে। পড়ার সময় প্রথম জায়গায় ওয়াক্ফ করলে অপর জায়গায় মিলিয়ে পড়তে হবে। কুরআন শরীফের পার্শ্বে এরূপ স্থানে مع বা معانقه লেখা থাকে।

১৫। وقف النبى صـ - এখানে ওয়াক্ফ করা অতি উত্তম।

১৬। وقف غفران - এখানে ওয়াক্‌ফ করলে গোনাহ মাফ হয়।

১৭। وقف جبرائيل - এখানে ওয়াক্‌ফ করা বরকতপূর্ণ।

উল্লেখ্য, যেখানে একই স্থানে উপর নীচে দুইটি ওয়াক্‌ফের চিহ্ন থাকে, সেখানে উপরের চিহ্নটা অনুসরণ করা হবে।

যেসব স্থানে লেখা হয় এক রকম পড়তে হয় অন্য রকম

* ১২শ পারার ৪র্থ রুকূতে যে مَجْرٖهَا শব্দটি আছে তাকে মাজরীহা পড়া যাবে না বরং মাজরেহা পড়তে হবে।

* ২৬শ পারার সূরা হুজুরাতের ২য় রুকুতে যে بِئْسَ الْاِسْمُ রয়েছে তাকে এভাবে পড়তে হবে بِئْسَ لِسْمُ

* কুরআন শরীফের যত স্থানে اَنَا শব্দ আছে (অর্থঃ আমি) সেখানে আলিফ পড়া হবে না অর্থাৎ, নূনে মদ হবে না। তবে চার স্থানে اَنَا -তে মদ হবে।

যথা ঃ اَنَا بِىْ ـ اَنَا مِلَ ـ اَنَا بِوْ ـ اَنَا بَا

* يَبْصُطُ ও بَصْطَةً শব্দের ص -এর উপরে সাধারণতঃ একটা ছোট س লেখা থাকে। এই س লেখা থাকুক বা না থাকুক এখানে ص পড়া হবে না বরং س পড়া হবে।

* ৪র্থ পারার اَفَائِنْ مَّاتَ শব্দের ف - এর পরের আলিফ পড়া হবে না– পড়তে হবে এরূপ اَفَئِنْ

* ৪র্থ পারার لَا اِلَى اللّٰهِ -এর ۷ এর আলিফ পড়া হবে না। পড়তে হবে এরূপ لَ اِلَى اللّٰهِ

* ৬ষ্ঠ পারার اَنْ تَبُوْءَا শব্দে হামযার পরের আলিফ পড়া হবে না।

* নবম পারার مَلَا۟ئِهٖ শব্দের লামের পরের আলিফ পড়া হবে না। পড়তে হবে এরূপ مَلَئِهٖ

* ১০ম পারার (সূরা আ'রাফ) وَلَا اَوْضَعُوْا শব্দের লামের পরের আলিফ পড়া হবে না। পড়তে হবে এরূপ وَلَ اَوْضَعُوْا

* ১২শ পারার এবং ২৬ শ পারার ثَمُوْدَا শব্দের আলিফ পড়া হবে না।

* ১৩শ পারার لِتَتْلُوَا শব্দের আলিফ পড়া হবে না।

* ১৫শ পারার (সূরা কাহ্ফ) لَن نَّدْعُوَا শব্দের আলিফ পড়তে হবে না।

* ১৫শ পারার لِشَاْيءٍ শব্দের আলিফ পড়া হবে না। পড়া হবে এরূপ لِشَيْءٍ

* ১৫শ পারার (সূরা কাহ্ফ) لَٰكِنَّا শব্দের নূনের পরের আলিফ পড়া হবে না।

* ১৯শ পারার (সূরা নামল) لَاْاَذْبَحَنَّهٗ শব্দের লামের পরের আলিফ পড়া হবে না।

* ২৩শ পারার (সূরা সাফ্ফাত) لَاْ اِلَى الْجَحِيْمِ - শব্দের لَا এর আলিফ পড়া হবে না।

* ২৯শ পারার সূরা দাহর-এর سَلَاسِلَاْ শব্দের শেষে আলিফ পড়া হবে না এবং এই সূরাতে قَوَارِيْرَا قَوَارِيْرَاْ শব্দটি পাশাপাশি দুইবার আছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় قَوَارِيْرَاْ শব্দের শেষের আলিফ কোন অবস্থাতেই পড়া হবে না, চাই ওয়াকফ করা হোক বা না হোক। আর প্রথম قَوَارِيْرَا শব্দের শেষের আলিফ ওয়াকফ করলে পড়া হবে এবং ওয়াকফ না করলে পড়া হবে না।

* কুরআন শরীফে কোন হরফের উপর জযম থাকলে এবং তার পরের হরফে তাশদীদ থাকলে ঐ জযম ওয়ালা হরফকে পড়তে হবে না।

যেমন- قَدْ تَّبَيَّنَ - قَالَتْ طَّائِفَةٌ - اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ - اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا

তিলাওয়াতের সাজদা

* কুরআন শরীফে মোট ১৪টি সাজদার আয়াত আছে; এগুলো পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে সাজদা দেয়া ওয়াজেব হয়ে যায়। একে সাজদায়ে তিলাওয়াত বা তিলাওয়াতের সাজদা বলে। সাজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ম এই যে, নামাযের ন্যায় পাক পবিত্র অবস্থায় কেবলামুখী হয়ে আল্লাহু আকবার বলে একটি সাজদা করবে, সাজদায় তিনবার সাজদার তাসবীহ পড়ে আবার আল্লাহু আকবার বলে উঠবে। হাত উঠাতে বা বাঁধতে হবে না। না দাঁড়িয়ে বসে বসেও সাজদা করা যায় বা দাঁড়িয়ে সাজদায় গিয়ে সাজদা করে বসে থাকলেও দুরস্ত আছে। শয্যাশায়ী রোগী নামাযের সাজদায় যেরূপ ইশারা করে এই সাজদাও তদ্রূপ ইশারায় করলেই আদায় হয়ে যাবে।

* সাজদার আয়াত তিলাওয়াত বা শ্রবণের সময় উযূ না থাকলে পরে যখন উযূ করবে তখন সাজদা করে নিলেও আদায় হয়ে যাবে। উযূ থাকলেও পরে আদায় করে নেয়া যায় তবে সাথে সাথে সাজদা করে নেয়া উত্তম। মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত সাজদা আদায় করে নিতে হবে; নতুবা গোনাহগার হতে হবে।

* হায়েয নেফাস অবস্থায় সাজদার আয়াত শুনলে সাজদা ওয়াজিব হয় না। কিন্তু গোসলের হাজতের অবস্থায় বা হায়েয নেফাস থেকে পাক হয়ে গোসলের পূর্বাবস্থায় সাজদার আয়াত শুনলে সাজদা ওয়াজিব হবে।

* নামাযের মধ্যে সাজদার আয়াত পড়লে সাজদার আয়াত পড়া মাত্র নামাযের মধ্যেই তৎক্ষণাৎ সাজদা করে নিতে হবে। তৎক্ষণাৎ সাজদা না করে এক দুই আয়াত আরও পড়ার পর সাজদা করলেও দুরস্ত আছে। কিন্তু আরও বেশী পড়ার পর সাজদা করলে সাজদা আদায় হবে না–গোনাহগার হতে হবে।

* নামাযের মধ্যে সাজদার আয়াত পড়ে নামাযের মধ্যে সাজদা না করলে নামাযের বাইরে এই সাজদা আদায় করলে আদায় হবে না। চিরকালের জন্য পাপী থাকতে হবে। এর জন্য এস্তেগফার করতে হবে।

* নামাযের মধ্যে সাজদার আয়াত পড়ে তৎক্ষণাৎ যদি রুকূতে চলে যায় এবং রুকূর মধ্যে সাজদায়ে তিলাওয়াতেরও নিয়ত করে তাতেও সাজদা আদায় হয়ে যাবে। আর রুকূতে অনুরূপ নিয়ত না করলে তারপর যখন সাজদা করবে তখন নিয়ত না করলেও তিলাওয়াতের সাজদা আদায় হয়ে যাবে।

* নামাযের মধ্যে অন্য কারও সাজদার আয়াত পড়তে শুনলে নামাযের মধ্যে সাজদা করবে না, নামাযের পরে সাজদা করবে। নামাযের মধ্যে করলেও তা আদায় হবে না উপরন্তু পাপ হবে। এক জায়গায় বসে একটি সাজদার আয়াত বার বার পড়লে বা শুনলে একটি সাজদাই ওয়াজেব হয়, শর্ত হল মজলিস এক থাকতে হবে–মজলিস পরিবর্তন হলে হুকুম পরিবর্তন হয়ে যাবে। দুনিয়াবী কথাবার্তা বা কাজ দ্বারা মজলিস পরিবর্তন হয়েছে ধরা হবে। এক জায়গায় বসে একাধিক সাজদার আয়াত পড়লে বা শুনলে যত আয়াত তত সাজদা ওয়াজেব হবে।

* রেডিও, টেপরেকর্ড ও গ্রামোফোনে সাজদার আয়াত তিলাওয়াত শুনলে সাজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজেব হয় না। (امداد الفتاوى ج ۲ و آلات جديده كے شرعى احكام)

* সমস্ত সূরা পাঠ করা এবং সাজদা থেকে বাঁচার জন্য শুধু সাজদার আয়াত বাদ দিয়ে যাওয়া মাকরূহ ও নিষিদ্ধ।

ঃ সমাপ্ত ঃ